

15518

ন্যায়-পরিচয়

~~1303.~~

SRI RAMAKRISHNA VEDA VIDYALAYA.

86A, Harish Chatterjee St., Cal-25

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ

প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক স্বত্তিপ্রাপ্ত অধ্যাপক

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

প্রণীত

SRI RAMAKRISHNA VEDA VIDYALAYA
86A, Harish Chatterjee St., Cal-25

This book is a gift presentation

from Radadhar Ashram

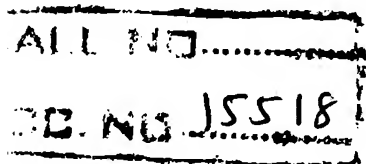
মূল্য ২।০ আড়াই টাকা মাত্র

সর্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ

ইহতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ কর্তৃক প্রকাশিত

যাদবপুর ২৪ পরগণা।



B
181'43
PHN

প্রিন্টার—শ্রীপরীক্ষিতচরণ গুপ্ত

কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

প. ট. গ. লাইব্রারী শ্রীশিক্ষিত ঘাট ইন্ট, বাগবাজার, কলিকাতা

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গ্রন্থাবলী

| | |
|----------------------------------|------|
| হিন্দুসমাজ বিজ্ঞান (২য় সংস্করণ) | ৫৯ |
| শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম্. এ | |
| হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন | ২১১০ |
| শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্. এ | |
| ইতিহাস ও অভিব্যক্তি | ৩৯ |
| শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ | |
| কমিউনিজম্ ও সোশিয়ালিজম্ | ১৮০ |
| শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ | |

যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদে

এবং

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ভূমিকা

শ্যামলাল বাঙ্গালীর জন্ম।

“বঙ্গ আমার জননী আমার” বলিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে স্বদেশের গৌরব গান করিতে এই বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি বিজ্ঞানলাল ঘোষাকে মনে করিয়া গাহিয়াছিলেন—“শ্যামল বিধান দিল রঘুমানি”—সেই রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার “দৌধিতি” টীকার প্রারম্ভে লিখিয়া গিয়াছেন—

“শ্যামল্যধীতে সৰ্বস্তুমুতে কুতুকাগ্নিবক্সমপ্যত্র।

অথ তু কিমপি রহস্যং কেচন বিজ্ঞাতুমোশতে সুধিয়ঃ ॥

অর্থাৎ সকলেই শ্যামলাল অধ্যয়ন করেন এবং সে বিষয়ে গ্রন্থও রচনা করেন। কিন্তু এই শ্যামলালের যে অনির্লচনীয় রহস্য, তাহা বুঝিতে কোন কোন সুধীই সমর্থ হন।

কথাটি তখন অনেকের অগ্রিয় হইতে পারে,—কিন্তু সত্য। কারণ, অসংখ্য ব্যক্তি শ্যামলালের অধ্যয়নাদি করিলেও ইহার অনির্লচনীয় গূঢ় রহস্য বিশেষরূপে, সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে যে অসাধারণ মনীষা অত্যাশঙ্ক, তাহা কখনই সকলে লাভ করিতে পারেন না। আর যে বিষয়ে রঘুনাথ শিরোমণির অপূর্ণ মনীষা যে বঙ্গের অভিনব অমূল্য সম্পদ, ইহা নির্লচনবাদ-সত্য। তাই কতকাল পরে তিনিই ত মিথিলা জয় করিয়া নিখিল ভারতে শ্যামলালের অভিনব যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অভিনব প্রতিভার গুরুগৌরবে ‘বঙ্গ আমার, জননী আমার’—নব্য শ্যামে নিখিল ভারতের গুরুস্থান হইয়া ধ্বং ও জগন্নাথ হইয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরব গান করিতে তাঁহার সম্বন্ধে, প্রখ্যাত যুবক কবি সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই লিখিয়াছেন—

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শািন করি’

বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে, যশের মুকুট পরি’।

কবে সেই বাঙ্গালীর ছেলে রঘুনাথ, মিথিলায় বাইয়া অস্ত্রের অসাধারণ ধনুর্ভঙ্গের ত্রায় সেই সরস্বতীর বরপুত্র মহানৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের পক্ষভঙ্গ-করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া কিরূপে নব্যত্নায়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে ইহা বলা অত্যাবশ্যক যে, রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক বাসুদেব সার্কর্ভোম প্রথমে মিথিলায় বাইয়া, নব্যত্নায় পড়িয়া নবদ্বীপে নব্যত্নায়ের প্রবর্তন করিয়াছিলেন—ইহা সত্য। কিন্তু তিনিই যে বঙ্গের আদি নৈয়ায়িক, তাঁহার পূর্বে বঙ্গদেশে আর কেহ ত্রায়শাস্ত্র পড়েন নাই, ত্রায়শাস্ত্রের কোন গ্রন্থও ছিল না—এই সমস্ত কথা সত্য নহে। বাসুদেব সার্কর্ভোম যে ত্রায়শাস্ত্রের কিছুই না পড়িয়া মিথিলায় গিয়া সেই সমস্ত নব্যত্নায়ের ছাত্র-মণ্ডে স্থান পাইয়াছিলেন এবং প্রথমেই সেই দুর্লভ নব্যত্নায় বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভবই নহে। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি নবদ্বীপে হইতে ত্রায়-শাস্ত্রের অনেক মূল সিদ্ধান্তে ব্যুৎপন্ন হইয়াই মিথিলার নব্য-ত্নায় পড়িতে সেখানে গিয়াছিলেন। তাহা হইলে তখনও যে নবদ্বীপেও ত্রায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ ছিল এবং তাহার অধ্যাপকও ছিলেন, ইহাও স্বীকার্য।

বস্তুতঃ, প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশেও যে ত্রায়-বৈশেষিক শাস্ত্রেরও বিশিষ্ট চর্চা হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মিথিলায় উদয়নাচার্য্যের ত্রায় বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ রাঢ়ায় শ্রীধর ভট্ট যে ত্রায়বৈশেষিক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “ত্রায়কন্দলী” গ্রন্থই নির্বিবাদ প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি ঐ গ্রন্থে বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা করিতে নানা দার্শনিক বিষয়ে যে বিস্তৃত হৃদয় বিচার করিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা বাৎস্তায়নের ত্রায়-ভাষ্য ও উদ্যোতকরের “ত্রায়বার্ত্তিক” প্রভৃতি প্রাচীন ত্রায় গ্রন্থেও যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁহার পূর্ব হইতেই যে বঙ্গদেশেও ঐ সমস্ত গ্রন্থের বিশেষ চর্চা হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি যে দেশান্তর হইতেই ত্রায়বৈশেষিক শাস্ত্র পড়িয়া আসিয়া-ছিলেন এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই নাই। শ্রীধর ভট্ট মীমাংসাদি শাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত

ছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু বৈশেষিকদর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা “জ্ঞায়কন্দলী”ই তাঁহার অক্ষয়কীর্তি। সর্বদেশেই উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জৈন পণ্ডিত রাজশেখরও উহার টীকা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীধর ভট্টের পরে বঙ্গদেশেও তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় অবশ্যই ছিলেন এবং তাঁহারও তৎকালে জ্ঞায় বৈশেষিক শাস্ত্রেরও অধ্যাপনাদি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেকের মতে “জ্ঞায়মঞ্জরী”-কার মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে তিনি জীবিকার্থ কাশ্মীরবাসী হন। জয়ন্ত ভট্টের পুত্র অভিনব যে “কাদম্বরী-ব্ধাসার” রচনা করেন, তাঁহার প্রারম্ভে নিজ বংশ পরিচয় বর্ণন করিতে তিনি লিখিয়াছেন—“শক্তিনামাভবদ্ গোড়ো ভারবাজকুলে দ্বিজঃ।” উহার দ্বারা বুঝা যায়, জয়ন্ত ভট্টের পূর্ব-পুরুষ শক্তি নামে ভারবাজ কুলোৎপন্ন গোড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। অবশ্য ঐ “গোড়” শব্দের দ্বারাই তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। কিন্তু উক্ত শ্লোকে “গোড়” শব্দ প্রয়োগের বিশেষ উদ্দেশ্য কি? তাহাও চিন্তা করা আবশ্যিক। আরও কোন কোন কারণে জয়ন্ত ভট্টের বঙ্গদেশের সহিত সম্বন্ধ বুঝা যায়। এবং “খণ্ডনখাণ্ড”কার মহানৈয়ায়িক শ্রীহর্ষও যে বঙ্গদেশের কোনস্থানে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা বুঝিবারও অনেক কারণ আছে। রাজশেখর হরিও তৎকৃত “প্রবন্ধকোষ”র উত্তরাংশে হরিহর প্রবন্ধে শ্রীহর্ষকে গোড়দেশীয় বলিয়াছেন। পরে মিথিলার কবি বিতাপতিও “পুরুষপরীক্ষা” গ্রন্থে তাহাই বলিয়াছেন। পরন্তু শ্রীহর্ষের “নৈষধ চরিতে”র অনেক শ্লোকে কোন কোন স্থলে যমক ও অল্পপ্রাসে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়—বঙ্গদেশীয় বর্ণোচ্চারণই তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। নচেৎ সেই সমস্ত যমক ও অল্পপ্রাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না (২)। অবশ্য জয়ন্ত ভট্ট এবং শ্রীহর্ষ যে, বাঙ্গালী পণ্ডিত

১। শ্রীধর ভট্ট “জ্ঞায় কন্দলী” গ্রন্থেও তাঁহার পূর্ব রচিত “অবয়সিক্তি”, “তত্ত্বপ্রবোধ”, “তত্ত্বসংবাদিনী”, ও “সংগ্রহটীকা” এই গ্রন্থ চতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়া সেই সমস্ত গ্রন্থেও যে “জ্ঞায়-কন্দলী” গ্রন্থোক্ত সেই সেই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন, ইহা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখন তাঁহার ঐ সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাই না।

২। নৈষধচরিতে—“অমী ততস্তস্ত বিভূষিতং সিতং” (১।৫৭)। “প্রহ্নন শূন্ততর গর্তগহ্বরং” (১।৯৫)। বনস্ত যং নোজ্জ্বলতি জাতু বাতু” (৩।৫২)। “জাগর্গি যোগেশ্বরঃ” ১২।৩৮। “সখ্যমৌলিকতে” ৮

ছিলেন—ইহা সকলেই স্বীকার করেন না। উক্ত বিষয়ে মতভেদ অবশ্য আছে। কিন্তু “শ্রায়কন্দলী”-কার শ্রীধরভট্ট যে বাঙ্গালী পণ্ডিতই ছিলেন,— ইহা নির্দিষ্টবাদ সত্য।

আমরা ব্ধমুখে জানিয়াছি,—শ্রীধরভট্ট বঙ্গদেশের “সপ্তশতী” ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণই পাই নাই। “শ্রায়কন্দলী”র শেষে শ্রীধরভট্টের নিজের উক্তির দ্বারা জানা যায় যে, গোড়দেশে দক্ষিণ রাঢ়ায় বহুপুণ্যকর্মা ব্রাহ্মণসমাজ এবং বহু শ্রেষ্ঠজনের বাসস্থলী “ভূরিস্থিটি” নামে যে সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল (১), সেখানে তাঁহার পিতামহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র (শ্রীধরের পিতা) বলদেবও পরমবিদ্বান্ ও বিবিধ কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার পত্নী (শ্রীধরের মাতা) অচ্ছোকা দেবী “বিগুহকুলসম্ভবা” ও বহুগুণবতী ছিলেন। শ্রীধরভট্ট তৎকালে ঐ দেশের অধিপতি কায়স্থকুলতিলক পাণ্ডুদাসের প্রার্থনায় “ত্র্যধিকদশোত্তর নবশত শাকাব্দে” অর্থাৎ ৯১৩ শকাব্দে (৯৯১ খৃঃ) “শ্রায়কন্দলী” রচনা করেন (২)।

(১)১৩৮। “অবোধিতজ্ঞাগর হুঃখসাক্ষিণী” ১১৪৯। নথিঃ কিতাখানি বিলিখ্য পক্ষিণা” ৯৬৬। আরও বহুস্থলে দ্রষ্টব্য। “সধ্য মীকতে” “হুঃখসাক্ষিণী” ইত্যাদি বহুস্থলেই শ্রীধর যে “ধকার” ও “ক”কারের বঙ্গদেশীয় একরূপ উচ্চারণই করিতেন, ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক।

১। শ্রীধরভট্ট লিখিয়াছেন :—“আসীদক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মাণাং। ভূরিস্থিতিরিত্তি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠকন্যাস্রয়ঃ”। “প্রোধোচন্দ্রোদয়” নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণমিশ্রও লিখিয়াছেন—“গোড়ং রাষ্ট্রবহুতমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া ততো ভূরিশ্রেষ্ঠকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা” ॥ গোড় রাঢ়ে রাঢ়া পুরীর অন্তর্গত শ্রীধরভট্টোক্ত “ভূরিস্থিটি” গ্রামকেই শ্রীকৃষ্ণমিশ্র উক্ত শ্লোকে “ভূরিশ্রেষ্ঠিক” নামে উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। টাকাকার হরীকেশ শাস্ত্রি মহাশয় সেখানে লিখিয়াছেন—“ভূরিশ্রেষ্ঠিগ্রামস্ত অধুনা “ভূরহট্” ইতি প্রসিদ্ধিঃ।” বস্তুতঃ, বর্তমান হুগলী জেলার মধ্যে এখনও ভূরহট্ নামে গ্রাম আছে।

২। অনেক ঐতিহাসিক খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে রাঢ়াধিপতি কায়স্থরাজ পাণ্ডুদাসকে বৌদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু “শ্রায়কন্দলী” গ্রন্থে শ্রীধরভট্ট বৌদ্ধমতের যেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং কোন স্থলে কোন প্রসঙ্গে “গুণরত্নাভরণঃ কায়স্থকুলতিলকঃ পাণ্ডুদাসঃ”—এইরূপ বলিয়া পাণ্ডুদাসের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীধরভট্টের অন্তর্গত ঐ পাণ্ডুদাস যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরোধীই ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। পরে রাঢ়াধিপতি অন্ত কোন পাণ্ডুদাস বৌদ্ধ হইতে পারেন।

ত্রিধরভট্টের পরে রাঢ়দেশে হরিবর্ষদেবের মন্ত্রী প্রবল বৌদ্ধবিরোধী সিদ্ধলগ্রামী ভবদেবভট্ট মীমাংসাদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কুমারিলভট্টের মতানুসারে অনেক মীমাংসাগ্রন্থ এবং স্মৃতি নিবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরে তাঁহার যে প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জ্ঞানাদি সর্বশাস্ত্রেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বিশিষ্ট নৈয়ায়িক না হইলে ভবদেবের জায় মীমাংসক হওয়া যায় না। আর পূর্বকালে যাহারা মীমাংসা শাস্ত্র পড়িতেন, তাহারা সকলেই ন্যায়-শাস্ত্রও অবগত পড়িতেন। কারণ জ্ঞানশাস্ত্রে অধিকার ব্যতীত মীমাংসা-দর্শনের প্রমাণ-ভাষ্যাদি বুঝা যায় না। যিনি জ্ঞানশাস্ত্রের কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি কখনই মীমাংসক হইতে পারেন না। বঙ্গের পাল বংশের রাজা মহীপাল দেবের প্রদত্ত কোন তাম্র শাসনে দেখা গিয়াছে, তিনি “মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাশাস্ত্রী” বৃক্ষাদিত্য শর্ম্মাকে কোন গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এইরূপ, কামরূপেও মহারাজ ইন্দ্র পালের প্রদত্ত (গোহাটিতে প্রাপ্ত) কোন তাম্র-শাসনে “সুবিদ্যুতানামপদ-ব্যাক্য-তর্ক” ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার ব্যাকরণ, মীমাংসা এবং তর্ক শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য বর্ণিত হইয়াছে। (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত “কামরূপশাসনাবলী” ১২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা লক্ষণ সেনের সময়েও বঙ্গে হলায়ুধ প্রভৃতি “মীমাংসক” ও অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। লক্ষণ সেনের সভাপণ্ডিত মহামনীষী হলায়ুধ “মীমাংসাসর্কস্ব” নামে মীমাংসা-গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার “ব্রাহ্মণসর্কস্ব” গ্রন্থের প্রারম্ভে নিজের উক্তির দ্বারা ই জানা যায়। আমরা বৃদ্ধ মুখে শুনিয়াছি—লক্ষণ সেনের রাজসভায় কোন নৈয়ায়িক তাঁহার দারিদ্র্য-বর্জন ছলে উপস্থিত মীমাংসকদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছিলেন—

অভাবা ভ্রাতরঃ সর্কে মীমাংসকভয়াদ্ধিতাঃ।

মাং নৈয়ায়িকমাপ্রিত্য তিষ্ঠন্তি মম বেষ্মনি ॥

অর্থাৎ সমস্ত অভাব রূপ ভ্রাতৃগণ মীমাংসকদিগের ভয়ে কাতর হইয়া নৈয়ায়িক আমাকে আশ্রয় করিয়া আমার গৃহে অবস্থান করিতেছে। আমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছি।

এখানে জানা আবশ্যক যে, মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু প্রভাকরের সম্প্রদায় ভাব পদার্থ হইতে ভিন্ন অভাব পদার্থ স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদিগের মতে—যে আধারে কোন অভাব বোধ জন্মে, সেই আধার হইতে সেই অভাব কোন পৃথক পদার্থ নহে। যেমন ‘ভূতলে ঘট নাই’ এইরূপ যে বোধ, তাহা তাদৃশ ভূতলেরই বোধ, অর্থাৎ তৎকালীন তাদৃশ ভূতল হইতে ভিন্ন সেই ভূতলস্থ ঘটাব নামে কোন পদার্থ নাই। বঙ্গদেশেও প্রাচীন কাল হইতে উক্ত প্রভাকর সম্প্রদায়ের বহু মীমাংসক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা গোড়মীমাংসক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। “গ্রন্থকুসুমাজ্জলি” গ্রন্থে (৩১৪) উদয়নাচার্য্যও উপহাসপূর্ব্বক কোন গোড়মীমাংসকের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১)।

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসক সম্প্রদায়ের সহিত বঙ্গদেশেও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের বহু বিষয়ে বহু বিচার হইত। তাঁহারা অতিরিক্ত অভাব পদার্থ খণ্ডন করিতেন এবং নৈয়ায়িকগণ তাহা সমর্থন করিয়া বলিতেন—অভাব পদার্থ, ভাব পদার্থ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন, স্তব্ধতা ভাব ও অভাব নামে পদার্থ দ্বিবিধ। ঐ দ্বিবিধ পদার্থ ভিন্ন আর কোন পদার্থ জগতে নাই। তাই কোন কবি লক্ষণসেনের রাজসভায় তাঁহার যশোবর্ণন করিতে কোন সময়ে বাঙ্গালী নৈয়ায়িকদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছিলেন—

ভাবাদভাবাদৃ যদি নাতিরিক্তঃ সন্ধিক্ষিভিঃ স্বীক্ৰিয়তে পরার্থঃ।

জ্ঞাতা বিনাশি প্রতিযোগিশূন্যং ত্রীলক্ষণক্ৰোণিপতের্দশঃ কিম্ ?

তাত্পর্য্য এই যে যদি সন্ধিক্ষিগণ অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ ভাব ও অভাব হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে রাজা লক্ষণসেনের যশঃ কি পদার্থ হইবে? উহা ভাব পদার্থ বলা যায় না। কারণ ভাব পদার্থ যদি কোন কারণ-জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে কোন কালে তাহার বিনাশ অবশ্যস্বাবী, ইহা নৈয়ায়িকদিগেরও সিদ্ধান্ত। কিন্তু

১। কুহমাঙ্গলির প্রাচীন টীকাকার বরদরাজ উদয়নোক্ত গোড় মীমাংসককে “পক্ষিকাকার” বলিয়াছেন। প্রভাকরের শিষ্য “প্রকরণপক্ষিকা”কার শালিকনাথই উক্তরূপে উদয়নের অভিপ্রেত হইলে তিনি তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্তী। তাঁহার বহু পূর্ব্বক বঙ্গে মীমাংসক পণ্ডিতের সংবাদ পাওয়া যায়।

রাজা লক্ষণ সেনের যশঃ তাঁহার নানাগুণ জ্ঞাত পদার্থ হইলেও উহা অবিনাশী। সুতরাং উহাকে ভাব পদার্থ বলা যায় না। এইরূপ উহাকে অভাব পদার্থও বলা যায় না। কারণ, উহা “প্রতিযোগিশূন্য” অর্থাৎ উহার প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী আর কাহারও যশঃ নাই। যাহার প্রতিযোগী অণীক, তাহা যে অভাব পদার্থ হইতে পারে না—ইহাও নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে রাজা লক্ষণ সেনের যশঃ কি পদার্থ হইবে? উহা যখন ভাব পদার্থও হয় না, অভাব পদার্থও হয় না, তখন সৎস্বকীদিগের মতে উহা কি কোন পদার্থই নহে? পাঠক কবির অভিনব কল্পনায় প্রণিধান করিবেন। *

সেন রাজত্বের অবসানে মুসলমান রাজ্যারম্ভেও বঙ্গ বহু নৈয়ায়িক ছিলেন। বর্তমান রাঙ্গসাহী জেলার অন্তর্গত নন্দনবাসি গ্রামে দিবাকর ভট্টের পুত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলপ্রদীপ কুল্লুক ভট্ট মীমাংসা ও শ্রায়শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পরে বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে আসিয়া “মহুসংহিতা”র যে টীকা করেন, তাহার প্রারম্ভে “মীমাংসে বহু স্বেবিতাসি শূদ্র স্তব্ধাঃ সমস্তাঃ স্ব মে”—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা তাঁহার অধীত তর্কশাস্ত্রের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কারণ তর্কশাস্ত্রে অধিকার ব্যতীত তর্ক দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয়ও করা যায় না। তাই ভগবান্ মহুও শেষে বলিয়াছেন—“বস্তুর্কেণামুসন্ধ্যন্তে স ধর্ম্মং বেদ নৈতরঃ”।

কুল্লুকভট্ট কাশীবাসী হইলেও উত্তরবঙ্গে কায়স্থ রাজা গণেশের আশ্রয়ে তখন রায় মুকুট বৃহস্পতি নানাশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। গণেশের পুত্র যহু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া “জালালউদ্দীন” নাম ধারণ করিলে তখনও বৃহস্পতি তাঁহার নিকটে বহু প্রকারে বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

* নৈয়ায়িকগণ “সমবায়” প্রভৃতি নানা প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করার উক্ত শ্লোকে কবি তাঁহাদিগকে ঐ অর্থে “সম্বন্ধী” বলিয়াছেন—ইহা বুঝা আবশ্যক। আর উক্ত “সম্বন্ধিভিঃ” এই পদের দ্বারা কিরূপ ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক। এবং জানা আবশ্যক, বঙ্গদেশে বাঙ্গালীরাই শ্যালকক সম্বন্ধী বলে। মিথিলাদি দেশে বৈবাহিক প্রভৃতিকেও সম্বন্ধী বলে। মৈথিল নৈয়ায়িক-গণকে কেহ “সম্বন্ধী”, বলিলে তাঁহারা ঐরূপ তিরস্কার বুঝিতে পারেন না।

তিনি অমরকোষের টীকা এবং আরও অনেক গ্রন্থের টীকা করেন। পরে “স্মৃতি কণ্ঠহার” নামে স্মৃতি-নিবন্ধও রচনা করেন। সেই নিবন্ধ এখনও বিদ্যমান আছে। মীমাংসা এবং ত্রায়শাস্ত্রেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। এইরূপ বঙ্গের প্রাচীন স্মার্ত পারিভাষ্য বংশজাত “দায়ভাগ”কার জীমূতবাহন এবং তাঁহার পরে “শ্রাদ্ধ বিবেক” প্রভৃতি স্মৃতি নিবন্ধকার শূলপাণি এবং আরও যে অনেক স্মৃতি নিবন্ধকার পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারাও যে সকলেই ত্রায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠেই বুঝা যায়। বস্তুতঃ, ত্রায়শাস্ত্রে কোন অধিকার না থাকিলে ঐ সমস্ত নিবন্ধ রচনা সম্ভবই হইতে পারে না। আর ব্যাকরণ শাস্ত্রের টীকা টিপ্পনী এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের হৃদয় বিচার বুঝিতেও ত্রায়শাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত-জ্ঞান আবশ্যক। যিনি ত্রায়শাস্ত্রের কিছুই পড়েন নাই, তিনি পূর্বকালে বৈয়াকরণ বলিয়াও গণ্য হইতেন না। সুতরাং নবদ্বীপে নব্যত্রায়-প্রতিষ্ঠার পূর্বেও বঙ্গে ত্রায়শাস্ত্রেরও পঠন-পাঠনা অব্যাহত ছিল, সন্দেহ নাই। ন্যায়শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য বোদ্ধা এবং সমস্ত সিদ্ধান্তবেত্তা সকলে না হইলেও প্রাচীনকালেও শাস্ত্র বিচারার্থী সমস্ত অধিকারীই যথাসম্ভব ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাই রঘুনাথ শিরোমণি সত্যই বলিয়াছেন—“ন্যায় মণীতে সর্বকঃ”।

মিথিলার প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়

সুপ্রাচীন কাল হইতেই মিথিলায় গৌতমের ত্রায়সূত্রাবলম্বনে ত্রায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তার হইয়াছে সন্দেহ নাই। ত্রায়ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন মৈথিল কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। মিথিলার কত নৈয়ায়িক যে, চিরকালের জন্য অজ্ঞানের গুহগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু ভারতের চিরন্তন সৌভাগ্যবশতঃ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নানাদর্শন-টীকাকার শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র এবং মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য অমরতলাভ করিয়া বহুজ্ঞানের মনোমন্দিরে বিদ্যমানই আছেন। “কৌত্তি যন্ত স জীবতি”।

বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচনও নানাদর্শন-নিষ্ণাত মহানৈয়ায়িক ছিলেন, তাঁহারও অনেক গ্রন্থ ছিল। যৌদ্ধাচার্য্য শঙ্করানন্দ “অপোহ-

সিদ্ধি” গ্রন্থে ত্রিলোচনের নামোল্লেখ পূর্বক তাঁহার অনেক মতের উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ত্রিলোচন-গুরুর নিকটে উপদেশ পাইয়াই যে, বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের “ন্যায় বার্তিক”র টীকা করেন, ইহা তাঁহার নিজের উক্তির দ্বারাও জানা যায়। “তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি” টীকার প্রারম্ভে উদয়নাচার্য্য তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। *

মিথিলার নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায় ও নব্যন্যায়

উদয়নাচার্য্যের পরে তাঁহারই সম্প্রদায়-ক্রমে মিথিলার “মঙ্গলবনী” (মঙ্গলোনী) গ্রামে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অভ্যুদয় হয় (১)। তিনি অভিনব প্রণালীতে ন্যায় শাস্ত্রে “তত্ত্বচিন্তামণি” নামে অপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। গোতমের ন্যায় সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই প্রমাণ চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া ঐ গ্রন্থ রচিত হওয়ায় উহা ন্যায়-শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ খণ্ড, অনুমান খণ্ড, উপমান খণ্ড ও শব্দ খণ্ড, এই চারি খণ্ডে বিভক্ত “প্রকরণ” গ্রন্থ। উহার মধ্যে “ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি” গ্রন্থও আছে, তাহা অনুমান খণ্ডেরই অন্তর্গত। গঙ্গেশের পূর্বে মিথিলায় সোন্দড় উপাধ্যায়ও নবীনভাবে পদার্থ তত্ত্ব বিচার করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থে গঙ্গেশ তাঁহারও মত খণ্ডন করিয়া অতি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা নিজমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সোন্দড়ের গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

* বাচস্পতি মিশ্রের “জ্ঞান-সূচী-নিবন্ধ” গ্রন্থের শেষোক্ত স্লোকে “বৎসর বহুবৎসরে” এই পদে “বৎসর” শব্দের দ্বারা বৈধর্ম্য সংবৎ বুঝিলে ৮৯ সংবতে অর্থাৎ ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন, ইহা বুঝা যায়। নানাকারণে ষাটরাও পরে উক্ত মতই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। উদয়নাচার্য্যের “লক্ষণাবলী” গ্রন্থের শেষে “তর্কীষারক” ইত্যাদি স্লোকের দ্বারা তিনি যে ৯০৬ শকাব্দে (৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ গ্রন্থ রচনা করেন,—ইহা জানা যায়। আরও নানা কারণে তিনি যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগেই জ্ঞান্যচার্য্য বলিয়া স্থপতিষ্ঠিত হন, ইহা বুঝা যায়। উদয়নাচার্য্যের সময় হইতেই মিথিলা জ্ঞান শাস্ত্রের বিদ্যা পীঠ বলিয়া সর্বদেশে প্রসিদ্ধ হয়।

১। খণ্ডন খাদ্যাকার জীর্ঘ ও “জ্ঞানলীলাবতী”কার বরভাণ্ডার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নহেন। গঙ্গেশ নিজগ্রন্থে ঐ উভয়েরই মত খণ্ডন করিয়াছেন। আর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে “প্রত্যক্ষ তত্ত্ব প্রদীপিকা” (চিংহুখা) গ্রন্থকার ঐতৈবাদী বৈদান্তিক চিংহুখ মুনি যে গঙ্গেশের “তত্ত্ব-

গঙ্গেশ উপাধায় “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থে ভ্রায়মতানুসারে বহু পদার্থ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অভিনব প্রণালীতে যেরূপ বিস্তৃত হৃদয় বিচার করিয়াছেন, প্রথমে পূর্বপক্ষরূপে নানা মতের উল্লেখ ও হৃদয় বিচার দ্বারা সেই সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া পরে যেরূপে নিজ সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিশেষতঃ ‘অনুমান’ খণ্ডে অনেক অভিনব পারিভাষিক শব্দের দ্বারা “ব্যাপ্তি” প্রভৃতি অনেক পদার্থের যে ভাবে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ভ্রায়শাস্ত্রে সত্যই অভিনব অপূর্ব। তাই উহাই পরবর্তী নব্য ভ্রায়ের মূল গ্রন্থ বলিয়া কথিত হয়। পরবর্তী বহু নৈয়ায়িক উহারই টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি করিয়া ক্রমশঃ আরও হৃদয়ান্তি হৃদয় বিচার দ্বারা উহারই পরিপুষ্ট ও প্রচার করিয়া নব্য ভ্রায়ের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তাই তখন হইতে তাঁহাদিগের সেই সমস্ত গ্রন্থই নব্যভ্রায় বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। প্রথমে গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধায় এবং তাঁহার পুত্র যজ্ঞপতি “তত্ত্বচিন্তামণি”র ব্যাখ্যা ও অধ্যাপনার দ্বারা উহার প্রচার করেন। পরে অগ্র সম্প্রদায় গঙ্গেশের ঐ গ্রন্থের প্রতিবাদ করিলে যজ্ঞপতির পুত্র নরহরি প্রণিতামহের মত রক্ষা করিতে সেই সমস্ত প্রতিবাদের খণ্ডন করেন। তৎকৃত “প্রত্যক্ষ দূষণোদ্ধার” ও “অনুমান দূষণোদ্ধার” প্রভৃতি গ্রন্থও বিদ্যমান আছে। পরে যজ্ঞপতিরই সম্প্রদায়-ক্রমে মিথিলায় ভবনাথ মিশ্র ও তাঁহার পুত্র শঙ্কর মিশ্র এবং স্মৃতি নিবন্ধকার দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্র, প্রগল্ভ মিশ্র, হরি মিশ্র এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ও ছাত্র সুপ্রসিদ্ধনামা পক্ষধর মিশ্র এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ও ছাত্র বাহুদেব মিশ্র এবং রুচি মন্ত প্রভৃতি মহানৈয়ায়িকগণ “তত্ত্বচিন্তামণি”র ব্যাখ্যা ও অধ্যাপনাদির দ্বারা মিথিলায় নব্যভ্রায়ের সুপ্রতিষ্ঠা করেন।

গঙ্গেশ প্রথমে “তত্ত্বচিন্তামণি”-রচনার দ্বারা মিথিলায় নব্যভ্রায়মন্দিরের যে মণিময় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার উপরেই ক্রমে সুদক্ষ টীকাকারগণ

চিন্তামণি” গ্রন্থও পাঠ করিয়া দব্যভ্রায়েরও অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং তিনি ভ্রায় মত খণ্ডন করিতে গঙ্গেশের অনেক কথাও প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়। আরও নানাকারণে গঙ্গেশ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে “তত্ত্বচিন্তামণি” রচনা করেন—ইহাই আবাদিগের ধারণা। গঙ্গেশের জন্মস্থানাদি বিষয়ে অসঙ্গত কথা গ্রন্থকৃত ভ্রামাচরণ সিংহ প্রণীত “ত্রিহুতের ইতিহাসে” উল্লিখ্য।

নব্যতায়ের সুবিশাল সমুচ্চ মহামন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া ভারতের বিদ্বৎ-সমাজকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তখন গঙ্গেশের “তত্ত্বচিন্তামণি”র এমন প্রতিষ্ঠা হয় যে, যিনি উহা পড়েন নাই, তিনি নৈমায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। এবং যিনি “তত্ত্বচিন্তামণি”র টীকা করিতে পারিতেন, তিনি তখন ভারতের বিদ্বৎসমাজে অসামান্য গৌরব লাভ করিতেন। তাই তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র বিজার্থী “তত্ত্বচিন্তামণি” এবং তাহার টীকা পড়িবার জন্য মিথিলায় বাইতেন। তখন মৈথিল নৈমায়িকগণ মিথিলার সেই মহাগৌরব রক্ষার জন্য সেই সমস্ত গ্রন্থকে মিথিলার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া বিদেশীয় কোন ছাত্রকে উহা লিখিয়া লইতে দিতেন না। মিথিলায় অধ্যয়ন কালেই তাঁহার পাঠ্য পুস্তক দেখিতে পাইতেন। কিন্তু তথাপি স্বদূরদেশ হইতেও বহু ছাত্র বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থ পড়িবার জন্ত মিথিলায় বাইতেন। বঙ্গদেশ হইতে মনস্বী বামুদেব সার্কভৌমই প্রথমে ঐ উদ্দেশ্যে মিথিলায় গিয়া “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থের অনেক অংশ পাঠ করিয়াই তাঁহার অসাধারণ সৃষ্টিশক্তিবলে উহা কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি প্রথমে তাঁহারই নিকটে অধ্যয়ন করিয়া পরে পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়নাদির উদ্দেশ্যে মিথিলার গিয়াছিলেন—ইহা বঙ্গদেশের সর্বত্র চিরপ্রসিদ্ধ আছে (১)। অনেকেই বামুদেব সার্কভৌমকেও পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বলিয়াই লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, তিনি পক্ষধর মিশ্রের সহাধ্যায়ী এবং তাঁহার অধ্যয়ন কালানুসারে উহাই সম্ভব মনে করি। পরে সেকথা বলিব। এখন সেই জগদ্বিখ্যাত বামুদেব সার্কভৌম ও তাঁহার ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণির কিছু পরিচয় বলা আবশ্যক।

(১) “কুহমাঙ্গলি-কারিকা-ব্যাখ্যা”কার নবদ্বীপের হরিদাস ভট্টাচার্য্যও যে বামুদেব সার্কভৌমের ছাত্র, এবিষয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু তিনিও যে মিথিলায় গিয়াছিলেন এবং কুহমাঙ্গলি-কারিকা পাঠ করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করিয়াই নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমে উহার প্রচার করেন, ইহা অনেক বৃদ্ধ পণ্ডিত বলিতেন। বস্তুতঃ কুহমাঙ্গলির পঞ্চম স্তবকে উদ্যমকৃত “উদ্দেশ্য এবং

বাসুদেব সার্কভোম ও রত্ননাথ শিল্পোন্নতি

বঙ্গের বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবংশজ আখণ্ডলের সন্তান নরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের নিকটে কোনস্থানে বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেশ্বর বিশারদ মহাপন্থী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের সংলগ্ন বিজ্ঞানগরে আসিয়া বিশারদ নামেই খ্যাত হন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র মহানৈয়ামিক জগদ্বিখ্যাত বাসুদেব সার্কভোম। তিনি পরে সার্কভোম ভট্টাচার্য্য নামেই খ্যাতিলাভ করেন। বিশারদের কনিষ্ঠ পুত্র রত্নাকর বিজ্ঞাবাচস্পতি, বিজ্ঞাবাচস্পতি নামেই খ্যাত হন। মহেশ্বর বিশারদ শেষ জীবনে বাশীবাসী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সার্কভোম ভট্টাচার্য্যও তখন নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উৎকলে প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত-রূপে তথায় বাস করেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিজ্ঞাবাচস্পতি নবদ্বীপেই বিজ্ঞানগরে ছিলেন। তিনি পরে বঙ্গাধিপতি হুসেনশাহের নিকটেও বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত সার্কভোম ভট্টাচার্য্য এবং

ভাণ্ডার্য্য" ইত্যাদি কারিকাটি হরিদাস নিজকৃত ব্যাখ্যার মধ্যেই "তত্ত্বত্বে" বর্ণিয়া অঙ্ককৃত-কারিকার স্থায় উদ্ধৃত করার বুরা যায়, তখনও মূল "কুহমাঞ্জলি" গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হয় নাই। পাবনা জেলার সালিখা গ্রামনিবাসী গোবিন্দবিজ্ঞাত্মণ মহাশয় (যিনি সরকার-কর্তৃক মূর্শিদাবাদে বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন) তৎকৃত "লঘুভারত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন— "স এবোদয়নাচার্য্যশ্চিকার কুহমাঞ্জলিঃ। তীর্থপর্যটনাররুং তস্মাদ্ গোড়ে প্রকাশিতং"। অর্থাৎ (১৪শ শতাব্দীতে) উত্তর বঙ্গের প্রখ্যাতনামা উদয়নাচার্য্য ভাট্টা মহাশয়ই তীর্থপর্যটনে যাইয়া কোনস্থানে কুহমাঞ্জলি গ্রন্থ লাভ করিয়া উহা বঙ্গদেশে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উদয়নাচার্য্য ভাট্টা মহাশয়ের বংশধরগণ যে উক্ত ভাট্টা মহাশয়কেই কুহমাঞ্জলি গ্রন্থকার বলেন,—(বহু প্রতিবাদ শুনিয়াও "স্বপ্নতসংহিতা"র টীকার প্রারম্ভে কবিরাজ ঐযুক্ত হারাণ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ও অসংকোচে তাহাই লিখিয়া নিজঃশের গৌরব ব্যাপন করিয়াছেন)—সেই নিতান্ত অসম্ভব অসত্য লিখিতে না পারিয়া পূর্বেই বারেক্স ব্রাহ্মণকুলপ্রদীপ স্থপণ্ডিত বিজ্ঞাত্মণ মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত গিয়াছেন, ইহাই মনে হয়। উদয়নাচার্য্য ভাট্টা মহাশয় যে, "কুহমাঞ্জলি", "শাস্ত্রতত্ত্ববিবেক", "কিরণাবলী" ও "লক্ষণাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থকার উদয়নাচার্য্যের বহু পরবর্তী এবং কুহমাঞ্জলি গ্রন্থরচনার তাহার ঘে সামর্থ্যই ছিলনা, ইহা "লঘুভারত"কার উক্ত বিজ্ঞাত্মণ মহাশয় অবশ্যই জানিতেন।

তঁাহার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি উভয়েই পরে শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হন। চৈতন্যভাগবতাদিগ্রন্থে সেই সমস্ত বার্তা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। *

রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাসও নানাপ্রকারে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য নামেই সর্বত্র খ্যাত হন। তিনিই প্রথমে মুক্তবোধ ব্যাকরণের টীকা করিয়া নববীণে ঐ ব্যাকরণ প্রচলিত করেন। তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থেরও টীকা করিয়াছিলেন। পূর্বে ঐ টীকার কোন সংবাদই আমরা পাই নাই। কিন্তু কিছুদিন হইল কাশীধামে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের গৃহে আমি ঐ টীকার অতি পুরাতন এক পুথী দেখিয়াছি। উহার প্রথমে আছে—

* কোন কোন খ্যাতনামা বিদ্বৎ ব্যক্তিও বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য নববীণের নৈয়ায়িক বাহুদেব সার্কভৌম নহন, তিনি উৎকলবাসী অদ্বৈতবাদী বৈরাগিক। তদনুসারে আমারও পূর্বে এরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু নববীণের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র মহানৈয়ায়িক বাহুদেব সার্কভৌমই যে, পরে উৎকলবাসী হইয়াছিলেন এবং তিনিই যে পরে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ দ্বারাও তাহাই নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। লোচনবাস তৎকৃত “চৈতন্যমঙ্গল” তাহার বাহুদেব নামের উল্লেখ করিয়াই লিখিয়াছেন—“উত্তরিল বাহুদেব সার্কভৌম বর” (মধ্যখণ্ড)। জয়ানন্দ তৎকৃত “চৈতন্যমঙ্গল” লিখিয়াছেন—“বিশারদ সূত্র সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য। সবংশে উৎকলেগোত্র হাড়ি গোড়রাজ্য। উৎকলে প্রতাপরত্ন ধর্ম্মরাজ। রত্নসিংহাসনে সার্কভৌমে কৈলা পূজা। তাঁর ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গোড়ে বসি। বিশারদ নিবাস করিল বারাগনী”। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকাতেও লিখিত আছে—“উৎকলে সার্কভৌমজন্ম বারাগন্ত্যঃ বিশারদঃ। বিদ্যা-বাচস্পতিগোড়ে ত্রিভিধস্তা বহুকরা”। রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও লিখিয়াছেন—“অনেক বড় বড় বাঙ্গালী পুস্তকান্তরে বাইরা বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাহুদেব সার্কভৌম সর্বপ্রধান। এই বাহুদেব সার্কভৌমই সর্ব প্রথম মিথিলায় গিয়া স্মাশপাত্র পড়িয়া আসেন।”

বস্তুতঃ উক্ত সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য যে, মহানৈয়ায়িক ছিলেন, তাই তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের মত খণ্ডনের দ্রষ্টা ন্যায়দর্শনোক্ত “বিতণ্ডা” এবং “হল”ও করিয়াছিলেন এবং শেষে বলিয়াছিলেন—“তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপণ্ড”—এবং প্রথমে তিনি নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অব্যবহার করাইয়াছিলেন—ইহা “চৈতন্যচরিতামৃত”র মধ্যখণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

“বিশারদতন্ত্রস্ত বিদ্যানিবাসপতে: স্তুত:। বিদ্যানিবাসস্তমুতে চিন্তামণি-
বিবেচনঃ” । •

বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্যের পুত্র রুদ্রনাথ শ্রায়-বাচস্পতি এবং বিশ্বনাথ শ্রায়-
পঞ্চাননও নানাগ্রন্থকার মহা নৈদামিক হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের “ভাষা-
পরিচ্ছেদ,” “সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী” ও “শ্রায়-স্থত্র বৃত্তি” সর্বদেশে প্রচলিত
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মহেশ্বর বিশারদের তপ: প্রভাবে তাঁহার বংশধর পণ্ডিতগণ
নানাশাস্ত্রে অসীম পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ভগবদ্ ভক্তির সমন্বয় দ্বারা নিজ
জীবন সার্থক করিয়া থকা হইয়াছেন এবং জন্মভূমি বঙ্গদেশকেও ধন্য করিয়া
গিয়াছেন। ত্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—

বিশারদ চরণে আমার নমস্কার ।

সার্কভৌম বাচস্পতি নন্দন যাহার ॥

চৈতন্য ভাগবত, অম্বা ওর অং ।

বাসুদেব সার্কভৌমের ছাত্র বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থান ও
বংশপরিচয়াদি এ পর্যন্ত নির্বিক্রমে নিশ্চিত হয় নাই। অনেকদিন হইতে
“শ্রীকৃষ্ণের ইতিবৃত্ত” লেখক প্রভৃতি কোন কোন স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তি “বৈদিক-
সংবাদিনী” নামক আধুনিক কুলগ্রন্থালুসারে বলিতেছেন যে, মিথিলা হইতে

* ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত “কাশীনাথ বিদ্যানিবাস”
এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যানিবাস সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন।
কিন্তু তিনিও তাঁহার “তত্ত্বচিন্তামণি”র টীকার কথা লেখেন নাই। তিনি উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে,
ককিচন্দ্র নামে এক কাবস্থ বিদ্যানিবাসের জন্য “কৃত্য কল্পতরু”র এক অংশ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে নকল
করেন। সেই পুণ্ড্রাবানি এখন ইণ্ডিয়া অফিস আছে। তাহা হইলে বুঝা যায়—উক্ত বিদ্যানিবাস
যোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। আমি বিদ্যানিবাসের “তত্ত্বচিন্তামণি”র টীকার অন্ত
এক পৃষ্ঠাও উক্ত স্থানে দেখিয়াছি, উহার শেষে আছে—“শকমণি পরীক্ষা”,—উহা তত্ত্বচিন্তামণি’র
শব্দবহুর কিয়ংশের টীকা। উহার সর্বশেষে আছে—“বিদ্যানিবাসানাম পুস্তকমিদং ভবানন্দ নন্দিনী
কাশ্যাং লিখিতং। শকাব্দা: ১৫০৩।” প্রথমোক্ত পুথীর শেষে আছে—“কৃষ্ণবাস যোগেশ লিখিতং
শকাব্দা: ১৫০৫।” কাণ্ডে লিখিত বিদ্যানিবাসের ঐ পৃষ্ঠা দেখিলে মনে হয়, তিনি তখন কিছু-
দিন কাশীতেই ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে দিল্লীতে ভারতীয় পণ্ডিতগণের দুই সভাতেই উপস্থিত
হইয়া বাঙ্গালী পণ্ডিত সমাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত
প্রবন্ধ ত্রুটিব্য।

শ্রীধরাচার্য্য নামক কাত্যায়নগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চগুণ নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহা হইতে অধস্তন ২৮শ পুরুষ পণ্ডিত গোবিন্দ চক্রবর্তী। তাঁহার ঔরসে সীতাদেবীর গর্ভে প্রথমে রঘুপতি, পরে রঘুনাথের জন্ম হয়; রঘুনাথ প্রথমে মাতার আদেশে নিজ গ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের নিকটে অধ্যয়নারম্ভ করেন। কএক বৎসর পরে তাঁহাদিগের অমতে জ্যেষ্ঠ রঘুপতি ঐ দেশের রাজা সুবিন্দনারায়ণের ঋজুকন্যা রত্নাবতীকে বিবাহ করায় সমাজে তাঁহাদিগের বড় কলঙ্ক হয়। ক্রমে সেই কলঙ্ক অসহ্য হইলে সীতাদেবী কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাহুদেব সার্কভোমের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। কেহ কেহ ঐ ঘটনার কোন কোন কথা অনাক্রম্য লিখিয়াছেন। এইমতে রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টের কাত্যায়নগোত্রীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিশ্বকোষেও এইমতই বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমি জানি, শ্রীহট্টের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতও রঘুনাথ শিরোমণির উক্তরূপ পরিচয় একেবারেই স্বীকার করেন না। কেহ কেহ উহার প্রতিবাদও করিয়াছেন। তবে রঘুনাথ শিরোমণির যে শ্রীহট্টেই জন্ম, ইহা তাঁহারাও দৃঢ় বিশ্বাসে বলেন। কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাহা বলিতেন না। অনেকে বলিতেন, রঘুনাথ শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলায় কোটামানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্টের ঐ রঘুনাথ, রঘুনাথ শিরোমণি নহেন। তিনি রঘুনাথ শিরোমণির পূর্ববর্তী। এ বিষয়ে বহুদিন হইতে বহু বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছে (১)। উভয়মতের সমালোচনা করা এখানে সম্ভব নহে, বিশেষ আবশ্যকও নহে। রঘুনাথ যেখানেই জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি, তিনি বাঙ্গালার মাথার মণি, সে বিষয়ে কোন বিবাদ হইতে পারেনা।

(১) রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টেই জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পূর্বোক্ত রঘুপতিরই কনিষ্ঠ সহোদর, এইমত সমর্থন করিতে নানা প্রকার নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পরে বহুবিজ্ঞ ঐযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ মহোদয় সেই সমস্ত প্রবন্ধেরই বিশদ সমালোচনা করিয়া ঢাকা হইতে প্রকাশিত “প্রতিভা” পত্রিকায় উহার সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধের নাম “শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি”। অনুসন্ধিৎসু তাঁহার সেই বহুগবেষণামূলক বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে বহু কথা জানিতে পারিবেন। “প্রতিভা” ১৩২ তৃতীয় বর্ষ ১১শ সংখ্যা ৫৪৫।

শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি

অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞ ব্যক্তিও লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী। অনেকে ইহাও লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবও শাস্ত্রশাস্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি একদিন তাঁহার সহাধ্যায়ী রঘুনাথ শিরোমণির হুঃখ বুঝিয়া ঐ টীকা গঙ্গামধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু “চৈতন্য ভাগবত”দি কোন সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থে ঐরূপ কোন কথাই নাই। বহুকাল পরে প্রকাশিত একমাত্র “অদ্বৈত প্রকাশ” গ্রন্থেই দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখা যায়—“তবে গেলা বাসুদেব সার্বভৌম পাশে ॥ তার স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বি বৎসরে।” পরে উনবিংশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীগৌরান্ধ্র অধ্যয়নকালে ন্যায় শাস্ত্রের এক টীকা করেন। তিনি একদিন ঐ টীকা লইয়া গঙ্গাপারে গেলে সেই সময়ে এক দ্বিজ তাঁহাকে উহা কোন্ গ্রন্থ, এই প্রশ্ন করায় তিনি বলেন—ইহা ন্যায়-শাস্ত্রের টীকা। তখন,—“দ্বিজ সেই টীকা দেখি করে হাহাকার। কহে মোর পরিশ্রব হৈল ছারখার ॥ ইহা দেখি মোর টীকার হৈবে অনাদর। শ্রীগৌরান্ধ্র কহে ভয় নাহি দ্বিজবর ॥” পরে শ্রীগৌরান্ধ্র তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সেই টীকা গঙ্গামধ্যে ফেলিয়া দিলে মহানন্দে সেই দ্বিজ বলিলেন—“তুমি হ নিশ্চয় সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার। তোমার চরণে মোর কোটি নমস্কার ॥ এত কহি দ্বিজ হর্ষে করিলা গমন। গৌরা চাঁদের ষণ্জ্যোৎস্নায় পূরিল ভুবন ॥”

“অদ্বৈত প্রকাশ”র ঐ স্থলে এবং অন্তর্ভুক্ত কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির নাম গন্ধও নাই। তথাপি অনেকে উক্ত স্থলে “দ্বিজ” শব্দের দ্বারা রঘুনাথ শিরোমণিকেই গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ীও বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে সেখানে অপরিচিত ব্যক্তির স্থায় “দ্বিজবর” বলিয়া সম্বোধন করিবেন কেন? আর গ্রন্থকার ঈশান নাগর ঐ সমস্ত বার্তাই জানিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে শাস্ত্রপুরে অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে থাকিয়াও সেই বিখ্যাতনামা পুরুষসিংহ রঘুনাথ শিরোমণির নামটা জানিতে পারিলেন না, তিনি পরে বৃদ্ধবয়সেও তাঁহাকে

“এক দ্বিজ” বলিয়াই ঐ কথা লিখিলেন, ইহা কি সম্ভব? পরন্তু রঘুনাথ শিরোমণি পরে শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া নিশ্চয় করিয়াও তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন না এবং স্বার্থপরতামূলক পূর্বকৃত কষ্টের জন্ত কিছুমাত্র অহুতাপও করিলেন না, কিন্তু নিজের সেই ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষায় হুটু হইয়া তখনই তথা হইতে চলিয়া গেলেন, ইহাও কি সম্ভব? আমরা কিন্তু অথ কোন দ্বিজের পক্ষেও উহা কোনরূপেই সম্ভব বলিয়া বুদ্ধি না। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত “অদ্বৈতপ্রকাশের” সমস্ত অংশই যে ঈশান নাগরেরই রচিত, ইহা নানা কারণেই বিশ্বাস করা যায় না। বৈষ্ণব ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ অনেক বিশিষ্ট বৈষ্ণবও ঐ গ্রন্থের সকল কথার প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, ইহাও আমি জানি।

পরন্তু “অদ্বৈত প্রকাশের” দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখা যায়—“গৌর কহে শুন শ্রুত বেদপঞ্চানন। বিদ্যানগর হইতে আইলু তোমার সদন॥” সুতরাং শ্রীগৌরানন্দেব যে, বিদ্যানগরবাসী বাসুদেব সার্কভোমের নিকটেই পরে যাইয়া ছই বৎসর আশ্রয়লাভ পড়িয়া বেদ পড়িবার জন্ত শান্তিপুত্রে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাই সেখানে লেখকের বক্তব্য বুঝা যায়। কিন্তু বিদ্যানগরের বিশারদ পুত্র সেই বাসুদেব সার্কভোম শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়নকালের পূর্বেই উৎকলে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে উৎকলেই শ্রীমন্দিরে প্রেমাবেশে মুচ্ছিত শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনলাভ করিয়া বিস্মিত হন এবং সেই অবস্থায় সাগ্রহে তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যান। “অদ্বৈত প্রকাশে”ও (১শ অঃ) ঐরূপই বর্ণিত হইয়াছে।

পরন্তু “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় আরও বিশেষ বার্তা বর্ণন করিয়াছেন যে, সার্কভোম ডাটাচার্য্য পরে তাঁহার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যকে শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, ইনি নবদ্বীপের জগন্নাথমিশ্রের পুত্র এবং নীলাধর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। ইহার পূর্ব নাম বিশ্বম্ভর। তখন সার্কভোম ডাটাচার্য্য বলেন যে, (১)

(১) “সার্কভোম কহেন নীলাধর চক্রবর্তী। বিশারদের সমাধায়ী এই তার খ্যাতি। মিশ্র পুরন্দর তার বাহু হেন জানি। পিতার সখকে দোহা পূজা করি মানি। নদীয়া সখকে সার্কভোম হুটু হেলা। শ্রীত হইয়া গোসাইরে কহিতে লাগিলা। সহজেই পূজা তুমি আরে ত সম্ভা। অতএব হও তোমার আমি নিম্নদাস॥” চৈঃ চঃ মধ্য ষষ্ঠ পঃ ॥

নীলাধর চক্রবর্তী আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং বিশ্র পুরন্দরও তাঁহার মান্য, ইহা আমি জানি। অতএব পিতার সম্বন্ধবশতঃ তাঁহার উভয়েই আমার পূজ্য। পরে সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য ত্রিচৈতন্য-দেবকেও বিশেষ পূজ্য বলিয়া আমি তোমার নিজ দাস হইলাম—এই কথাও বলেন। পরে তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য যে, তৎপূর্বে ত্রিচৈতন্যদেবকে দেখেন নাই, তিনি পূর্বে তাঁহার পরিচয়ও জানিতেন না, ইহা উক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাহা হইলে ত্রিচৈতন্যদেব যে, পূর্বে নবদ্বীপের সংলগ্ন বিদ্যানগরে বাহুদেব সার্কভৌমের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বুঝব ?

ত্রিচৈতন্যদেবের অধ্যয়নকালে বিদ্যানগরে আর এক বাহুদেব সার্কভৌম ছিলেন, ত্রিচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহারই নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন,—এইরূপ কল্পনার কিন্তু কোন প্রমাণই নাই (১)। আর তাহা হইলে ত্রিচৈতন্যদেবের অধ্যয়নকালে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি অবশ্যই থাকিত এবং তদনুসারে “১৫তত্ত্বভাগবত”াদি গ্রন্থকার হৃদ্যাবন দাস প্রভৃতিও তাঁহার কথা বিশেষ করিয়াই লিখিতেন। কিন্তু

১। মুক্তবোধ ব্যাকরণের টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের পিতা বাহুদেব সার্কভৌম হইলে তিনি ত্রিচৈতন্যদেবের পরবর্তী। “নবদ্বীপমহিমা” পুস্তক দেখিয়া “বিষকোষে”ও উক্ত দুর্গাদাসকে পূর্বোক্ত বাহুদেব সার্কভৌমের পুত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং দুর্গাদাস কৃত “ধাতুদীপিকা” টীকার শেষে “শাকে সোমরসে-ভূমিগণিতে ত্রীসার্কভৌমস্বজ্ঞঃ”—ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সময় লিখিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু হৃপণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি-সম্পাদিত “ধাতুদীপিকা”র শেষে উক্তশ্লোকে “গান্ধোলীয়জ সর্বদেশবিদিত ত্রীসার্কভৌমস্বজ্ঞঃ”—এইরূপ পাঠই দেখিতে পাই। বলাঘটীর বিশারদ পুত্র বাহুদেব সার্কভৌম গান্ধোলীয় বংশজাত নহেন। পরন্তু “ধাতুদীপিকা”র কোন পৃষ্ঠার শেষে “শাকে সোমরসে-ভূমিগণিতে” ইত্যাদি শ্লোক থাকিলে তদ্বারা দুর্গাদাস ১৫৬১ শকাব্দে (১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ টীকা রচনা করেন—ইহাই বুঝা যায়। বস্তুতঃ বিদ্যানিবাসের পরে ত্রীরাম তর্কবাগীশকৃত মুক্তবোধ টীকার প্রচার হইলে সপ্তদশ শতাব্দীতে দুর্গাদাস মুক্তবোধের টীকা করেন। পবন প্রকরণে “ঘে শাশ্র” এই শব্দের দুর্গাদাস কৃত টীকা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সুতরাং দুর্গাদাসের পিতা সার্কভৌম যে, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর পরাৰ্দ্ধেই অধ্যাপনা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। ত্রিচৈতন্যদেব কিন্তু ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

তঁাহারা ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সৰ্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যাদি সমস্তই বিশদরূপে বর্ণন করিতেও সেই বাসুদেব সার্কভোমের কোন কথা লেখেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যাপকগণের নাম বলিতে তঁাহার সহাধ্যায়ী মুরারি গুপ্তও বাসুদেব সার্কভোমের নাম বলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—“ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতাং। সুদৰ্শনাং পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতাং॥”

পরন্তু চৈতন্যভাগবতের আদিকাণ্ডে (১১শ পঃ) বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—
 “কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ ছায় যদি পড়ে। ভট্টাচার্য্য হয় তবে কখনও না নড়ে॥”
 অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়নাদিকালে তঁাহার অদ্ভুতবিচারশক্তি দেখিয়া কেহ বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি ছায়শাস্ত্র পড়েন, তাহা হইলে অগ্রতিদ্বন্দ্বী ভট্টাচার্য্য হইতে পারেন। বৃন্দাবন দাসের ঐ কথার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব তখনও কাহারও নিকটে ছায়শাস্ত্র পড়িতেন না। পরে তঁাহার কাহারও নিকটে ছায়শাস্ত্র-পাঠের কোন প্রয়োজন বা প্রবৃত্তিও ছিল না। সে যাহা হউক, মূলকথা, শ্রীচৈতন্যদেব যে রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী ছিলেন—এ বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ কিছুই নাই। ঐ বিষয়ে ঘটক ঠাকুর মুলোপক্কাণনের নিদার্প শ্লোক গুলি অপ্রমাণ। পরন্তু আমরা তাহা সম্ভবও বুঝি না। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়ন কালের পূর্বেই রঘুনাথ মিথিলা-যাত্রা করেন। অতঃপর সেই কথাই বলি।

রঘুনাথের পদব্রজে মিথিলাযাত্রা ও

অধ্যয়নকাল

যিনি ত্রেতাযুগে অষোধ্যা হইতে মিথিলায় যাইয়া অন্যের অসাধ্য শ্রুতভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ রঘুনাথের অব্যর্থ ইচ্ছায় নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালী নবযুবক রঘুনাথ নবোদ্যমে পদব্রজে মিথিলায় উপস্থিত হইয়া অন্যের অসাধ্য পক্ষধরের পক্ষভঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন সময়ে মিথিলায় গিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে। এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, রঘুনাথ প্রথমে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্কভোমের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া

পরে পক্ষধর মিশ্রের নিকটে (১) অধ্যয়নার্থ মিথিলায় গমন করেন এবং সেখানে পক্ষধরের সহিত অনেক বিচার করিয়া নায়শাত্ত্রের অনেক বিষয়ে পক্ষধরের পক্ষ-খণ্ডন—(মত খণ্ডন)—পূরক নিজমতের প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা বঙ্গদেশের সর্বত্র চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ। উক্ত প্রবাদ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সুতরাং আমরা অন্যান্য নানারূপ প্রবাদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিলেও উক্ত চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদকে উপেক্ষা করিতে পারিব না। উক্ত প্রবাদের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা করিয়াই আমাদেরকে রঘুনাথ শিরোমণির সময় নিণয় করিতে হইবে।

আমরা পূর্বে বুঝিয়াছি যে, খ্রীষ্টেতন্যাদেবের জন্ম গ্রহণের পূর্বে বা কিছু পরেই বিশারদ-পুত্র মহানৈয়ায়িক বাহুদেব সার্কভোম উৎকল-যাত্রা করেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর অধ্যয়নকালে নবদ্বীপেই বিদ্যানগরে ছিলেন, ইহা বুঝা যায়। কারণ সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকার শেষে গুরুগণের নাম করিতে লিখিয়াছেন—“ভট্টাচার্য্যঃ সার্কভোমঃ বিদ্যাভাচম্পতৌ গুরুন্”। সনাতন বিদ্যাভাচম্পতির প্রধান ছাত্র ও বিশেষ ভক্ত ছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধও আছে। খ্রীষ্টেতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফাস্তুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা নিশ্চিত আছে। সনাতন গোস্বামী তাঁহার ২০ বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে বাকলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, খ্রীষ্টেতন্যদেবের অধ্যয়ন কালের পূর্বেই বাহুদেব সার্কভোম উৎকলে চলিয়া গেলে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়নার্থ মিথিলায় গমন করেন। অবশ্য পক্ষধর মিশ্র ঐ সময়ের পূর্ববর্তী

১। পক্ষধর মিশ্রের প্রকৃত নাম জয়দেব। তিনি গরেশ উপাধ্যায়ের “তত্ত্ব-চিন্তামণি”র “আলোক” নামে যে টীকা করেন, উহার প্রারম্ভে “অধীতা জয়দেবেন হরিমিশ্রাঃ পিতৃব্যতঃ”—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও জানা যায়, তাঁহার নাম জয়দেব এবং তিনি তাঁহার পিতৃব্য হরিমিশ্রের ছাত্র। তাঁহার পক্ষধর নামের অনেকরূপ কারণ কথিত হয়। কিন্তু আমরা বুঝি যে, তিনি পাঠ্যবস্থা হইতেই বিচারে যে-পক্ষই গ্রহণ করিতেন, তাহাই রক্ষা করিবেন বলিয়া গর্ব করিতেন এবং কেহই তাঁহার পক্ষ খণ্ডন করিতে পারিতেন না—এজন্যই তিনি পক্ষধর নাম লাভ করেন এবং পরে তিনি ঐ নামেই প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাহুদেব মিশ্রও তৎকৃত টীকার শেষে “পক্ষধর মিশ্র ভ্রাতুষ্পুত্র.....বাহুদেব মিশ্র বিচর্চিতায়াং”—এইরূপ লিখিয়াছেন।

হইলে (কেহ কেহ তাহাই বলিয়াছেন)—ইহা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না। কেন বুঝি না, তাহাও এখানে বলা আবশ্যিক।

শুনিয়াছি, পক্ষধর মিশ্রের স্বহস্ত লিখিত বিষ্ণুপুরাণের এক পৃথী দারভাঙ্গা জেলায় যোগিয়াড়া গ্রামে কেশব বা নৈমায়িকের বাড়ীতে আছে। ঐ পৃথীর শেষে লিখিত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় (১) পক্ষধর ৩৪৫ লক্ষণ সংবতে মার্গমাসে ষষ্ঠী তিথিতে গুরুবারে অমরাবতী নগরে বাস করতঃ ঐ পৃথী লিখিয়াছিলেন। মিথিলার প্রাচীন গাথানুসারে ১১০৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষণ সংবতের আরম্ভ হয়। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষণ সংবতের আরম্ভ হয়,—এই বহুসম্মত বর্তমান মতানুসারে বুঝা যায়, পক্ষধর ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ পৃথী লেখেন। (কারণ ১১১৯ সংখ্যার সহিত ৩৪৫ সংখ্যার যোগ করিলে ১৪৬৪ হয়)। পক্ষধর যে, পাঠাবস্থাতেই স্থানান্তর হইতে ঐ পৃথী লিখিয়া আনিয়াছিলেন, ইহাই আমরা সম্ভব বুঝি। পূর্বোক্ত বাহুবল্লভ সার্কভৌমের নবদ্বীপে শ্রায়শাস্ত্রের অধ্যাপনাকালানুসারে বুঝা যায়, তিনিও ঐ সময়ই মিথিলায় শ্রায়শাস্ত্র পড়িতে গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষধর মিশ্রের সহায়্যায়িত্বই সম্ভব। পক্ষধরের যৌবনকালে মিথিলার শঙ্করমিশ্র ও স্মৃতিনিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র অতি প্রাচীন। (২)। মৈথিলী পণ্ডিতগণও তাহাই বলেন এবং

১। উক্ত পৃথীর শেষে লিখিত আছে, “বাইপেৰ্দ্দয়ুঠেঃ শঙ্করনরেনঃ সংখ্যাং গতে হাঙ্গন, ত্রীমদ্-গোড় মহীভুজো গুরুদিনে মার্গে চ পক্ষে সিতে। ষষ্ঠ্যাং তামরাবতী মধিমস্ বা ভূমি দেবালয়ঃ, ত্রীমৎ পক্ষধরঃ হুপুতক মিদং শুদ্ধং ব্যালেখীদ্-দ্রুতং”। শঙ্করনরেনঃ=৩, বেদ=৪, বাণ=৫। ৩৪৫ লক্ষণ সংবৎ। এ বিষয়ে ১৩০০ সালের “ভারতবর্ষ” পত্রিকার আখ্যায়িক সংখ্যায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। মিথিলাধিপতি ভৈরবেন্দ্র দেবের সময়ে নব্যবর্দ্ধমান তৎকৃত “দণ্ডবিবেক” গ্রন্থের প্রারম্ভে “শঙ্কর-বাচস্পতী মে গুরুবঃ”—এই উক্তিদ্বারা তৎকালে জীবিত বৃদ্ধ শঙ্কর মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রকে গুরু বলিয়াছেন। উক্ত বাচস্পতি মিশ্রও ভৈরবেন্দ্র দেবের ধর্ম্মগুহ্যর আদেশে “বৈত নির্ঘ্ন” নামক স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও ভৈরব সিংহের অমূল্য রূপনারায়ণের উৎসাহে “দুর্গাত্তিত্তিরঙ্গিণী” গ্রন্থ রচনা করেন। তাই তিনি সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে উক্ত রূপনারায়ণের গুণবর্ণন করিতে কোন স্নানকে লিখিয়াছেন—“তদমুজো যো রূপনারায়ণঃ”। উক্ত ভৈরব সিংহ ও রূপনারায়ণের জীবনকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী, ইহা নিশ্চিত। ষোড়শ শতাব্দীর পরার্ধে স্মার্তরঘুনন্দন নিজগ্রন্থে উক্ত বাচস্পতি মিশ্র ও বিদ্যাপতির গ্রন্থের উল্লেখ

তঁাহারা মিথিলার প্রসিদ্ধ প্রাচীনশ্লোক পাঠ করেন—“শঙ্কর-বাচস্পত্যৌঃ
শঙ্কর বাচস্পতি সদৃশৌ। পক্ষধরস্ত প্রতিপক্ষোলক্ষী ভূতোন কুত্রাপি”।

পরন্তু পক্ষধর মিশ্রের প্রসিদ্ধ ছাত্র মিথিলার “সোদরপুর নিবাসী” রুচি দত্তের
মৈথিল অক্ষরে স্বহস্ত লিখিত উদয়ন কৃত “কিরণাবলী”র এক পৃথী কাশীর
সরস্বতী ভবনে আছে। উহার শেষে লিখিত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়, রুচি দত্ত
৩৬৬ লক্ষণ সংবতে (১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ পৃথী লেখেন (১)। রুচি দত্তের নিজ কৃত
“মকরন্দবাখ্যা”র এক পৃথী এবং “দ্রব্যাকিরণাবলীপ্রকাশিকাবিবৃতি”র
এক পৃথীও কাশীর সরস্বতী ভবনে আছে। উক্ত দুই পৃথীর লিপিকাল
যথাক্রমে ৪২৩ লক্ষণ সংবৎ এবং ১৬০০ বৈক্রম সংবৎ। মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের
বংশধর আমার কোন ছাত্রের নিকটে তালপত্রে রাজকর শর্মার লিখিত রুচি
দত্ত কৃত “মকরন্দবাখ্যা”র এক পৃথী দেখিয়াছি। উহার শেষে লিপিকাল
স্পষ্ট লিখিত আছে—৪১৮ ল সং। ল সং অর্থাৎ লক্ষণ সংবৎ। সুতরাং রুচি
দত্তও যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিশিষ্ট নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন,—
ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে তঁাহার অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র ঐ সময়ের বহু
পূর্ববর্তী হইতে পারেন না।

পরন্তু রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের নিকটে ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া
পরে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্টের নিকটে অনেকদিন পর্য্যন্ত
সীমাংসাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র শঙ্কর ভট্ট
“গাধিবংশাঙ্কুরিত” নামে যে পুস্তকে নিজ বংশের ইতিহাস বর্ণন করিয়া
সিয়াছেন, তাহাতে তঁাহার পিতামহের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণির কথাও

করিয়াছেন। সুদীর্ঘ জীবী বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও রূপনারায়ণের অভূদয় পর্য্যন্ত
জীবিত ছিলেন। কিন্তু শঙ্করমিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্র তঁাহার পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। শঙ্কর
মিশ্রের “ভেদরত্ন” গ্রন্থের বে পৃথী জন্মতে আছে, তাহার লিপিকাল ১৫১৯ সংবৎ। (১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দ)।

১। উক্ত পৃথীর শেষে লিখিত আছে—“রস-বহু-হরনেত্র চৈত্রকে গুরুপক্ষে, প্রতিপদি
বৃষবারে বৎসরে লাক্ষণ্যেচ। বিবৃবৃধবিনোদ ভাবয়ন্তীঃ স্তপ্তন্তী মলিখ দমল পাণিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ
শ্রীসমোতাং”। হরনেত্র = ৩, বহু = ৮, রস = ৬, —৩৮৬ লক্ষণ সংবৎ (১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। কেহ
রুচিদত্ত কৃত কোন পৃথীর লিপিকাল ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া পক্ষধর মিশ্রকে তৎপূর্ববর্তী বলি-
য়াছেন। কিন্তু হরিমিশ্রের ত্র্যমুপ্ত ও ছাত্র পক্ষধর মিশ্র যে পঞ্চদশশতাব্দীর পূর্ববর্তী, ইহা
আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন (১)। রামেশ্বর ভট্টের বংশধরগণ এখনও কাশীতে আছেন। তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণ ভট্ট ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে “বৃত্তরত্নাকরে”র টীকা করেন। স্তত্রায় রামেশ্বর ভট্ট যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রখ্যাত প্রবীণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন, এবিষয়ে সংশয় নাই। তাহা হইলে রঘুনাথ শিরোমণিও সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বেই পঞ্চদশ শতাব্দীর নিকটে “তাব্বিক শিরোমণি” উপাধিলাভ করিয়া পরে রামেশ্বর ভট্টের নিকটে অধ্যয়ন করেন, ইহাই বুঝা যায়। আর তিনি সেই সময়েই “তত্ত্বচিন্তামণি”র দীর্ঘিতি টীকা এবং আরও কোন কোন গ্রন্থ রচনা করেন, ইহাই মনে হয়। তাই তখন হইতেই বিদেশীয় পণ্ডিত সমাজে অনেক স্থানে তাঁহার গ্রন্থের প্রচার হয় এবং শব্দর ভট্টও রঘুনাথ শিরোমণির তৎকালীন বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রযুক্তই তাঁহার পিতামহের গৌরব বর্ণন করিতে তাঁহার বহু ছাত্রের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির কথাও বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

সে যাহা হউক, মূল কথা, পূর্বোক্ত নানা কারণেই রঘুনাথ শিরোমণির গুরু “আলোক” টীকাকার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ভারত বিখ্যাত মহানৈমায়িক হইয়াছিলেন—ইহাই আমরা বুঝি। তিনি যে, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পৌত্র যজ্ঞপতির শিষ্য বা প্রশিষ্য, ইহা আমরা বুঝি না। আর তিনি “আলোক” টীকাকার নহেন, “আলোক” টীকাকার পঞ্চদশ শতাব্দীর তাহা হইতে পূর্ববর্তী, এইরূপ কল্পনাও আমরা করিতে পারি না (২)। কারণ রঘুনাথ

১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত “গাধিবংশামৃতরিত” পাঠ করিয়া অনেক প্রবন্ধেই ঐকথা লিখিয়াছেন। পূর্বোক্ত “কাশীনাথ বিদ্যানিবাস” প্রবন্ধে—রামেশ্বর ভট্টের কাশীবাসের কথাও লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ রামেশ্বর ভট্ট প্রথমে ৬ কাশীতেই বাস করিতেন; পরে কোনও কারণে তিনি দ্বারকায় কএক বৎসর বাস করিয়া আবার পূর্ববং কাশীবাসী হইয়াছিলেন। দ্বারকায় বাইবার, সময়েই তাহার পুত্র নারায়ণ ভট্টের জন্ম হয়। কিন্তু তাহার প্রথম কাশীবাস কালেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহাই আমাদের ধারণা।

২। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ৩৮শ্রীকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় “স্ত্রায় কুহ্মাঞ্জলির” ভূমিকায় ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কারণ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের সংগৃহীত পঞ্চদশ শতাব্দীর “প্রত্যাকালোকে”র এক পৃথক লিপিকাল ১৫৯ লক্ষ্য সনৎ। কিন্তু শুনিয়াছি, মিত্র মহোদয়ের সংগৃহীত সেই পৃথক শেষে লিখিত আছে—গুপ্তমন্ত্র ত্রিরস্ত শকাব্দ। লক্ষ

শিরোমণির গুরু পক্ষধর মিশ্রই যে, “তত্ত্বচিন্তামণি”র “আলোক” নামে টীকা করেন, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ আছে। তাই পরে নবদ্বীপের মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতিও রবুনাথ শিরোমণির গুরু পক্ষধর মিশ্রকৃত “আলোক” টীকার টীকা করিয়াছিলেন। “ব্যাপ্তিসিদ্ধান্তলক্ষণ দীপ্তি”র “যৌবদীয়কল্পে”র টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও ঐ পক্ষধর মিশ্রেরই নামোল্লেখ পূর্বক নিজের উক্তি-বিশেষের সমর্থনের জন্য সসম্মানে তাঁহারই “আলোক” টীকার সম্ভর্ষিত বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর “আলোক” টীকার পক্ষধর মিশ্র যে, তাঁহার পিতৃব্য হরি মিশ্রের ছাত্র, ইহা তিনি সেই টীকার প্রারম্ভে নিজেই বলিয়াছেন। মিথিলায় কবি বিদ্যাপতিও উক্ত হরিমিশ্রের নিকটে প্রথমে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাও মিথিলায় প্রসিদ্ধ আছে এবং উক্ত পক্ষধর মিশ্র যে, যৌবনকালে বুদ্ধ বিদ্যাপতির গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন—এই রূপ প্রবাদও আছে (১)। পরন্তু পক্ষধর মিশ্র যে সময়ে “তত্ত্ব চিন্তামণি”র “আলোক” নামে টীকা রচনা করেন, তখন “তত্ত্বচিন্তামণি”র বিভিন্ন লেখকের লিখিত বিভিন্ন পুথিতে তিনিও পাঠভেদ দেখিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ ঋণেও কোন স্থলে পাঠ ভেদের উল্লেখ করিয়া উহা কল্পিত

১৫০২। উক্ত স্থলে পরে “লসং” লিখিত হওয়ায় ১৫০২ লক্ষণ সংবৎ অসম্ভব বলিয়া মিত্র মহোদয় উক্ত অঙ্কে শুদ্ধতাগ করিয়া ১৫০ লক্ষণ সংবৎই উক্ত পুথীর লিপিকাল নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে উক্ত লেখক পূর্বে “শকাব্দ” লিখিয়াছেন কেন? সেখানেও তাঁহার কোন অংশে ভ্রম স্বীকার্য্য হইলে তিনি পরে সংখ্যা অর্থেই “লসং” লিখিয়াছিলেন ইহাও বলা যায়। আমাদের মনে হয়, উক্ত লেখক পরে লক্ষণ সংবৎ ও লিখিবার জন্তই “লসং” লিখিয়া পরে উহার সংখ্যাক্ষ স্মরণ না হওয়ায় পূর্বে লিখিত শকাব্দের সংখ্যাক্ষই লিখিয়াছিলেন ১৫০২।

১। প্রবাদ আছে,—একদিন ক্ষীণকায় বৃদ্ধ পক্ষধর মিশ্র স্থানান্তরে যাইতে বিদ্যাপতির গ্রামে তাঁহার হুবিশাল অতিথিশালার এক স্তম্ভকোণে বসিয়াছিলেন। পরে বিদ্যাপতি অতিথিগণের পর্যবেক্ষণের জন্য আসিয়া তাহাকে ঐ স্থানে দেখিয়াই বলেন,—“প্রাণুণো যুগবৎ কোণে হৃদয়ান্নোপলভ্যসে”। অর্থাৎ স্তম্ভকোণে যুগবৎ অবস্থিত “প্রাণুণ” (অতিথি) তুমি হৃদয়ত বশতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছ না। বিদ্যাপতি ঐ কথা বলিলে পরক্ষণেই পক্ষধর মিশ্র বলেন—“নহি ত্বলাধঃ পুংসঃ হৃদয়ে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে”। অর্থাৎ স্থূল বুদ্ধি প্রকৃতির হৃদয় পদার্থে দৃষ্টি জন্মে না। পরক্ষণেই বিদ্যাপতি তাহাকে চিনিতে পারিয়া বহু সমাদর করিয়াছিলেন।

“এক দ্বিজ” বলিয়াই ঐ কথা লিখিলেন, ইহা কি সম্ভব? পরন্তু রঘুনাথ শিরোমণি পরে ত্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া নিশ্চয় করিয়াও তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন না এবং স্বার্থপরতামূলক পূর্বকৃত কষ্টের জন্ত কিছুমাত্র অনুতাপও করিলেন না, কিন্তু নিজের সেই ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষায় হুট হইয়া তখনই তথা হইতে চলিয়া গেলেন, ইহাও কি সম্ভব? আমরা কিন্তু অত্র কোন দ্বিজের পক্ষেও উহা কোনরূপেই সম্ভব বলিয়া বুঝি না। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত “অদ্বৈত প্রকাশের” সমস্ত অংশই যে ঈশান নাগরেরই রচিত, ইহা নানা কারণেই বিশ্বাস করা যায় না। বৈষ্ণব ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ অনেক বিশিষ্ট বৈষ্ণবও ঐ গ্রন্থের সকল কথার প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, ইহাও আমি জানি।

পরন্তু “অদ্বৈত প্রকাশের” দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখা যায়—“গৌর কহে শুন গুরু বেদপঞ্চানন। বিদ্যানগর হইতে আইলু তোমার সদন॥” স্মরণ্য ত্রীগৌরানন্দদেব যে, বিদ্যানগরবাসী বাসুদেব সার্কভোমের নিকটেই পরে যাইয়া দুই বৎসর ত্রায়শাস্ত্র পড়িয়া বেদ পড়িবার জন্ত শাস্ত্রপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাই সেখানে লেখকের বক্তব্য বুঝা যায়। কিন্তু বিদ্যানগরের বিশারদ পুত্র সেই বাসুদেব সার্কভোম ত্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়নকালের পূর্বেই উংকলে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে উংকলেই ত্রীমন্দিরে প্রেমাবেশে মুচ্ছিত ত্রীচৈতন্যদেবের দর্শনলাভ করিয়া বিস্মিত হন এবং সেই অবস্থায় সাগ্রহে তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যান। “অদ্বৈত প্রকাশে”ও (১৫শ অঃ) ঐরূপই বর্ণিত হইয়াছে।

পরন্তু “ত্রীচৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় আরও বিশেষ বার্তা বর্ণন করিয়াছেন যে, সার্কভোম ভট্টাচার্য্য পরে তাঁহার ভগ্নপতি গোপীনাথ আচার্য্যকে ত্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, ইনি নবরীপের জগন্নাথমিশ্রের পুত্র এবং নীলাধর চক্রবর্তীক দৌহিত্র। ইহার পূর্ব নাম বিশ্বম্ভর। তখন সার্কভোম ভট্টাচার্য্য বলেন যে, (১)

(১) “সার্কভোম কহেন নীলাধর চক্রবর্তী। বিশারদের সমাধারী এই তার খ্যাতি। দ্বিজ পুরন্দর তার মায়া হেন জানি। পিতার সন্মুখে দোহা পূজা করি মানি। নদীয়া সন্মুখে সার্কভোম হুট হেলা। পিত হইয়া গোসাইরে কহিতে লাগিল। সহজই পূজা তুমি আরে ত সম্ভান। অতএব হঞ তোমার আমি নিম্নদাস॥” চৈঃ চঃ মধ্য ষষ্ঠ পঃ।

বীলাধর চক্রবর্তী আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং মিশ্র পুরন্দরও তাঁহার মান্য, ইহা আমি জানি। অতএব পিতার সম্বন্ধবশতঃ তাঁহার উভয়েই আমার পূজ্য। পরে সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য ত্রিচৈতন্যদেবকেও বিশেষ পূজ্য বলিয়া আমি তোমার নিজ দাস হইলাম—এই কথাও বলেন। পরে তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য যে, তৎপূর্বে ত্রিচৈতন্যদেবকে দেখেন নাই, তিনি পূর্বে তাঁহার পরিচয়ও জানিতেন না, ইহা উক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাহা হইলে ত্রিচৈতন্যদেব যে, পূর্বে নবদ্বীপের সংলগ্ন বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্কভৌমের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বুঝিব ?

ত্রিচৈতন্যদেবের অধ্যয়নকালে বিদ্যানগরে আর এক বাসুদেব সার্কভৌম ছিলেন, ত্রিচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহারই নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন,—এইরূপ করণার কিন্তু কোন প্রমাণই নাই (১)। আর তাহা হইলে ত্রিচৈতন্যদেবের অধ্যয়নকালে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি অবশ্যই থাকিত এবং তদনুসারে “চৈতন্যভাগবত”দি গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস প্রভৃতিও তাঁহার কথা বিশেষ করিয়াই লিখিতেন। কিন্তু

১। মুদ্রবোধ ব্যাকরণের টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের পিতা বাসুদেব সার্কভৌম হইলে তিনি ত্রিচৈতন্যদেবের পরবর্তী। “নবদ্বীপমহিমা” পুস্তক দেখিয়া “বিবাকোষে”ও উক্ত দুর্গাদাসকে পূর্বোক্ত বাসুদেব সার্কভৌমের পুত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং দুর্গাদাস কৃত “ধাতুদীপিকা” টীকার শেষে “শাকে সোমরসেষ্-ভূমিগণিতে ত্রিসার্কভৌমসম্বন্ধঃ”—ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সময় লিখিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু স্থপণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি-সম্পাদিত “ধাতুদীপিকা”র শেষে উক্তশ্লোকে “গাঙ্গোলায়জ সর্কদেশবিদিত ত্রিসার্কভৌমসম্বন্ধঃ”—এইরূপ পাঠই দেখিতে পাই। বঙ্গাযটীর বিশারদ পুত্র বাসুদেব সার্কভৌম গাঙ্গোলায় বংশজাত নহেন। পরন্তু “ধাতুদীপিকা”র কোন পুথীর শেষে “শাকে সোমরসেষ্-ভূমিগণিতে” ইত্যাদি শ্লোক থাকিলে তদ্বারা দুর্গাদাস ১৫৬১ শকাব্দে (১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে) ঐ টীকা রচনা করেন—ইহাই বুঝা যায়। বস্তুতঃ বিদ্যানিবাসের পরে শ্রীরাম তর্কবাগীশকৃত মুদ্রবোধ টীকার প্রচার হইলে সমুদয় শতাব্দীতে দুর্গাদাস মুদ্রবোধের টীকা করেন। পবন প্রকরণে “যে শত্রে” এই শব্দের দুর্গাদাস কৃত টীকা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সুতরাং দুর্গাদাসের পিতা সার্কভৌম যে, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর পরার্দেই অধ্যাপনা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। ত্রিচৈতন্যদেব কিন্তু ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্ভবিত হইয়াছেন।

তঁাহার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সর্লশাত্রে পাণ্ডিত্যাদি সমস্তই বিশদরূপে বর্ণন করিতেও সেই বাহুদেব সার্কভোমের কোন কথা লেখেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যাপকগণের নাম বলিতে তঁাহার সহাধ্যায়ী মুরারি গুপ্তও বাহুদেব সার্কভোমের নাম বলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—“ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতাৎ। সূদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতাৎ॥”

পরন্তু চৈতন্তভাগবতের আদিকাণ্ডে (১১শ পঃ) বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—“কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ ছায় যদি পড়ে। ভট্টাচার্য্য হয় তবে কখনও না নড়ে॥” অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়নাদিকালে তঁাহার অদ্ভুতবিচারশক্তি দেখিয়া কেহ বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি ছায়শাস্ত্র পড়েন, তাহা হইলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভট্টাচার্য্য হইতে পারেন। বৃন্দাবন দাসের ঐ কথার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব তখনও কাহারও নিকটে ছায়শাস্ত্র পড়িতেন না। পরে তঁাহার কাহারও নিকটে ছায়শাস্ত্র-পাঠের কোন প্রয়োজন বা প্রবৃত্তিও ছিল না। সে বাহা হউক, মূলকথা, শ্রীচৈতন্যদেব বে রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী ছিলেন—এ বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ কিছুই নাই। ঐ বিষয়ে ষটক ঠাকুর হুলোপঞ্চাননের নিন্দার্থ শ্লোক গুলি অপ্রমাণ। পরন্তু আমরা তাহা সম্ভবও বুলি না। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়ন কালের পূর্বেই রঘুনাথ মিথিলা-যাত্রা করেন। অতঃপর সেই কথাই বলি।

রঘুনাথের পদব্রজে মিথিলাযাত্রা ও

অধ্যয়নকাল

যিনি ত্রেতাযুগে অযোধ্যা হইতে মিথিলায় যাইয়া অন্যের অসাধ্য ধনুর্ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ রঘুনাথের অব্যর্থ ইচ্ছায় নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালী নবযুবক রঘুনাথ নবোদ্যমে পদব্রজে মিথিলায় উপস্থিত হইয়া অন্যের অসাধ্য পক্ষধরের পক্ষভঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন সময়ে মিথিলায় গিয়াছিলেন, ইহা বুলিতে হইবে। এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, রঘুনাথ প্রথমে নবদ্বীপে বাহুদেব সার্কভোমের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া

পরে পক্ষধর মিশ্রের নিকটে (১) অধ্যয়নার্থ মিথিলায় গমন করেন এবং সেখানে পক্ষধরের সহিত অনেক বিচার করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অনেক বিষয়ে পক্ষধরের পক্ষ-খণ্ডন—(মত খণ্ডন)—পূর্বক নিজমতের প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা বঙ্গদেশের সর্বত্র চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ। উক্ত প্রবাদ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সুতরাং আমরা অন্যান্য নানারূপ প্রবাদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিলেও উক্ত চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদকে উপেক্ষা করিতে পারিব না। উক্ত প্রবাদের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা করিয়াই আমরা দগকে রঘুনাথ শিরোমণির সময় নিণয় করিতে হইবে।

আমরা পূর্বে বুঝিয়াছি যে, খ্রীষ্টেতন্যদেবের জন্ম গ্রহণের পূর্বে বা কিছু পরেই বিশারদ-পুত্র মহানৈয়ায়িক বাহুদেব সার্কভোম উৎকল-যাত্রা করেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর অধ্যয়নকালে নবদ্বীপেই বিদ্যানগরে ছিলেন, ইহা বুঝা যায়। কারণ সনাতন গোস্বামী খ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকার শেষে গুরুগণের নাম করিতে লিখিয়াছেন—“ভট্টাচার্য্যঃ সার্কভোমঃ বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরুন্”। সনাতন বিদ্যাবাচস্পতির প্রধান ছাত্র ও বিশেষ ভক্ত ছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধও আছে। খ্রীষ্টেতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফাস্তুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা নিশ্চিত আছে। সনাতন গোস্বামী তাঁহার ২০ বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে বাকলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, খ্রীষ্টেতন্যদেবের অধ্যয়ন কালের পূর্বেই বাহুদেব সার্কভোম উৎকলে চলিয়া গেলে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়নার্থ মিথিলায় গমন করেন। অবশ্য পক্ষধর মিশ্র ঐ সময়ের পূর্ববর্তী

১। পক্ষধর মিশ্রের প্রকৃত নাম জয়দেব। তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “তত্ত্ব-চিন্তামণি”র “আলোক” নামে যে টীকা করেন, উহার প্রারম্ভে “অধীতা জয়দেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যতঃ”—ইত্যাদি লোকের ঘরাণ্ড জানা যায়, তাঁহার নাম জয়দেব এবং তিনি তাঁহার পিতৃব্য হরিমিশ্রের ছাত্র। তাঁহার পক্ষধর নামের অনেকরূপ কারণ কথিত হয়। কিন্তু আমরা বুঝি যে, তিনি পাঠাবস্থা হইতেই বিচারে যে-পক্ষই গ্রহণ করিতেন, তাহাই রক্ষা করিবেন বলিয়া গর্ব করিতেন এবং কেহই তাঁহার পক্ষ খণ্ডন করিতে পারিতেন না—এজন্যই তিনি পক্ষধর নাম লাভ করেন এবং পরে তিনি ঐ নামেই প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাহুদেব মিশ্রও তৎকৃত টীকার শেষে “পক্ষধর মিশ্র ভ্রাতুষ্পুত্র.....বাহুদেব মিশ্র বিরচিতায়াঃ”—এইরূপ লিখিয়াছেন।

হইলে (কেহ কেহ তাহাই বলিয়াছেন)—ইহা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না। কেন বুঝি না, তাহাও এখানে বলা আবশ্যক।

শুনিয়াছি, পক্ষধর মিশ্রের স্বহস্ত লিখিত বিষ্ণুপুরাণের এক পৃথী দারভাঙ্গা জেলায় যোগিনাড়া গ্রামে কেশব বা নৈয়ায়িকের বাড়ীতে আছে। ঐ পৃথীর শেষে লিখিত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় (১) পক্ষধর ৩৪৫ লক্ষ্মণ সংবতে মার্গমাसे ষষ্ঠী তিথিতে গুরুবারে অমরাবতী নগরে বাস করতঃ ঐ পৃথী লিখিয়াছিলেন। মিথিলার প্রাচীন গাথানুসারে ১১০৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভ হয়। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভ হয়,—এই বহুসম্মত বর্তমান মতানুসারে বুঝা যায়, পক্ষধর ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ পৃথী লেখেন। (কারণ ১১১৯ সংখ্যার সহিত ৩৪৫ সংখ্যার যোগ করিলে ১৪৬৪ হয়)। পক্ষধর যে, পাঠাবস্থাতেই স্থানান্তর হইতে ঐ পৃথী লিখিয়া আনিয়াছিলেন, ইহাই আমরা সম্ভব বুঝি। পূর্বোক্ত বামুদেব সার্কভোমের নবদ্বীপে স্থায়শাস্ত্রের অধ্যাপনাকালানুসারে বুঝা যায়, তিনিও ঐ সময়েই মিথিলায় স্থায়শাস্ত্র পড়িতে গিয়াছিলেন। স্মৃতরাং তাঁহার পক্ষধর মিশ্রের সহাধ্যায়িত্বই সম্ভব। পক্ষধরের যৌবনকালে মিথিলার শঙ্করমিশ্র ও স্মৃতিনিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র অতি প্রাচীন। (২)। মৈথিলী পণ্ডিতগণ তাহাই বলেন এবং

১। উক্ত পৃথীর শেষে লিখিত আছে, “বাণৈক্কেদয়ুতঃ সশত্বনয়নৈঃ সংখ্যাং গতে হান্ধন, শ্রীমদ্ গোড় মহীভুজো গুরুদিনে মার্গে চ পক্ষে সিতে। ষষ্ঠ্যাং তামরাবতী মধিবল্ বা ভূমি দেবালয়ঃ, শ্রীমৎ পক্ষধরঃ হপুস্তক মিব শুদ্ধঃ ব্যলেক্ষীত্ৰুতং”। শত্বনয়ন=৩, বেদ=৪, বাণ=৫। ৩৪৫ লক্ষ্মণ সংবৎ। এ বিষয়ে ১৩৩০ সালের “ভারতবর্ষ” পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। মিথিলাধিপতি ভৈরবেন্দ্র দেবের সময়ে নব্যবর্তমান তৎকৃত “দণ্ডবিবক” গ্রন্থের প্রারম্ভে “শঙ্কর-বাচস্পতী মে গুরুবঃ”—এই উক্তিদ্বারা তৎকালে জীবিত বৃদ্ধ শঙ্কর মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রকে গুরু বলিয়াছেন। উক্ত বাচস্পতি মিশ্রও ভৈরবেন্দ্র দেবের ধর্মপত্নীর আদেশে “বৈত নির্ণয়” নামক স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। মিথিলার কাবি বিদ্যাপতিও ভৈরব সিংহের অল্প রূপ-নারায়ণের উৎসাহে “দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” গ্রন্থ রচনা করেন। তাই তিনি সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে উক্ত রূপনারায়ণের গুণবর্ণন করিতে কোন ভ্রাতাকে লিখিয়াছেন—“তদনুজো যো রূপনারায়ণঃ”। উক্ত ভৈরব সিংহ ও রূপনারায়ণের জীবনকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী, ইহা নিশ্চিত। ষোড়শ শতাব্দীর পরার্ধে স্মার্ত্তরম্মন্দন নিজগ্রন্থে উক্ত বাচস্পতি মিশ্র ও বিদ্যাপতির গ্রন্থের উল্লেখ

তঁাহারা মিথিলার প্রসিদ্ধ প্রাচীনশ্লোক পাঠ করেন—“শঙ্কর-বাচস্পত্যৌ শঙ্কর বাচস্পতি সদৃশৌ। পঞ্চধরস্ত প্রতিপক্ষোলক্ষ্যৌ ভূতান কুজাপি”।

পরন্তু পঞ্চধর মিশ্রের প্রসিদ্ধ ছাত্র মিথিলার “সোদরপুর নিবাসী” রুচি দত্তের মৈথিল অক্ষরে স্বহস্ত লিখিত উদয়ন কৃত “কিরণাবলী”র এক পৃথী কাশীর সরস্বতী ভবনে আছে। উহার শেষে লিখিত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়, রুচি দত্ত ৩৬ লক্ষণ সংবতে (১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ পৃথী লেখেন (১)। রুচি দত্তের নিজ কৃত “মকরন্দবাখ্যা”র এক পৃথী এবং “দ্রব্যাকিরণাবলীপ্রকাশিকাবিবৃতি”র এক পৃথীও কাশীর সরস্বতী ভবনে আছে। উক্ত দুই পৃথীর লিপিকাল যথাক্রমে ৪২৩ লক্ষণ সংবৎ এবং ১৬০০ বৈক্রম সংবৎ। মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের বংশধর আমার কোন ছাত্রের নিকটে তালপত্রে রাজকর শর্তার লিখিত রুচি দত্ত কৃত “মকরন্দবাখ্যা”র এক পৃথী দেখিয়াছি। উহার শেষে লিপিকাল স্পষ্ট লিখিত আছে—৪১৮ ল সং। ল সং অর্থাৎ লক্ষণ সংবৎ। সুতরাং রুচি দত্তও যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিশিষ্ট নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন,— ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে তঁাহার অধ্যাপক পঞ্চধর মিশ্র ঐ সময়ের বহু পূর্ববর্তী হইতে পারেন না।

পরন্তু রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চধর মিশ্রের নিকটে ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পরে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্টের নিকটে অনেকদিন পর্য্যন্ত শ্রীমাংসাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র শঙ্কর ভট্ট “গাধিবংশানুচরিত” নামে যে পুস্তকে নিজ বংশের ইতিহাস বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তঁাহার পিতামহের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণির কথাও

করিয়াছেন। সুদীর্ঘ জীবী বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও রূপনারায়ণের অভ্যাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু শঙ্করমিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্র তঁাহার পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। শঙ্কর মিশ্রের “ভেদরত্ন” গ্রন্থের যে পৃথী জন্মুতে আছে, তাহার লিপিকাল ১৫১৯ সংবৎ। (১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ)।

১। উক্ত পৃথীর শেষে লিখিত আছে—“রস-বহু-হরনেত্র চৈত্রকে শুক্লপক্ষে, প্রতিপদি বুধবারে বৎসরে লাক্ষণেচ। বিবুধবুধবিনোদ ভাবরত্নীং হ্রপুস্তী মলিখ দমল পাণিঃ শ্রীকৃষ্টিঃ শ্রীসমত্যাং”। হরনেত্র=৩, বহু=৮, রস=৬,—৩৮৬ লক্ষণ সংবৎ (১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। কেহ রুচিদত্ত কৃত কোন পৃথীর লিপিকাল ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া পঞ্চধর মিশ্রকে তৎপূর্ববর্তী বলিয়াছেন। কিন্তু হরিমিশ্রের ত্রাত্মপুত্র ও ছাত্র পঞ্চধর মিশ্র যে পঞ্চদশশতাব্দীর পূর্ববর্তী, ইহা আশ্রয় বিশ্বাস করিতে পারি না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

লিখিয়া গিয়াছেন (১)। রামেশ্বর ভট্টের বংশধরগণ এখনও কাশীতে আছেন। তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণ ভট্ট ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে “বৃন্দাবনাকারে”র টীকা করেন। সুতরাং রামেশ্বর ভট্ট যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রখ্যাত প্রবীণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন, এবিষয়ে সংশয় নাই। তাহা হইলে রঘুনাথ শিরোমণিও সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বেই পঞ্চদশ মিশ্রের নিকটে “তাত্ত্বিক শিল্পোন্নতি” উপাধিলাভ করিয়া পরে রামেশ্বর ভট্টের নিকটে অধ্যয়ন করেন, ইহাই বুঝা যায়। আর তিনি সেই সময়েই “তত্ত্বচিন্তামণি”র দীপ্তি টীকা এবং আরও কোন কোন গ্রন্থ রচনা করেন, ইহাই মনে হয়। তাই তখন হইতেই বিদেশীয় পণ্ডিত সমাজে অনেক স্থানে তাঁহার গ্রন্থের প্রচার হয় এবং শঙ্কর ভট্টও রঘুনাথ শিরোমণির তৎকালীন বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রযুক্তই তাঁহার পিতামহের গৌরব বর্ণন করিতে তাঁহার বহু ছাত্রের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির কথাও বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

সে যাহা হউক, মূল কথা, পূর্বোক্ত নানা কারণেই রঘুনাথ শিরোমণির গুরু “আলোক” টীকাকার পঞ্চদশ মিশ্র যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ভারত বিখ্যাত মহানৈয়ায়িক হইয়াছিলেন—ইহাই আমরা বুঝি। তিনি যে, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পৌত্র যজ্ঞপতির শিষ্য বা প্রশিষ্য, ইহা আমরা বুঝি না। আর তিনি “আলোক” টীকাকার নহেন, “আলোক” টীকাকার পঞ্চদশ মিশ্র তাঁহা হইতে পূর্ববর্তী, এইরূপ কল্পনাও আমরা করিতে পারি না (২)। কারণ রঘুনাথ

১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত “গাধিবংশাবতরিত” পাঠ করিয়া অনেক প্রবন্ধেই ঐকথা লিখিয়াছেন। পূর্বোক্ত “কাশীনাথ বিজ্ঞানিগণ” প্রবন্ধে—রামেশ্বর ভট্টের কাশীবাসের কথাও লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ রামেশ্বর ভট্ট প্রথমে ৮কাশীতেই বাস করিতেন। পরে কোনও কারণে তিনি দ্বারকার কএক বৎসর বাস করিয়া আবার পূর্ববৎ কাশীবাসী হইয়াছিলেন। দ্বারকার ঘাইবার, সময়েই তাঁহার পুত্র নারায়ণ ভট্টের জন্ম হয়। কিন্তু তাহার প্রথম কাশীবাস কালেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহাই আমাদের ধারণা।

২। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ৩৮ব্রহ্মকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় “স্মার কুম্মাঙ্গলির” ভূমিকায় ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কারণ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের সংগৃহীত পঞ্চদশ মিশ্রকৃত “প্রত্যক্ষালোকে”র এক পৃথক লিপিকাল ১৫৯ লক্ষণ সন্ধ্যা। কিন্তু গুনিয়াছি, মিত্র মহোদয়ের সংগৃহীত সেই পৃথক শেষে লিখিত আছে—শুভমন্ত শ্রীরন্ত শকাব্দ। ৯৭২

শিরোমণির গুরু পক্ষধর মিশ্রই যে, “তত্ত্বচিন্তামণি”র “আলোক” নামে টীকা করেন, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ আছে। তাই পরে নবদ্বীপের মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতিও রঘুনাথ শিরোমণির গুরু পক্ষধর মিশ্রকৃত “আলোক” টীকারও টীকা করিয়াছিলেন। “ব্যাস্তিসিদ্ধান্তলক্ষণ দীপ্তি”র “যৌবদীয়কল্পে”র টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও ঐ পক্ষধর মিশ্রেরই নামোল্লেখ পূর্বক নিজের উক্তি-বিশেষের সমর্থনের জন্য সসম্মানে তাঁহারই “আলোক” টীকার সন্দর্ভ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর “আলোক” টীকার পক্ষধর মিশ্র যে, তাঁহার পিতৃব্য হরি মিশ্রের ছাত্র, ইহা তিনি সেই টীকার প্রারম্ভে নিজেই বলিয়াছেন। মিথিলায় কবি বিদ্যাপতিও উক্ত হরিমিশ্রের নিকটে প্রথমে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাও মিথিলায় প্রসিদ্ধ আছে এবং উক্ত পক্ষধর মিশ্র যে, যৌবনকালে বুদ্ধ বিদ্যাপতির গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন—এই রূপ প্রবাদও আছে (১)। পরন্তু পক্ষধর মিশ্র যে সময়ে “তত্ত্ব চিন্তামণি”র “আলোক” নামে টীকা রচনা করেন, তখন “তত্ত্বচিন্তামণি”র বিভিন্ন লেখকের লিখিত বিভিন্ন পুথীতে তিনিও পাঠভেদ দেখিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ খণ্ডেও কোন স্থলে পাঠ ভেদের উল্লেখ করিয়া উহা কলিত

১৫০২। উক্ত স্থলে পরে “লসং” লিখিত হওয়ায় ১৫০২ লক্ষণ সংবৎ অসম্ভব বলিয়া মিত্র মহোদয় উক্ত অঙ্কে শূন্যত্যাগ করিয়া ১৫০ লক্ষণ সংবৎই উক্ত পুথীর লিপিকাল নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে উক্ত লেখক পূর্ব “শকাব্দা” লিখিয়াছেন কেন? সেখানে তাহার কোন অংশে ভ্রম স্বীকার্য্য হইলে তিনি পরে সংখ্যা অর্থেই “লসং” লিখিয়াছিলেন ইহাও বলা যায়। আমাদের মনে হয়, উক্ত লেখক পরে লক্ষণ সংবৎ ও লিখিবার জন্তই “লসং” লিখিয়া পরে উহার সংখ্যাক স্মরণ না হওয়ায় পূর্বলিখিত শকাব্দের সংখ্যাই লিখিয়াছিলেন ১৫০২।

১। প্রবাদ আছে,—একদিন ক্ষীণকায় যুবক পক্ষধর মিশ্র স্থানান্তরে যাইতে বিদ্যাপতির গ্রামে তাঁহার সুবিশাল অতিথিশালায় এক স্তম্ভকোণে বসিয়াছিলেন। পরে বিদ্যাপতি অতিথি-গণের পর্যবেক্ষণের জন্য আসিয়া তাহাকে ঐ স্থানে দেখিয়াই বলেন,—“প্রাযুগো যুগবৎ কোণে হৃদয়ান্নোপলভাসে”। অর্থাৎ স্তম্ভকোণে যুগবৎ অবস্থিত “প্রাযুগো” (অতিথি) তুমি হৃদয়ত বশতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছ না। বিদ্যাপতি ঐ কথা বলিলে পরক্ষণেই পক্ষধর মিশ্র বলেন—“নহি স্বর্নধ্বজঃ পুংসঃ হৃদয়ে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে”। অর্থাৎ হ্রীল বুদ্ধি পুরুষের হৃদয় পদার্থে দৃষ্টি জন্মে না। পরক্ষণেই বিদ্যাপতি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বহু সমাদর করিয়াছিলেন।

অসাম্প্রদায়িক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন (১)। সুতরাং তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি গঙ্গেশের পৌত্র-যজ্ঞপতির অনেক পরে ঐ টীকা করেন। কারণ, তিনি যজ্ঞপতি বা তাঁহার ছাত্রের নিকটে “তত্ত্ব-চিন্তামণি”র পুথী পাইলে কখনই উহার কোন পাঠান্তরের উল্লেখ করিতেন না।

তार्কিক শিরোমণি রঘুনাথের নবদ্বীপে

নব্যন্যায়-প্রতিষ্ঠা

রঘুনাথ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থের “দীধিতি” নামে যে-টীকা করেন, তাহার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—“দীধিতিমণিচিন্তামণি কুরুতে তार्কিকশিরোমণিঃ শ্রীমান্”। সুতরাং বুঝা যায়, তিনি মিথিলায় “তार्কিকশিরোমণি” উপাধি লাভ করেন এবং ঐ নামেই তখন প্রসিদ্ধ হন। পরে তিনি কেবল “শিরোমণি” নামেই প্রসিদ্ধ হন এবং তাঁহার গ্রন্থও “শিরোমণি” নামে কথিত হয়। তাঁহার “দীধিতি” টীকা সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ হইলেও (২), তাঁহার অভিনব হৃদয় বিচারও মৈথিল টীকাকার-গণের মত-বিশেষে অকাট্য হৃদয় যুক্তির প্রভাব উদ্ভাসিত হইয়া উহা তখন সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সেই অভিনব টীকার প্রচার করিয়া এক অপূর্ণ নব্যন্যায়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলে তখন

১। “কচিৎ আবশ্যক ইদিত্যনন্তরং অন্তথাগুহ্যপক্ষে ... ন তু”—ইতি পর্য্যন্তঃ গ্রন্থ লিখনং, অগ্রে লঘুত্বা চেত্যানন্তরং ন শক লোপশ্চ দৃশ্যতে, তত্ত্বকল্পিত মনাস্প্রদায়িক মিথ্যাপেক্ষিতঃ”। প্রত্যক্ষ খণ্ড মনোহণুবাদের “আলোক” টীকা। (সোসাইটি সংস্করণ ৭৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। রঘুনাথ শিরোমণি “তত্ত্ব চিন্তামণি”র প্রথম হইতে অনুমান খণ্ডের “বাব” পর্য্যন্ত গ্রন্থের টীকা করেন। “ঈশ্বরানুমান চিন্তামণি”র প্রথম হইতে কিয়দংশের “দীধিতি” ও দেখা যায় এবং উহার শেষেই তাঁহার সেই উৎকট গর্ব প্রকাশক মোকটি দেখা যায়—

“বিদ্বৎ নিবহৈরিহৈক মত্যাৎ বদদৃষ্টঃ নিরটকি বচ দৃষ্টঃ।

ময়ি জলতি কল্পনাধি নাথে রঘুনাথে মনুত্যাং তদহুধৈব” ॥

ইহার দ্বারা বুঝা যায়, ঐ স্থানেই তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি টীকার শেষ। এবং মনে হয় তিনি পরে তত্ত্বচিন্তামণির শেষ অংশ মিথিলায় না পাইয়াই উহার টীকা করিতে পারেন নাই এবং মিথিলাতেই কোন সভায় কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া উক্ত শ্লোক বসিয়াছিলেন। তিনি পরে শব্দ খণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে “নঞবাদ” ও “আখ্যাত বাদ” প্রভৃতি অনুসৃত্ত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

হইতেই শত শত গ্রায়-বিচারী তাঁহার “দীধিতি” পাঠ করিবার জন্ত নবদীপে আসিতে থাকেন। পরে তাঁহারই সম্প্রদায়ক্রমে নবদীপে বহু মহা-নৈয়ায়িকের অভ্যুদয় হয় এবং অনেকে তাঁহার “দীধিতি”র টীকা করিয়া অধ্যাপনাদির দ্বারা তাঁহারই প্রতিষ্ঠাপিত সেই নব্যায় রাজ্যকে সর্বাঙ্গসংগত ও সুসমৃদ্ধ করিয়া উহার অক্ষয়-প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করেন।

রঘুনাথ শিরোমণির “দীধিতি”র প্রচার হইলে ক্রমে সর্বত্র উহার এমন প্রতিষ্ঠা হয় যে, যিনি উহা পড়েন নাই, তিনি কোন দেশেই নৈয়ায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। তাই তখন হইতে ভারতে ষাঁহার গ্রায়শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তাঁহার সকলেই রঘুনাথ শিরোমণির নব্য গ্রায়গ্রন্থ বিশেষ রূপে পড়িয়াছেন। সপ্তদশশতাব্দীর প্রারম্ভে হৈলিঙ্গ দেশীয় জগন্নাথ পণ্ডিতও রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থ ও তাঁহার টীকা পড়িয়াছিলেন—ইহা “রসগঙ্গাধর” গ্রন্থে তাঁহার উক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। (১) মিথিলাতেও পরে রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থের পঠন-পাঠনারম্ভ হয়। সপ্তদশশতাব্দীতে মিথিলার মহানৈয়ায়িক গোকুলনাথ উপাধ্যায়ও রঘুনাথ শিরোমণির “দীধিতি”র “দীধিতিবজোত” নামে সংক্ষিপ্ত টীকা করেন। তৎপূর্ব হইতেই মৈথিল ছাত্রগণও নবান্ধার পড়বার জন্ত নবদীপেই গিয়াছেন এবং তাঁহার মিথিলার অগ্রাশ্রয় নব্যগ্রায়গ্রন্থও পরে নবদীপে লইয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। টীকাকার মথুরানাথ প্রভৃতিও মিথিলার সমস্ত গ্রায়গ্রন্থ ও বৈশেষিক গ্রন্থ বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,— ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়।

রঘুনাথের “দীধিতি”র প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ

অনেকেই “দীধিতি”র টীকা করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ অনুমান খণ্ডের “দীধিতি”র টীকা টিপ্পনী যে কত নৈয়ায়িক করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যাই নাই। কিন্তু নবদীপের মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, জগদীশ

১। “রসগঙ্গাধর” নামক জগন্নাথ গ্রন্থ উপমাঙ্গকার বিচারে (“কাব্যমালা”, ১৮৭ পৃষ্ঠায়) জগন্নাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—“ইথমেবচাধ্যাতবাদ শিরোমণি-ব্যাখ্যাত্তি রসিসিদ্ধান্তিত মিতি চেৎ”। রঘুনাথশিরোমণি কৃত “আখ্যাত বাদ” গ্রন্থই উক্ত সূক্তে—“আখ্যাতবাদ শিরোমণি”

তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্যই প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইহাদিগের সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার যাহা বিশেষ বক্তব্য, তাহাও বলা আবশ্যক। “নবদ্বীপমহিমা”র লেখক প্রভৃতি অনেকেই মথুরানাথ তর্কবাগীশকে রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কারণ, অনেক বৃদ্ধ পণ্ডিত তাহাই বলিতেন। কিন্তু সে বিষয়ে আমি কোন প্রমাণ পাই নাই এবং তাহা সম্ভবও বুঝি না। মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার তৎকালে নবদ্বীপে মহানৈয়ায়িক ছিলেন। মথুরানাথ তাঁহারই নিঃকটে প্রথমে অধ্যয়ন করেন। তিনি পরে “তত্ত্বচিন্তামণি”র “রহস্য” নামে উৎকৃষ্ট টীকাও করিয়াছেন (১)। সেই টীকার প্রারম্ভেও তিনি তাঁহার পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কারেরই বহু গৌরব প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকেই নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। এবং ঐ টীকায় অনেক স্থলে “পিতৃচরণাস্ত” “পিতৃসরণানাংমতে” এইরূপ বলিয়া তাঁহার পিতার ব্যাখ্যা-বিশেষেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য তিনি অনেক স্থলে “গুরুচরণাস্ত” বলিয়া তাঁহার গুরুমত প্রকাশ করার স্মারশাস্ত্রে তাঁহার অল্প গুরুও ছিলেন, ইহা বুঝা যায় এবং তিনি কোন কোন স্থলে “ভট্টাচার্য্যাস্ত” বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা রঘুনাথ শিরোমণিরও মত। কিন্তু তদ্বারা রঘুনাথ শিরোমণি যে, তাঁহার অধ্যাপক গুরু, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, তিনি রঘুনাথ শিরোমণির মত প্রকাশ করিতে “দীধিতিকৃতস্ত”, “দীধিত্যনুযায়িনস্ত” এইরূপই

শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, তৎপূর্ব্ব হইতেই রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থও সর্বত্রই “শিরোমণি” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখনও উহা “শিরোমণি” নামে কথিত হয়।

১। মথুরানাথের “তত্ত্বচিন্তামণি রহস্য” টীকার সর্বাংশ পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত অংশ অনেকদূর পূর্ব্বেরই কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। মথুরানাথ স্মারশাস্ত্রবিষয়ে “সিদ্ধান্ত রহস্য” নামে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। “তত্ত্বচিন্তামণি”র টীকার মধ্যে অনেক স্থলে তিনি ঐ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। (অনুমান ঋণ সোসাইটি সংস্করণ ২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাঁহার ঐ গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই নাই। মথুরানাথ পঞ্চদশ শতাব্দীর “আনোকে” টীকারও অনেক অংশের টীকা করিয়াছিলেন। শব্দ খণ্ডের কোন কোন অংশের টীকার পৃষ্ঠা কাপিতে আছে।

লিখিয়াছেন (১)। পরন্তু তিনি রঘুনাথশিরোমণির “দীধিতি”র টীকা করিতে কোন কোন স্থলে তাঁহার সন্দর্ভ বিশেষের অর্থ ব্যাখ্যায় অপরের মতও বলিয়াছেন এবং উহার পরেই “গুরুচরণান্ত” বলিয়া সে বিষয়ে তাঁহার গুরুমতও বলিয়াছেন (২)। তিনি রঘুনাথ শিরোমণির নিকটে তাঁহার দীধিতি পাঠ করিলে কখনই তাঁহার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ঐ ভাবে অপর সম্প্রদায়ের মত বলিয়া নিজ গুরুমতের উল্লেখ করিতে পারেন না। পরন্তু রঘুনাথ শিরোমণি “তত্ত্বচিন্তামণি”র হেত্বাভাস পর্য্যন্তই টীকা করায় মথুরানাথ কোনস্থলে শিরোমণির শিষ্যসম্প্রদায়কেই উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন “জানন্তি কেচি-
ক্লেভাভাসান্তঃ” অর্থাৎ তাঁহারা তত্ত্ব-চিন্তামণির হেত্বাভাস পর্য্যন্তই জানেন। মথুরানাথ পরে সমগ্র “তত্ত্ব-চিন্তামণি”রই টীকা করিয়াছিলেন এবং সেই টীকায় তিনি অনেক স্থলে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া অভিনব ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ব্যাপ্তি-সিদ্ধান্ত-লক্ষণের “দীধিতি” এবং মথুরানাথের “রহস্ত” টীকা পাঠ করিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

পরন্তু শ্রীরাম তর্কালঙ্কার উদয়নাচাৰ্যের “আত্মতত্ত্ব-বিবেকে”র রঘুনাথ-শিরোমণিকৃত টীকার যে টীকা করিয়াছিলেন—(কাশীধামে চৌধাষায় উহা মুদ্রিত হইতেছে)—সেই টীকার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—“হৃদি কৃষ্ণা চ নিখিলং সার্বভৌমশ্চ সদৃশঃ”। সুতরাং তিনি যে, কোন সার্বভৌমের ছাত্র, এবং তাঁহার উপদেশ অরণ করিয়া তিনি ঐ টীকা করেন, ইহাই বুঝা যায়। পরন্তু তিনিও ঐ টীকায় “গুরুচরণান্ত” ইত্যাদি এবং “কেচিভু” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা রঘুনাথ শিরোমণির উক্তিবিশেষের ব্যাখ্যায় নিজ গুরুমত

১। “মঙ্গলবাদ রহস্ত” টীকার (সোসাইটি সংস্করণ ১৭ পৃষ্ঠার) “উপাখ্যায়ান্ত”। পরে “প্রামাণ্যবাদ রহস্ত” টীকায় (ঐ ১১৫ পৃঃ) “দীধিতিকৃত্ত জগৎ পরং তদানং সংসার বিশিষ্টান্ত পরং” ইত্যাদি। পরে—“প্রামাণ্যবাদ সিদ্ধান্ত রহস্ত” টীকার “দীধিতাত্ম যারিনন্ত” ইত্যাদি (ঐ ২৭৭ পৃঃ)। পরে “ভট্টাচার্য্যান্ত...তদসৎ” (ঐ ২৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। ব্যাপ্তি সিদ্ধান্ত লক্ষণের “দীধিতি”র টীকায় মথুরানাথ কোন স্থলে লিখিয়াছেন—“কেচিভু উক্ত কবিকৈব দীধিতিকৃত্ত সিদ্ধান্তীকৃত্ত, তথাচ তদগ্রন্থস্যায়মর্থঃ” ইত্যাদি। উহার পরেই “গুরু চরণান্ত” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্তস্থলে দীধিতিকার শিরোমণির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তাঁহার গুরুমতও বলিয়াছেন।

এবং মতান্তরও প্রকাশ করিয়াছেন। (কাশীতে মুদ্রিত ঐ পুস্তকের ২৪ ও ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ আরও নানা কারণে মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ও যে, রঘুনাথ শিরোমণির অন্তর্ভাবের অনেক পরে উক্ত টীকা করিয়াছিলেন, ইহাই আমরা বুঝিয়াছি। অনেকে যে, শ্রীরাম তর্কালঙ্কারকে রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র বলিয়াছেন, তাহাও আমরা কোন রূপেই বুঝিতে পারি না। আমরা দিগে মনে হয়, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার রামভদ্র সার্কভোমের ছাত্র।

নবদ্বীপে রামভদ্র নামে অনেক নৈয়ায়িক ছিলেন। “শব্দশক্তি প্রকাশিকা”র টীকাকার রামভদ্র তাঁহাদিগের পরবর্তী এবং তাঁহার উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ। (তাঁহার সংক্ষিপ্ত টীকা দেখিয়াছি, এখন কাশীতে উহা মুদ্রিত হইতেছে)। তাঁহার পূর্বে এফ রামভদ্র সার্কভোম বা স্ত্রায়ালঙ্কার, রঘুনাথ শিরোমণির দীক্ষিতের টীকা করেন। কিন্তু তিনি যে শিরোমণির পুত্র বা ছাত্র, তাহাও কোন প্রমাণ পাই নাই। অপর রামভদ্র সার্কভোম “সমাসবাদ” ও “নানাস্ববাদ” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। অপর রামভদ্র সার্কভোম নবদ্বীপে অতি বিখ্যাত প্রধান নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন। তিনি উদয়নাচার্য্যকৃত “কুশ্মাঞ্জলি কারিকা”র টীকা এবং “কিরণাবলী”র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের টীকা “গুণ রহস্ত” এবং স্ত্রায়হস্তের টীকা “স্ত্রায়রহস্ত” রচনা করেন। এবং তিনি রঘুনাথ শিরোমণি কৃত “পদার্থ তত্ত্ব নিরূপণ” বা পদার্থখণ্ডন গ্রন্থেরও টীকা করেন। (অনেক দিন পূর্বেই কাশীতে উহা মুদ্রিত হইয়াছে)। সেই টীকার প্রারম্ভে “তাতম্য তর্ক সরসীরূহ কাননেষু চূড়ামণেদ্বিনমণেশচরণে প্রণম্য”—এই উক্তির দ্বারা বুঝা যায়, তৎকালে তাঁহার পিতা চূড়ামণি নামে প্রসিদ্ধ মহানৈয়ায়িক ছিলেন। কিন্তু সেই চূড়ামণির প্রকৃত নাম নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। তবে তিনি যে, রঘুনাথ শিরোমণি নহেন, উক্ত শ্লোকে ছন্দে অসঙ্গতিতে শিরোমণিই যে চূড়ামণি নামে কথিত হন নাই, ইহা নিশ্চিত। বর্তমান হুগলি জেলার অন্তর্গত বঙ্গের প্রখ্যাত প্রাচীন পণ্ডিত সমাধি খানাকুল কৃষ্ণনগরের মহানৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশ তাঁহার “ভ.সারত্ব” গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—“চূড়ামণিপদাস্তোজব্রহ্মরীভূতমোলিনা। সংক্ষপ্য ত্রিকণাদেন ভাষারত্নং বিতত্ততে” ॥ সুতরাং বুঝা যায়, তাঁহার স্ত্রায়শাস্ত্রে

অধ্যাপক কোন চূড়ামণি। কেহ বলেন, তিনি “সিদ্ধান্ত মঞ্জরী”কার জ্ঞানকী নাথ চূড়ামণি। আমাদিগের মনে হয়, উক্ত কণাদ তর্কবাগীশ রামভদ্র সার্কভোমের পিতা চূড়ামণির ছাত্র।* তিনিও “তত্ত্বচিন্তামণি”র কোন কোন অংশের টীকা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে “অবয়ব” গ্রন্থের টীকার পৃথী আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে দেখিয়াছি।

পূর্বোক্ত রামভদ্র সার্কভোম কৃত কুহ্মাঞ্জলি কারিকা ব্যাখ্যার তিনখানা পৃথী আমি দেখিয়াছি (১)। উহার এক পৃথী ৩০ পত্রে সম্পূর্ণ। উহার

* রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কোন প্রমাণ না বলিয়াও উক্ত কণাদ তর্কবাগীশকে বাহুদেব সার্কভোমের ছাত্র এবং রঘুনাথ শিরোমণি হইতে বয়োযুক্ত বলিয়াছেন। খানিকুল কুকুনগরের “স্মৃতিসর্বস্ব” প্রভৃতি নানা গ্রন্থকার নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত কণাদ তর্কবাগীশের ছাত্র, ইহাও লিখিয়াছেন। ইহা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু উক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত “ধাতুরত্নাকর” গ্রন্থের শেষে লিখিত “শাকাদে রস (৬)-নাগ (৮)-রোপ (৭)-রজনীনামৈ (১) মিতে মাধবে” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা জানা যায়, তিনি ১৮৬৬ শকাদে (১৬৬৪ খ্রীঃ) ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাহা হইলে তাঁহার অধ্যাপক কণাদ তর্কবাগীশ বাহুদেব সার্কভোমের ছাত্র হইতে পারেন না। কারণ ১৪৫৫ শকাদে খ্রীঃচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্বানের কিছুকাল পরেই বাহুদেব সার্কভোম অন্তর্হিত হন। কেহ কেহ উক্ত কণাদ তর্কবাগীশকে মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র বলিয়া তাঁহার প্রকৃত নাম বলিয়াছেন—রঘুদেব। কেহ আবার তাঁহাকে মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের গুপ্তও বলিয়াছেন। (কিরণাবলী ও শঙ্কর মিশ্র কৃত টীকা সহিত ষণ্ডন খণ্ডখাণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহা একেবারেই অসম্ভব অসত্য। কণাদ যত ব্যাখ্যাকার মহানৈয়ায়িক রঘুদেব ত্রায়ালাস্কার উক্ত কণাদ তর্কবাগীশের পরবর্তী। তাঁহার কথা পরে বলিব।

১। বঙ্গদেশে লিখিত কুহ্মাঞ্জলির রামভদ্রী টীকার পুথীর প্রারম্ভে “ভবানীভবনাখ্যাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রণমামাহং” ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া অফ্রেট সাহেব প্রভৃতি কেহ কেহ উক্ত রামভদ্র সার্কভোমের পিতার নাম ভবনাথ ও মাতার নাম ভবানী, ইহা লিখিয়াছেন। কিন্তু মিথিলার শঙ্করমিশ্র কুহ্মাঞ্জলি কারিকার “আমোদ” নামে যে টীকা করেন, তাহারই প্রথমে উক্ত “ভবানী ভবনা-খ্যাভ্যাং” ইত্যাদি শ্লোক আছে। এবং উহার পরে “মকরন্দ প্রকাশে বা ব্যাখ্যা পরিমলে ২ধবা। ততোহধিকাংপিতৃব্য্যাং মাধ্যাত্মময় মুদ্রমঃ” এই শ্লোক আছে। শঙ্করমিশ্রের পিতার নাম ভবনাথ ও মাতার নাম ভবানী, ইহা বৈশেষিক দর্শনের তৎকৃত “উপস্কার” টীকাতেও তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার ঐ “আমোদ” টীকাও সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। স্ততরাং বুঝা যায়,—বঙ্গদেশে প্রথমে কোন নৈয়ায়িক লেখক শঙ্কর মিশ্রের ঐ “আমোদ” টীকার কিয়দংশ মাত্র পাইয়া উহা লিখিয়া উহার পর হইতেই রামভদ্রী টীকা লিখিয়াছিলেন। সেই পৃথী দেখিয়া

শেষে লেখকের লিপিকাল স্পষ্ট লিখিত আছে—১৫৮৩ শকাব্দ (১৬৬১ খৃঃ) । সুতরাং উক্ত রামভদ্র সার্কভোম ঐ সময়ের পূর্ববর্তী সন্দেহ নাই । তিনি ষোড়শ শতাব্দীর পরার্ধে নবদ্বীপে ত্রায়শাস্ত্রের অধ্যাপনারম্ভ করিলে এবং সুদীর্ঘজীবী হইলে প্রথমে শ্রীরাম তর্কালঙ্কার পরে তৎপুত্র মথুরানাথ ও পরে জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে পারেন । শ্রীরাম তর্কালঙ্কার অত্র কোন সার্কভোমেরও ছাত্র হইতে পারেন । কিন্তু জগদীশ যে উক্ত রামভদ্র সার্কভোমের ছাত্র, ইহা নিশ্চিত । কারণ, জগদীশ “তত্ত্ব-চিন্তামণি”র “ময়ূখ” নামে যে টীকা করেন—(উহার সর্বোংশ পাওয়া যায় না । কোন অংশ আমি দেখিয়াছি)—ঐ টীকার প্রারম্ভে “শ্রীসার্কভোমস্ত গুরোঃ পদাঙ্কঃ”—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা এবং তাঁহার “শব্দশক্তিপ্রকাশিকা” গ্রন্থে শক্তিবিচারের শেষে “ইতি পুনস্ত্রায়-রহস্যেহম্মদ গুরুচরণাঃ”—এই উক্তির দ্বারা তাহা বুঝা যায় । ত্রায় হস্তের টীকা উক্ত “ত্রায়রহস্য” গ্রন্থ যে, উক্ত রামভদ্র সার্কভোমেরই রচিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । উহার অসম্পূর্ণ পৃথী কানীর সম্ভবতী ভবনে আছে ।

বঙ্গদেশে অনেক বুদ্ধ নৈয়ায়িক বলিতেন,—মথুরানাথতর্কবাগীশের ছাত্র ভবানন্দ, ভবানন্দের ছাত্র জগদীশ । কিন্তু এ বিষয়েও কোন প্রমাণ পাই নাই । পরন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কার কোন কোন স্থলে ভবানন্দ সিদ্ধান্ত-বাগীশের সম্মত “দীর্ঘিতি”র পাঠ গ্রহণ না করিয়া অত্ররূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন । অনুমান খণ্ডের হেতুভাস বিভাগে “অসিদ্ধি” গ্রন্থের “দীর্ঘিতি”র টীকায় জগদীশ কোনস্থলে লিখিয়াছেন—“উচ্যত ইত্যানন্তর মন্বংসম্প্রদায়-সিদ্ধঃ পার্ঠোলিখ্যতে” । (জাগদীশী চৌখাষা সিরীজ ১১৮৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য) । সুতরাং জগদীশের সম্প্রদায় যে ভবানন্দের সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা যায় । বস্তুতঃ মথুরানাথের সময়েও নানা লেখকের লিখিত “দীর্ঘিতি”র

লিখিত অন্তান্ত পৃথীও ঐ রূপই লিখিত হইয়াছে । বস্তুতঃ ঐ পৃথীর প্রথমে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোকাদি দেখা যায়, তাহা শব্দর মিশ্রকৃত । দুই থানা পৃথীতে কিয়দংশের পরেই লিখিতও দেখিয়াছি,—“এতৎ পর্য্যন্ত শব্দর মিশ্রকৃতঃ ততঃ সার্কভোমীয়ঃ” । সুতরাং উক্ত লেখক যে, উহার প্রথম হইতে ঐ অংশ পর্য্যন্ত শব্দর মিশ্রের টীকা, ইহা জানিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছেন, সে বিষয়েও সংশয় নাই ।

পুথীতে তিনিও কোন কোন স্থলে পাঠ ভেদ দেখিয়াছিলেন। পরে জগদীশ চর্কাক্ষর তাঁহার টীকায় অনেকস্থলে সেই পাঠ ভেদেরও প্রকাশ করিয়াছেন (১)। এইরূপ আরও নানা কারণে আমার ধারণা হইয়াছে যে, রঘুনাথ শিরোমণি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামেশ্বর ভট্টের নিকটে অধ্যয়ন শেষ করিয়া সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই নবদ্বীপে আসিয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। স্মার্ত রঘুনন্দন, শিরোমণিকে দেখিলেও তাঁহার গ্রন্থ-রচনা কালে শিরোমণি জীবিত ছিলেন না। শিরোমণি ও রঘুনন্দনের সম্বন্ধে কোন কোন দ্বন্দ্ব পণ্ডিতের প্রাচীন গল্প বিশেষ কোন প্রমাণ নহে। *

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ৮নবদ্বীপের মুখোপাধ্যায় বংশীয় এবং তাত্ত্বিক সাধক ছিলেন, ইহা জানা যায়। তিনিও পক্ষধর মিশ্র কৃত “আলেক”র টীকা এবং রঘুনাথ শিরোমণি কৃত “দীপ্তি”র টীকা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ

১। “ঘটাস্তইত্যেব সম্যক্ পাঠঃ, ঘটাস্ত ইতি পাঠস্ত” ইত্যাদি। ব্যাপ্তি পঞ্চ জগদীশীর শেষ। “দীপ্তিতে বিশেষ পদাদব—পক্ষেহপি এষ এবার্থো গ্রাহঃ”। পক্ষতা জগদীশী।

* অনেকে স্মার্ত রঘুনন্দনকেও ঐচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন তাঁহার “জ্যোতিষতত্ত্ব” গ্রন্থে সংক্রান্তি গণনার লিখিয়াছেন—“নবাষ্ট শত্ৰু-হীনেন শকাব্দাকেন পুরিতা”। ইহার দ্বারা বুঝা যায় তিনি (শত্ৰু=১৪, অষ্ট, নব,) ১৪৮২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে “জ্যোতিষতত্ত্ব”-রচনা করেন। নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিতগণের নিকটে শ্রবণ করিয়া “নবদ্বীপ মহিমা” পুস্তকে অনেক দিন পূর্বে কাস্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় এবং রাধা-নগর সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও রঘুনন্দনের “জ্যোতিষতত্ত্ব” রচনার ঐ সময়ই লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐ সময়ে রঘুনন্দনের বয়স যদি ৬৫ বৎসর পর্যন্তও ধরা যায়, তাহা হইলেও ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হওয়ায় ঐচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ কালের (১৫০২ পূঃ) পরেই তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন। ঐ সময়ে মলমাস বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হওয়ার রঘুনাথ শিরোমণি “মল্লিচবিবেক” নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (উহা এখনও পাওয়া যায়)। রঘুনন্দন পরে বিস্তৃত বিচার করিয়া মলমাস নিরূপণ করিতে প্রথমে “মলমাস তত্ত্ব” গ্রন্থে শিরোমণি বা তাঁহার ঐ গ্রন্থের নাম না করিলেও তাঁহার কোন কোন কথার প্রতিবাদও করিয়াছেন। গোপাল ভট্টের “হরিভক্তি বিলাস” এবং উহার সনাতন গোখামি কৃত টীকা রঘুনন্দনের একাদশী তত্ত্বাদি গ্রন্থ রচনার অনেক পূর্বেই রচিত হইয়াছে। কারণ সনাতন গোখামি সর্বশেষে “শাকে বটু সমুত্তি মনে” অর্থাৎ ১৫৭৬ শকাব্দে “বৈকবজোবিনী” টীকা সমাপ্ত করিয়া ঐ বৎসরেই বৃন্দাবনে দেহ ত্যাগ করেন।

রচনা করিয়াছিলেন। (ভবানন্দকৃত দীধিতি টীকার কিয়দংশ কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।) পরে মহারাষ্ট্র দেশেই ভবানন্দের দীধিতি টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হয়। মহারাষ্ট্র দেশীয় নৈয়ায়িক মহাদেব পুস্ত্যাকর ভবানন্দের দীধিতি টীকার “সর্বোপকারিণী” ও “ভবানন্দী প্রকাশ” নামে ছোট ও বড় দুইখানি টীকা করেন। ভবানন্দের দীধিতি টীকা পরে বঙ্গদেশে অপ্রচলিত হইলেও তাঁহার ক্ষুদ্র গ্রন্থ “কারকচক্র” বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হয়। বঙ্গদেশের বহু পল্লীতেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গৃহে আমরা ঐ পুস্তক দেখিয়াছি। আমরাও উহার অধ্যাণা করিয়াছি। পূর্বে অনেক বৈয়াকরণও ঐ গ্রন্থ পড়িতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ঐ গ্রন্থের উৎকৃষ্ট টীকা করিয়াছিলেন এবং উহা কলিকাতায় মুদ্রিতও হইয়াছে। (১)

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (যশোবন্তসিংহের সময়ে) গুপ্তিপাড়া নিবাসী নানাশাস্ত্রনিষ্ঠাত নৈয়ায়িক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য তৎকৃত “বিদ্যামোদ তরঙ্গিণী” গ্রন্থে নিজ বংশপরিচয়বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা রাধবেন্দ্র ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র এবং “শতাবধান” ছিলেন। একশত ব্যক্তি একশত শ্লোক বলিলে তিনি প্রত্যেকের শ্লোক হইতেই শব্দ গ্রহণ

(১) মাধব তর্কসিদ্ধান্ত আরও অনেক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। “শক্তিবাদের” টীকার প্রারম্ভে তাঁহার লিখিত শ্লোকের দ্বারা জানা যায়, তিনি চক্রপাণির সম্মান, রাঢ়ীয় শ্রেণীর (পুত্রিত্বও) বংশধর ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বিবেকধর। চক্রপাণির বংশে মহা-তপস্বী পণ্ডিত রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য যশোহরের অন্তর্গত ভূগলহাট গ্রামে বাস করিয়া তপোবলে নিজ গৃহের সমিহিত তৈরবনন্দের মহাবেগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ঐ নদকে দূরস্থ করেন, ইহা চির প্রসিদ্ধ আছে। মাধব তর্কসিদ্ধান্তও উক্ত শ্লোকে তাহা প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন—“তদ্ব্যন্তো নদরাজ ভৈরব মহাবেগাত্মনা কারকঃ। যো রাজেন্দ্রকৃতী.....” (কানীতে মুদ্রিত শক্তিবাদের ঐ টীকার প্রারম্ভে উক্ত শ্লোকে অজ্ঞতাবশতঃ “নদরাজ” স্থলে “নগরাজ” মুদ্রিত হইয়াছে)। উক্ত রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বংশধর অনেক ব্রাহ্মণ এখনও উক্ত ভূগলহাট গ্রামে তৈরবনন্দের নিকটে বাস করিতেছেন। মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশের পুত্র শিবনাথ বাচস্পতির নিকটে স্মারশাস্ত্র পাঠ করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ বাচস্পতি পরলোক-গমন করেন। শঙ্কর তর্কবাগীশ ও তৎপুত্র শিবনাথ বাচস্পতির কথা শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” পুস্তকের প্রথমখণ্ডে ১৬ ও ৩৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

করিয়া অবিলম্বে একশতশ্লোক রচনা করিতে পারিতেন—এজ্ঞ নান্যশাস্ত্র
বিশারদ রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ‘শতাবধান’ নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।
অল্প বয়সেই পাঠাবস্থায় কোন কবি তাঁহার উক্তরূপ কবিত্ব শক্তি দেখিয়া
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“অহঃ হরিহরঃ সিদ্ধেরবিলম্বসরস্বতী। সাক্ষাৎ
শতাবধানম্ভবতীর্ণা সরস্বতী”। অর্থাৎ হরিহর আমি সাধনা ঙ্গত সিদ্ধি
বশতঃ ‘অবিলম্ব সরস্বতী’ হইয়াছি। কিন্তু শতাবধান তুমি সাক্ষাৎ অবতীর্ণ
সরস্বতী। এখন যদি প্রতাপাদিত্যের ভূতপূর্ব সভাপণ্ডিত যশোহরবাসী অবিলম্ব
সরস্বতীই রাঘবেন্দ্রকে ঐ শ্লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভবানন্দ
সিদ্ধান্তবাগীশ যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে রাঘবেন্দ্র প্রভৃতি
ছাত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। *

পূর্বোক্ত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের “কাব্যবিলাস” গ্রন্থে “ইমৌ ভট্টাচার্য্য
প্রবররঘুদেবস্ত চরণৌ”—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়, তিনি রঘুদেব
ভট্টাচার্য্যের ছাত্র। উক্ত রঘুদেব জায়ালাল্লার “কণাদসূত্রব্যাখ্যা” এবং “তত্ত্বচিন্তা-
মণিব্যাখ্যা” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনি পরে রঘুনাথ শিরোমণি কৃত
“পদার্থতত্ত্বনিরূপণ” গ্রন্থেরও উৎকৃষ্ট টীকা করেন। অনেকদিন পূর্বেই
কাশীধামে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। উহার শেষে তাহার জায়ালাল্লার উপাধিই
লিখিত আছে। অফ্রেট সাহেবের ক্যাটালগে দেখা যায়—রঘুদেব ও গদাধর
ভট্টাচার্য্য উভয়েই হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র। রঘুদেবের “নঞ্জ-বাদ-বিবেচন”

* ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত “চিরঞ্জীব শর্মা” প্রবন্ধে
মহামহোপাধ্যায় ওহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ মুদ্রিত “বিষ্ময়োদ তরঙ্গিণী” গ্রন্থ দেখিয়াই উক্ত
শ্লোকে “অবিলম্ব সরস্বতী” ও “শতাবধানম্ভবতীর্ণা” এইরূপ পাঠ লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত
পাঠে “অবিলম্ব” শব্দের কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। আমার মনে হয়, কোন প্রাচীন
পুথিতে উক্ত শ্লোকে “অবিলম্বসরস্বতী” এইরূপ পাঠই দেখিয়াছিলাম এবং কোন প্রাচীন
সুপণ্ডিতের মুখেও ঐরূপ পাঠই শুনিয়াছিলাম। তাই মনে হয়, উক্ত অবিলম্ব সরস্বতীর প্রকৃত
নাম ছিল হরিহর। তিনি অবিলম্বে অনর্গল বহু শ্লোক রচনা করিতে পারায় অবিলম্ব সরস্বতী
নামেই প্রসিদ্ধ হন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে তিনি যশোহরে সাগরদাড়ীতে
আসিয়া বাস করেন। তখন তিনি নবদ্বীপে আসিয়া ‘শতাবধান’ রাঘবেন্দ্রকে দেখিতে পারেন।
যশোহর ও গুলনার তাঁহার বংশধর অনেক রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এখনও আছেন। কোটালি পাড়ার
অবিলম্ব সরস্বতী ভিন্ন ব্যক্তি।

গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার “তর্কবাগীশং ধ্বংসং”—এই উক্তির দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। উক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মার সময়ানুসারে তাঁহার অধ্যাপক রঘুদেব যে সপ্তদশ-শতাব্দীর পরাদেই গদাধরের সময়ে প্রখ্যাত গ্রন্থকার হইয়াছিলেন—ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু তখন বহু গ্রন্থকার গদাধরের হস্তবিচার-শক্তির সীমা ছিল না।

তিনিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিজাভূষণ মহাশয় নিজগ্রন্থে (History of Indian Logic) লিখিয়া গিয়াছেন যে, গদাধর ভট্টাচার্য্যের “ব্যুৎপত্তিবাদ” গ্রন্থের এক পুথীর লিপিকাল ১৬২৫ খ্রষ্টাব্দ। কিন্তু, আমরা তাহা সম্ভব মনে করি না। কারণ, জগদীশ তর্কালঙ্কারের “শব্দশক্তি প্রকাশিকা” রচনার পরে গদাধর “ব্যুৎপত্তি বাদ” রচনা করেন, ইহা তাহার সেই গ্রন্থ পাঠেই বুঝা যায়। জগদীশ তর্কালঙ্কারের বৃদ্ধাবস্থায় গদাধর যুবক, ইহাও পণ্ডিতসমাজে চিরপ্রসিদ্ধ আছে। নবদ্বীপে জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশধর পণ্ডিতের মুখে তিনিয়াছি, বৈদিক ব্রাহ্মণ যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পুত্র জগদীশ ত্রিচৈতন্যদেবের হস্তের সনাতন মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। তাহা হইলে জগদীশ যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের টীকা রচনার পরে দীপ্তি টীকা রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। আর তিনি যে, “শাস্ত্র-রহস্ত”কার রামভদ্র সার্কভোমের ছাত্র, এবং সেই রামভদ্র সার্কভোম যে ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ববর্তী, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। সুতরাং গদাধর ভট্টাচার্য্য যে ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই “ব্যুৎপত্তি বাদ” রচনা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা সম্ভব বুঝি না।

গদাধরের বংশধর কোন পণ্ডিত বলেন যে, ১০০৬ বঙ্গাব্দে গদাধরের জন্ম এবং ১১১০ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়,—ইহা তাঁহাদিগের গৃহে কোন পুথীর মধ্যে এক কাগজে লিখিত ছিল। পরন্তু মহানৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণি (মঃ মঃ ভূবনমোহন বিজ্ঞানব্রহ্মের পিতা) গদাধরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ইহা নিশ্চিত। [গদাধর, (২) কৃষ্ণদেব, (৩) হরদেব, (৪) কৃষ্ণকান্ত, (৫) শ্রীরাম] উক্ত শ্রীরাম শিরোমণি নবদ্বীপে প্রধান নৈয়ায়িক হইলে বঙ্গাব্দ ১২৬০ সালে ৬ই ফাল্গুনে কলিকাতা কাশীপুরে নড়াইলের জমিদার

রামরত্ন রায়ের বটীতে তাঁহার সঁহত ঞায় শাস্ত্রের যে গুরুতর বিচার হয়, সেই বিচারবার্তা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে “সংবাদ দ্বারক” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। (“পঞ্চপুষ্প”—১৩৩৭, আশ্বিন সংখ্যায় তাহা দ্রষ্টব্য)। ঐ সময়ে শ্রীরাম শিরোমণি অতি বৃদ্ধ হন নাই। তখন (১২৬০ বঙ্গাব্দে) তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর হইলেও তাঁহার বুদ্ধ-প্রপঞ্চমহগদাধর ডট্টাচার্য্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীর পরেও কিছুদিন বিদ্যমান ছিলেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। স্মরণ্যঃ ১১১০ বঙ্গাব্দে যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই আমরা সন্তুষ্ট মনে করি। গদাধরই নব্যজ্ঞানের চরমমূর্ত্তি।

নব্যজ্ঞান ও আত্মীক্ষিকী বিজ্ঞা

পূর্বে যে নব্যজ্ঞানের কিঞ্চিৎ পরিচয় বলিয়াছি,—যাহা পরে নবদীপে নবমূর্ত্তি পরিগ্রহে উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া জ্ঞানশাস্ত্রে বাঙ্গালীর অক্ষয় জয়ন্তরূপে বিদ্যমান আছে, - তাহা পরবর্ত্তি তার্কিকসিংহ বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়কে নিরস্ত করিবার জ্ঞান গঙ্গেশ প্রভৃতি তার্কিক মহাবীরগণের নিজ বুদ্ধি কল্পিত অভিনব কোন তর্কবিজ্ঞা নহে। কিন্তু উহাও সেই বেদমূলক আত্মবিজ্ঞারূপ আত্মীক্ষিকী বিজ্ঞা।

কোষকার অমরসিংহ “স্বর্গবর্গে” তর্কবিজ্ঞা মাত্রকেই “আত্মীক্ষিকী” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন। কারণ, বাহ্যতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, সেই সমস্ত নাস্তিক-তর্কবিজ্ঞাতেও “আত্মীক্ষিকী” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে (১)। কিন্তু বেদমূলক যে “আত্মীক্ষিকী” বিজ্ঞা, তাহাতে বেদের প্রামাণ্য এবং আত্মার নিত্যত্ব, জ্ঞানান্তর ও মুক্তি প্রভৃতি বৈদিক সিদ্ধান্ত তর্কের দ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ায় উহা কেবল তর্কবিজ্ঞা নহে, উহা তর্কবিজ্ঞা হইলেও আত্মবিজ্ঞা।

১। মহাভারতেও প্রয়োগ হইয়াছে, “আত্মীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামমুরক্তো নিরর্থিকাং” (শান্তি-পর্ব—১৮০।৪৭)। উক্তস্থলে “আত্মীক্ষিকী” শব্দের পরে “তর্ক বিজ্ঞা” ও “নিরর্থিকাং” শব্দের প্রয়োগ করিয়া কেবল তর্কবিজ্ঞা রূপ নাস্তিক তর্কবিজ্ঞাই যে, উক্ত “আত্মীক্ষিকী” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত, ইহাই স্বব্যক্ত করা হইয়াছে। এবং ঐ স্থলে সেই নাস্তিক তর্কবিজ্ঞার অনুরক্ত বেদ নিন্দাকারী নাস্তিকদিগেরই উক্তরূপে নিন্দা করা হইয়াছে। মহাভারতে অন্ততঃ গোতম প্রকাশিত আত্ম-বিজ্ঞারূপ আত্মীক্ষিকীর নিন্দা হয় নাই। পরন্তু উহা মুমুকুর পক্ষে হিতকরী বনিয়া উহার প্রশংসাই হইয়াছে। মৎসর্য্যাদিত জ্ঞান দর্শনের ভূমিকায় উক্ত বিষয়ে প্রশংসা ও বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মুক্তিলাভই উহার মুখ্য প্রয়োজন। ছায়দর্শনের প্রথম সূত্র ভাষ্য-শেষে বাস্তবানু-
ইহা বলিয়াছেন। রাজার শিক্ষণীয় বিচার উল্লেখ করিতে মনুও বলিয়াছেন—
“আত্মক্ষিকীক্షাত্ৰ-বিদ্যাঃ” (৭।৪৩)। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি সেখানে
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, চার্বাক ও বৌদ্ধাদি প্রণীত তর্কবিদ্যা অনেকের
আস্তিত্ব নাশ করে,—এজন্য তাহা রাজার শিক্ষণীয় নহে; কিন্তু আত্মবিদ্যারূপ
আত্মক্ষিকীই রাজার শিক্ষণীয়। মেধাতিথির ঐ কথার দ্বারাও বুঝা যায়
যে, তিনিও তর্কবিদ্যা মাত্রকেই “আত্মক্ষিকী” শব্দের অর্থ বলিতেন (১)।
বেদ-বিরুদ্ধ তর্কবিজ্ঞাও স্প্রাচীনকাল হইতে নানারূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে পরমাস্তিক
জাবালিমুনিও সেই নাস্তিক-তর্ক বিদ্যানুসারেই তাঁহাকে অনেক কথা বলিয়া-
ছিলেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র তাহার প্রতিবাদ ও নিন্দা করিলে তখন ভক্তিমান্
জাবালি অতি দীনভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে কত কথা
বলিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু পূর্বে সেখানে আত্মবিদ্যারূপ আত্মক্ষিকী বা
গৌতমোক্ত ছায়শাস্ত্রের কোন কথাই বলেন নাই। শ্রীরামচন্দ্রও সেখানে
সেই আন্তিক তর্কবিদ্যার কোন নিন্দা করেন নাই। বাল্মীকিরামায়ণের
অবোধাকাণ্ডের ১০৯ সর্গ পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

১। বহুবিক্ত রাজশেখর হরিও তাঁহার “কাব্যমীমাংসা” পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বপক্ষও
উত্তরপক্ষরূপে আত্মক্ষিকী বিভাগে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জৈন, বৌদ্ধ ও
চার্বাকদর্শন পূর্বপক্ষরূপ আত্মক্ষিকী এবং সাংখ্য, ছায় ও বৈশেষিক উত্তরপক্ষরূপ আত্মক্ষিকী।
অর্থশাস্ত্রে কোটিল্য ও সাংখ্য, যোগ ও লোকাযত শাস্ত্রকে আত্মক্ষিকী বলিয়া উহার যে কল
বলিয়াছেন এবং সর্বশেষে “প্রদীপঃ সর্ববিজ্ঞানাং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা উহার যে বৈশিষ্ট্য
বাস্তব করিয়াছেন তদ্বারা বুঝা যায় যে তিনিও সমস্ত তর্ক বিজ্ঞা এবং তদ্ব্যবহৃত মুখ্যরূপে
গৌতমোক্ত ছায়শাস্ত্রকে গ্রহণ করিয়াই ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন। স্মরণ্য উক্ত্যুপলব্ধি
যে “যোগ” শব্দের দ্বারা ছায় বৈশেষিক শাস্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়।
প্রাচীনকালে ছায় বৈশেষিক শাস্ত্রও “যোগ” শব্দের দ্বারা কথিত হইত। এ বিষয়ে প্রমাণাদি
অসংস্পাদিত ন্যায়দর্শনের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা ও ২২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। মহিঃ স্তোত্রের
“দরিতা” নামী টীকাকার ভগীরথ মিশ্র “ত্রয়ী সাংখ্য যোগঃ” ইত্যাদি শ্লোকে পুংলিঙ্গ “যোগ”
শব্দেরও অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“যোগো বৈশেষিক দর্শন মধ্যম্নবিজ্ঞা”। বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদের পুথীশালায় ঐ টীকার পুথী দ্রষ্টব্য।

পূর্বোক্ত বেদমূলক এবং বেদের উপাঙ্গ বলিয়া কথিত “আত্মক্ষিকী”
 বিদ্যার প্রাসিদ্ধ নাম “ন্যাস্ত্র”। পরার্থ অনুমান এবং তদ্ব্যবস্থাপ্রণালী
 প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যকে বাৎস্ত্রায়ন প্রভৃতি “ত্ৰায়” বলিয়াছেন। সেই
 ত্ৰায়-প্রতিপাদক শাস্ত্রও “ত্ৰায়” নামে কথিত হইয়াছে। উক্ত অর্থে পরে
 অনেকে উহাকে “নীতি” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। (২) বেদাদি শাস্ত্রের ত্ৰায়
 উক্ত ত্ৰায় শাস্ত্রও যে সেই সর্বশাস্ত্র-যোনি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই উদ্ভূত হয়, এই
 সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সুব লোপনিষদের দ্বিতীয়খণ্ডে পরে কথিত হইয়াছে—
 “ত্ৰায়োমীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাণি”। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রারম্ভে “পুরাণ-ত্ৰায় মীমাংসা”
 ইত্যাদি শ্লোকে এবং “মীমাংসা ত্ৰায়তর্কশ্চ উপাংগং পারিকীর্তিতং”—এই পুরাণ
 বচনে “ত্ৰায়” শব্দের দ্বারা উক্ত “ত্ৰায়” শাস্ত্রই গৃহীত হইয়াছে। উহা তর্কশাস্ত্র
 বলিয়া “ত্ৰায়ভব” নামে এবং অনেক স্থলে কেবল “তর্ক” নামেও কথিত
 হইয়াছে। উক্ত তর্কশাস্ত্রের অপর প্রাচীন নাম “বাকোবাক্য”। ছান্দোগ্য-
 উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে নারদ সনৎকুমার সংবাদে এবং পতঞ্জলির
 মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকে “বাকোবাক্য” নামেই উহার উল্লেখ হইয়াছে।
 সুপ্রাচীন কাল হইতেই উক্ত তর্ক শাস্ত্রের তদ্ব্যবস্থাক বহু সূত্র ঋষিগণ জানিতেন।
 বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে পরমেশ্বরের নিঃশব্দিত
 বেদাদি বিদ্যার উল্লেখ করিতে যে (“সূত্রাণি”) সূত্রসমূহেরও উল্লেখ হইয়াছে,
 তন্মধ্যে যে, তর্ক শাস্ত্রের তদ্ব্যবস্থাক ষোড়শ সূত্র ছিল না এবং প্রাচীন ঋষিগণ
 তাহা জানিতেন না, ইহা বলিবার পক্ষে কোন প্রমাণই নাই। আর তৈত্তিরীয়
 আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে “স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষ মৈতিলম্ অনুমানং
 চতুষ্টিয়ং”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে পরে যে, অনুমান প্রমাণের উল্লেখ হইয়াছে,
 তাহার তত্ত্ব বৃত্তিতে অবশ্যজ্ঞাতব্য বাপ্তি ও হেতুভাস প্রভৃতি পদার্থের তত্ত্ব
 যে, অক্ষপাদ গৌতম ঋষির পূর্বে বেদজ্ঞ আর কোন ঋষিও জানিতেন না—ইহা
 কখনই বলা যাইবে না। অক্ষপাদের পূর্বেও সৃষ্টির প্রথম অবস্থা হইতেই যে,
 সংক্ষিপ্তরূপে ত্ৰায়শাস্ত্রও ছিল,—ইহা “ত্ৰায়মঞ্জরী”র প্রারম্ভে মহানৈয়ায়িক

১। “মিলিন্দ পঞ্জ” নামক বৌদ্ধ পালিগ্রন্থেও দেখা যায়, “সাংখ্য যোগা নীতি বিসেসিকা”।
 (৩য় পৃঃ)। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও দ্ব্যনুমান চিন্তাসমিতির দীর্ঘত্বের টীকার শেষে
 লিখিয়াছেন—“কুর্কণ্ঠি নিত্যমনুমানবশেনেকৈ প্রায়ঃ প্রায়ঃ সধির্দীর্ঘত্বাৎ নীতিভাজঃ”।

জয়ন্ত ভট্টও বলিয়া গিয়াছেন। শ্রায়ভাষ্যের শেষে বাংস্থায়নও বলিয়া গিয়াছেন—
“ষোড়ক্ষপাদমুখিং শ্রায়ঃ প্রত্যভাদ বদতাং বঃ”। অর্থাৎ অক্ষপাদ ঋষির
সম্বন্ধে শ্রায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি উহার শ্রষ্টা নহেন, কিন্তু বক্তা।
কারণ জগৎশ্রষ্টা পরমেশ্বর হইতেই সর্ববিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে।

বস্তুতঃ মুমুক্শুগণের অসুমান প্রমাণরূপ যুক্তির দ্বারা আত্মার দেহাদি ভিন্নত্ব
নিত্যত্ব ও পরলোকাদি বৈদিক সিদ্ধান্তের “আর্যক্ষা” অর্থাৎ শ্রবণের পরে
মননের জন্ত পরমেশ্বর হইতে যে-আত্মবিদ্যার উদ্ভব হওয়ায় শাস্ত্রে উহা “আর্য-
ক্ষিকা” নামে কথিত হইয়াছে, —পরে সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহর্ষি গৌতম
সম্পূর্ণরূপে ঐ বিদ্যা লাভ করিয়া সুপ্রণালীবদ্ধ হৃদয়সমূহ রচনার দ্বারা উহারই
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই উক্ত আত্মবিদ্যারূপ
“আর্যক্ষিকা”র প্রতিপাদ্য। বাংস্থায়ন প্রভৃতি শ্রায়্যসংবাদ্যগণ তাহাই বলিয়া
গিয়াছেন। নৈষধচরিত কাব্যে (১০.৮১) অবৈতবাদী শ্রীহর্ষও তাহাই বলিয়া
উক্ত আর্যক্ষিকাবিভাগকে মুমুক্শুর পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়াছেন। পরে “তত্ত্ব-
চিন্তামণি” কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও পরম কারুণিক অক্ষপাদ মুনি জগতের মুক্তি
লাভের জন্ত আর্যক্ষিকাবিভাগ প্রকাশ করিয়াছেন—এই কথা বলিয়া শ্রায়দর্শনে
গৌতমোক্ত “প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দাঃ—প্রমাণানি”—এই তৃতীয় সূত্রের উল্লেখ
করিয়া প্রধানতঃ গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণ পদার্থের বিশদ ব্যাখ্যা
করিতে উক্ত “আর্যক্ষিকা” বিভাগ প্রতিপাদ্য অত্যাশ্রিত অনেক পদার্থেরও ব্যাখ্যা
করিয়াছেন। সুতরাং “তত্ত্বচিন্তামণি” এবং উহার টীকা প্রভৃতি নব্যশ্রায়
গ্রন্থ ও গৌতম প্রকাশিত মূল “আর্যক্ষিকা” বিভাগই ব্যাখ্যান গ্রন্থ। তাই
বলিয়াছি, নব্যশ্রায়ও মূলতঃ আর্যক্ষিকাবিভাগ। “তত্ত্বচিন্তামণি”র টীকার
মধুরানন্দ তর্কবাগীশও (শব্দ ধণ্ডের টীকারস্তে) নব্যশ্রায়ের অধ্যাপক মণ্ডলীকেও
“আর্যক্ষিকা পণ্ডিতমণ্ডলী” বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যেমন
বেদান্তার্থ প্রকাশক ব্রহ্মসূত্র এবং উহার ভাষ্যাদি সমস্ত গ্রন্থও বেদান্ত শাস্ত্র
বলিয়া কথিত হয়—(বেদান্তো নাম উপনিষৎ, তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদানিচ
—বেদ.সুসার)—তদ্রূপ শ্রায়সূত্র এবং উহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যান রূপ
প্রাচীন ও নব্য সমস্ত শ্রায়গ্রন্থও শ্রায়শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

মহর্ষি অক্ষপাদেবের পরিচয় ও শাস্ত্রসূত্র- রচনার কাল।

বাংলায়ন গ্রন্থটি পূর্বাচার্যগণ মহর্ষি অক্ষপাদকে শাস্ত্রসূত্রকার বলিলেও এবং পরে অনেক গ্রন্থকার তাঁহাকে গৌতম বা গৌতম বলিলেও তাঁহার বিশেষ পরিচয় কিছু বলেন নাই। আমি পূর্বে শাস্ত্রদর্শনের ভূমিকায় যথামতি বলিয়াছি যে, অহল্যাপতি মহর্ষি গৌতমই শাস্ত্রসূত্রকার অক্ষপাদ। কারণ স্বন্দপুরাণে তাঁহাকেই অক্ষপাদ বলা হইয়াছে (১) এবং কালিদাসেরও বহু পূর্ববর্তী ভাস্কর কবি তাঁহার “প্রতিমা” নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যে মেধাতিথির শাস্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মেধাতিথিও অহল্যাপতি গৌতম,—ইহা মহাভারতের শাস্তিপর্বে—“মেধাতিথি মহাপ্রাজ্ঞাগৌতমস্তপসিস্থিতঃ” ইত্যাদি (২৬৫ অঃ-৪২)—শ্লোকের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। মেধাতিথি—এই নামে আর কেহ যে, শাস্ত্রশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং ভাস্করকবির পূর্বে তাহা প্রসিদ্ধ ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ বা প্রবাদও নাই। কিন্তু গৌতম মুনি কোন সময়ে বেদব্যাসকে দর্শন করিবার জন্ত যোগবলে নিজ চরণে চক্ষুরিন্দ্রিয় সৃষ্টি করায় তখন হইতে তিনি অক্ষপাদ নামে খ্যাত হন, এইরূপ প্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধ আছে (২)। উক্ত প্রবাদের সমর্থক রূপে আমি পূর্বে দেবীপুরাণের অনেক বচনও উদ্ধৃত করিয়াছি। মুদ্রিত দেবীপুরাণে ঐ অংশ নাই বলিয়া উহা অপ্রমাণ বলিলেও স্বন্দপুরাণের যে বচনে অহল্যাপতি গৌতমকেই অক্ষপাদ বলা হইয়াছে, উহাকে

১। অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যোহভবমুনিঃ। গোদাবরী সমানেতা অহল্যায়ঃ পতিঃ
প্রভুঃ ॥ (স্বন্দপুরাণ মাহেখর খণ্ড কুমারিকাখণ্ড—৫৫ অঃ—৫ শ্লোক)।

২। কেহ কেহ অমরকোষের উল্লেখ করিয়া “অক্ষপাদ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন ‘নৈয়ামিক’। কিন্তু প্রচলিত অমরকোষে আমরা “অক্ষপাদ” শব্দ পাইনা। এবং “অক্ষপাদ” শব্দের উক্ত অর্থ অথবা কোন প্রমাণ বা প্রয়োগও দেখিতে পাইনা। শাস্ত্রসূত্রকার অক্ষপাদ ঋষির শিষ্য সম্প্রদায় অর্থে অক্ষপাদ শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় সিদ্ধ “আক্ষপাদ” শব্দের দ্বারা ‘নৈয়ামিক’ অর্থ বুঝা যায়। সুতরাং বুঝা যায় যে, পরে “অভিধান চিন্তামণি” গ্রন্থে, হেমচন্দ্র হরি “আক্ষপাদ” শব্দ গ্রহণ করিয়াই বলিয়াছেন—“নৈয়ামিকশাস্ত্রাঙ্গপাদঃ”। হরিতন্ত্র হরিও “বড়দর্শন সমুচ্চয়” গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“আক্ষপাদ মতে দেবঃ যস্তু সংহার কারকঃ”।

প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রমাণ বলিবার কোন হেতুই আমরা বুঝি না। সুতরাং গৌতম ও অক্ষপাদ যে ভিন্ন ব্যক্তি, এবং ত্রায়দর্শনের প্রাচীন অংশই গৌতম রচনা করেন, তাঁহার অনেক পরে অক্ষপাদ নূতন অংশ রচনা করেন,—এইরূপ মতও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। উক্ত অহল্যাপতি ঋষির প্রসিদ্ধ নাম যে, গৌতম, ইহা সর্ব্ব-সম্মত। আমরা হৃদ্য নৈয়ায়িকগণের মুখে ত্রায়সূত্রকারের গৌতম নামই শুনিয়াছি এবং অনেক গ্রন্থেও আমরা তাঁহার গৌতম নামই দেখিতে পাই (১)। কিন্তু তাঁহার আদি পুরুষ বেদোক্ত মহর্ষি গৌতমের নামানুসারে অনেকগ্রন্থে তিনি গৌতম নামেও কথিত হইয়াছেন। প্রাচীন কালে আদি পুরুষের নামেও অনেক প্রধান পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে, এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ আছে। তদনুসারেই নৈষধচরিত কাব্যে (১৭।৭৫) শ্রীহর্ষও কোন প্রয়োজন বশতঃ ত্রায়শাস্ত্রবক্তা মুনির গৌতম নামই গ্রহণ করিয়াছেন। কোনমতে অল্প অর্থে তিনি গৌতম নামে কথিত হইলেও মহর্ষি গৌতমের বংশজাত বলিয়া তিনি গৌতম নামেও কথিত হইতেন। দেবীপুরাণের কোন বচনেও পরে ঐ তাৎপর্য্যেই কথিত হইয়াছে—“গৌতমায়জ্ঞোতি গৌতমোহপি স চাক্ষপাৎ”। উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত বক্তব্য পূর্বেই বলিয়াছি (২)।

১। বেদান্তদর্শনের চতুর্থতন্ত্রের শাক্তরভাষ্যের ‘রত্নপ্রভা’ টীকায় “তত্র অক্ষপাদগৌতম মুনিসম্মতিমাহ।” “তাক্ষিকরক্ষা” গ্রন্থে হেতুভাসের ব্যাখ্যারস্তে “গৌতমেন প্রপঞ্চিতাঃ”। “গৌতম গ্রহণেন”। অর্থে তত্রাক্ষিকি গ্রন্থে “গৌতমাদি মুনীনাং” ইত্যাদি। পরে ৭৭ ও ২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। কেহ পরে “অক্ষপাদ গৌতম” নামে পুস্তক প্রকাশ করিয়া নিজমত প্রচার করিয়াছেন যে, দীর্ঘতমা গৌতম মুনিই ন্যায়সূত্রকার। তাই তিনি “অক্ষপাদ” বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কারণ, তিনি ছিলেন জন্মাক্ষ। “অক্ষ” শব্দের একটি অর্থ জাতাক্ষ, ইহা “শব্দরত্নাবলী” কোষে কথিত হইয়াছে। ঐ অর্থে “অক্ষ” শব্দের পরে পূজ্যার্থে “পাদ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া উক্ত দীর্ঘতমা গৌতমকেই প্রাচীনগণ অক্ষপাদ বলিয়াছেন। এই নবীনকল্পনায় বহু বক্তব্য থাকিলেও পাঠকগণের বিচারার্থ সংক্ষেপে কয়েকটি কথা এখানে অবশ্য বক্তব্য। প্রথম কথা, বাৎস্তায়নের সময়েও যে “অক্ষ” শব্দের জন্মাক্ষ অর্থেও প্রয়োগ হইত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই। “শব্দকল্পদ্রুমে” উল্লিখিত “শব্দরত্নাবলী” নামক কোষ মণুরেশ পণ্ডিত কৃত আধুনিক গ্রন্থ। কোন প্রাচীন কোষেই “অক্ষ” শব্দের ঐরূপ অর্থ কথিত হয় নাই। পরন্তু বাৎস্তায়নও দীর্ঘতমা গৌতম মুনিকেই ত্রায়সূত্রকার বলিয়া জানিলে তিনি কেবল মাত্র জন্মাক্ষ

মহাবোগী মহর্ষি গৌতম বোগবলে স্তূর্দীর্ঘজীবী হইয়া নানা সময়ে নানাস্থানে নানাকার্য্য করিয়াছেন। স্বন্দুরাণাদিতে সেই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণপুরাণে তিনি শিবাবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শিবপুরাণেও তাঁহার বহুমহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণে (২৪ অঃ) অক্ষপাদ ও উলূক মুনি শিবাবতার সোমশস্ত্রার ভাবি-শিষ্য রূপে কথিত হইয়াছেন। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মদেবের দেহত্যাগকালে বেদব্যাস, নারদ, গৌতম এবং উলূক প্রভৃতি মুনিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন,— ইহা মহাভারতের শান্তিপর্বে (৪৭ অঃ) বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত উলূক মুনি অথবা (মতান্তরে) ঔলূক্য মুনি বৈশেষিকসূত্রকার। তাই বৈশেষিক দর্শন “সর্বদর্শনসংগ্রহে” “ঔলূক্যদর্শন” নামে কথিত হইয়াছে। উক্ত উলূক বা ঔলূক্য ঋষি সামান্য তত্ত্বলক্ষণ বা তুষকণা মাত্র ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করায় তিনি “কণাদ” নামেই প্রসিদ্ধ হন। পরে অনেক গ্রন্থকার তাঁহার

বলিয়াই তাঁহার পরিচয় দিবেন কেন? আর তিনি উক্ত অর্থে “অক্ষপাদ” শব্দের একবচনান্ত প্রয়োগই বা করিবেন কেন? আয়বাস্তিকের প্রারম্ভে উদ্ঘোষিতকরও ত লিখিয়াছেন,—“যদক্ষপাদঃপ্রবরো মুনীনাং”। কিন্তু কোন শব্দের পরে পূজ্যার্থে “পাদ” শব্দ বা “চরণ” শব্দের প্রয়োগ হইলে সেই শব্দের বহুবচনান্ত প্রয়োগই হইয়া থাকে। যেমন “গুরুপাদাঃ,” “গুরুচরণাঃ”। কিন্তু “অক্ষপাদে যস্য,” এই বিগ্রহে অথবা “অক্ষযুক্তঃ পাদোযন্ত,” এইরূপ বিগ্রহে মধ্যপদলোপী সমানার্থিকরণ বহুব্রীহিসমাসেই অক্ষপাদ শব্দ সিদ্ধ হইলে উহার একবচনান্ত প্রয়োগও হইতে পারে। “অক্ষপাদ” শব্দের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াই বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেকে ন্যায়সূত্রকারকে “অক্ষচরণ” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু মাধবাচার্য্য কোন লোকে তাঁহাকে “চরণাক্ষ”ও বলিয়াছেন। (পরে ১১শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। “চরণস্থিতমক্ষং যন্ত” এইরূপ বিগ্রহে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহিসমাসই ঐ স্থলে তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। কিন্তু “চরণ” শব্দের পূজ্যার্থে প্রয়োগ হইলে “চরণাক্ষ”—এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। “গুরুচরণঃ”—এই প্রয়োগের স্থায় উক্ত অর্থে “চরণগুরু” এইরূপ প্রয়োগ কখনই হয়না। স্তত্রাং মাধবাচার্য্যও যে, গৌতমের “অক্ষপাদ” নামে পাদ শব্দকে চরণার্থেই জানিতেন,—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পরন্তু পরে “মানমৈয়াদয়” গ্রন্থের প্রমেষপরিচ্ছেদে মীমাংসক নারায়ণ পণ্ডিত ন্যায়সূত্রকারকে “অক্ষপাদং” বলিয়াও প্রয়োগ করিয়াছেন—“উভয়ং পরতঃ প্রাহরক্ষপাদং পক্ষিনাদয়ঃ”। কিন্তু ঐ পাদ শব্দ চরণার্থে না হইলে পক্ষান্তরে “অক্ষপাদং” এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। ফলকথা, পূর্বোক্ত বানা কারণেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পূর্বাচার্য্যগণ ন্যায় সূত্রকারের অক্ষপাদ নামে পাদ শব্দকে চরণার্থেই জানিতেন। তাঁহারা ঐ অক্ষপাদ শব্দের দ্বারা জন্মাক্ষপাদ এইরূপ অর্থ কখনও বুঝেন নাই।

ঐ নামার্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে “কণভূক্” এবং “কণভক্” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কণ্ঠপের অপত্য বলিয়া কোন কোন প্রাচীন আচাৰ্য্য “কণ্ঠপ” নামেও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু মহাভারতের সভাপর্কের পঞ্চম অধ্যায়ে নারদ মুনির নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য বর্ণনায় ত্রায়-বৈশেষিক শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে পরে আবার বিশেষ করিয়াও কথিত হইয়াছে—“পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষ বিৎ”। অর্থাৎ নারদমুনি গৌতমের ত্রায়দর্শনোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য বা ত্রায়বাক্যের সম্বন্ধে অমুকুল-তর্করূপগুণ এবং গৌতমোক্ত সর্বপ্রকার হেতুদোষও জানিতেন। টীকা-কার নীলকণ্ঠও সেখানে উক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং মহাভারত-রচনার অনেক পূর্বেই যে, কণাদ ও গৌতম যথাক্রমে বৈশেষিক সূত্রও ত্রায় সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

পরন্তু এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ত্রায়-বৈশেষিক সূত্রে কোন পূর্বাচাৰ্য্যের নাম নাই। ত্রায়ভাষ্যে (১।১।৩২) দশাবয়ববাদি নৈম্বায়িক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু ত্রায়সূত্রে তাহা নাই। ত্রায়সূত্রে প্রাচীন সাংখ্যমতের খণ্ডন এবং প্রাচীন যোগশাস্ত্রেরই উল্লেখ হইয়াছে। বিচার দ্বারা খণ্ডনের জন্ত পূর্বপক্ষরূপে যে সমস্ত নাস্তিক মতের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা উপনিষদেও প্রকাশিত আছে। সুপ্রাচীন কালে নানা নাস্তিক সম্প্রদায় নানাপ্রকারে ঐ সমস্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়া উহা সমর্থন করিবার জন্ত আরও অনেক মতেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দার্শনিক ঋষিগণ কোন কোন সূত্র দ্বারা সেই সমস্ত মতেরও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্ট জন্মের পরে বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যেরূপ শূন্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা ত্রায়সূত্রে নাই, বাৎস্তা-য়নের ভাষ্যেও নাই। নাগার্জ্জুনের ব্যাখ্যাত শূন্যবাদ সর্বনাস্তিবাদ নহে। পূর্বে ত্রায়সূত্র ও বাৎস্তা-য়নের ভাষ্যব্যাখ্যায় যথাস্থানে আমি ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। ফলকথা, ত্রায়সূত্র যে নাগার্জ্জুনের পরে রচিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন কারণই নাই (।)।

১। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত “বাল্লভার বৌদ্ধ-সমাজ” প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও লিখিয়াছেন—“আমাদিগের ত্রায়সূত্রখানি নাগার্জ্জুনের সময়ে বা কিছু পরে লেখা”। ঐতিহাসিক-বুদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে

কোন বৌদ্ধগ্রন্থের কোন একটি শব্দ কোন গ্রন্থসূত্রে দেখিয়া সেই সূত্রটি যে, সেই বৌদ্ধ গ্রন্থের পরে রচিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমানও কোন-মতে সম্ভবমান হইতে পারে না। “লঙ্কাবতারসূত্র” বা “মাধ্যমকসূত্র” প্রভৃতি কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের কোন অসাধারণ পারিভাষিক শব্দও গ্রন্থসূত্রে নাই। বাৎস্তায়নও “প্রতীত্যসমুৎপাদ” প্রভৃতি বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। তিনি “ক্ষণিকবাদী”, “অনাত্মবাদী” এবং সর্বনাস্তিত্ববাদীকে “আনুপলব্ধিক” নামে উল্লেখ করিলেও “শূন্যবাদী” বলেন নাই; “শূন্য” শব্দের ব্যাখ্যাও করেন নাই। তবে কিরূপে বুঝিব যে, বাৎস্তায়নও শূন্যবাদি বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের পরবর্তী?

অবশ্য খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অংশাজ্ঞকার কৌটিল্যই গ্রন্থভাষ্যকার বাৎস্তায়ন, এই প্রাচীনমতে যাহারা এখনও দৃঢ় বিশ্বাসী, অথবা “প্রতিমা” নাটককার ভাসকবিকে (গণপতিশাস্ত্রীর মতামুসারে) যাহারা খৃষ্ট পূর্ববর্তী বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তাহারা খৃষ্ট জন্মের পরে গ্রন্থসূত্র-রচনার কথায় কর্ণপাতই করেন না। কিন্তু যাহারা খৃষ্ট জন্মের পূর্বে অথবা বুদ্ধদেবের পূর্বে আনাদিগের গ্রন্থসূত্রাদির অস্তিত্বস্বীকার করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, তাঁহারা অনেক প্রাচীনকেও নবীন করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কত কলনাই করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনি যে, বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী, ইহাও কি তাঁহারা খণ্ডন করিতে পারিবেন? অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও ত বিচারপূর্বক উহাই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত পাণিনি মূনি অনেক সূত্রে “গ্রন্থ” শব্দের উল্লেখ করিলেও তাঁহার সময়ে যে গ্রন্থসূত্র ছিল না এবং তিনি অনেক সূত্রে “চরকে”র উল্লেখ করিলেও তাঁহার সময়ে যে, আয়ুর্বেদবিজ্ঞ চরকমুনির কোন গ্রন্থই ছিল না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। “চরকসংহিতা”র সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে

তৎপূর্বে আরও অনেক প্রবন্ধে গ্রন্থসূত্র এবং তাহার সিদ্ধান্ত বিষয়েও আরও অনেক সম্ভব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে মূল গ্রন্থদর্শনের ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সে বিষয়েও আমি যথাবস্তু্য বলিয়াছি। সে সব কথা এখানে সংক্ষেপে বলা সম্ভব নহে। তবে ইহা বক্তব্য যে, সিদ্ধান্ত-জিজ্ঞাস্য পাঠকগণ সম্পূর্ণ রূপে মূলগ্রন্থের পর্যালোচনা করিয়াই সিদ্ধান্ত-নির্ণয় করিবেন।

বৈশেষিক দর্শনোক্ত দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের এবং পরে বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে ত্রায়দর্শনোক্ত “বাদ”, “জল”, “বিতণ্ডা” এবং “প্রতিজ্ঞা” দি পঞ্চাবয়ব প্রভৃতি অনেক পদার্থেরই উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ভেদ থাকিলেও এবং পরে ঐ গ্রন্থের কোন কোন অংশের প্রতিসংস্কার হইলেও ঐ সমস্ত পদার্থ যে, ঐ গ্রন্থের বহু পূর্বে হইতেই সুপ্রসিদ্ধ ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পরন্তু পাণিনি যে (৪।৩।১১০ হ্রস্বে) পারাশর্য্য ভিক্ষু হ্রস্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরাশরপুত্র বেদব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন ভিন্ন আর কিছুই বুঝা যায় না। আর শারীরকভাষ্যে (৩।৩।৫০) আচার্য্য শঙ্করের কথার দ্বারা যে উপবর্ষ মুনিকে আমরা মীমাংসা ও বেদান্তসূত্রের প্রাচীন বৃত্তিকার বলিয়া জানিয়াছি, তিনি যে পাণিনিরও গুরু ছিলেন, ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। ফলকথা, পাণিনিহ্রস্বে এবং ভগবদ্গীতায় (১৩।৫) যে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ হইয়াছে এবং সুপ্রাচীন উপবর্ষ মুনিও যাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা যে, গৌতমবুদ্ধদেবেরও বহু পূর্বে রচিত, ইহা সত্য। আর মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক সূত্র ও গৌতমের ত্রায়সূত্র যে, বেদান্তসূত্র রচনার পূর্বেই রচিত হইয়াছে, ইহাও সর্বসম্মত চিন্তা প্রসিদ্ধ সত্য। পরন্তু ত্রেতাযুগে জনক পুরোহিত শতানন্দের পিতা গৌতম এবং জাবালি মুনি যে, মহানৈয়ায়িক ছিলেন, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ আছে। বাল্মীকি রামায়ণেও (বঙ্গদেশীয় পুস্তকে) জাবালিকে নৈয়ায়িক বলা হইয়াছে। আর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতার-বর্ণনার সপ্তদশ অবতার পরাশরনন্দন ব্যাস প্রথমে ত্রেতাযুগেই (অষ্টাদশ অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বে) অবতীর্ণ হন, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তৎকালেও উক্ত গৌতম মুনি তাঁহার আচার্য্য হইতে পারেন। শারীরক ভাষ্যে (১।১।৪) শঙ্করাচার্য্যও ত্রায়সূত্রকার মহর্ষিকে কেবল “আচার্য্য” বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তনীয়। *

* ন্যায়সূত্রাদিরচনার কালবিষয়ে পাশ্চাত্যমতবাদের করিতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যমত-বিচক্ষণ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয় তৎকৃত “বেদান্তদর্শনের ইতিহাস” পুস্তকের অবতরণিকায় অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন,—“ব্যাস গৌতমের শিষ্য। গৌতমের

শ্রায়স্থত্রে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকল্পগণ।

খৃষ্টজন্মের পূর্বে হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রথম অভ্যুদয়কালে বাৎস্তায়নই (পক্ষিলস্বামী) প্রথমে বথাক্রমে সম্পূর্ণ শ্রায়স্থত্রে উদ্ধার করিয়া উহার ভাষ্যরচনা করেন (১)। পরে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয় কালে বৌদ্ধাচার্য্য বহুবল্লু ও তাঁহার শিষ্য দিগ্‌নাগ প্রভৃতি নানা কুতর্কের দ্বারা শ্রায়স্থত্র ও বাৎস্তায়ন ভাষ্যের খণ্ডন করিলে ভারদ্বাজ উদ্যোতকর বাৎস্তায়ন-ভাষ্যের “বার্ত্তিক” রচনা করেন। তাহাতে তিনি নিজ মতানুসারে শ্রায়স্থত্রও উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি উক্তগ্রন্থে বহু সূক্ষ্মবিচার দ্বারা তৎকালীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতখণ্ডন করিয়া নিষ্কৰণে এক প্রবল সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তখন ভারতের অনেক স্থানে বৌদ্ধ প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছিল। অনেকের মতে “শ্রায়বার্ত্তিকে” উদ্যোতকরের “এষ পস্থাঃ শ্রবণং গচ্ছতি” এই উক্তির দ্বারা ধ্যানেচ্ছরে শ্রবণ গ্রামের কিছুদূরে তিনি বাস করিতেন, ইহা বুঝা যায়। বাৎস্যায়ন নামের শ্রায় তাঁহারও গোত্র-নিমিত্তক প্রসিদ্ধ নাম ভারদ্বাজ। ক্রমে উদ্যোতকরের শ্রায়বার্ত্তিকেরও অনেক টীকা হইয়াছিল। পরে ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ

অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে আখ্যায়িকা সর্বজন বিদিত” (২৫ পৃঃ)। আর সুবিচারকের ন্যায় তিনিও লিখিয়াছেন—“পাণিনি কোনও শব্দ সাধন না করিলে যে, সে শব্দ ভাষ্য ছিল না, এইরূপ যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারা যায় না।” “কোনও শাস্ত্রকার কোনও শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, অন্যে তাহা করেন নাই, ইহাতে পৌর্বাপণ্য নির্ণীত হইতে পারে না”। (ঐ-২০ পৃঃ)

(১) বাৎস্তায়ন ও উদ্যোতকরের সমগ্রাদি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পূর্বে শ্রায়দর্শনের ভূমিকায় স্বাক্ষরিত বলিয়াছি। কিন্তু অনেক বৌদ্ধগ্রন্থের উদ্ধার না হইলে বাৎস্তায়নের প্রকৃত পরিচয় নিঃসন্দেহে বুঝিবার উপায় নাই। কামসূত্রকার বাৎস্তায়নও নৈয়ায়িক ছিলেন। কারণ তিনি (২য় অঃ ১১শ সূত্রে) শ্রায়মতানুসারেই কামের লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি শ্রায়ভাষ্যকার নহেন,—ইহা তাহার কামসূত্র গ্রন্থ পাঠেও বুঝা যায়। তিনি ন্যায়ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী; তাঁহার বংশধরও হইতে পারেন। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন যে দাক্ষিণাত্য নহেন, ইহাও তাঁহার কোন কোন কথা দ্বারা বুঝা যায়। মিথিলার গোকুলনাথ উপাধ্যায়ের “অমৃতোদয়” নাটকের পঞ্চম অঙ্কে “বাৎস্তায়নবংশানামেকভমস্ত” এবং “বাৎস্তায়নবংশবিবর্দ্ধনাঃ কবয়ঃ” ইত্যাদি উক্তির দ্বারা বুঝা যায়, গোকুলনাথ প্রভৃতি বাৎস্তায়নকে যেন মৈথিল বলিয়াই জানিতেন।

নৈয়ায়িক উহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে ক্রমে উদ্যোতকরের সম্প্রদায় বিলুপ্তপ্রায় হইলে তাঁহার অনেক পরে খৃঃ নবম শতাব্দীতে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র “শ্রায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য টীকা” নামে অত্যুৎকৃষ্ট টীকা করিয়া সেই অতি প্রাচীন শ্রায়বার্ত্তিকের উদ্ধার করেন। তিনি উদ্যোতকরের মত সমর্থন করিয়া তৎকালে আবার বিশেষ বিচার দ্বারা অনেক বৌদ্ধ মতের খণ্ডন করেন। তাঁহার পরে সম্ভবতঃ নবমশতাব্দীর শেষেই মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট কাস্মীরে অবস্থান কালে বিশেষ বিচার দ্বারা ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িকগণের মত-খণ্ডন ও গোতিমমতের সমর্থনের জন্য গল্প ও পথে “শ্রায়-মঞ্জরী” নামে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি অনাবশ্যক-বোধে সমস্ত শ্রায়হস্তের ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহা তিনি নিজেও বলিয়া গিয়াছেন। তিনি “শ্রায়কলিকা” নামে শ্রায়হস্তের এক লঘুবৃত্তিও রচনা করিয়াছিলেন। কাস্মীর সরস্বতী ভবন হইতে ঐ গ্রন্থেরও প্রাপ্ত অংশ প্রকাশিত হইয়াছে (১)।

(১) গঙ্গেশ উপাধ্যায় “উপমানচিন্তামণি” গ্রন্থে “জরনৈয়ায়িক-জয়ন্তভট্ট প্রভৃত্যঃ” এই কথা লেখায় মঃ মঃ গঙ্গাধর শাস্ত্রি মহাশয় প্রভৃতিও জয়ন্তভট্টকে জরনৈয়ায়িক বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু “জরদীমাংসকে”র ন্যায় “জরনৈয়ায়িক” বলিতে বুঝা যায়, বুদ্ধ নৈয়ায়িক—যেমন বাৎস্তায়ন প্রভৃতি। “শ্রায়মঞ্জরী”তে উপমান প্রমাণের ব্যাখ্যায় জয়ন্তভট্ট নিজেও “বুদ্ধ নৈয়ায়িক”গণের মত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ গঙ্গেশের উক্ত সন্দর্ভে জরনৈয়ায়িক ও জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি, ইহাই তাহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। জয়ন্ত ভট্টই জরনৈয়ায়িক নহেন। “শ্রায়মঞ্জরী”তে (৬৬, ৭৮, ৩১২ পৃঃ) জয়ন্তভট্ট আচাৰ্য্য বলিয়া তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথার উল্লেখ করায় তিনি তাহার পরবর্ত্তী, ইহা বুঝা যায়। আর জয়ন্ত ভট্ট গুণপদার্থে সজাতীয় গুণই থাকে না, বিজাতীয় গুণ থাকে, এইরূপ যে, অভিনব মত সমর্থন করিয়াছেন, ‘কিরণাবলী’ টীকায় (১৬২ পৃঃ) উদয়নাচাৰ্য্য উক্ত মতের খণ্ডন করায় এবং আরও কোন কারণে বুঝা যায়, উদয়নাচাৰ্য্য জয়ন্ত ভট্টের কিছু পরবর্ত্তী। কিন্তু তিনি বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার ব্যোমশিবাচাৰ্য্যের বিশেষ মতের উল্লেখ না করায় ব্যোমশিব যে, তাঁহার পূর্ববর্ত্তী, ইহা আমরা বুঝি না। আর শিবানিত্যমিশ্রই যে ব্যোমশিব, ইহাও বুঝি না। কারণ শিবানিত্যমিশ্র “সপ্তপদার্থী” গ্রন্থে প্রচলিত বৈশেষিক মতানুসারে শব্দ প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গতই বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যোমশিব তাহা বলেন নাই। পরে ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জয়ন্তভট্টের পরেই দশম শতাব্দীতে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য—
পূর্বোক্ত বাচস্পতিমিশ্রকৃত তাৎপর্যটীকার “শ্রায়-বাস্তিক-তাৎপর্য-পরিশিষ্ট”
নামে টীকা করেন। উহা “শ্রায়নিবন্ধ” নামেই খ্যাত হয়। তাই
পরে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র সর্বমাত্ম মহানৈয়ায়িক বর্দ্ধমান উপাধ্যায়
উহার যে “প্রকাশ” নামে টীকা করেন, তাহা “শ্রায়নিবন্ধ-প্রকাশ” নামেই
কথিত হইয়াছে। পদ্মনাভ মিশ্র ঐ টীকার “বর্দ্ধমানেন্দু” নামে টীকা
করেন এবং শঙ্করমিশ্র উহারই “শ্রায়তাৎপর্যমণ্ডল” নামে টীকা করেন।
উদয়নাচার্য পরে স্বতন্ত্রভাবে শ্রায়স্থত্রের ব্যাখ্যা করিতে “প্রবোধসিদ্ধি”
নামে এক তুৎপুস্তক গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে শ্রায়দর্শন ও ভাষ্যাদি গ্রন্থে
অপ্রকাশিত বহু পদার্থতত্ত্ব, বিশেষতঃ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” বিষয়ে
গ্রন্থান্তরে অনুরূপ বহুস্থল তত্ত্ব অতিসুস্পষ্টভাবে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
তাই উহা “ন্যায়পরিশিষ্ট” ও পরে “পরিশিষ্ট” নামেই প্রসিদ্ধ হয়। তাই
পরে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ঐ গ্রন্থের “প্রকাশ” নামে যে টীকা করেন, তাহাও
“পরিশিষ্টপ্রকাশ” নামেই প্রসিদ্ধ হয় (১)।

গঙ্গেশ উপাধ্যায় শ্রায়স্থত্রাদির কোন বৃত্তি বা টীকা না করিলেও তৎপুত্র
বর্দ্ধমান উপাধ্যায় পিতার উপদেশানুসারে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বতন্ত্রভাবে
“অবীক্ষানয়তত্ত্ববোধ” নামে শ্রায়স্থত্রের বৃত্তিরচনা করিয়া অনেক নূতন
ব্যাখ্যাও প্রকাশ করেন। তাহার পরে মিথিলার দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্রও “শ্রায়-
তত্ত্বালোক” নামে শ্রায়স্থত্রের নূতন টীকা করেন এবং তিনি আবার বিচার

(১) “তত্ত্ব-চিন্তামণি”র “আলোক” টীকার (সোসাইটি সংস্করণ ৬৭৪ পৃঃ) পক্ষধর মিশ্রও
লিখিয়াছেন—“যদু পরিশিষ্টপ্রকাশে মহামহোপাধ্যায়চরণাঃ”। পরে মিথিলার মহানৈয়ায়িক
গোকুলনাথ উপাধ্যায়ও তাহার “অমৃতোদয়” নাটকের তৃতীয় অঙ্কে লিখিয়াছেন “এষ
পরিশিষ্ট-প্রকাশকৃদ্বৃদ্ধবর্দ্ধমানঃ”। সেখানে টীকার অজ্ঞতাবশতঃ বর্দ্ধমানকৃত কুসুমালি-
প্রকাশ টীকাকেই “পরিশিষ্ট প্রকাশ” বলিয়াছেন। বস্তুতঃ উদয়নাচার্যকৃত “প্রবোধসিদ্ধি”
গ্রন্থের বর্দ্ধমানকৃত “প্রকাশ” নামী টীকাই “পরিশিষ্টপ্রকাশ”। একাদশ শতাব্দীতে উদয়নাচার্যের
সম্প্রদায় মহানৈয়ায়িক বরদরাজও “তর্কিকরশ্মা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“প্রবোধসিদ্ধি নামি
পরিশিষ্টে”। উক্ত পরিশিষ্ট গ্রন্থ এবং উহার বর্দ্ধমান কৃত টীকাও পূর্বকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত ও
প্রচলিত ছিল। এ পর্যন্ত উহা মুদ্রিত হয় নাই। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি গৃহে এবং
অক্সফোর্ডে উক্ত “প্রবোধসিদ্ধির” পুথী আছে। অক্সফোর্ড সাহেবের ক্যাটালগ ৩১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করিয়া (তাৎপর্য্য টীকাকার প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্রের “শ্রায়স্থচ নিবন্ধ”র শ্রায়) যথাক্রমে সমস্ত শ্রায়স্থত্র উদ্ধৃত করিয়া “শ্রায়স্থত্রোদ্ধার” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন (১)। “শ্রায়স্থচনিবন্ধ”কার প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্রের মতে শ্রায় দর্শনের স্থত্র-সংখ্যা ৫২৮। দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্রের মতে স্থত্র-সংখ্যা ৫৩১।

এইরূপ বঙ্গদেশেও প্রাচীনকাল হইতে ন্যায়স্থত্রের বহু চর্চা ও স্থত্র-পাঠাদিবিচার হইয়াছে। পরে নবদ্বীপের নব্যনৈয়ায়িকগণও নানা গ্রন্থে অনেক ন্যায়স্থত্রের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে, কেবল নব্যশাস্ত্রের অল্পমান খণ্ড বা ব্যাপ্তিবাদ লইয়াই বিব্রত ছিলেন—ইত্যাদি কথা একেবারেই অসত্য। তৎপূর্ব্বেও পঞ্চদশশতাব্দীর শেষভাগে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে হইতেই নবদ্বীপে শ্রায়স্থত্রেরও বিশেষ চর্চা হইয়াছে। তৎকালে রামকলিগ্রামে গোড়রাজমন্ত্রী সনাতন গোস্বামীর আবাসেও বহু নৈয়ায়িক উপস্থিত হইয়া সনাতন ও তাঁহার কনিষ্ঠ রূপকে নিজকৃত ন্যায়স্থত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইতেন। বৈষ্ণব ইতিহাসবিজ্ঞ নরহরি চক্রবর্তী সেই বাতী প্রকাশ করিতে তৎকৃত “ভক্ত-রত্নাকরে” লিখিয়া গিয়াছেন—“ন্যায়স্থত্রব্যাখ্যা নিজ কৃত যে করয়। সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়” (১ম ৪২ পৃঃ)।

পরে নবদ্বীপে পূর্ব্বোক্ত রামভদ্র সার্কর্ভৌম ন্যায়রহস্য নামে ন্যায়স্থত্রের উৎকৃষ্ট টীকা করেন। পরে বিশ্বনাথ ন্যায়গুণানন ন্যায়স্থত্রের বৃত্তি রচনা করিলে ঐ বৃত্তিই সর্ব্বদেশে প্রচলিত হয়। মহাদেব ভট্টাচার্য্যও কাশীবাস কালে ন্যায়স্থত্রের “মিতভাষিণী” নামে এক বৃত্তি রচনা করেন। তিনি কাশীতে আসিয়া বেদান্তশাস্ত্রেরই বিশেষ চর্চা করায় তখন বেদান্তি মহাদেব নামেই খ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও যে বাঙ্গালা নৈয়ায়িকই

১। উক্ত “ন্যায়স্থত্রোদ্ধারের” কোন পুথীর শেষে বাচস্পতি মিশ্রের লিখিত শ্লোকের পরাৰ্দ্ধ আছে, “ব্যালেশি ন্যায়স্থত্রোধ্যং চৈত্রে বশস্কি বাসবে”। “বাসব” শব্দের অর্থ ইন্দ্র ১৪। “অস্কি” শব্দের দ্বারা ৩ সংখ্যা গ্রহণ করিলে (বাসব ১৪, অস্কি ৩, বহু ৮,) ১৪৩৮ বৈক্রম সংবতে (১৩৮১ খৃঃ) বাচস্পতি মিশ্র ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও তিনিও গঙ্গেশের পৌত্র যজ্ঞপতির পরবর্তী এবং তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। পরে বুদ্ধ বয়সেই তিনি অনেক স্মৃতি নিবন্ধ ও “খণ্ডনোদ্ধার” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীদাস ১৫০১ খৃষ্টাব্দে “গণিততত্ত্ব চিন্তামণি” রচনা করেন।

ছিলেন, ইহা আমরা গুনিয়াছি। আর উক্ত বিখ্যাত ন্যায়জ্ঞান-
যে, ন দ্বীপের রত্নাকর বিদ্যাচাম্পতির পুত্র এবং কাশীনাথ বিদ্যা-
নিবাসের পুত্র, ইহা নিশ্চিত। বিখ্যাত নিজেই ন্যায়তত্ত্ববৃত্তির প্রারম্ভে
দুই শ্লোকে এবং তাঁহার “ভাষ্যপরিচ্ছেদ” প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থেরই শেষে
উক্ত বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্যের পুত্র বলিয়াই আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া
গিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক রত্ননাথ ন্যায়চাম্পতিও নিজ গ্রন্থ-শেষে ঐরূপই
আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনিও বর্দ্ধমান কৃত “গুণকিরণাবলী-
প্রকাশের রঘুনাথ শিরোমণিকৃত টীকার (“গুণদীপ্তি”র) “প্রকাশ-
বিবৃতিপরীক্ষা” নামে টীকা এবং আরও অনেক গ্রন্থরচনা করেন। কাশীর
সংস্কৃতী ভবনে তাহার লিখিত গ্রন্থও আছে।

উক্ত বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষেও বিদ্যমান ছিলেন,
ইহা পূর্বে (১১শ পৃঃ) বলিয়াছি। তিনি অনেকদিন কাশীবাস করিয়াছিলেন।
সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশীয় কোন ব্রাহ্মণসমাজের সহক্রে এক ব্যবস্থাপত্রে
তাঁহারও নাম স্বাক্ষর এখনও বিদ্যমান আছে। ষোড়শ শতাব্দীর পরার্ধে
বাদসাহ আকবরের সময়ে দিল্লিতে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মহাসভাতেও তিনি
নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন কাশীর সুপ্রসিদ্ধ দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত
নারায়ণ ভট্টের সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে বিচার হয়। তিনি কোন বিষয়ে
বঙ্গদেশীয় আচারেরই শাস্ত্রোক্ত সমর্থন করেন। পরে মাংস-শ্রাদ্ধ ও মৎস্য-মাংস-
ভক্ষণাবয়োগে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার গুরুতর বিবাদ উপস্থিত
হইলে স্বদেশ বঙ্গল বিখ্যাত তখন বঙ্গদেশীয় আচারের নিন্দায় নিতান্ত ব্যথিত
হইয়া (সম্ভবতঃ বিদ্যানিবাসের বৃদ্ধাবস্থায় কাশীবাসকালেই) “মাংসতত্ত্ব-
বিবেক” নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া শাস্ত্র দ্বারা এবং ভিন্নদেশীয় অনেক
স্মৃতি নিবন্ধকারের উক্তির দ্বারাও মাংস-শ্রাদ্ধ ও মৎস্য-মাংস ভক্ষণ সমর্থন
করেন। উক্ত গ্রন্থপাঠে লক্ষ্যীধর কৃত “কৃত্যকল্পতরু” প্রভৃতি স্মৃতি নিবন্ধও
যে, তখন তাঁহার পিতার নিকটে ছিল এবং তাঁহারা ঐ সমস্ত স্মৃতিনিবন্ধও
বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। (বিদ্যানিবাসের সংগৃহীত
“কৃত্যকল্পতরু”র এক অংশ এখন লওনে ইণ্ডিয়া অফিসে আছে)। পরন্তু
উক্ত “মাংসতত্ত্ববিবেক” গ্রন্থের শেষে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের প্রতি বিখ্যাতের

ক্ৰোধ-মূলক অনেক কটুক্তির দ্বারা তৎকালে তাঁহাদিগের মত ও ব্যবহার এবং তাঁহাদিগের সহিত ঐ সমস্ত বিষয়ে বিবাদটা যে কিরূপ গুরুতর হইয়াছিল,—ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। কাশীর সরস্বতী ভবন হইতে বিশ্বনাথের ঐ গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। *

বিশ্বনাথ ন্যায্যস্বত্ববৃত্তিতে বাৎস্তায়নভাষ্যাदि প্রাচীন গ্রন্থের অনেক কথাও লিখিয়াছেন। কোনস্থলে (১:১৩০) “দীধিতি”কার রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যা বিশেষেরও উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—“ইতি ব্যাখ্যাতং দীধিতিকৃতং”। সুতরাং কেহ যে, বিচার করিয়া তাহাকে রঘুনাথ শিরোমণিরও পূর্ববর্তী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ বিদ্যানিবাসের সময়ানুসারে তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং তিনি যে, পরবর্তী গদ্যধরশিষ্য জয়রামের ছাত্র, (কেহ কেহ তাহাই লিখিয়াছেন)—ইহাও সম্ভব হইতে পারে না। ন্যায্যস্বত্ববৃত্তির কোন প্রাচীন পুথীর শেষে লিখিত “রস-বার-তিথৌ শকেন্দ্রকালে”—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা জানা যায়, বিশ্বনাথ ১৫৫৬ শকাব্দে (১৬০৪ খৃষ্টাব্দে) বৃন্দাবনে ন্যায্যস্বত্ববৃত্তি রচনা করেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা উহার কিছু পরেও জন্ম গ্রহণ করিলে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সেই তাঁহার ন্যায্যস্বত্ববৃত্তি রচনা সম্ভব হয়। উক্ত শ্লোকে “রস-বার-তিথৌ” এইরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। §

* “মাংসতত্ত্ব-বিবেকে”র সর্বশেষে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—“ব্রহ্মাবর্ত-ব্রহ্মর্ষি-দেশ-মধ্যদেশা-র্যাবর্তেণ মাংসভক্ষণাচার আছাদিকোহবিগীতঃ প্রতীয়ত এব। যেতু কলিবজ্জাতয়া মাংসশ্রাদ্ধে বিবদন্তে, ‘স্তোয়ানামহাপাতক-নিষ্কৃতি’রিত্তি কলিবজ্জাতয়োক্ত মপি ব্রহ্মহত্যা—তৎসংসর্গ প্রায়শ্চিত্তং ধনলোভাদ্রুপদিশক্তি, মাতৃসপিণ্ডানয়নে চ নবি-বদন্তে রাগরোধদূষিতচেতসোদেবানাং প্রিয়ান্তে কেন শিষ্ণীয়া ইত্যং মাংসং বিদ্বিষন্তিঃ সৌগত মতানুসারিভিঃ সহ ভ্রমেণেতি”।

§ বিশ্বনাথ বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবনবাসী এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত হইলেও পিতার স্থায় তিনিও কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠা হন নাই। তাঁহার “ন্যায্যস্বত্ববৃত্তি” ও “দিকান্তমুক্তাবলী”র মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যায়। তিনি তাঁহার “ভেদসিদ্ধি” গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ গ্ৰহণ করিতেও বৈষ্ণবভাবে কোন কথা বলেন নাই। প্রথমে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক নারায়ণতীর্থ যতিও বিশ্বনাথের “কারিকাবলী”র টীকা করিয়াছিলেন। উহাও কাশী মুদ্রিত হইয়াছে।

বিশ্বনাথের অনেক পরে শান্তিপুত্রের অদ্বৈতপ্রভুর অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাস্পতি ভট্টাচার্য্য “শ্রায়হৃত্তবিবরণ” নামে রুত্তি রচনা করেন (১)। অনেক দিন পূর্বেই কাশীধামে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি তাহাতে অনেক স্থলে নব্যত্নায়ের বিচারপদ্ধতি অনুসারে হস্ত বিচার করিতে জগদীশ ও গদাধরের কথাও লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি বাৎস্তায়নভাষাদি প্রাচীন গ্রন্থের কোন কথার সমালোচনা করেন নাই। ভাষ্যাদির কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশ্বনাথের শ্রায়হৃত্ত রুত্তি হইতেই গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন। তদ্বারাও বুঝা যায় যে, তাঁহার পূর্বে হইতেই বাৎস্তায়ন ভাষাদি প্রাচীন শ্রায় গ্রন্থের পঠন পাঠন বিলুপ্ত হয় (২)। তিনি তৎকালে প্রচলিত উদয়নাচার্য্যের “কুহুমাজলিকারিকার” হরিদসী

১। উক্ত রাধামোহন গোস্বামী অদ্বৈত প্রভুর প্রপৌত্র—(কেহ তাহাই লিখিয়াছেন)—নহেন। অদ্বৈতবংশের হস্ত লিখিত কুল পঞ্জিকার দেখিয়াছি,—অদ্বৈতপ্রভুর চতুর্থ পুত্র বলরাম, তৎপুত্রঃ শমুদ্ভদ্র, তৎপুত্র শ্রীরাম, তৎপুত্র রামানন্দ, তৎপুত্র রাধামোহন, তৎপুত্র হরেকৃষ্ণ, তৎপুত্র হরিনারায়ণ, তৎপুত্র নৃসিংহ নারায়ণ। উক্ত রাধামোহন গোস্বামী ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে নানাগ্রন্থ রচনা ও অধ্যাপনা করায় “গোসাই ভট্টাচার্য্য” নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণবও ছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণব ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রভাবেই নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ তাঁহার নিকটে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন। (তখন হইতেই নাটোরের রাজবাটিতে বিশ্বনাথের বংশধরগণই বৈষ্ণব)। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য পরে শান্তিপুত্রে নিজগৃহে “বিশ্বমোহন” নামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আরও নানাকারে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র তৎকৃত “শ্রুতদ্বী” কাব্যে শান্তিপুত্রের বর্ণনায় “মহাদী গোসাই ভট্টাচার্য্য মহাজন”—ইত্যাদি পদ্যে তাঁহার যে নন্দ-নন্দনো সন্দেহের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না।

২। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির নিয়োগানুসারে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক বিখ্যাত মহানৈয়াসিক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রথমে সভায় শ্রায়দর্শন সম্পাদন করেন। কিন্তু তিনিও ন্যায়-ভাষ্যের বিস্তৃত পুস্তক পান নাই। উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন—“ন্যায়ভাষ্যমিদং পূর্বে বিরলং লুপ্তবৎস্থিতং”। কিন্তু তৎপূর্বেও কলিকাতায় শ্রায়দর্শন মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখের “সমাচারচক্রিকা” পত্রিকার বিজ্ঞাপন পাঠে বুঝা যায়। তবে সম্ভবতঃ তাহাতে ভাঙ্গ মুদ্রিত হয় নাই। “সংবাদ পত্রে সেকালের কথা” পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠায় উক্ত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

ব্যাখ্যার টীকাও করিয়াছিলেন এবং গদাধর ভট্টাচার্য্যের শ্রায় “মুক্তিবাদ” নামে একগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন (উহার পাণ্ডুলিপি আমি দেখিয়াছি)। পরন্তু তিনি মীমাংসা ও স্মৃতি শাস্ত্রেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া স্বর্গে রঘুনন্দনের “মলমাসতত্ত্বা”দি অনেক কঠিন গ্রন্থের উৎকৃষ্ট টীকাও করিয়া গিয়াছেন। তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনেও প্রকৃত সিদ্ধান্তবৎ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বলদেব বিদ্যভূষণের পরে তিনি শ্রীজীব গোস্বামি কৃত “তত্ত্ব সন্দর্ভের”ও অত্যাৎকৃষ্ট টীকা করিয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পূর্বে বৃন্দাবনে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। সেই পুস্তকে তাঁহার সময় বিষয়েও প্রমাণ আছে। পরন্তু ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামকৃষ্ণের দেহান্ত হইলে একবৎসর পরে তৎপুত্র বিশ্বনাথ উক্ত গোস্বামি ভট্টাচার্য্যের শিষ্য হন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও (কোলকাত্ত সাহেবের সময়ে) এক বৎসর জীবিত ছিলেন। তৎকালে নাটোর হইতে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এক পত্রও আমি দেখিয়াছি। তাঁহার সময়ে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কশঙ্করান এবং নবদ্বীপের শঙ্করতর্কবাগীশ প্রভৃতি অনেক অতি বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গুপ্তিপাড়ার চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য শ্রায়শাস্ত্রেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে উক্ত গোস্বামি ভট্টাচার্য্যের শ্রায় স্মৃতি, শ্রায় ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে নানাগ্রন্থকার এবং নব্যজ্ঞানেও অসাধারণ পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না।

১। চিরঞ্জীবের শ্রায়শাস্ত্রে গ্রন্থের কথা তাঁহার “বিদ্যামোদতরঙ্গিনী” গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে দ্রষ্টব্য। কিন্তু উক্তগ্রন্থ যে, তিনি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন—(দেখিলাম—১৮৪৬ খৃঃ ডিসেম্বরের “কলিকাতা রিভিউ”পত্রে “ভাগীরথী তীর” প্রবন্ধে লং সাহেবও গুপ্তিপাড়ার কথায় তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন)—এ বিষয়ে প্রমাণ কিছুই নাই। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”য় লিখিত আনুমানিক সময় নিম্নমাণ। পরন্তু আমরা তাহা সম্ভবই বুঝি না। কারণ চিরঞ্জীব যশোবন্ত সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খৃঃ) পূর্ববর্তী। এ বিষয়ে পরি৯৯ পত্রিকায় প্রকাশিত মঃঃ ৬হরপ্রদাদ শাস্ত্রি মহাশয়ের “চিরঞ্জীব শর্ম্মা” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পরন্তু চিরঞ্জীবের পিতা রাঘবেন্দ্র যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র ছিলেন, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি।

ন্যায় দর্শনোক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও

‘ন্যায় পরিচয়’ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ।

মহর্ষি অক্ষপাদ প্রণীত তদাদি তদন্ত ত্রায়সূত্র সমূহই ত্রায়দর্শন নামে প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত ত্রায়দর্শনে পাঁচটি অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি আত্মিক আছে। সূত্রসংখ্যা এবং অনেকস্থলে সূত্রের পাঠও ব্যাখ্যাাদিবিষয়ে ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকারগণের কিছু কিছু মত-ভেদ হইলেও পঞ্চাধ্যায় ত্রায়দর্শনই যে, এক অক্ষপাদ মহর্ষির প্রণীত, এই বিষয়ে এবং “ভারতবাদ”, “অসংকার্যবাদ” ও “নানাত্ববাদ” প্রভৃতি ত্রায় দর্শনোক্ত মূল সিদ্ধান্ত বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন মতভেদ নাই। মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম ত্রায়দর্শনের সর্বপ্রথম সূত্রে (১৪৫ পৃঃ) প্রমাণ ও প্রমেয় প্রভৃতি বোদ্ধশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তি লাভের প্রয়োজক বলিয়া কিরূপে পরামুক্তি হইলে, তাহা দ্বিতীয়সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। তদ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই যে, মুক্তির চরমকারণ, এবং প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান উহার সম্পাদক ও রক্ষক, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ত্রায়সূত্র যে, কেবল হেতু-বিজ্ঞা বা শুদ্ধ তর্কশাস্ত্র, অর্থাৎ প্রাচীনকালে উহা কেবল তর্কশাস্ত্রই (Logic) ছিল, পরে বৌদ্ধযুগে উহাকে দর্শনশাস্ত্র করা হইয়াছে, এই অভিনব মত কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না। কারণ, যিনি উক্ত প্রথম সূত্রও দ্বিতীয়সূত্র বলিয়াছেন, তিনি পরে যে, তাঁহার প্রথমসূত্রোক্ত আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বও অবশ্যই বলিয়াছেন, ইহা স্ব কার্য্য। প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রও পূর্বে ছিল না,—(কারণ উহাতে মুক্তির কথা আছে)—ইহা বলিতে গেলে সেই প্রাচীন ত্রায়সূত্র গ্রন্থের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা যাইবে না। শারীরক ভাষ্যে (১১১৪) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও প্রচলিত ত্রায় দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রটিকে আচার্য্য প্রণীত ন্যায়সূত্র বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন।

স্বাভাবিক উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারাই ত্রায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব নিরূপণ হইয়াছে। পদার্থের সামান্য নাম ও বিশেষ নাম কখনকে “উদ্দেশ্য” বলে এবং তাহার স্বরূপ নির্দেশকে “লক্ষণ” বলে। সেই লক্ষিত পদার্থের লক্ষণ-রূপকে

উপপাদন বা বিচার দ্বারা তাহার তত্ত্ব-সংস্থাপনকে “পরীক্ষা” বলে। মহর্ষি গোতম তাঁহার প্রথমসূত্রোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের সামান্য লক্ষণ এবং অনেক পদার্থের প্রকার ভেদ ও বিশেষ লক্ষণ বলিয়া অনেক পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ত্রায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমোক্ত প্রমাণ পদার্থের সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ পরীক্ষা করিতে পূর্বপক্ষ খণ্ডন পূর্বক প্রমাণমাত্রের প্রামাণ্য—এবং তাঁহার সম্মত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ,—এই চতুর্বিধ প্রমাণেরই পৃথক প্রামাণ্য এং বিশেষ বিচার করিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রথমাধ্যায়োক্ত ষাদশ প্রমেয়ের পরীক্ষা করিয়া তদ্বিশেষে নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। আর সর্বোক্ত পরমেশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাপেক্ষ সর্ব্ব কর্তা, পরমাণু নিত্য, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যমাত্রই অসৎ, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া নিজস্বমত “আরম্ভবাদে”র সমর্থন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে জীবাত্মার তত্ত্বপরীক্ষা করিতে জীবাত্মা যে, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে ভিন্ন এবং নিত্য পদার্থ, ইহা নানা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়া শেষে জীবের বিচিত্র শরীর সৃষ্টি যে, তাহার প্রাক্তন কর্ম্মকল ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞাত, এই সিদ্ধান্তও সমর্থন করিয়া তদ্বারা শ্রুতি-সিদ্ধ ও সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্তিত কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদেরও সমর্থন করিয়াছেন (১), ইহা ত্রায়দর্শনের অধ্যাত্ম অংশে সর্ব্বসম্মত বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব্বোক্ত “ত্রায়দর্শন” নামক ত্রায়শাস্ত্রের পরিচয় প্রকাশের জন্ত “জাতীয়া-শিক্ষা-পরিষদে”র নিয়োগানুসারে “ন্যাস-পরিচয়” নামে

(১) অনেকে বলেন যে, বেদের সংহিতা ভাগে জন্মান্তরবাদ বা পরলোকাদির কোন কথা নাই। কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের ২৫শ বর্গে “অয়ংপন্থা অনুবিতঃ পুরাণঃ”—ইত্যাদি মন্ত্র সমূহে জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। ঐ সমস্ত মন্ত্রে গর্ত্ত্ব বান্দেব ইন্দের নিকটে নিজের জন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন। এবং ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ১৮শ বর্গের মন্ত্র সমূহে স্বর্গধাম প্রাপ্তির প্রার্থনা এবং পরে ২০শ বর্গ প্রভৃতির মন্ত্রসমূহে মৃতজীবের যমালয় গমন এবং মৃতের পুনর্জীবন লাভের কথা দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে ২০শ বর্গে ও অবিনশ্বর আত্মার বিভিন্ন জন্ম গ্রহণের কথা দ্রষ্টব্য। দশম-মণ্ডলেও (১৪।২।৭) জীবের পিতৃলোকাদি প্রাপ্তির কথা দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। যাহাতে শিক্ষিত পাঠক মাত্রই মূল ত্রায়দর্শন পাঠ না করিয়াও ত্রায়দর্শনোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ এবং পরম্পরাগত মূল সিদ্ধান্ত অল্প সময়ে বুঝিতে পারেন, ইহাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। যথাসম্ভব সংক্ষেপে দ্বাদশ অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে ন্যায়দর্শনে গৌতমোক্ত মুক্তির স্বরূপ ও তাহার উপায় লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মা যে ব'হিরঙ্গিয় নহে, দেহ নহে এবং মনও নহে, এই বিষয়ে গৌতমোক্ত যুক্তি এবং তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার নিত্যত্ব ও পূর্ব জন্মের সাধক-যুক্তি বিচার পূর্বক লিখিত হইয়াছে। কণাদ ও গৌতম যে দ্বৈতবাদী, ইহা কিরূপে তাঁহাদিগের মত দ্বারা বুঝা যায়, তাহাও আবশ্যকবোধে চতুর্থ অধ্যায়ে বিচার পূর্বক লিখিত হইয়াছে। কণাদ ও গৌতমের উক্ত মত যে, তাঁহাংগির নিম্ন বুদ্ধি-কল্পিত নহে, ইহা সমর্থন করিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদরূপ দ্বৈতবাদ কিরূপে উক্তমতে শাস্ত্রনিন্দিত হয়, এ বিষয়ে ত্রায়-বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের অনেক কথা পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। কণাদের ত্রায় গৌতম ও আনন্তবাদী, তাহার মতেও পরমাণু নিরবয়ব নিত্য, এই বিষয়ে ত্রায়দর্শনে গৌতমের কথা এবং তাহার সমর্থনে অন্যান্য বক্তব্য ও দ্বৈতবাদসমর্থনে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অনেক কথাও সংক্ষেপে ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে (১)। জগৎকর্তা নিত্য সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-বিষয়ে কণাদ ও গৌতমের মত সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে গৌতমোক্ত প্রমাণ পদার্থের ব্যাখ্যা এবং নবম অধ্যায়ে ন্যায়দর্শনে প্রমাণ পরীক্ষায় গৌতমের কথা, দশম অধ্যায়ে বেদের প্রামাণ্যপরীক্ষায় গৌতমের কথা এবং তদ্বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য লিখিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে গৌতমোক্ত আত্মা হইতে মুক্তি পর্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা

(১) স্ত্রায়মত বৃত্তিকার বিবনাথ স্ত্রায়পঞ্চানন পরে ন্যায়মতানুসারে উপনিষদের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন পূর্বক ভেদবাদ সমর্থন করিতে “ভেদসিদ্ধি” নামে এক গ্রন্থও রচনা করেন। উহা তৎপূর্ববর্তী শঙ্কর মিশ্রের “ভেদরত্ন” গ্রন্থ হইতে বিতৃত। কিন্তু উহার সৰ্ব্বাংশ পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত প্রথম অধ্যায় মাত্র কাশীর সরস্বতী ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ জিজ্ঞাস্য উহা পাঠ করিবেন। শঙ্কর মিশ্রের “ভেদরত্ন” গ্রন্থও ঐ স্থান হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইবে।

এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্ভাষাদি চতুর্দশ পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও তদ্বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য বক্তব্য লিখিত হইয়াছে।

ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম নিঃসমতসমর্থন করিতে যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহার কিছুই প্রকাশ না করিয়া এবং বিকল্প মতের কোনই আলোচনা না করিয়া কেবল তাঁহার সিদ্ধান্তপ্রকাশ করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বিচারশীল পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন মতের সমালোচনাও সম্ভব হয় না। সুতরাং যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিচার করিয়া লিখিতে পূর্বাচাৰ্য্য গণের অনেক কথাও লিখিত হইয়াছে। পরন্তু কতিপয় বিষয় ভিন্ন সমস্ত মূল সিদ্ধান্তেই কণাদ ও গৌতমের একট মত। তাই পূর্বাচাৰ্য্যগণ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে “সমানতন্ত্র” বলিয়া গিয়াছেন। তাই মিথিলা ও নবদ্বীপের নৈয়ায়িক টীকাকারগণ অনেক বৈশেষিক গ্রন্থেরও টীকা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বলা আবশ্যক যে, কোন বৈশেষিক গ্রন্থ নব্যতায়ের মূল নহে। নব্যতায় গ্রন্থে ন্যায়দর্শনোক্ত চতুর্বিধ প্রমাণই গৃহীত হইয়াছে এবং তাহাতে গৃহীত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ স্নায়ুত্বকার গৌতমেরও সম্মত। এই গ্রন্থে যথা স্থানে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং গৌতমের মতের ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলে কণাদের কথা এবং তাহার বিশেষ মতও লিখিত হইয়াছে। পরন্তু গৌতমমতের ব্যাখ্যায় শৈবসম্প্রদায়-বিশেষের আচার্য্য কাস্মীরক ভাস্কর্য্যজের অনেক কথা এবং তাঁহার মতভেদও লিখিত হইয়াছে (১)। সুতরাং মতভেদাদি প্রকাশের জন্তও গ্রন্থ-বিস্তার হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, স্বভাবতঃ দুর্লভ বিষয়সমূহ বঙ্গভাষায় বিদ্যুতরূপে প্রকাশ করিলেও তাহা কখনই সর্জনবোধ্য হইতে পারে না। পরন্তু

(১) ভাস্কর্য্যজের “স্নায়নার” গ্রন্থের অষ্টাদশ টীকাকারের মধ্যে মুখ্য টীকাকার ভূষণ উদয়নাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। (কিরণাবলী কালী সংস্কৃত সিরীজ ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভাস্কর্য্যজ উদয়নের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি “স্নায়নার” গ্রন্থে অনেক স্নায়ুত্বও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কোন কোন বিষয়ে নিজমতানুসারেই গৌতমের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুক্ত পুস্তকের নিত্যত্বের অভিযুক্তিবাণও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবায়ন বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করার তাহার পূর্ব্বও যে, শৈব সম্প্রদায় বিশেষের নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ নিজ মতে স্নায়ুত্বের ব্যাখ্যা করিতেন, ইহা বৃক্ষা বায়।

সংক্ষেপে লিখিলে কিছুই বুঝা যায় না। সূত্রাং বাহ্য ভাষে অনেক হুবোঁধ বিষয় লিখিত হয় নাই। সংক্ষেপের অনুরোধে পরে পাণ্ডুলিপির অনেক অংশও পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি আমি নিত্যন্ত রুগ্ন দেহেও এই গ্রন্থে গ্রাহ্যদর্শনের বহু সূত্রই উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও অনেক বক্তব্য বিষয় যথাসম্ভব সূবোধ করিবার জন্য যথাসক্তি চেষ্টা করিয়াছি। ইহার দ্বারা পাঠকগণের কিছু উপকার হইলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। অবশ্য এখন অনেক পাঠকেরই গ্রায়বৈশেষিক মত রুচিকর হইবে না। পূর্বকালেও বিভিন্নমতবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় অপর মতকে অগ্রাহ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও সমস্ত বিরুদ্ধ মতেরও বিশেষরূপে অনুশীলন করিতেন। আর “যোগবাশিষ্ঠে” দেখিতে পাই, বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

অহঙ্কার-মনোবুদ্ধি-দৃষ্টয়ঃ সৃষ্টিকল্পনাঃ ।

একরূপতয়া প্রোক্তা যা ময়া রঘুনন্দন ॥

নৈয়ায়িকৈ রিতরথা তাদৃশৈঃ পরিকল্পিতাঃ ।

অন্যথা কর্নিতাঃ সাংখ্যশ্চার্ক্যকৈ রপিচান্যথা ॥

জৈমিনীয়েশ্চার্হিতৈশ্চ বৌদ্ধৈর্কৈশেথিকৈস্তথা ।

অন্যৈরপিবিচিত্রৈস্তৈঃ পাঞ্চরাত্রদিভিস্তথা ॥

সর্কৈরপিচ গন্তব্যং তৈঃ পদং পারমার্থিকং ।

বিচিত্রং দেশকালোথৈঃ পুরমেকমিবাধ্বনৈঃ ॥

উৎপত্তি প্রকরণ—২৬.৪৮—৫১ ।

৬ কাশীধাম, গণেশমহল্লা ।

২৫শে আশ্বিন, ১৩৪০ ।

ন্যায়-পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন

সকল শাস্ত্রেরই প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন না বুঝিলে কোন শাস্ত্রেরই শ্রবণে এবং কোন কথেরই কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। বিশ্ববিখ্যাত মীমাংসার্চা কুমারিল ভট্ট এই বিশ্বজনীন সত্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—

“সৰ্ব্বশ্চেব হি শাস্ত্রং কৰ্ম্মণো বাপি কশ্চিৎ ।

যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহতে ? ॥

জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে ।

শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ ॥”

—ম্লোকবার্তিক, ১২শ, ১৭শ শ্লোক ।

অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেরই এবং যে কোন কথেরই যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন কথিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা কেহই গ্রহণ করে না। যাহার প্রয়োজন ও সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে, সেই শাস্ত্রই শ্রবণ করিতে শ্রোতা প্রবৃত্ত হন। অতএব শাস্ত্রের প্রারম্ভে সেই শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং তাহার সহিত সেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি, তাহা বক্তব্য।

সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র প্রকাশ করিতে হইলে সৰ্ব্বাগ্রে উহার প্রয়োজন এবং তাহার সহিত ন্যায়শাস্ত্রের সম্বন্ধ অবশ্য বক্তব্য। তাই ন্যায়শাস্ত্রের প্রকাশক মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রেরই শেষে বলিয়াছেন,—“নিঃশ্রেয়-সাদিগমঃ ।” ইহার দ্বারা নিঃশ্রেয়সলাভই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন বা ফল, ইহা সূচিত হইয়াছে।

এখন ঐ “নিঃশ্রেয়স” শব্দের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। “নিঃশ্রেয়স” শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা উহার অর্থ বুঝা যায়—নিশ্চিত শ্রেয়ঃ। মুক্তিই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ, ইহা বলিয়া প্রাচীন কাল হইতেই মুক্তি অর্থে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের প্রয়োগ হইতেছে। সুতরাং শ্রায়দর্শনের প্রথম সূত্রোক্ত ঐ “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা মুক্তি অর্থ অবশ্যই বুঝা যায়। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ঐ “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা মুক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু আয়াদিগের মনে হয়, ঐ “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা মুক্তির শ্রায় অগ্ন্যাচ্ছ নিঃশ্রেয়সও অর্থাৎ ইষ্টমাত্রই শ্রায়শাস্ত্রের প্রয়োজনরূপে স্থচিত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের প্রয়োগ করিয়া, দ্বিতীয় সূত্রে এবং অন্যান্য সূত্রেও সর্বত্র মুক্তি প্রকাশ করিতে “অপবর্গ” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগের অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য আছে। “নিঃশ্রেয়স” শব্দের যেমন মুক্তি অর্থ প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ কল্যাণ বা ইষ্টমাত্র অর্থেও উহার প্রয়োগ হইয়াছে। মহাভারতেও উক্ত দ্বিবিধ অর্থেই নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে “অপবর্গ” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া “নিঃশ্রেয়স” শব্দের প্রয়োগ করায় সর্বপ্রকার নিঃশ্রেয়সই উহার দ্বারা তাঁহার বিবক্ষিত, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি।

“নায়বার্তিক” কায় উদ্যোতকর ঐ নিঃশ্রেয়সের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, ২ নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ,—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। তন্মধ্যে প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব-

১। কচ্চিৎ সহস্রৈর্নূর্য্যামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্ ।

পণ্ডিতো হর্থকৃষ্ণে য় কুব্যাশ্রিতঃশ্রেয়সঃ পরম্ ॥—মহাভারত, সভা-৫।৩৫ ।

নিঃশ্রেয়সং কল্যাণম্ ।—নীলকণ্ঠ-কৃত টীকা ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্দ্দ্বমোগন্ত নিঃশ্রেয়সকরাবৃত্তে ।—গীতা, ৫।৩ ।

“নিঃশ্রেয়সকরো” নিঃশ্রেয়সং যোগং কুর্য্যতে ।—শঙ্কর ভাষ্য ।

২। নিঃশ্রেয়সং পুনর্দৃষ্টাদৃষ্টভেদাদ্বেদা ভবতি । তত্র প্রমাণাদি-পদার্থতত্ত্ব-জ্ঞানানিঃশ্রেয়সং দৃষ্টং, নহি কচ্চিৎ পদার্থো জায়মানো হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধিনিবিন্ধং ন ভবতীতি, এবং কুত্বা সর্বৈ পদার্থা জ্ঞেয়তয়া উপক্ষিপ্যন্তে ইতি । পরন্তু নিঃশ্রেয়সমাত্মদেস্তত্ত্ব-জ্ঞানাদ্ভবতি ।—শ্রায়বার্তিক ।

জ্ঞান প্রযুক্ত অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত দ্বিবিধ নিঃশ্রেয়সের মধ্যে চরম নিঃশ্রেয়স মুক্তিই অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স। তত্ত্বিন্ন সমস্ত নিঃশ্রেয়সই দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স। ন্যায়-দর্শনের প্রথম সূত্রে যে প্রমাণ ও প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়সলাভ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মুক্তিরূপ চরম নিঃশ্রেয়স লাভে চরম কারণ। কিন্তু প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত সর্বপ্রকার দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের লাভ হয়। তাহা হইলে ঐ প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যে, আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের শ্রবণ মননাদি কার্যের সম্পাদন করিয়া এবং মুক্তিলাভার্থ অত্যাবশ্যক আরও অনেক দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স সম্পাদন করিয়াও মুক্তিলাভের প্রয়োজক হয়, ইহাও উদ্যোতকরোং ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায়। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সলাভেও গৌতমোক্ত প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং উদ্যোতকরের পূর্বোক্ত কথার দ্বারা তিনিও যে গৌতমের প্রথম সূত্রোক্ত “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা সর্বপ্রকার নিঃশ্রেয়সই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

পরন্তু গৌতমের প্রথম সূত্রের ভাষ্যশেবে যেখানে বাৎস্তায়ন ত্রায়শাস্ত্রকে সর্বশাস্ত্রের প্রদীপ, সর্বকণ্ঠের উপায় ও সর্বধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়াছেন, সেখানে বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে, ১ সূত্রকার মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স-লাভই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের এমন কোন প্রয়োজনই নাই, বাহাতে ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ সমস্ত প্রয়োজন-সিদ্ধিতেই ন্যায়শাস্ত্র অপরিহার্য্য অবলম্বন। কারণ, ইহা সর্বশাস্ত্রের প্রদীপ। ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে বিচার না করিলে কোন শাস্ত্রেরই গূঢ়ার্থ প্রকাশ হয় না। সুতরাং যে কোন শাস্ত্র সাহায্যে যে কোন অভীষ্ট লাভ করিতে হইলেই তাহাতে প্রথমে ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক। পরন্তু যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সকল লোকবাহা-নির্ব্বাহ হইতেছে—বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, রাজনীতি প্রভৃতি—সর্বত্রই

১। সূত্রকারেণ শাস্ত্রতাত্ত্বিকদ্বঃখোপমরূপনিঃশ্রেয়সাধিগমঃ প্রয়োজনমুক্তং, ভাষ্যকারন্ত নাস্ত্যেব তৎ তৎস্বাভাৱং প্রয়োজনং, যজ্ঞাবীক্ষিকী ন নিমিত্তং ভবতীত্যাহ ‘সেয়দাবীক্ষিকীতি’।—তাৎপর্য্যটিকা।

যে অনুমান-প্রমাণ প্রধান অবলম্বন, সেই অনুমান-প্রমাণের তব ন্যায়শাস্ত্রেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ষাঠ্যরূপে অনুমান করিতে হইলে যে, হেতু ও হেতুভাসের তত্ত্বজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক, তাহা ন্যায়শাস্ত্র ব্যতীত হইতেই পারে না। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র সর্বকর্মের উপায় অর্থাৎ অপরিহার্য অবলম্বন। ফলকথা, ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের মতেও যে সর্বপ্রকার অভীষ্টই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা বাচস্পতি মিশ্রও স্পষ্ট বলিয়াছেন।

তবে মুক্তিই যে, ন্যায়শাস্ত্রের পরম প্রয়োজন বা মুখ্য প্রয়োজন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। আমাদের সকল শাস্ত্রেরই চরম প্রয়োজন মুক্তি। শাস্ত্রবক্তা ঋষিগণ সেই মুক্তি লাভের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই অধিকারিত্বে শাস্ত্রে নানারূপ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, মুক্তিই পরম-পুরুষার্থ, সুতরাং মুক্তিই চরম নিঃশ্রেয়স। আর কোন নিঃশ্রেয়স লাভেই জীবের চিরশান্তি হয় না। সেই মুক্তিরূপ মুখ্য প্রয়োজন এবং অন্যান্য সমস্ত গৌণ প্রয়োজনের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রযোজ্য-প্রযোজক-ভাব সম্বন্ধ। অর্থাৎ শ্রায়শাস্ত্র সেই সমস্ত প্রয়োজনের প্রযোজক বা সম্পাদক। সেই সমস্ত প্রয়োজন ন্যায়শাস্ত্রের প্রযোজ্য বা সম্পাদ্য।

গৌতমোক্ত মুক্তির স্বরূপ ও তদ্বিষয়ে মতভেদ

মুক্তির নাম অপবর্গ। জীবের সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই তাহার অপবর্গ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—‘দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি।’ শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,—‘জন্মমৃত্যুজরাঃ দুঃখৈর্কিমুক্তোহমৃতমগ্ন তে ॥’—(গীতা, ১৪।২০)। তাই মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে বলিয়াছেন,—

তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ ॥ - ১।১।১২।

ইহার পূর্বসূত্রে দুঃখের উল্লেখ থাকায় উক্ত সূত্রে প্রথমোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা সর্বপ্রকার সমস্ত দুঃখই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বপ্রকার সমস্ত দুঃখের যে অত্যন্ত বিমোক্ষ অর্থাৎ আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহাই মোক্ষ।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন,—“তদভাবে সংযোগাভাবোহপ্রাহর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।” — (৫।২।১৮)। ইহার পূর্বসূত্রে অদৃষ্টের উল্লেখ থাকায়

কণাদের উক্ত হস্তের দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবের ধর্ম ও অধর্মরূপ সমস্ত অদৃষ্টের অভাবপ্রযুক্ত তাহার যে সেই শরীরাদির সহিত সেই বিলক্ষণ সংযোগের অভাব এবং পুনর্জন্মের অথ শরীরাদির বিলক্ষণ সংযোগের অপ্রোতর্জাব বা অনুৎপত্তি, তাহাই মুক্তি। সুতরাং কণাদের উক্ত হস্তের দ্বারাও ফলতঃ সর্বপ্রকার সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি, ইহা বুঝা যায়। কারণ, জীবের জন্ম হইলেই নানা দুঃখভোগ অবশ্যস্বাভাবী। চিরকালের জন্ত তাহার শরীরাদি-সম্বন্ধের উচ্ছেদ অর্থাৎ পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হইলেই আর কখনও তাহার কোন দুঃখভোগের সম্ভাবনাই থাকে না। শরীরাদির অভাবে কখনও সেই মুক্ত আত্মাতে জ্ঞানাদি কোন বিশেষ গুণই জন্মিতে পারে না। তাই বৈশেষিকাচার্য্যগণ কণাদের উক্ত হস্তানুসারেই বলিয়াছেন যে, আত্মার জ্ঞানাদি সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদই মুক্তি।

এখানে প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, ত্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে আত্মা চৈতন্য ও স্বরূপ নহে। কিন্তু চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান তাহার বিশেষ গুণ এবং জীবাত্মার পক্ষে উহা অনিত্য। ধর্ম ও অধর্ম এবং তজ্জন্ত সুখ ও দুঃখও জীবাত্মার অনিত্য বিশেষ গুণ। সুতরাং যে সমস্ত কারণে জীবাত্মাতে ঐ জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুণ জন্মে, তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে আর কখনও সেই জীবাত্মাতে জ্ঞানাদি কোন বিশেষ গুণ জন্মিতে পারে না। সুখের কারণ ধর্ম এবং দুঃখের কারণ অধর্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে আর কখনও তাহার সুখদুঃখের উৎপত্তি সম্ভবই হয় না। কিন্তু কোন জীবাত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলেও তখন সেই আত্মার উচ্ছেদ হইতে পারে না। কারণ, আত্মা নির্বিকার নিত্য। উক্ত মতে জীবাত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলেই তখন তাহার স্বরূপে অবস্থান হয়।

পূর্বোক্ত মতে অনেক সম্প্রদায়ের ঘোর প্রতিবাদ এই যে, যদি মুক্ত পুরুষের কোন সুখভোগ না হয় এবং তখন তাহার কোন চৈতন্যই না থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থা ত তাহার মুচ্ছাবস্থার তুল্য। তাহা হইলে উহা ত পুরুষার্থই হইতে পারে না। কারণ, পুরুষ বা জীব যাহা প্রার্থনা করে, তাহাকেই বলে পুরুষার্থ। কিন্তু কেহ কি নিজের মুচ্ছাবস্থাকে প্রার্থনা করে? এবং তাহার জন্ত কোন কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়? “নহি মুচ্ছাঽবস্থাং প্রবৃত্তো দৃশ্যতে

সুখীঃ”—কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই নিজের মুচ্ছাদি অবস্থানাভের জন্ত প্রবৃত্ত দেখা যায় না। ✓

এতদ্ব্তরে স্থায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কখনও নিজের অচৈতন্যাবস্থা প্রার্থনা করেন না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, অসহ বেদনায় কাতর হইয়া সময়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিও নিজের মুচ্ছাবস্থা প্রার্থনা করেন এবং অনেক সময়ে আত্মহত্যা করিতেও প্রবৃত্ত হন, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং কেবল দুঃখ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই সময়বিশেষে অচৈতন্যাবস্থাও যে পুরুষার্থ হয়, ইহা স্বীকার্য। বস্তুতঃ মুক্ত পুরুষের পূর্বোক্ত-রূপ অবস্থা মুচ্ছাবস্থা বা ততুল্য কোন অবস্থাও নহে। কারণ, মুচ্ছাদি অবস্থার অবসান হইলে আবার নানা দুঃখভোগ অবশ্যস্তাবী। কিন্তু মুক্তি হইলে আর কখনও তাহার কোন দুঃখেরই সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং উহা পুরুষার্থ এবং উহাই পরমপুরুষার্থ।

পরন্তু সুখ এবং দুঃখনিবৃত্তি, এই উভয়ই জীবের কাম্য বা পুরুষার্থ। তন্মধ্যে সংসারবিরক্ত পুরুষের পক্ষে দুঃখনিবৃত্তিই অধিকতর প্রিয়। কারণ, যাহারা সংসারে সুখের জন্ত বহু দুঃখভোগ করিয়া অবসন্ন হন, যাহারা সংসারে প্রকৃত দুঃখবোধী, তাঁহারা দুঃসহ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে চিরপ্রিয় বহু সুখও পরিত্যাগ করেন। তাই তখন তাঁহারা সুখে বিরক্ত হইয়া বলেন যে—“আর সুখ চাই না, এখন এই সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইলেই বাচি, সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল।”

দুঃখনিবৃত্তিই এখানে শান্তি বা শান্তি। কিন্তু সুখভোগ করিতে হইলে কখনই আত্যন্তিক শান্তি হইতেই পারে না। কারণ, সুখমাত্রই দুঃখানুযুক্ত। অর্থাৎ একেবারে দুঃখসম্বন্ধহীন চিরস্থায়ী কোন সুখ নাই। যে সমস্ত মুমুক্শু অধিকারী ইহা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তির জন্ত সর্বপ্রকার সমস্ত সুখভোগেই কামনা পরিত্যাগ করেন। একেবারে চিরশান্তি লাভের জন্ত তাঁহারা সুখদুঃখশূন্য অবস্থাই প্রার্থনা করেন। শান্ত রসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় কোন পূর্বাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা

ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা।

ব্রহ্মঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রে;

সর্বেষু ভাবেষু শমপ্রদানঃ ॥

অবশ্য ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষে মুক্ত পুরুষের সংকল্পমাত্রই নানাবিধ সংকল্পসিদ্ধি এবং নানাবিধ ঐশ্বর্যাদি লাভ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধেই ঐ সমস্ত কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই প্রকৃত মুক্তি নহে। কারণ, অনেকের ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “আব্রহ্ম-ভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।”—(গীতা, ৮।১৬)। কিন্তু যে সমস্ত উপা-সনাবিশেষের ফলে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, তথা হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ঐহারা মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারাও পূর্ববৎ চিরকালের জ্ঞান স্মৃতিভোগ করেন,—ইহা ত আর ছান্দোগ্য উপনিষদে পরে কথিত হয় নাই। পরন্তু তৎপূর্বে কথিত হইয়াছে,—“অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ”—(৮।১২।১)। স্থারবৈশেষিকসম্প্রদায় এবং আরও অনেক সম্প্রদায় উক্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, নির্বাক-মুক্তি হইলে তখন সেই আত্মার কোন শরীর থাকে না এবং তাহাতে প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ, উভয়ই থাকে না। শরীরাদি না থাকায় তখন তাহাতে সুখদুঃখাদি জন্মিতেই পারে না। জীবন্ত্যুক্তাবস্থায় যে অনির্কটনীর আনন্দ-ভোগ হয়, তাহারই নাম ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু নির্বাক-মুক্তি হইলে তখন সেই আনন্দভোগও সম্ভব নহে। তখন সেই পুরুষের কোনপ্রকার শরীর না থাকায় এবং আর কখনও কোন শরীরোৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় উক্ত মুক্তি বিদেহ-মুক্তি ও বিদেহকৈবল্য নামে কথিত হইয়াছে। উহাই প্রকৃত মুক্তি।

গৌতমমতের ব্যাখ্যাতা মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও “ঈশ্বরানু-মানচিন্তামণি” গ্রন্থে পূর্বোক্ত মত সমর্থন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, সুখ যেমন পুরুষার্থ, তদ্রূপ দুঃখনিবৃত্তিও পুরুষার্থ। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তিকে জীব স্বতঃই প্রার্থনা করে, এ জ্ঞাত ঐ উভয়কে বলা হইয়াছে, ‘স্বতঃ-পুরুষার্থ।’ কিন্তু যদি সুখসম্বন্ধস্থ কেবল দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ না হয়, তাহা হইলে আত্মতে দুঃখানুবিদ্ধ সুখও কেন পুরুষার্থ হইয়াছে? যে সুখের পূর্বে ও পরে নানা দুঃখভোগ অবশ্যস্তাবী, তাহাও ত পুরুষার্থ

বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে বাহা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, তাহাও সুখসম্বন্ধশূন্য হইলেও পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ঐরূপ মুক্তি হইলে তখন কোন সুখভোগ হইবে না, এইরূপ জ্ঞান উক্তরূপ মুক্তি-বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায়, উহা পুরুষার্থ হইতে পারে না—ইহাও বলা যায় না। কারণ, অনেক স্থলে কেবল দুঃখনিবৃত্তির জ্ঞাত কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সর্বত্রই যে সুখলিপ্সাবশতঃই সকলের কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে সর্বত্রই সুখকেই স্বতঃপুরুষার্থ বলা যায়। দুঃখনিবৃত্তিও যে স্বতঃপুরুষার্থ, ইহা কেন স্বীকৃত হইয়াছে? বস্তুতঃ যাহারা প্রকৃত মোক্ষাধিকারী, তাহারা সুখ-মাত্রকেই দুঃখানুবিক্ত ও অনিত্য বুঝিয়া, কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রবিহিত উপায়ের অনুষ্ঠান করেন। অতএব সুখমাত্রলিপ্সু যে সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তি বহুতর দুঃখানুবিক্ত সুখের জন্তও “শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু”^১ অর্থাৎ “তোমার জন্ত আমার মস্তক যায় বাউক, জনকাত্মজা সীতার জন্ত স্বয়ং দশাননও তাঁহার দশ বদন ছিন্ন করিয়াছিলেন,”—এইরূপ বলিয়া পরদারাদিতে প্রবৃত্ত হয় এবং “বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজামাহং। ন তু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥”—এইরূপ শ্লোক পাঠ করিয়া পূর্বোক্তরূপ মুক্তিকে উপহাস করে, তাহারা মুক্তিতে অধিকারীই নহে। কিন্তু যে সমস্ত বিবেকী ব্যক্তি এই সংসারকাস্তারে দুঃখ-হৃদ্বিনই অসংখ্য, ইহাতে

১। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের উক্ত “শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু”, এই বাক্য কোন প্রাচীন শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ। ঐ শ্লোকের দ্বারা পরদারপ্রবৃত্ত কামার্ত পুরুষের প্রিয়তমার প্রতি উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই,—“যুগ্মবৃত্তে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি! শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু। লুপ্তি নুনং জনকাত্মজার্থে দশাননেনাপি দশাননানি॥”

২। এই শ্লোকটিও প্রসিদ্ধ আছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করার উহাও প্রাচীন শ্লোক বুঝা যায়। উক্ত শ্লোকের দ্বারা কোন বৈষ্ণব বলিয়াছিলেন যে, বরং আমি বৃন্দাবনে শৃগাল হইব; কিন্তু আমি বৈশেষিক দর্শনোক্ত মুক্তি কখনও প্রার্থনা করি না। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ঐ স্থলে “পরদারাদিবু অবর্তমানা বরং বৃন্দাবনে রম্যে ইত্যাদি বদন্তো নাত্রাধি-কারিণঃ—” এইরূপ বলিয়া যেন তৎকালীন কোন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি কটাক্ষ হচনা করিয়াছেন।

সুখ-খ্যোত অতি অল্প, ইহা কুপিত সর্পের ফণামণ্ডলের ছায়ার তুল্য, এইরূপ বুদ্ধিয়া একেবারে সুখকেও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই মুক্তিতে অধিকারী।

শ্রায়দর্শনের ভাষ্যকার বাংস্ত্রায়ন বলিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায় মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় অর্থাৎ আত্মাতে নিত্যসুখ চির-বিद्यমানই আছে, মুক্তিকালে তাহার অনুভূতি হয়, ইহা বলেন। কিন্তু প্রমাণভাবে উক্ত মত উপপন্ন হয় না। কারণ, সেই নিত্যসুখের অনুভূতিও নিত্য পদার্থ হইলে সকল জীবাত্মাতেই সর্বদা সেই নিত্যসুখের অনুভূতি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। আর সেই নিত্যসুখের অনুভূতি যদি অনিত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে কোন কালে তাহার বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। স্মৃতরাং যখন উহার বিনাশ হইবে, তখন আর সেই পুরুষকে মুক্ত বলা যাইবে না। স্মৃতরাং সেই নিত্যসুখের অনুভূতিকে যখন নিত্যও বলা যায় না, অনিত্যও বলা যায় না, তখন উহা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে মুক্ত পুরুষের অবস্থাস্ত বর্ণনায় যে আনন্দ ও সুখ শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার লাক্ষণিক অর্থ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই বুঝিতে হইবে। লোকেও দুঃখনিবৃত্তি অর্থে অনেক স্থলে আনন্দ ও সুখ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাংস্ত্রায়ন পূর্বোক্ত মত খণ্ডনের জন্ত আরও বহু বিচার করিয়া সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের যদি নিত্যসুখ ভোগের কামনা থাকে, তাহা হইলে ত তখন তাঁহাকে মুক্তই বলা যায় না। কারণ, কামনা বন্ধন বলিয়াই কথিত। আর যদি তখন তাঁহার নিত্যসুখ ভোগের কামনা না থাকে, তিনি যদি সর্ববিষয়েই সর্বথা নিষ্কাম হন, ইহা স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে

১। তন্মাদবিকেনঃ স্বখমাত্রলিপ্সবো বহুতরদ্বুঃখানুবিজ্ঞমপি স্বখমুদ্ভিদ্ধ “।শ্রো মদীয় যদি যতি যাদি”তি কৃতা পরমারাদিসু প্রবর্তমানা “বরং বৃন্দাবনে রম্যে”—ইত্যাদি বদন্তো নাত্মাদিকারিণঃ। যে চ বিবেকিনোহস্মিন্ সংসার-কাস্তারে কিয়ন্তি দুঃখহৃদ্দিনানি, কিয়তী বা স্বখখ্যোতিকেতি কুপিতকপি-ফণামণ্ডলচ্ছায়াশ্রতিমিহমিতি মন্ত্যমানাঃ স্বখমপি হাতুমিচ্ছন্তি,—তেহত্মাদিকারিণঃ।—ঈশ্বরানুমান-চিন্তামণি।

তখন তাঁহার নিত্যস্ব স্বস্তোগ না হইলেও তাঁহাকে মুক্ত বলিবে না কেন? তাঁহার বখন আর কখনও পুনর্জন্ম হইবে না, তখন তাঁহার নিত্যস্ব স্বস্তোগ হউক বা না হউক, উভয় পক্ষেই তাঁহার মুক্তি বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না।

কিন্তু শৈব সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ বাৎস্তায়নের কথিত যুক্তি গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তী শৈবাচার্য্য ভাস্করজ্ঞ বাৎস্তায়নের যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য “শ্রায়সার” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্যস্ব-ভোগ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ থাকায় কোনরূপেই উহা অস্বীকার করা যায় না। সেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে যে “আনন্দ” ও “স্ব” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার মুখ্য অর্থের কোনই বাধক নাই। কারণ, মুক্ত পুরুষের বে নিত্যস্ব-থের অনুভব, তাহাও নিত্য। সমস্ত জীবাত্মাতেই নিত্যস্ব-থের অনুভব চিরবিद्यমানই আছে। কিন্তু যেমন আমরাদিগের চক্ষুরিল্লিঃ এবং দৃশ্য বস্তুাদি পদার্থ বিद्यমান থাকিলেও ঐ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে সেখানে সেই দৃশ্য পদার্থের সহিত চক্ষুরিল্লিঃের সংযোগসম্বন্ধ জন্মে না, কিন্তু সেই ব্যবধান অপস্থত হইলে তখন ঐ উভয়ের সংযোগসম্বন্ধ জন্মে, তদ্রূপ আত্মাতে নিত্যস্ব ও তাহার নিত্য অনুভব বিद्यমান থাকিলেও সংসারাবস্থায় পাপাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ সেই নিত্যস্ব ও তাহার অনুভবের বিষয়-বিষয়িভাব-সম্বন্ধ জন্মে না। কিন্তু মুক্তিকালে সমস্ত প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হওয়ায় তখন ঐ উভয়ের বিষয়-বিষয়িভাব-সম্বন্ধ জন্মে এবং সেই সম্বন্ধ উৎপন্ন ভাব পদার্থ হইলেও উহার বিনাশের কোন কারণ না থাকায় কখনও উহার বিনাশ হয় না। সুতরাং সেই নিত্যসংবেদ্য নিত্যস্ব-থবিশিষ্ট যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, তাহাই মুক্তি।

ভাস্করজ্ঞ প্রথমে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিগাত্রই মুক্তি, এই মতের উল্লেখ করিয়া, পরে তাঁহার উক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। টীকাকার জয়সিংহ হুরি সেখানে ভাস্করজ্ঞের পূর্বোক্ত মতকে কণাদসম্প্রদায়ের মত

১। ভাস্করজ্ঞ কৃতকদেহপি স্বস্বদেহদনসম্বন্ধস্ত বিনাশকারণাভাবান্নিত্যং স্থিতং। তৎ সিদ্ধ-মতেন্নিত্যদংবেদ্যং।

অনেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্ত মোক্ষ ইতি।—“শ্রায়সার”ের ৭ম

বলিয়া, শেষোক্ত মতকে নৈয়ায়িকনায়কগণের প্রকৃষ্ট মত বলিয়াছেন। “শ্রায়সারে”র মুখ্যটীকাকার ভূষণ বা শ্রায়ভূষণ যে, ভাস্করস্বরের সমর্থিত উক্ত মতকে স্পষ্টরূপে গোতমের মত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা ত্রীশস্রদায়ের বেদান্তাচার্য্য বেকটনাথের উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, তিনি তাঁহার “শ্রায়পরিণুক্তি” গ্রন্থে গোতমের মতে মুক্তিকালে নিত্যস্বত্বের অনুভূতি থাকে, ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, এই জন্তই ভূষণের মতে মুক্তিকালে নিত্যস্বত্বের অনুভূতি সমর্থিত হইয়াছে।

পরন্তু “সংক্ষেপশঙ্করজয়” গ্রন্থে মহামনীষী মাধবাচার্য্য্য দুইটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরিভ্রমণকালে কোন স্থানে কোন নৈয়ায়িক গর্কের সহিত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি তুমি সর্বজ্ঞ হও, তাহা হইলে কণাদের সম্মত মুক্তি হইতে গোতমের সম্মত মুক্তির বিশেষ কি, তাহা বল, নচেৎ সর্বজ্ঞতা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর। তৎক্ষণে শঙ্করাচার্য্য্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, কণাদের মতে আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে আকাশের শ্রায় স্থিতিই মুক্তি। আর তোমার সম্মত গোতমমতে আনন্দানুভূতির সহিত ঐরূপ অবস্থাই মুক্তি। মাধবাচার্য্যের ঐরূপ বর্ণনা অমূলক হইতে পারে না। “সর্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ”

১। অতএব ই ভূষণমতে নিত্যস্বত্বসংবেদনসিদ্ধিরপৰ্য্যন্ত সাধিতা।—“শ্রায়পরিণুক্তি;” কাশী চৌধাৰ্য্য সংস্কৃত দিৱিজ, ১৭ পৃষ্ঠা।

২। তত্রাপি নৈয়ায়িক আন্তর্গর্ভঃ কণাদপক্ষাচ্চরণাক্ষ-পক্ষে। মুক্তেৰ্বিশেষঃ বদ সৰ্ববিশেষঃ, নোচেৎ প্রতিজ্ঞা ত্যজ সৰ্ববিশেষে ॥

৩। অত্যন্তনাশে গুণসংগত্যা স্থিতিরভাবঃ-কণভক্ষপক্ষে। মুক্তিস্বদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দ-সংবিৎ-সহিতা বিমুক্তিঃ ॥—“সংক্ষেপশঙ্করজয়,” ১৬ অঃ, ৬৮।৬৯।

কণাদ নামের অর্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্লোকে বৈশেষিকদর্শনকার কণাদকে মাধবাচার্য্য্য কণভক্ষ বলিয়াছেন এবং গোতমের অক্ষপাদ নামের অর্থ গ্রহণ করিয়া গোতমকে “চরণাক্ষ” বলিয়াছেন। “কণভক্ষপক্ষে” অর্থাৎ কণাদমতে। “চরণাক্ষপক্ষে” অর্থাৎ অক্ষপাদমতে। উক্ত শ্লোকে “স্বদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে” এই স্থলে “স্বদীয়ে” শব্দের প্রয়োগ দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তা সেই নৈয়ায়িকের সম্মত গোতমমতই যে শঙ্করাচার্য্য্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে মুক্তি বিষয়ে বাৎশ্রায়নের সম্মত গোতমমত বলেন নাই, ইহাও মাধবাচার্য্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন—ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। “স্বদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে” অর্থাৎ তোমার সম্মত গোতমমতে।

গ্রন্থেও মুক্তি বিষয়ে গৌতম ও কণাদের উক্তরূপ মতভেদই কথিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব হইতেই যে শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ মুক্তি বিষয়ে গৌতমের উক্তরূপ মতই সমর্থন করিতেন, তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ে উক্তরূপ মতই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের কোন নৈয়ায়িকই শঙ্করাচার্য্যকে ঐরূপ প্রমাণ করায় তিনি তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক মত বলিয়াই নিজের সর্বজ্ঞতার পরীক্ষা দিয়াছিলেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

মুক্তির উপায়

শ্রুতি বলিয়াছেন,—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বা বিজ্ঞানেনেনঃ সর্বং বিদিতং।”—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২।

অর্থাৎ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য—নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীর প্রণোত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অরে মৈত্রেয়ি! মুক্তিলাভে ইচ্ছা হইলে আত্মা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ আত্মার দর্শন কর্তব্য। সেই আত্মদর্শনের জন্ত প্রথমে আত্মা শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য, অর্থাৎ যথাক্রমে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যানাদি) কর্তব্য। সুতরাং আত্মার দর্শনরূপ তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায় বা সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সেই আত্মদর্শনের উপায় হওয়ায় পরস্পরায় ঐ সমস্তও মুক্তির উপায়।

বস্তুতঃ জীব তাহার নিজের আত্মবিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানবশতঃই অনাদি কাল হইতে নানাবিধ শরীরপরিগ্রহরূপ জন্ম লাভ করিয়া, নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছে। নিজের দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারই জীবের সংসারের মূল নিদান। সুতরাং সেই অহঙ্কারের নিবৃত্তি ব্যতীত তাহার সংসারের নিবৃত্তি হইতেই পারে না। রোগের নিদানের নিবৃত্তি না হইলে রোগের নিবৃত্তি সম্ভবই নহে। কিন্তু কিরূপে সেই অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইবে? তাই শ্রায়দর্শনে গৌতম বলিয়াছেন,—“দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তিঃ”—(৪।২।১)। পরেও বলিয়াছেন,—“মিথ্যোপলব্ধিবিনাশতত্ত্বজ্ঞানাৎ”—(৪।২।৩৫)।

যে বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান, সেই বিষয়ে সেই ভ্রমজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন নিজ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রমজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান যে নিজ দেহাদিতে অনাত্মবুদ্ধি, তাহাই সেখানে তত্ত্বজ্ঞান। ঐ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে, তদ্বারা সেই পূর্বজাত মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বোগশাস্ত্রোক্ত উপায়ে চরম সমাধিরূপ নিদিধ্যাসনের পরে মুমুক্শু বোগীর যখন নিজের আত্মার প্রকৃত স্বরূপের অলৌকিক দর্শনরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তখন উহার পরেই তাঁহার নিজের আত্মাবিষয়ে সর্বপ্রকার সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তখনই তাঁহার অপরা মুক্তি জন্মে। কিন্তু তখনও তাঁহার সেই শরীরনিষ্পাদক প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত না হওয়ার তিনি জীবিত থাকেন। তাই তাঁহাকে জীবমুক্ত বলে। কিন্তু তাঁহার সেই প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে সেই দেহের বিনাশ হওয়ায় তখন তাঁহার নির্বাণ-মুক্তি হয়। সেই নির্বাণ-মুক্তিই পরা মুক্তি। মহর্ষি গোতম সেই পরা মুক্তির ক্রম প্রদর্শনের জন্য দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন,—

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুক্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপ-বর্গঃ। —১।১২।

উক্ত সূত্রে শুভাশুভ কর্মজন্ত ধর্ম ও অধর্মই ‘প্রবৃত্তি’ শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। সেই প্রবৃত্তির ফলভোগের জন্তই জীবের নানাবিধ জন্ম পরিগ্রহ হইয়া থাকে। জন্ম হইলেই নানা দুঃখ অবশ্যস্তাবী। সূত্রাতঃ দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবের ধর্ম ও অধর্ম। সেই প্রবৃত্তির কারণ রাগ ও দ্বেষরূপ দোষ। কারণ, বিষয়বিশেষে আসক্তিরূপ রাগ এবং দ্বেষের বশবর্ত্তা হইয়াই মানব নানাবিধ শুভ ও অশুভ কর্ম করিয়া, তজ্জন্ত ধর্ম ও অধর্ম সঞ্চয় করে। সেই রাগ ও দ্বেষরূপ দোষের কারণ—তাঁহার নানাবিধ মিথ্যাজ্ঞান বা মোহ। সূত্রাতঃ সেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তন্মূলক সমস্ত দোষের নিঃশি হইয়া যায়। সেই দোষের নিবৃত্তি হইলে তন্মূলক ধর্মাদ্বৈতের আর উৎপত্তি হইতে পারে না। উহাই ধর্মাদ্বৈতরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সমস্ত ধর্মাদ্বৈতই দৃষ্ট বীজের হায় অকর্মণ্য হয়। সূত্রাতঃ সেই ভ্রমজ্ঞানী পুরুষের আর কখনও জন্ম হইতে পারে না। তাঁহার সেই বর্ত্তমান জন্মের অবসান হইলেই চিরকালের জন্ত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি:

হয়, উহাই তাঁহার পরা মুক্তি। উক্ত হস্তের দ্বারা গৌতম ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ গৌতমের মতানুসারে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ স্বীকাণ করিয়া, মুক্তিলাভে জীবাশ্মার অর্থাৎ মুমুকুর নিজের আশ্মার দর্শনের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও পরমাশ্মা মহেশ্বর শিবের দর্শনকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ চরম কারণ বলিয়াছেন। তাই শৈবাচার্য্য ভাসরবজ্জ “শ্রায়সারে” বলিয়াছেন,—“তস্মাৎ শিবদর্শনাদেব মোক্ষ ইতি।”

কিন্তু বাৎশ্রায়ন ও তন্মতানুবর্তী নৈয়ায়িকসম্প্রদায় এবং বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতে মুমুকুর নিজের আশ্মার দর্শনই তাঁহার সংসারনিদান মিথ্যা-জ্ঞানের নিবৃত্তি করায় উহাই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। উক্ত মতে মুমুকুর নিজের আশ্মা হইতে পরমাশ্মা যখন স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ, তখন পরমাশ্মার দর্শনই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না। কারণ, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুমুকুর নিজের আশ্মাবিষয়ক মিথ্যা-জ্ঞান নিবৃত্ত করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন মুমুকুর নিজের আশ্মাদর্শন উৎপন্ন করিয়া তদ্বারাই মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। ঈশ্বর-দর্শন ব্যতীত আর কোন উপায়েই মুমুকুর নিজের আশ্মা-দর্শন জন্মে না, ঈশ্বরের দর্শন হইলে তখন তাঁহার অনুগ্রহেই মুমুকুর নিজের আশ্মাদর্শনরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। সুতরাং তখনই নিজের আশ্মাবিষয়ে সমস্ত মিথ্যা-জ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় মুক্তি জন্মে—এই তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—“তমেব বিদিত্বাভিমুত্বামেতি নাশ্রঃ পশ্বা বিমুত্তেহয়নায় ॥”—(ষ্ঠেতাস্থতর উপ, ৬৮)। এবং উক্ত মতে ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—“মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিমুত্তে ॥”—(গীতা, ৮।১৬)। ঈশ্বরদর্শনই মুক্তি লাভে একমাত্র পন্থা, ইহা বলিলে উক্ত যে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণেরই চরম কারণ, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, যাহাকে পন্থা বলা হয়, তাহা ইষ্ট লাভে সাক্ষাৎ কারণ হয় না।

বস্তুতঃ মুমুকু সাধক সেই মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিজের আশ্মাতে তাঁহার দর্শন পাইলেই তখনই তাঁহার অনুগ্রহেই তাহার মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ আশ্মাদর্শনরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। তাই মুমুকু বলেন,—“তং হ দেবমাশ্ম-বুদ্ধি-প্রকাশং মুমুকুর্দে শরণমহং প্রপণ্ডে ॥”—(ষ্ঠেতাস্থতর উপ)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে

দেবীমাহাত্ম্যের শেষে স্পষ্টরূপে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্তই বর্ণিত হইয়াছে যে ১ দেবী, মুমুক্শু সাধক সমাধিনামক বৈশ্যের প্রার্থনানুসারে যে জ্ঞান জন্মিলে তাঁহার নিজের দেহাদিতে অহংবুদ্ধি এবং গৃহাদিতে মদীয়ত্ববুদ্ধিরূপ মোহের নিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞান তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানরূপ বর প্রদান করিতেই দেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—“তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।” ফলকথা, যাহারা জীবের কৰ্ম্মফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা সকলেই মুক্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহজ্ঞত বলিয়াছেন। তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করও যখন ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন, ২ তখন দ্বৈতবাদী ঈশ্বরপরায়ণ কণাদ ও গোতমর যে উহাই মত; এ বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? ঈশ্বর যে জীবের সর্বকৰ্ম্মের কারয়িতা ও ফলদাতা, তাহার অনুগ্রহ ব্যতীত যে জীবের কোনই কৰ্ম্ম সফল হয় না, ইহা গোতমও পরে বলিয়াছেন। সেই স্বত্রের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত যে, জীবের মুক্তি হইতে পারে না, ইহাও স্থচিত হইয়াছে। ঈশ্বর প্রসঙ্গে সে কথা পরে বলিব। ঈশ্বরের কথা অনেক বার বলিতে হইবে। “আদ্যন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।”

১। মোহাপ বৈশ্যন্ততো জ্ঞানং বস্ত্র নির্ঝিন্নমানদঃ ।

মমোত্যহমিতিপ্রাক্তঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকঃ ॥

বৈশ্যবৰ্ণ্য ! জ্ঞা যন্ত বরোহমন্তোহভিবাঙ্কিতঃ ।

তং প্রযচ্ছামি সংসন্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥—মার্কঃ ওয় পূঃ ৭, ২০ অঃ ।

২। তদনুগ্রহহেতুকেমৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষদিক্ৰির্ভবিষ্যতি, কৃতঃ ? তৎপ্রত্যয়ঃ ।—

শারীরভাষ্য, — ২।৩।১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবাত্মার শ্রবণ ও মননের

স্বরূপ ও প্রয়োজন

প্রশ্ন হয় যে, আত্মার শ্রবণ ও মনন কি, আর উহার প্রয়োজনই বা কি ? উহার দ্বারা ত কাহারও আত্মদর্শন জন্মে না ।

এতদ্বত্তরে বলব্য এই যে, প্রথমে আত্মার শ্রবণ ও মনন না করিলে ক্রতিবিহিত নিদিধ্যাসন করাই যায় না । কারণ, যেক্রমে আত্মার শ্রবণ হইয়াছে, সেইক্রমেই তাহার মনন করিয়া, পরে সেইক্রমেই তাহার ধ্যানাদি করিতে হইবে, ইহাই পূর্বোক্ত ক্রতির দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাই যুক্তিসিদ্ধ । কারণ, আত্মার তত্ত্ব কি, ইহা প্রথমে শাস্ত্র হইতে শ্রবণ না করিলে কিরূপে আত্মার ধ্যানাদি করিবে ? নিজদেহে যে আত্মবুদ্ধি আছে, তদনুসারে দেহই আত্মা, এইক্রমে আত্মার ধ্যানাদি করিলে ত প্রকৃত আত্মদর্শন হইতে পারে না । সুতরাং আত্মতত্ত্বপ্রকাশক বেদাদি শাস্ত্র হইতেই প্রথমে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে । শ্রবণ বলিতে এখানে কর্ণ দ্বারা কোন শব্দ শ্রবণ নহে । বেদাদি শব্দপ্রমাণজ্ঞাত আত্মার স্বরূপবিষয়ক যথার্থ শাব্দ বোধই আত্মার শ্রবণ । তাহাও প্রথমে শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ সদগুরুর উপদেশানুসারেই করিতে হইবে । নচেৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ভ্রম হইতে পারে ।

যেমন পূর্বকালে মনের আত্মতত্ত্ববাদী কোন ভ্রান্ত নাস্তিক, ক্রতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও মনই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন । এইরূপ দেহাত্মবাদী কোন নাস্তিক, ক্রতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও দেহই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন । ঐরূপ ইন্দ্রিয়াত্মবাদী কোন নাস্তিক, ক্রতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও ইন্দ্রিয়বর্গই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন । ঐরূপ কোন বৌদ্ধ, ক্রতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন । ঐরূপ অপর কোন বৌদ্ধ, ক্রতির কোন

বাক্যবিশেষের দ্বারাও শূন্যই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। “বেদান্তসারে” সদানন্দ ষোগীন্দ্রও সেই সমস্ত শ্রুতি বাক্যের উল্লেখ পূর্বক এই সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু উহার কোন মতই শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে। শ্রুতিতে পূর্বশব্দরূপেও অনেক মতের প্রকাশ হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে নিম্নাধিকারীকে ক্রমশঃ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে অন্তরূপ উপদেশও করা হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে সেই সমস্ত অবলম্বন করিয়াই অনেক নাস্তিক, নিজ বুদ্ধিমূলক কুতর্কের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মত সমর্থন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত নাস্তিক মতের বীজও শ্রুতিতেই আছে। কিন্তু শ্রুতির বাহ্য সিদ্ধান্ত, তাহা শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া বৃষ্টিতে হইবে। বেদাদি কোন শাস্ত্র দ্বারা সমস্ত অধিকারীরই প্রথমে সিদ্ধান্ত বৃষ্টিতে হইবে যে, আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই; আত্মার কোন প্রকার বিকার নাই, আত্মা দেহাদিভিন্ন নিত্য। কারণ, শ্রুতি সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—“অবিনাশী বা অরেহয়মাআত্মহচ্ছিত্তিধর্মা”, (বৃহদারণ্যক্য, ৪।৪।১৭), “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিৎ”, ‘অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণঃ’—(কঠ, ২।১।১৮)। উক্ত শ্রুতি অনুসারে শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,—

“ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হত্বতে হন্তমানে শরীরে” ॥

—গীতা, ২।২০।

আবার বলিয়াছেন,—

“অচ্ছেত্তোহয়মদাহোহয়মক্লেত্তোহৈশোব্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥”—গীতা, ২।২৪।

আত্মার কখনও উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই; আত্মা শাস্বত নিত্য। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য; আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা অচল অর্থাৎ গতি-শূন্য এবং সনাতন। আত্মা—“ন হত্বতে হন্তমানে শরীরে”—অর্থাৎ শরীর, বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না,—এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা মন নহে, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য। কারণ, দেহাদি অচ্ছেদ্য অদাহ্য নহে, সর্বব্যাপী নহে—গতিহীন নহে। উক্তরূপে বিচার করিয়া

শাস্ত্র দ্বারা আত্মা দেহাদি-ভিন্ন ও নিত্য, এইরূপ যে বোধ, তাহা আত্মার শ্রবণ। সৰ্বাগ্রে উহাষ্ট কর্তব্য।

কিন্তু উক্তরূপে আত্মার শ্রবণ করিলেও নিজ শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অবস্থার বিবৃতি হয় না। অসংখ্য মানব আত্মার নিত্যই শ্রবণ করিলেও তাঁহাদিগের পূর্ববৎ নিজশরীরাদিতে আত্মবুদ্ধির উদয় হইতেছে এবং তজ্জন্ম কুসংস্কারের প্রভাবে তাঁহাদিগেরও পূর্ববৎ নানাবিধ সংস্কারাদির উদ্ভব হইতেছে, মৃত্যুভয়ও জন্মিতেছে। সুতরাং শাস্ত্রদ্বারা আত্মা দেহাদিভিন্ন নিত্য, এইরূপ শ্রবণ করিয়া, পরে ঐ শ্রবণরূপজ্ঞানজন্য সংস্কারকে দূর করিবার নিমিত্ত উক্তরূপে আত্মার মনন কর্তব্য। যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের বিবেচন বা অবধারণই আত্মার মনন। অহুমান-প্রমাণকেই যুক্তি বলে। মীমাংসক-সম্মত “অর্থাপত্তি”রূপ যুক্তিও গৌতমের মতে অহুমানবিশেষ। সুতরাং অহুমান-প্রমাণের দ্বারা—আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা মন নহে, আত্মা দেহাদিসমষ্টিরূপও নহে এবং আত্মা নিত্য, এইরূপ যে বোধ, তাহাই আত্মার মনন। পূৰ্ব্বোক্ত শ্রবণের পরে উক্ত তত্ত্বের ধারণা বা ধ্যানই মনন নহে। কারণ, উহা নির্দিধ্যাসনের অন্তর্গত। কিন্তু মননের পরেই নির্দিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। সুতরাং তৎপূর্বে অহুমান-প্রমাণরূপ তর্কের দ্বারা পূর্বোক্তরূপে আত্মার মনন কর্তব্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের “মন্তব্যঃ”—এই বাক্যের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন,—“পশ্চাত্তত্ত্বব্যস্তকৃতঃ”—অর্থাৎ শ্রবণের পরে তর্কের দ্বারা আত্মা মন্তব্য। কঠোপনিষদে যে আত্মাকে “অতর্ক্য” বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে—“নৈবা তর্কেণ মতিরাপনোয়া,”- তাহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্কর বলিয়াছেন যে—নিজ বুদ্ধিমূলক উহরূপ কেবল তর্কের দ্বারা আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যায় না। কারণ, কুতর্কের কুত্রাপি প্রতিষ্ঠা নাই। বেদান্ত-দর্শনে “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং” ইত্যাদি (২।১।২১) সূত্রে বাদরায়ণও শাস্ত্রনিরপেক্ষ নিজ বুদ্ধিমূলক কুতর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন।

১। অতর্ক্যমতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যাহ্নাছেন কেবলেন তর্কেণ। ন হি কুতর্কশ্চ প্রতিষ্ঠা কচিদ্ বিদ্যতে।
“নৈবা তর্কেণ” স্ববুদ্ধ্যাহ্নাহ্নাত্রেণ। কঠ। ১ অঃ ২ ব্রহ্মী, ৮।৯ শঙ্করভাষ্য।

বস্তুতঃ শাস্ত্রে অনুমান-প্রমাণও “তর্ক” নামে কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত-
রূপে আত্মার মননের জ্ঞাত্ৰী অনুমান-প্রমাণরূপ তর্ক এবং তাহার সহকারী
অগ্ররূপ তর্কও অবশ্য গ্রাহ্য। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় হ্রের ভাষ্যে আচার্য্য
শঙ্করও ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ১ বেদান্ত-বাক্যের অর্থজ্ঞানের দৃঢ়তার জ্ঞাত্ৰী
বেদান্তবাক্যের অবিরোধী অনুমান-প্রমাণও গ্রাহ্য। কারণ, ঐতিহ্য তর্ককে
সহায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের এই কথায় অনুমান-
প্রমাণরূপ তর্ক দ্বারাই যে, আত্মার মনন কর্তব্য, ইহা তাঁহারও সম্মত বুঝা
যায়। তাই বৃহদারণ্যক—ভাষ্যে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে আচার্য্য
শঙ্করও পরে—“ত্ৰায়াচ্চ”—ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা আত্মার নিত্যত্বসাধক “ত্ৰায়”
অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহর্ষি গৌতমের ত্ৰায়-দর্শন অধ্যাত্ম অংশে মননশাস্ত্র। তাই তিনি ত্ৰায়-
দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে মুমুকুর পক্ষে ঐতিহ্য বিহিত পূর্বোক্তরূপ আত্মমননের
জ্ঞাত্ৰী অনুমান-প্রমাণরূপ বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আত্মা ইন্দ্রিয় নহে,
আত্মা দেহ নহে, আত্মা মন নহে, স্মরণ্য আত্মা ঐ দেহাদিসমষ্টিরূপও নহে
এবং আত্মা অনাদি, নিত্য, ইহা তিনি বহু যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া
গিয়াছেন। এখন তাঁহার কথিত ও স্মৃতিত সেই সমস্ত যুক্তিও বখাসম্ভব
বলিতেছি।

ইন্দ্রিয় আত্মা নহে

মনে হয়, সুপ্রাচীনকালে নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে ইন্দ্রিয়াত্মবাদেরই
প্রকাশ হইয়াছিল। তাই মহর্ষি গৌতম প্রথমে আত্ম-পরীক্ষায় উক্ত মতের
খণ্ডন করিতে প্রথম হ্রত্ব বলিয়াছেন—

“দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ” । ১।১।১

অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা এবং স্পর্শিন্দ্রিয় দ্বারা একই ব্যক্তির এক পদার্থের
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়ায় আত্মা ইন্দ্রিয় নহে। তাৎপর্য্য এই যে, আমি কোন

১। সংগ্রহ তু বেদান্তবাক্যে জগতো জন্মাদিকারণবাস্তব তদর্থগ্রহণ-দার্ঢ়্যানুমানমপি
বেদান্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণ্য ভবন নির্বাহতে। ঐশ্বর্য্য চ সহায়ত্বেন তর্কত্ৰায়াভ্যুপেক্ষ্যতঃ। তথাহি
“স্রোতবো মদ্যবা” ইতি ঐতিহ্যঃ “পশুতো মেধাবী গাভারানবোপসংপ্তেভবনবোহাচার্য্যবান্
পুশ্বো বেদ” (ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২) ইতি চ পুশ্ববুদ্ধির্নাহাযামাত্মনো দর্শয়তি। শারীরকভ ৩।

দ্রব্যকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিয়া স্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার স্বাচ-প্রত্যক্ষ করিলে পরে আমার এইরূপ জ্ঞান জন্মে যে, যে আমি চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা এই দ্রব্যকে দেখিয়াছি, সেই আমিই—স্বগিন্দ্রিয় দ্বারা এই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্তস্থলে আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় ও স্বগিন্দ্রিয় যথাক্রমে পূর্বজাত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্তা নহে; কিন্তু তন্নিহ্ন কোন একটি পদার্থই ঐ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্তা। সুতরাং সেই পদার্থট আত্মা। কারণ, যে পদার্থ জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয়, তাহাই আত্মা।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মহর্ষি গৌতম জ্ঞানের আশ্রয়কেই আত্মা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মগত জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য। ঐ চৈতন্য থাকা কালেই জীবাত্মা চেতন। জীবাত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ নহে। কিন্তু জ্ঞানচৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাতা। “জ্ঞাতৃ” শব্দের দ্বারাও জ্ঞানের আশ্রয়ই বুঝা যায়। জ্ঞানের আশ্রয়ই জ্ঞানের কর্তৃত্ব। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিতে হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই দর্শন-জ্ঞানের কর্তা এবং স্বগিন্দ্রিয়কেই স্বাচ-প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের কর্তা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে পরে এক আমিই যে, পূর্বোক্ত উভয় জ্ঞানের কর্তা, এইরূপ বোধ হইতে পারে না। ঐরূপ বোধ যে, আমাদেরিগের ভ্রম, এ বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই।

পরন্তু আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করিতেছি, স্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বাচ-প্রত্যক্ষ করিতেছি, শ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে আমাদেরিগের যে, ঐ সমস্ত জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তদ্বারাও বুঝা যায় যে, আমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। কারণ, করণ হইতে কর্তা ভিন্ন পদার্থ। নচেৎ চক্ষু আমি দেখিতেছি, কর্ণ আমি শুনিতেছি, এইরূপে আমার দর্শনাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না কেন? বিবেচনা বশতঃ কখনও চক্ষু দেখিতেছে, কর্ণ শুনিতেছে, এইরূপ বাক্য-প্রয়োগ হইলেও ঐরূপে কাহাও দর্শনাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না। আমি কাণ, আমি অন্ধ, আমি বধির, এইরূপে যে বোধ হয়, তদ্বারাও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই যে আত্মা, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, আমার চক্ষু কাণ বা অন্ধ আমার কর্ণ বধির, এইরূপও বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং বাহ্যর চক্ষু কাণ বা অন্ধ, এইরূপ অর্থেই

সেই ব্যক্তিতে “কাণ” বা “শ্রুত” শব্দের প্রয়োগ এবং আমি কাণ বা শ্রুত, এইরূপ বোধ হয়, ইহা বলা যায়। আর কাহারও নিজের আত্মাতেই কাণাদির ভ্রমাত্মক বোধ হইলেও তদ্বারা ইন্দ্রিয়ই আত্মা, ইহা প্রতিপন্ন হয় না।

কোন বহিরিন্দ্রিয়কেই যে, আত্মা বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি গৌতম পরে মূল যুক্তি বলিয়াছেন যে, ভ্রাণাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-নিয়ম আছে। অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে গন্ধই ভ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং রসই রসেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং রূপই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় এবং স্পর্শই ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় এবং শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়। পূর্বোক্ত গন্ধাদি সমস্ত বিষয়ই কোন এক বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় নহে। সুতরাং ভ্রাণাদি সর্কেন্দ্রিয় অথবা উহার মধ্যে যে কোন ইন্দ্রিয় সর্কবিষয়ের জ্ঞাতা আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যে আমি গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, সেই আমিই যে, রূপ-রস, স্পর্শ ও শব্দ গ্রহণ করিতেছি, ইহা আমি মনের দ্বারাই বুঝিতেছি। সকলেরই উক্তরূপে ঐ সমস্ত জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হওয়ায় তদ্বারা কোন একই পদার্থ যে ঐ গন্ধাদি সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞাতা, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং আত্মা যে ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্নপদার্থ, ইহাও প্রতিপন্ন হয়। কারণ ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়ই সর্কবিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না।

গৌতম পরে আরও বলিয়াছেন,—

সবাদৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাং। ৩।১।৭।

অর্থাৎ বামচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট পদার্থের দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারাও প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব আত্মা ইন্দ্রিয় নহে। তাৎপর্য্য এই যে, কোন ব্যক্তি যদি দক্ষিণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাম চক্ষুর দ্বারা কাহাকে দর্শন করে, তাহা হইলে পরে তাহার ঐ বাম চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া গেলেও দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারাও তাহাকে “সোহং”—অর্থাৎ সেই পূর্বদৃষ্ট ব্যক্তি এই,—এইরূপে দর্শন করে। ঐরূপ প্রত্যক্ষকে “প্রত্যভিজ্ঞা” বলে। কিন্তু উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির অন্নয়ন ব্যতীত ঐরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে সংস্কার ব্যতীতও তাহার অন্নয়ন হইতে পারে না। পূর্বে কখনও সেই ব্যক্তির দর্শনরূপ অনুভব না জন্মিলেও তদ্বিষয়ে সংস্কার জন্মিতে পারে না। কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানব কর্ত্তা আত্মা বলিতে হয় তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে সেই

বাম চক্ষুই তাহার সেই ব্যক্তির প্রথম দর্শনের কর্তা আত্মা, ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং তাহার সেই বাম চক্ষুতেই সেই দর্শনরূপ অমুভব জ্ঞান সংস্কার জন্মিয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত স্থলে তাহার সেই বাম চক্ষুই তাহাকে পূর্বজাত সংস্কারবশতঃ স্মরণ করিতে পারে, দক্ষিণ চক্ষু তাহা পারে না,—ইহাও স্বীকার্য। কিন্তু যখন তাহার সেই বাম চক্ষু বিনষ্ট হইয়া গেলেও সেই ব্যক্তি দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারাও সেই পূর্বদৃষ্ট ব্যক্তিকে “সৌহরৎ”—এইরূপে প্রত্যক্ষ করে, তখন তাহার সেই বাম চক্ষু পূর্বে সেই ব্যক্তির দ্রষ্টা নহে, সুতরাং স্মৃতিও নহে, ইহা স্বীকার্য। সুতরাং আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে, ইহাও স্বীকার্য।

যদি বলা যায় যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় বস্তুতঃ একই। একই চক্ষুরিন্দ্রিয় বাম ও দক্ষিণ চক্ষুগোলাকে অবস্থিত থাকে। সুতরাং কহারও বাম চক্ষুর বিনাশ হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়না। গ্রায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভেদ স্বীকার করিলেও বার্তিককার উদ্যোতকর প্রভৃতি উহা অস্বীকার করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় এক, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা গৌতমের স্বত্র দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়, যে ব্যক্তি একেবারে অন্ধ হইয়া যায়, তাহার পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয় আত্মা হইলে উহাই দ্রষ্টা বা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের কর্তা বলিতে হইবে। কিন্তু দ্রষ্টা বিনষ্ট হইলে তাহারই দৃষ্টবস্তু আর কেহই স্মরণ করিতে পাবে না। অতএব সেই ব্যক্তির অগ্র কোন ইন্দ্রিয়ই যে তখন তাহার পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ করে, ইহাও বলা যায় না। এইরূপ অগ্র কোন ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও পরে তাহার পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। কিন্তু কহারও কোন ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গেলেও সেই ব্যক্তি যে, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করে, ইহা নির্বিবাদ সত্য। যিনি বৃদ্ধকালে অন্ধ হইয়াছেন, তিনিও তাহার পূর্বদৃষ্ট কত ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কত বার্তা বলিতেছেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার ঐ স্মরণের কর্তা কে? তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই দ্রষ্টা বলিলে, তাহাকেই ত সেখানে স্মরণের কর্তা বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব দর্শনাদি

জ্ঞান ও তজ্জন্তু সংস্কারবশতঃ স্রবণের কর্তা যে ইন্দ্রিয় নহে, কিন্তু উহা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য।

মহর্ষি গৌতম উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে—পরে আরও বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারাৎ ত্য ১২।

তাৎপর্য্য এই যে, কোন অন্নরসবিশিষ্ট ফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ হইলে তখন কাহারও রসনেন্দ্রিয়ের বিকার জন্মে অর্থাৎ জিহ্বায় জলের আবির্ভাব হয়। কেন ঐরূপ হয়? উক্ত স্থলে কেন তাহার জিহ্বা জলার্জ হয়? ইহা বিচার করিলে বুঝা যায় যে, তখন তাহার সেই পূর্বানুভূত অন্নরসের স্রবণ হওয়ায় তজ্জাতীয় রসাস্বাদে অভিলাষরূপ লোভ জন্মে। নচেৎ তাহার ঐরূপ হইতে পারে না। কারণ, যাহার তখন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ জন্মে না, তাহার সেই ফল দেখিগেও ঐরূপ রসনেন্দ্রিয়ের বিকার হয় না, ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু যাহার সেই ফলের রসাস্বাদে লোভ জন্মে, তাহার পূর্বানুভূত তজ্জাতীয় রসের স্রবণ আবশ্যক। নচেৎ তাহার তদ্বিষয়ে লোভ জন্মিতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে সেই অন্নরসের স্রবণকর্তা কে? ইহা বিচার করিয়া বুঝা আবশ্যক। সেই ব্যক্তির চক্ষু-রিন্দ্রিয় অথবা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই সেখানে সেই অন্নরসের স্রবণ করে, ইহা বলা যায় না, কারণ ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় কখনও অন্নরসের অনুভব করে নাই। অন্নরস চক্ষু বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই নহে। সেই ব্যক্তির রসনেন্দ্রিয়ই উক্ত স্থলে পূর্বানুভূত অন্নরসের স্রবণ করিয়া তজ্জাতীয় রসাস্বাদে অভিলাষী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির রসনেন্দ্রিয় সেই ফলের রূপ দর্শনও করে নাই—গন্ধ গ্রহণও করে নাই, রূপ বা গন্ধ তাহার গ্রাহ্য বিষয়ই নহে। কিন্তু যে অন্নফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ করে, তাহারই সেখানে পূর্বানুভূত অন্নরসের স্রবণ হওয়ায় রসনেন্দ্রিয়ের পূর্বোক্তরূপ বিকার হইতে পারে এবং কাহারও তাহা হইয়া থাকে। অস্ত্রের ঐরূপ হয় না। অতএব প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত স্থলে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই সেই অন্নফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্বানুভূত অন্নরসের স্রবণ করিয়া তজ্জাতীয় রসাস্বাদে অভিলাষী হয়। সেই পদার্থই আত্মা।

কেহ বদি বলেন, যে, স্মরণীয় বিষয়েই স্মৃতি জন্মে। আত্মা স্মরণীয় বিষয় নহে। স্মৃতরাং তাহাতে কোন স্মৃতি জন্মে না। অতএব স্মৃতির দ্বারা অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। মহর্ষি গৌতম পরে নিজেই উক্ত পূর্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—

তদান্ব-গুণত্বসদ্বাদপ্রতিবেদঃ ॥ ৩।১।১৪

তাৎপর্য্য এই যে, স্মৃতি জ্ঞানবিশেষ, স্মৃতরাং উহা গুণ-পদার্থ। কিন্তু উহা আত্মার গুণ হইলেই উহার উপপত্তি হয়,—নচেৎ উহার উপপত্তিই হয় না। অর্থাৎ স্মৃতিরূপ গুণের আশ্রয় কোন দ্রব্য না থাকিলে স্মৃতি জন্মিতেই পারে না। কিন্তু চিরস্থায়ী আত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থকেই স্মৃতির আশ্রয় বা আধার বলা যায় না। স্মরণীয় বিষয়কে স্মৃতির আধার বলা যায় না। কারণ, বিনষ্ট বিষয়েও স্মৃতি জন্মিতেছে। স্মৃতরাং তাহা স্মৃতির আধার কিরূপে হইবে? বাহা বিনষ্ট, বাহা নাই, তাহা কখনই উহার আধার হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ই ভিন্ন ভিন্ন অনুভব জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ও তজ্জাত ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির আধার হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কোন ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস হইলেও তদ্বারা পূর্বানুভূত সেই বিষয়ের স্মৃতি জন্মে। বিনষ্ট ইন্দ্রিয় কখনই সেই স্মৃতির আধার হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।

দেহও আত্মা নহে

নাস্তিকশিরোমণি চার্কাক বলিয়াছেন যে, দেহই স্মৃতির আধার। কারণ দেহই, আত্মা, দেহই স্মরণ করে। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, বাল্য যৌবনাদিভেদে দেহেরও ভেদ হয়। আমার বাল্যকালে যে শরীর ছিল, এই বৃদ্ধকালে সেই শরীর নাই। শরীরের পরিমাণভেদপ্রযুক্তও শরীরের ভেদ স্বীকার্য্য। স্মৃতরাং অত্যাশ্চর্য্য পরমাণুর সংযোগে আমার যে পৃথক শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্য্য! পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রাচ্য-সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে আমি আমার বাল্যকালে দৃষ্ট কত বিষয় এখনও কেন স্মরণ করিতেছি? অনেকে? এই দেহই আমি হইলে বৃদ্ধকালীন এই দেহ কখনই তাহা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, এই দেহ বাল্যকালে না থাকায় ইহা তখন সেই সমস্ত বিষয় দর্শন করে নাই। স্মৃতরাং তজ্জাত কোন সংস্কারও এই দেহে নাই।

যদি বল যে, আমার বাল্যকালীন সেই শরীরে তৎকালে সেই সমস্ত বিষয়ের দর্শন জন্ম যে সমস্ত সংস্কার জগিয়াছিল, তাহাই আমার এই দেহে সংক্রান্ত হওয়ায়, তজ্জন্মই আমার এই ভিন্ন দেহরূপ আত্মাও সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, সংস্কারের গতিক্রিয়া না থাকায় তাহার এক দেহ হইতে অল্প দেহে গতিবিশেষরূপ সংক্রম হইতে পারে না। আর তাহা হইলে মাতার কুক্ষিস্থ শিশুর শরীরেও মাতার শরীরস্থ সংস্কার সংক্রান্ত হয় না কেন? সেই শিশুও পরে তাহার মাতার অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করেনা কেন?

যদি বল, উপাদান-কারণ যে শরীর, তদগত সংস্কারই তাহার কার্যরূপ অল্প শরীরে সংক্রান্ত হয়, ইহাই নিয়ম। মাতার শরীর ত তাহার কুক্ষিস্থ শিশুর শরীরের উপাদান-কারণ নহে। কিন্তু ইহা বলিলে বাল্যকালীন শরীরস্থ সংস্কারও বুদ্ধকালীন শরীরে সংক্রান্ত হইতে পারে না। কারণ বাল্যকালীন সেই শরীর বহু পূর্বে বিনষ্ট হওয়ায় তাহা কখনই বুদ্ধকালীন শরীরের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। যদি বল, বুদ্ধকালীন শরীরে তজ্জাতীয় অল্প সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে, উহাই সংস্কারের সংক্রম। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহাতে তজ্জাতীয় অন্য সংস্কারের উৎপাদক কারণ নাই। বুদ্ধকালীন দেহ সেট সমস্ত বিষয়ের দর্শন না করায় তাহাতে তদ্বিষয়ে অল্প সংস্কারও জন্মিতে পারে না। যে যাহা কখনও অনুভব করে নাই, তাহাতে কোন কারণেই সে বিষয়ে সংস্কার জন্মে না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত সত্য। অতএব স্মৃতি দেহেরই গুণ, দেহই আত্মা, ইহাও কখনও বলা যায় না।

চৈতন্য বা জ্ঞান যে শরীরের বিশেষ গুণ নহে অর্থাৎ শরীরই জ্ঞাতা বা আত্মা নহে, ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

“যাবচ্ছরীরভাবিত্ত্বাক্রপাদীনাং”। (৩।২।৪৭)।

তাৎপর্য্য এই যে, যে কাল পর্য্যন্ত শরীর বিद्यমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহাতে রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলিও বিद्यমান থাকে। অতএব জ্ঞান শরীরের বিশেষ গুণ হইলে উহাও রূপাদির দ্বারা শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত বিद्यমান থাকিবে। কিন্তু তাহা থাকে না। শরীর বিद्यমান থাকিলেও অনেক সময়ে কোন জ্ঞানই থাকে না। সুতরাং জ্ঞান শরীরের বিশেষগুণ নহে।

যদি বল, শরীরের সমস্ত বিশেষগুণই যে, রূপাদির তায় শরীরস্থিত পর্য্যন্ত বিজ্ঞমান থাকিবে, এইরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই, শরীরের সমস্ত বিশেষগুণই ত একজাতীয় নহে। সুতরাং শরীরে অস্থায়ী বিশেষগুণও থাকিতে পারে। তাই মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

“শরীরব্যাপিত্বাং।” অঃঃঃ।

অর্থাৎ জ্ঞান শরীরব্যাপী, শরীরের সর্বংশেই জ্ঞান জন্মে। অতএব জ্ঞান শরীরেরই বিশেষগুণ, ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরের হস্তপদাদি সমস্ত অবয়বেই যখন জ্ঞান জন্মে, তখন সেই সমস্ত অবয়বকেই জ্ঞানের আধার বলিলে প্রত্যেক শরীরেই ভিন্ন ভিন্ন বহু জ্ঞাতা বা আত্মা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আমার হস্তপদাদি ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ আত্মা, ইহা নিশ্চয়। পরন্তু এক আমিই যে, আমার সমস্ত জ্ঞানের আধার আত্মা, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ। কারণ, যে আমি হস্ত দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, সেই আমিই চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতেছি, কর্ণ দ্বারা তোমার কথা শুনিতেছি, ইহাই সর্বানুভবসিদ্ধ। প্রত্যেক শরীরেই যে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কর্তা বহু আত্মা, ইহা সকলেরই অনুভববিরুদ্ধ। পরন্তু প্রত্যেক শরীরেই বহু আত্মা স্বীকার করিলে সর্বকাৰ্য্যে সকলের ঐকমত্য কখনই সম্ভব না হওয়ায় কোন আত্মারই সর্বকাৰ্য্যনির্বাহ হইতে পারে না। পরন্তু অনেক সময়ে সকলের বৈমত্যমূলক বিরোধবশতঃ বহু অনর্থপাতেরও আপত্তি হয়। পরন্তু শরীরের প্রত্যেক অবয়বই জ্ঞাতা হইলে কোন ব্যক্তি যখন আমাদের হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, তখন তাহার সেই হস্তেই ত্র্যচ প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান ও তজ্জ্ঞ সংস্কার জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু পরে কখনও সেই ব্যক্তির সেই হ? ছিন্ন হইলেও সেই ব্যক্তি কিরূপে আমাদের স্মরণ করে? তাহার সেই পূর্বেতৎপন্ন প্রত্যক্ষের কর্তা সেই হস্ত ত তখন তাহার নাই। তাহার সেই হস্তস্থিত সেই সংস্কার যে, তাহার অগ্র কোন অবয়বে সংক্রান্ত হইতে পারে না, ইহার কারণ পূর্বেই বলিধাছি।

পরন্তু শরীরেই চৈতন্য বা জ্ঞান জন্ম, ইহা বলিলে সেই শরীর-নির্বাহক মূল-পরমাণুতেও চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, মূল-পরমাণুতে চৈতন্য না থাকিলে তাহার কার্য্যরূপ শরীরে চৈতন্য জন্মিতে পারে না। কারণ, চৈতন্য

বিশেষগুণ। উপাদানকারণে যে বিশেষগুণ থাকে, তাহাই তাহার কার্যদ্রব্যে তজ্জাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। সুতরাং শরীরের সাক্ষাৎ উপাদান-কারণ হস্তপদাদির দ্বারা তাহার মূল-পরমাণুতেও চৈতন্য স্বীকার্য। কিন্তু সেই মূল-পরমাণুতে কিরূপে চৈতন্য জন্মিবে? তাহার ত কোন কারণই নাই,—চার্ক্ষাক ত নিত্য চৈতন্য মানেন না, তাহার মতে সমস্তই অনিত্য। পরন্তু পরমাণুতে চৈতন্য স্বীকার করিলে ঘটপটাদি সমস্ত জড়বস্তুকেও চৈতন্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নাস্তিকশিরোমণি চার্কাকও তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং শরীরেই চৈতন্য জন্মে, শরীরই জ্ঞাতা আত্মা, ইহা কিছুতেই বলা যায় না।

নাস্তিকশিরোমণি চার্কাক অতীন্দ্রিয় কোন পদার্থ মানেন নাই। সুতরাং তাহার মতে অতীন্দ্রিয় পরমাণু নাই; কিন্তু তিনি ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ভূত স্বীকার করিয়া তাহার অতি সূক্ষ্ম অংশ অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন। সেই সমস্ত সূক্ষ্ম অংশই তাহার মতে পরমাণু। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, যেমন গুড় ও তণ্ডুলে মাদকত্ব না থাকিলেও ঐ উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্যে মাদকত্ব জন্মে, তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম চতুর্ভূতে চৈতন্য না থাকিলেও তাহাদিগের বিলক্ষণ সংযোগে উৎপন্ন শরীরে চৈতন্য জন্মে। কিন্তু চার্কাকের এই কথাও অগ্রাহ। কারণ, গুড় ও তণ্ডুলে একেবারেই মদশক্তি বা মাদকত্ব না থাকিলে ঐ উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন মত্তে কখনই মাদকত্ব জন্মিতে পারে না। তাহা হইলে যে কোন উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্যগাত্রই মত্তের দ্বারা মাদক কেন হয় না? এবং চার্কাকের মতে ঘটপটাদি দ্রব্যেও প্রাণ ও চৈতন্য জন্মে না কেন? ফল কথা, চৈতন্য বা জ্ঞানকে শরীরের গুণ বলিতে হইলে শরীরের হস্তপদাদি প্রত্যেক অবয়ব এবং তাহার মূল পরমাণুতেও চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না; সুতরাং স্মৃতি নামক জ্ঞান যে শরীরের গুণ, ইহাও বলা যায় না। পরন্তু নবজাত শিশুর প্রথম স্তম্ভপানাদিতে ইচ্ছার কারণ, যে, স্বর্গবিশেষ, তাহা তাহার সেই শরীরে তখন জন্মিতেই পারে না। কারণ তৎপূর্বে তাহার সেই শরীর কখনও স্তম্ভপানাদিকে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া অনুভব করে নাই। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফল কথা, দেহও আত্মা নহে।

মনও আত্মা নহে

পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা চক্ষুরাদি বহিরিঙ্গিয় ও শরীর হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সেই সমস্ত যুক্তির দ্বারা চিরস্থায়ী নিত্য মনেরই আদ্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, মনেরই গুণ, মনই জ্ঞাতা, ইহা বলা যায়। মহর্ষি গৌতম পরে নিজেই এই পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তদন্তরে বলিয়াছেন—

“জাতুজ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রঃ”। (৩।১।১৬)।

তাৎপর্য্য এই যে, যে পদার্থ জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা, তাহার সমস্ত জ্ঞানেরই সাধন বা করণ আছে। নচেৎ তাহার কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। সুতরাং সেই জ্ঞাতার সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষেরও কোন করণ অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহারই নাম মন। সুতরাং উহা জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। কারণ, কর্তা ও করণ ভিন্ন পদার্থ। তবে যদি জ্ঞাতাকে মন বলিয়া উহার সুখ-দুঃখাদি ভোগের করণ পৃথক্ কোন অন্তরিঙ্গিয় অন্য নামে স্বীকার কর, তাহা হইলে নামভেদমাত্রই হইবে, পদার্থের কোন ভেদ হইবে না। কারণ সুখ-দুঃখাদি ভোগের কর্তা এবং উহার করণ পৃথক্ৰূপে স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু সুখ-দুঃখাদি ভোগের করণরূপে যে অন্তরিঙ্গিয় মন নামে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাকেই জ্ঞাতা বলা যাইবে না। কারণ, উহা করণরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জ্ঞাতার বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষেই করণ আছে, কিন্তু সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষে কোন করণ নাই। সুতরাং মনকে জ্ঞানের কর্তাই বলিব। এতদন্তরে মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন—“নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ”। (৩।১।১৭)।

তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ, কিন্তু সুখ-দুঃখাদি-প্রত্যক্ষের কোন করণ নাই, এইরূপ নিয়ম নিশ্চয়। পরন্তু আমাদিগের বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষের শ্রায় সুখ-দুঃখাদি-প্রত্যক্ষেরও অবশ্য কোন করণ আছে, ইহাই অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। সেই কারণেই “মন” নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং উহাকে জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা বলা যায় না। কারণ, বাহ্য জ্ঞানের করণ, তাহা জ্ঞানের কর্তা হইতে পারে না। পরন্তু আমি চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিতেছি, শ্রোণের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিতেছি,

ইত্যাদি প্রকার মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা যেমন চক্ষুরাদি করণকে জ্ঞানের কর্তা হইতে ভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়, তজ্জন্য আমি মনের দ্বারা সুখবোধ করিতেছি, দুঃখবোধ করিতেছি,—ইত্যাদি প্রকার মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা মনকেও জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়। সুতরাং মন জ্ঞাতা নহে অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নহে। গৌতম পরে তদ্বিষয়ে আরও অনেক বুলি বলিয়াছেন।

পরন্তু এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম মনকে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া সমর্থন করায় তদ্বারা জ্ঞানাদি যে মনের ধর্ম্য নহে অর্থাৎ মন জ্ঞাতা নহে, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। কারণ আত্ম সূক্ষ্ম দ্রব্যের দ্বারা তদুৎপত্ত গুণাদিরও লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদি মনের ধর্ম্য হইলে সেই জ্ঞানাদির লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পরন্তু অতি সূক্ষ্ম মন জ্ঞাতা হইলে উহা শরীরের সর্বাংশে বিद्यমান না থাকায় সর্ব শরীরে কখনও সেই মনে কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু অনেক সময়ে শরীরের সর্বাংশেই আত্মাতে জ্ঞান জন্মে। প্রবল শীতার্ভ ব্যক্তি সর্বশরীরেই শীত বোধ করে। পীড়া বিশেষ হইলে রোগী সর্বশরীরেই বেদনা বা ক্রেশ বোধ করে। সুতরাং সর্বশরীরেই যে বোদ্ধা আত্মা আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু মন আত্মা হইলে শরীরের সর্বত্র উহার সত্তা সম্ভব হয় না। অতএব মন আত্মা নহে।*

* অবশ্য জীব অণু ইহাও প্রাচীন মত আছে। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ উক্ত মতই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। তৈন দার্শনিকগণ জীবাত্মাকে দেহসম পরিমাণ বলিয়া উহার সংকোচ ও বিকশ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যেক জীবাত্মাই আকাশের দ্বারা সর্বব্যাপী। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—“বৈশ্বানরহানাকশন্তথাচাক্সা” (৭।১।২২)। শ্রীভগবান্ও জীবাত্মার স্বরূপবর্ণনাই বলিয়াছেন—“নিত্যঃ সর্বগতঃ প্রাপুরচলোহয়ঃ সনাতনঃ” (গীতা ২।২৪) বিষ্ণু পুরাণেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—পুমান্ সর্বগতো ব্যাপী আশাশবদয়ঃ বঃ” ইত্যাদি (২.১৫.২৪)। উক্ত মতে নির্বিচ্যার নিরবয়ব জীবাত্মার সংকোচ বিকাশ ও গতাগতি সম্ভবই নহে। সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ের মতে জীবের স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরেরই উৎক্রান্তি ও গতাগতি হয় এবং উহাই শাস্ত্রে জীবের উৎক্রান্তি ও গতাগতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু কণাদ ও গৌতম সূক্ষ্ম শরীরের উল্লেখ না করায় ভাষ্যদাতাদের মতে জীবের মনই সূক্ষ্ম শরীর স্থানীয়, ইহা বুঝা যায়। প্রাচীন বৈশেষিকপ্রাচ্য প্রশস্তপাদও লিখিয়াছেন যে, জীবের মৃত্যুর পরক্ষণে উৎপন্ন আতিবাহিক শরীর। বিশেষরূপে মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবের সেই মনই পরলোকে গমন করে। অর্থাৎ স্থূল শরীর হইতে সেই মনেরই উৎক্রান্তি এবং পরলোকে গতি ও সময়ে ইহলোকে উৎপন্ন স্থূল শরীর মধ্যে আগতি হয়। জীবাত্মার উগাধি সেই অন্তঃকরণ বা মনের সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করিয়াই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীবকে অণু বলা হইয়াছে। কোন স্থলে জীবাত্মা দ্রুজেরূপ, এই তাৎপর্য্যও তাহাকে অণু বলাইয়াছে। শারীরকভাষ্যে (২।৩।২০) প্রাচ্য শব্দরত্ন শ্রেণে গ্রন্থপ কথাই বলিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায় ।

জীবাশ্মার নিত্যত্ব ও পূর্বজন্মের সাধক যুক্ত

পূর্বোক্ত সমস্ত যুক্তির দ্বারা জীবাশ্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন হইলেও জীবাশ্মা যে নিত্য অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাই মহর্ষি গোতম পরে জীবাশ্মার নিত্যত্বসাধক যুক্তি প্রকাশ করিতে প্রথমে বলিয়াছেন—

“পূর্বাভাস্ত-স্বতানুবন্ধাজ্জাতস্ত হর্ষ-ভয়-শোক-সম্প্রতিপত্তেঃ”। —৩।১।১৮

অর্থাৎ নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোকের প্রাপ্তি হওয়ায় আত্মা নিত্য, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, তাহার ঐ হর্ষ, ভয় ও শোক পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্ত উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, নবজাত শিশুর মুখে হস্ত দেখিলে তদ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার হর্ষ জন্মিয়াছে এবং তাহার শরীরে কম্পবিশেষ দেখিলে তদ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার ভয় জন্মিয়াছে এবং তাহার রোদন শুনিলে তদ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার শোক জন্মিয়াছে। কারণ, তাহার হর্ষাদি ব্যতীত ঐরূপ হস্তাদি জন্মিতে পারে না; কারণ ব্যতীত কখনও কার্য্য জন্মে না। সুতরাং কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণের যথার্থ অনুমান হইয়া থাকে। অতএব নবজাত শিশুর ঈর্ষ হস্ত দ্বারা তাহার কারণ হর্ষ অনুমিত হয়। এবং তাহার রোদন দ্বারা তাহার কারণ শোকও অনুমিত হয়। তাহা হইলে তখন সেই নবজাত শিশুর যে, কোন বিষয়ে অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে, ইহাও অনুমিত হয়। কারণ, অভিলিখিত বিষয়ের প্রাপ্তিতে যে সুখ জন্মে, তাহার নাম হর্ষ এবং অভিলিখিত বিষয়ের অপ্ৰাপ্তি বা বিয়োগে যে দুঃখবিশেষ জন্মে, তাহার নাম শোক। সুতরাং কোন বিষয়ে একেবারেই অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে কখনই কাহারও হর্ষ ও শোক জন্মিতে পারে না। কিন্তু কোন বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া না বুঝিলেও কাহারও সে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। সুতরাং নবজাত শিশুও যে, কোন বিষয়কে তাহার ইষ্টজনক বলিয়া বুঝিয়াই তদ্বিষয়ে অভিলাষী হয় এবং সেই বিষয়ের প্রাপ্তিতে হৃষ্ট এবং অপ্ৰাপ্তি বা বিয়োগে দুঃখিত হয়, ইহাও স্বীকার্য্য।

কিন্তু নবজাত শিশু ইহজন্মে সেই বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া কল্পে বুঝিবে? ইহজন্মে সেই বিষয়কে পূর্বে কখনও ইষ্টজনক বলিয়া অনুভব না করার ইহজন্মে সে বিষয়ে তাহার ঐরূপ সংস্কারও ত জন্মে নাই। সুতরাং তাহার ঐরূপ স্মৃতিও জন্মিতে পারে না। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, নবজাত শিশুর সেই আত্মা পূর্বজন্মে তজ্জাতীয় বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া অনুভব করিয়াছে এবং তজ্জন্মই তাহার ঐরূপ সংস্কার থাকায় ইহজন্মে সেই সংস্কার উদ্ভূত হইয়া তাহার ঐরূপ স্মৃতি উৎপন্ন করে। তাহার ফলে তাহার পূর্বানুভূত তজ্জাতীয় বিষয়ে অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাহা হইলে নবজাত শিশুর সেই আত্মা যে পূর্বে হইতেই বিদ্যমান আছে এবং সেই আত্মারই অভিনব শরীরাদিসদ্ব্যকরূপ পুনর্জন্ম হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য।

দেহানুবাদী কোন নাস্তিক বলিয়াছিছিলেন যে, নবজাত শিশুর ঐ হস্তাদি, তাহার হর্ষাদি জন্ম নহে। কিন্তু যেমন সময়-বিশেষে পদ্মাদির বিকাশ ও সংকোচ প্রভৃতি বিকার জন্মে, তদ্রূপ নবজাত শিশুর হস্তাদিও তাহার সেই দেহেরই বিকার বা অবস্থা বিশেষ। পদ্মের বিকাশের ত্রায় নবজাত শিশুর মুখের বিকাশই তাহার হস্ত বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ পদ্মাদির সুদ্রণের ত্রায়ই কখনও তাহার মুখের সুদ্রণ হইয়া থাকে। এইরূপ কোন সময়ে তাহার কল্প বা রোদনাদিও তাহার দেহেরই বিকার-বিশেষ। মহর্ষি গোতম পরে নাস্তিকের এই কথার উল্লেখ করিয়া তদন্তরে বলিয়াছেন—

“নোক-শীত-বর্ষাকালনিমিত্তত্বাং পঞ্চায়কবিকার্যাণাং”। ১।১।১০।

অর্থাৎ পূর্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ পঞ্চাভৌতিক দ্রব্য পদ্মাদির সংকোচ, বিকাশ প্রভৃতি যে সমস্ত বিকার, তাহাও স্বাভাবিক নহে। তাহারও নিমিত্ত বা কারণ আছে। উষ্ণ, শীত ও বর্ষাকাল প্রভৃতিই তাহার নিমিত্ত। কিন্তু নবজাত শিশুর ঐ হাস্য, কল্প ও রোদনের নিমিত্ত কি? ইহা বলা আবশ্যক। পদ্মের ত্রায় সূর্য্যাকিরণের সংযোগে ঐ শিশুর ত মুখ-বিকাশ হয় না এবং রাত্রিকালে পদ্মের ত্রায় ঐ শিশুর নিয়ত মুখমুদ্রণও হয় না। ঐ যে স্মৃতিকাগৃহে শিশু রোদন করিতেছে, আবার ডখনই মায়ের দেহের ক্রোড়ে উঠিয়া স্তন্য পান করিয়া এবং তাহার স্নেহ-আদর বুঝিয়া জীবন হাস্য করিতেছে, ইহার কি কোন কারণ নাই? অথবা উহা কি তাহার

সেই জড় দেহেরই সাময়িক কোন অবস্থা মাত্র? তাহা হইলে দেহান্ধবাদী নাস্তিক যে, তাহার নবজাত কুমারের মধুর হাস্য দেখিয়া হাস্য করিতেছেন এবং ছরদৃষ্টবশতঃ সেই স্নেহময় কুমারের মৃত্যু হইলে রোদন করিতেছেন, তাহাও তিনি তাহার দেহের বিকার মাত্র, ইহা কেন বলেন না? সেই স্থলে তাঁহারও হর্ষ জন্ম হাস্য এবং পরে শোক জন্ম রোদন, ইহা ত তিনিও স্বীকার করেন। সুতরাং তাহার নিজের দৃষ্টান্তে নবজাত শিশুর ঐ হাস্যও তাহার হর্ষ জন্ম এবং তাহার রোদনও তাহার দুঃখ জন্ম, ইহা তাহারও স্বীকার্য। আর যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই বৈরূপ হাস্য ও রোদনের কারণরূপে হর্ষ ও শোক সর্বসম্মত, নবজাত শিশুর পক্ষেও তাহাই স্বীকার না করিয়া অভিনব কোন কারণ কল্পনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব নবজাত শিশুর ঐ হাস্য ও রোদনের দ্বারা তাহার হর্ষ ও শোকের অনুমান হওয়ায় তদ্বারা পূর্বোক্তরূপে তাহার পূর্বজন্ম সিদ্ধ হইলে আত্মার নিত্যস্থিতি সিদ্ধ হয়।

এইরূপ নবজাত শিশুর ভয়ের দ্বারাও তাহার পূর্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় আত্মার নিত্যস্থিতি সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র ইহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নবজাত শিশু কখনও মাতার ক্রোড় হইতে কিছু স্থলিত হইলেই তখনই রোদনপূর্বক কম্পিতকলেবরে হস্তদ্বয় বিক্ষিপ্ত করিয়া মাতার বক্ষঃস্থ মঙ্গলসূত্র জড়াইয়া ধরে, ইহা দেখা যায়। কিন্তু কেন সে ঐরূপ করে? যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতির শ্রায় নবজাত শিশুও পতনভয়ে ভীত হইয়া পতন নিবারণের জন্ত কেন ঐরূপ চেষ্টা করে? পতন যে দুঃখের কারণ, এইরূপ বোধ ব্যতীত তাহার তখন ভয়, দুঃখ এবং ঐরূপ চেষ্টা হইতেই পারে না। কারণ, সমস্ত প্রাণীই পতন যে দুঃখের কারণ, এইরূপ বোধ বশতঃই পতনভয়ে ভীত হয় এবং বথাগন্তি পতননিবারণের জন্ত চেষ্টা করে, ইহা সত্য। যে প্রাণী কোন স্থান হইতে পতনকে তাহার দুঃখের কারণ বলিয়া বুঝে না, সে কখনই সেই স্থান হইতে পতনভয়ে ভীত হয় না। সুতরাং পূর্বোক্তস্থলে নবজাত শিশুরও ঐরূপ চেষ্টার দ্বারা মাতৃক্রোড় হইতে তাহার পতনভয় ও তজ্জন্ত দুঃখ অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুতরাং তৎকালে পতন যে দুঃখের কারণ, এইরূপ বোধও তাহার অবশ্য জন্মে, ইহাও অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়।

কিন্তু নবজাত শিশুর জন্মের পরে সর্বপ্রথম তাহার যে পতনভয় এবং পতননিবারণের জন্ত যে ঐক্য চেষ্টা, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সে ত তাহার ঐ জন্মে কখনও পতন যে হুখের কারণ, ইহা অনুভব করে নাই। অতএব অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, তাহার দেহাদি হিন আত্মা আছে। সেই আত্মা পূর্বে পূর্বে জন্মে বহুবার পতনের পূর্বাবস্থা ও তৎপরে পতনেরও অনুভব করিয়া উহা যে হুখের কারণ, ইহাও অনুভব করিয়াছে। সুতরাং তজ্জন্ত সেই আত্মাতে ঐ সমস্ত বিষয়ে সংস্কার আছে। ইহজন্মে পূর্বোক্ত হলে সেই সংস্কার বশতঃই পতনের পূর্বাবস্থা বুঝিয়া তদ্বারা তাহার ভাবী পতনের অনুমান করিয়া তাহাও হুঃখজনক বলিয়া অনুমান করে। সুতরাং তখন সে পতনভয়ে ভীত হইয়া সেই পতন নিবারণের জন্ত ঐক্য চেষ্টা করে। পতনের পূর্বাবস্থা ও পতন—যাহা তাহার পূর্বাভূত, তাহার স্মৃতি ব্যতীত কখনই তাহার ঐক্য ভয় জন্মিতে পারেনা। সংস্কার ব্যতীতও তাহার সেই সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি ঙ্গিতে পারে না। অতএব তাহার পূর্বজন্ম অবশ্য স্বীকার্য। আত্মার উৎপত্তি না থাকিলেও—কোন অভিনব শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সম্বন্ধরূপ জন্ম আছে। অনাদিকাল হইতেই আত্মার ঐক্য জন্ম স্বীকার্য হওয়ায় আত্মা নিত্য, ইহাও স্বীকার্য।

পরন্তু মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত হুত্রে আত্মার নিত্যত্বসিদ্ধি করিতে নবজাত শিশুর যে ভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার দ্বারা সর্বপ্রাণীর মৃত্যুভয়ও তাহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি ঐ মৃত্যুভয়কেই “অভিনিবেশ” নামক পঞ্চম ক্লেণ বলিয়া উহার স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে ১, যিনি শাস্ত্র দ্বারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব বুঝিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষেও ঐ অভিনিবেশ পূর্ববৎ উপস্থিত হয় এবং উহা “স্বরসবাহা” অর্থাৎ অনাদি বাসনা মূলক। অনাদিকাল হইতে জীবের পুনঃ পুনঃ মরণ হুখের অনুভব জন্ত তরিবরে যে সমস্ত বাসনা বা সংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহা “স্বরস” নামেও কথিত হইয়াছে। ঐ অনাদি সংস্কারবশতঃই সর্বজীবের মরণভয় জন্মে। পতঞ্জলি পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে ,

(১) স্বরসবাহা বিদ্বৎসাহসি তথা ক্লোহাভিনিবেশঃ।—যোগদর্শন ॥ ২।৯ ॥

(২) তাসামন্যদিকালিষো নিত্যত্বাৎ।—যোগদর্শন ॥ ৪।১০ ॥

পূর্বোক্ত সগুণ বাসনা বা সংস্কার অনাদি। কারণ, সর্বজীবেরই ‘আমি বেন না মরি, আমি যেন ধুধাকি’—এইরূপ কামনা সতত আছে। বস্তুতঃ সর্বজীবেরই উক্তরূপ কামনাবশতঃ যে অভিনিবেশ, তাহা মৃত্যুভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহা সর্বজীবেরই ক্লেশকর, এ জ্ঞাত যোগদর্শনে “ক্লেশ” বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ মৃত্যুভয়ও বিনা কারণে হইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ যাহাই বলুন, বস্তুতঃ মরণভয় জীবের একটা স্বভাব বা তাহার মানসিক হৃদৌর্দল্যমাত্র বলা যায় না। তাই যোগদর্শনের ভাষ্যে বাসদেব বলিয়াছেন যে,—সর্বজীবেরই—আমি বেন না মরি, এইরূপ যে কামনা বা মরণভয়, তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে না,—তাহারও নিমিত্ত বা কারণ আছে।

কিন্তু উহার কারণ বিচার করিতে গেলে যাহার মৃত্যুভয় জন্মে, তাহার পূর্বে কখনও মৃত্যু-যাতনার অনুভব ও তজ্জ্ঞ সংস্কার অবশ্য স্বীকার্য। কারণ, যে যাহাকে কখনও তাহার দুঃখের কারণ বলিয়া অনুভব করে নাই, সে কখনও তাহা হইতে ভীত হয় না। ইহা সর্বজনসিদ্ধ। সুতরাং সর্বজীবই যে পূর্বে মৃত্যুর যাতনায় পূর্বাভাব অনুভব করিয়াছে, এবং তজ্জ্ঞ তাহার আত্মাতে ঐরূপ সংস্কার আছে, ইহা স্বীকার্য। তাই সময়ে সর্বজীবেরই সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় পূর্বাভূত সেই অবস্থার অশ্রুত স্বভাবশতঃ মৃত্যুভয় জন্মে। কদাচিৎ কাহারও কোন সময়ে কোন কারণে সেই সংস্কার অভিভূত হইলেও সেই বদ্ধমূল অনাদি সংস্কার সহজে কাহারও একেবারে বিনষ্ট হয় না। আত্মহত্যাকারীও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আবার মরণভয়ে ভীত হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে, ইহা সত্য। ফল কথা, সর্বজীবের যে মৃত্যুভয়, তদ্বারাও আত্মার পূর্বজন্ম ও নিত্য সিদ্ধ হয়। যোগদর্শনের ভাষ্যে বাসদেব বিশেষ করিয়া ঐ মৃত্যুভয়কেই সমস্ত জীবের পূর্বজন্মের সাধকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

আত্মার নিত্যসিদ্ধ করিতে মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

প্রত্যাহারাদ্যাসক্ততাং তন্ত্ৰাভিলাষাং ॥ ৩।১।২১ ॥

অর্থাৎ নবজাত শিশুর যে প্রথম স্তম্ভপানে ইচ্ছা, উহা তাহার পূর্বজন্মে আহারের অভ্যাসজনিত। সুতরাং সেই ইচ্ছাপ্রযুক্তও তাহার পূর্বজন্ম সিদ্ধ

হওয়ায় আহার নিত্যসিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, নবজাত শিশুর সর্ব প্রথম স্তন্যপানকালে তাহার দৈহিকক্রিয়া-বিশেষরূপ চেষ্টা দেখিয়া তাহার স্তন্যপানে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তির অনুমান হয়। কারণ, প্রবৃত্তি ব্যতীত চেষ্টা জন্মে না এবং তাহার ঐ প্রবৃত্তির দ্বারা সে বিষয়ে তাহার ইচ্ছার অনুমান হয়। কারণ, ইচ্ছা ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না। এবং তাহার ঐ ইচ্ছার দ্বারা তাহার জ্ঞানের অনুমান হয়। কারণ, জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছা জন্মে না। যে বিষয়ে ‘ইহা আমার ইষ্টজনক’—এইরূপ জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয়ে তজ্জন্ত ইচ্ছা জন্মে এবং তজ্জন্ত সে বিষয়ে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে এবং সেই প্রবৃত্তি জন্তই সেই কার্য্যের অনুকূল শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টা জন্মে। পূর্বোক্তরূপ কার্য্য-কারণভাব সর্বজনসিদ্ধ। বালক, যুবক ও বৃদ্ধ *ভূতি সকলেই ক্ষুধার্ত হইলে ‘আহার আমার ইষ্টজনক’—এইরূপ স্মৃতিবশতঃ আহারে অভিলষী হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের সকলেরই আহারের পূর্বাভাসজনিত সংস্কার বশতঃই আহার যে, ক্ষুধার নিবর্তক, এইরূপ স্মৃতি জন্মে, ইহাও সর্বজনসিদ্ধ। সুতরাং উক্তরূপ সর্বজনসিদ্ধ কার্য্যকারণ-ভাবানুসারে নবজাত শিশুরও যে সর্বপ্রথম স্তন্যপানেচ্ছা, তাহার কারণরূপে তাহারও মতন ‘আহার আমার ইষ্টজনক,’—এইরূপ স্মৃতি জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহার সংস্কার স্বীকার্য্য হওয়ায় তদ্বিষয়ে তাহার পূর্বাভাবও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তাহার পূর্বজন্মও স্বীকার্য্য। কারণ, ইহজন্মে পূর্বে সে আর কখনও স্তন্যপান করে নাই, অথ কিছুও আহার করে নাই। পূর্বজন্মে তাহার অনুভূত স্তন্যপানাদি বিষয়ে সংস্কার থাকিলেই তাহার সাহায্যে ইহজন্মে তজ্জাতীয় স্তন্যপানাদিকে সে তাহার ইষ্টজনক বলিয়া অনুমান করিতে পারে। নচেৎ তাহাও পারে না। সুতরাং নবজাত শিশুর পূর্বজন্মে আহারাত্যাসজনিত সংস্কার অবশ্যই স্বীকার্য্য হওয়ায় তাহার পূর্বজন্ম অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

কোন নাস্তিক বলিয়াছিলেন যে, যেমন পূর্বাভাস ব্যতীতও বস্তুশক্তি বশতঃ লৌহ অয়স্কান্ত মণির (চুম্বকের) অভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ, নবজাত শিশুও মাতৃস্তনের অভিমুখে গমন করে। পূর্বাভাস ব্যতীত যে প্রবৃত্তিই হয় না, ইহা বলা যায় না। কারণ, অয়স্কান্তমণি নিকটে থাকিলে

তাহতে লৌহের প্রবৃত্তি হইতেছে। মহর্ষি গৌতম পরে নিজেই এই পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তত্ত্বেরে বলিয়াছেন—

নাশ্চঃ প্রবৃত্ত্যভাবাং ॥৩।১২৩ ॥

অর্থাৎ পূর্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ, লৌহে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি নাই। অগ্ন্যন্তমণির অভিমুখে লৌহের যে গতি, তাহা প্রবৃত্তিজন্ত চেষ্টারূপ ক্রিয়াও নহে, উহা ক্রিয়া মাত্র। সুতরাং নবজাত শিশুর প্রবৃত্তিজন্ত চেষ্টা রূপ স্তম্ভপানক্রিয়া লৌহের ক্রিয়ার তুল্য নহে।

ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন গৌতমের তাৎপর্য্য বাখ্যা কহিয়াছেন যে, অগ্ন্যন্তমণির অভিমুখে লৌহের গতিক্রিয়ারূপ যে প্রবৃত্তি, তাহার অবস্থা কোন নিয়ত কারণ আছে। নচেৎ লোষ্ট্র প্রভৃতি যে কোন দ্রব্যও অগ্ন্যন্তের অভিমুখে কেন গমন করে না? আর সেই লৌহই বা অগ্ন পদার্থে কেন —ঐরূপ গমন করে না? সুতরাং লৌহই যে অগ্ন্যন্তমণিরই অভিমুখে গমন করে, ইহাতে কোন নিয়ত কারণ অবস্থা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐরূপ নবজাত শিশু যে স্তম্ভপানের জন্ত মাতৃস্তনের অভিমুখেই গমন করে, ইহাতেও কোন নিয়ত কারণ অগ্ন স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে নবজাত শিশু যে আহারেচ্ছা বশতঃই মাতৃস্তনের অভিমুখে গমন করে অর্থাৎ সেই আহারেচ্ছা জন্তই তখন তাহার আহারে প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে এবং তজ্জন্তই তাহার দেহে ঐরূপ চেষ্টা জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, আহারেচ্ছা ব্যতীত কখনও আহার বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। সেই প্রবৃত্তি ব্যতীতও আহারের জন্ত ঐরূপ চেষ্টা জন্মে না। সর্বলোকসিদ্ধ কারণ ত্যাগ করিয়া উক্ত বিষয়ে অভিনব কোন কারণ কল্পনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বস্তুতঃ নবজাত শিশুর মাতৃস্তনের অভিমুখে যে সাময়িক গতি, তাহা কখনই অগ্ন্যন্তমণির অভিমুখে লৌহের গতির তুল্য বলা যায় না। কারণ, অগ্ন্যন্তমণির নিকটে লৌহ রাখিলে তখনই তাহা ঐ গতিতে উপস্থিত হয়। কিন্তু মাতৃস্তনে নবজাত শিশুর মুখ সংলগ্ন করিয়া দিলেও অনেক সময়ে তাহার মুখে ক্রিয়া জন্মে না। সুতরাং যে সংস্কারবশতঃ নবজাত শিশু স্তম্ভপানকে নিজের ইষ্টজনক বলিয়া স্মরণ করে সেই সংস্কার উদ্ভূত না

হওয়া পর্যন্ত তাহার ঐক্যপন্থ্য নী হওয়ায় স্তম্ভপানে ইচ্ছা জন্মে না, ইহাই স্বীকার্য্য। নচেৎ অঃস্ফাল্মগণির নিকটস্থ লৌহের ত্রায় মাতৃস্তনের নিকটস্থ শিশুর মুখ সর্বত্র প্রথমেই কেন মাতৃস্তনে উপস্থিত হয় না? আর ঐ শিশু হামাগুড়ি দিয়া নিজের অভিলষিত দ্রব্য ধরিতে বাইতেছে—আবার বাধা পাইলে ঘুরিয়া অল্প দিকে আসিতেছে, সহস্রে অশ্রু লইয়াও মুখে দিতেছে,—আবার উহা কাড়িয়া লইলে কান্দিয়া পড়িতেছে, এই সমস্তও কি সে ইহজন্মেই পূর্বে কাহারও নিকট শিখিয়াছে? অথবা ঐ সমস্ত তাহার জ্ঞানমূলক কোন কার্য্য নহে? কেবল দৈহিক ক্রিয়া মাত্র?—সত্যের অপলাপ করিয়া বুদ্ধিমান নাস্তিকও কিন্তু ইহা বলিতে পারেন না।

পরন্তু মহর্ষি পৌতম নবজাত শিশুর “স্তম্ভাভিলাষ” বলিয়া নবজাত মানব-শিশুর ত্রায় গোমহিষাদি বৎসেরও প্রথম স্তম্ভপানেচ্ছা তাহাদিগের পূর্বজন্মের সাধক রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সময়ে অনেক গৃহস্থ প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিয়াছেন—তাহার গোশালায় গোবৎস প্রস্তুত হইয়া নিজেই দাঁড়াইয়া তাহার মাতার স্তম্ভপান করিতেছে। তপোবনে ঋষিরা দেখিয়াছেন—মৃগশিশু প্রস্তুত হইয়াই স্বয়ংই তাহার জননীর স্তম্ভপানে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু ঐ গোবৎস প্রভৃতি তখন কিরূপে মাতৃস্তন চিনিতে পারে? এবং সেই মাতৃস্তনে যে দুগ্ধ আছে, এবং তাহাতে প্রতিঘাত করিলেই যে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় এবং সেই দুগ্ধপান যে তাহার ক্ষুধার নিবর্তক, ইহাই বা কিরূপে বুঝিতে পারে? ঐ স্থলে তাহার ঐ সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি ব্যতীত কখনই ঐ বিষয়ে ইচ্ছা ও তজ্জ্ঞ প্রবৃত্তি ও তজ্জ্ঞ ঐক্য চেষ্টা হইতেই পারে না। কিন্তু পূর্বজন্মের সংস্কার ব্যতীতও তাহাদিগের ঐ বিষয়ে স্মৃতিক্রম জ্ঞান জন্মিতে পারে না। অতএব তাহাদিগের পূর্বজন্ম স্বীকার্য্য হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। মৃগশিশু প্রস্তুত হইয়া স্বয়ংই তাহার জননীর স্তম্ভপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহা দেখিয়া আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরচাৰ্য্যও আত্মার চিরস্থায়িত্ব বা নিত্যত্ববিষয়ে অনুমান-প্রমাণরূপ যুক্তি প্রকাশ করিতে “মানসোল্লাস” গ্রন্থে সরল সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন—

পূর্বজন্মানুভূতার্থ-স্মরণান্ মৃগশাবকঃ।

জননী-স্তম্ভ-পানায় স্বয়মেব প্রবর্ততে।

তন্মান্বিতীয়তে স্থায়ীত্যায়া দেহান্তরেষপি ।

স্বতিং বিনা ন ঘটতে স্তম্ভপানং শিশোর্যতঃ ॥ ৭৬ ॥

আত্মার নিত্য সিদ্ধ করিতে মহর্ষি গৌতম শেষে বলিয়াছেন—

বীত-রাগ-জন্মাদর্শনাৎ ॥ ৩১:২১ ॥

তাৎপর্য এই যে, যাহার জন্মের পরে কখনও কোন বিষয়ে কিছু মাত্র রাগ বা অভিলাষ জন্মে না, যে সর্বদা সর্বদা বীতরাগ, এমন কোন প্রাণীর জন্ম দেখা যায় না। সমস্ত প্রাণীই জন্মের পরে কখনও কোন না কোন বিষয়ে রাগবিশিষ্ট হয়, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। সমস্ত প্রাণীরই শারীরিক ক্রিয়া বা চেষ্টার দ্বারা তাহাকে কোন বিষয়ে সরাগ বলিয়া অনুমিত হয়। ক্রুধা-তৃষ্ণার তাড়নায় ভক্ষ্য-পেয়াদি বিষয়েও সমস্ত প্রাণীরই কখনও অবশ্য রাগ বা অভিলাষ অবশ্যই জন্মে, সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রত্যেক জীবেরই প্রত্যেক জন্মের পূর্বেই তাহার অন্ত জন্ম স্বীকার্য; নচেৎ তাহার পূর্বোক্তরূপ রাগ জন্মিতে পারে না। কারণ, পূর্বজাত সংস্কার ব্যতীত কখনই কোন বিষয়ে কাহারই রাগ বা অভিলাষ জন্মে না।

আত্মার উৎপত্তিবাদী কোন নাস্তিক বলিয়াছিলেন যে, যেমন ঘটাদি দ্রব্য রূপাদি-গুণবিশিষ্ট হইয়াই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিষয়বিশেষে রাগবিশিষ্ট হইয়াই সমস্ত জীব উৎপন্ন হয়। জীবের ঐ রাগ দ্বারা তাহার পূর্বজন্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহাও জীবের সহিতই উৎপন্ন হয়। জীবের যাহা উৎপাদক, তাহাই জীবের ঐ রাগেরও উৎপাদক। মহর্ষি গৌতম পরে নাস্তিকের ঐ কথারও উল্লেখপূর্বক তদন্তরে বলিয়াছেন—

ন সংকল্পনিমিত্ততাদ্রাগাদীনাঃ ॥ ৩১:২৬ ॥

অর্থাৎ পূর্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ, জীবের যে রাগাদি, তাহা জীবের সংকল্পজাত। সংকল্প ব্যতীত কোন জীবেরই কোন বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ জন্মে না।

এখানে গৌতমোক্ত ঐ “সংকল্প” শব্দের অর্থ কি, তাহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক। “সংকল্প” শব্দের আকাজক্ষা-বিশেষ অর্থই প্রসিদ্ধ। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে “নহসংকল্পস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন”— এই বাক্যে এবং চতুর্থ শ্লোকে “সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগীরূঢ়স্তদোচ্যতে”—

এই বাক্যে পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ অর্থেই “সংকল্প” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু পরে “সংকল্পপ্রভগ্ন ক্রমোন্ত্যক্তা সর্কানশেষতঃ”—ইত্যাদি চতুর্বিংশ শ্লোকে কামকে যে সংকল্পজন্ত বলা হইয়াছে—ঐ সংকল্প জীবের মোহ বা মিথ্যাজ্ঞানবিশেষ, উহা আকাজ্জারূপ সংকল্প নহে, ইহাই বহুসম্মত। তবে টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ সংকল্পকেও আকাজ্জা-বিশেষই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর ও টীকাকার শ্রীধর স্বামী উক্ত শ্লোকে ঐ সংকল্প কি, তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলেও শঙ্কর-মতের ব্যাখ্যাতা আনন্দগিরি উহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—“সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ”। অর্থাৎ যাহা শোভন বা সমীচীন নহে তাহাতে সমীচীন বলিয়া যে অধ্যাস অর্থাৎ সমাক্ কল্পনারূপ ভ্রম,—তাঁহাই উক্ত শ্লোকে “সংকল্প” শব্দের অর্থ। টীকাকার মধুহৃদন সরস্বতীও এইরূপই বলিয়াছেন। ঐ সংকল্পই জীবের সমস্ত কামের মূল, তাই সমস্ত কামকেই বলা হইয়াছে “সংকল্প-প্রভব”।—

বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতমও যে, উক্ত সূত্রে মোহবিশেষরূপ সংকল্পকেই জীবের রাগও দ্বেষের নিমিত্ত বলিয়াছেন, ইহা পরে তাহার অষ্ট সূত্রের দ্বারাও বুঝা যায়। কারণ, তিনি পরে চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

“তেবাং মোহঃ পাণীয়ান্ নামুচ্ছ্রুতরোৎপত্তে” ॥ ৪।১।৬ ॥

অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহই সর্কানশেষা নিকৃষ্ট। কারণ, মোহশূন্য ব্যক্তির রাগও দ্বেষ জন্মে না। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন সেখানে বলিয়াছেন যে, বিষয়বিশেষে যে সংকল্প জীবের রাগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম রজনীয় সংকল্প, এবং যে সংকল্প দ্বেষ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কোপনীয় সংকল্প। ঐ দ্বিবিধ সংকল্পই জীবের সেই বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উহা তাহার মোহভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু, জীবের ঐ রাগ বা দ্বেষের অনেক যে মোহরূপ সংকল্প, তাহাও তাহার পূর্ভানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ দ্বারা জন্মে না। কারণ, যে জীব যে বিষয়কে পূর্বে কখনও তাহার স্মৃতির কারণ বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই বিষয় বা তজ্জাতীয় বিষয়েই আবার তাহার আকাজ্জারূপ রাগ জন্মে—এবং যে বিষয় পূর্বে কখনও দ্বেষের কারণ বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই বিষয় বা তজ্জাতীয় বিষয়েই আবার তাহারই দ্বেষ জন্মে ; নচেৎ তাহা জন্মে না। সুতরাং পূর্ভানুভূত সেই বিষয়ের সেইরূপে অনুস্মরণ জন্মই প্রথমে তজ্জাতীয়

বিষয়ে রাগজনক বা দ্বেষজনক মোহবিশেষরূপ সংকল্প জন্মে এবং তজ্জন্মই সেই বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ ভ্রমো, ইহাই স্বীকার্য্য। অতএব জীবের জন্মের পরে সর্বপ্রথমে যে রাগ ভ্রমে, তাহাও পূর্বোক্তরূপ সংকল্প ব্যতীত জন্মিতে পারে না। ঘটাদিদ্ৰব্য রূপাদি গুণের শ্রায় কখনই জীবের জ্ঞানমূলক রং জন্মিতে পারে না। জীবের যৌবনাদি কালে রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তিতে যেরূপ জ্ঞান, কারণ বলিয়া সর্বসিদ্ধ, জীবের সর্বপ্রথম রাগের উৎপত্তিতেও সেইরূপ জ্ঞানই অবশ্য কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য। অভিনব কোন কারণ বলনায় কোন প্রমাণ নাই।

ফল কথা, জীবমাত্রেরই যখন জন্মের পরে বিষয়বিশেষে রং অবশ্যই জন্মে, এবং সেই বিষয়ে সংকল্প ব্যতীতও সেই রাগ জন্মিতে পারে না এবং পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুস্মরণ ব্যতীতও সেই সংকল্প জন্মিতে পারে না। তখন জন্মাত্রই পূর্বজন্মে তজ্জাতীয় বিষয়কে সেইরূপে অনুভব করিয়াছে এবং তজ্জন্ম তাগাতে ঐরূপ সংস্কার বিদ্যমান থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তৎপূর্বজন্মেও সেই জীবের বিষয়বিশেষে সর্বপ্রথম রাগের কারণরূপে ঐরূপ সংকল্প এবং তাহার কারণরূপে তৎপূর্বজন্মে অনুভূত সেই বিষয়ের সেইরূপে অনুস্মরণও স্বীকার্য্য। অতএব উক্তরূপে সমস্ত জীবেরই অনাদি জন্মপ্রবাহ ও অনাদি সংস্কারপ্রবাহ স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আত্মার সংস্কার-প্রবাহের অনাদিত্ব বশতঃ ঐ অনাদি সংস্কারপ্রবাহের আশ্রয় আত্মারও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মার অনাদিত্ব সিদ্ধ হইলে তদ্বারা আত্মার নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। কারণ, অনাদি ভাব পদার্থের উৎপত্তি নাই ও বিনাশ নাই, ইহা অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। মহর্ষি গৌতম শেষে “বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ”—এই সূত্র দ্বারা উক্তরূপে আত্মার অনাদিত্ব সমর্থন করিয়া আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ আত্মার বিলক্ষণ শরীরাদি সঞ্চররূপ জন্মপ্রবাহ অনাদি। সূত্ররূপে সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি, ইহাই আমাদের বেদমূলক সর্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—“হৃদ্যাচক্ষুশসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ” (ঋগবেদস হিতা ১০।১২০।১) বিধাতা যথাপূর্ব চক্ষুহৃদ্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা বলিলে অনাদিকাল হইতেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, ইহা বুঝা যায়। যে সময়ে

তিনি জগতের সংহার করেন, সেই সময়ে প্রলয় হয়। প্রলয়কালেও নিত্য অসংখ্য জীবাত্মা এবং তাগতে উৎপন্ন অসংখ্য বিচিত্র সংস্কার ও ধর্মাদর্ম বিদ্যমান থাকে। তদনুসারে পুনঃসৃষ্টিতে সেই সমস্ত জীবাত্মার পুনর্জন্ম অভিনব শরীরাদিসম্বন্ধরূপে জন্ম হয়। প্রলয়ের পরে যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইবে, তাহারই আদি আছে। সেই তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি কথিত হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি; অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির পূর্বেই কোনদিন অতীত সৃষ্টি হইয়াছে। যে সৃষ্টির পূর্বে আর কখনও সৃষ্টি হয় নাই, এমন কোন সৃষ্টি নাই। বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও সৃষ্টিপ্রবাহ যে অনাদি, এই ঠৈ দিক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—“নাস্তো ন চ দিনং চ সম্প্রতিষ্ঠা”। গীতা ১৫।৩।

কিন্তু সৃষ্টিপ্রবাহ বা জীবের জন্মপ্রবাহ অনাদি হইলেও অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে অনন্ত জীব অনন্ত জন্মলাভ করিয়া অনন্ত বিচিত্র সংস্কার লাভ করিলেও সমস্ত ভ্রমেই সমস্ত প্রাক্তন সংস্কার উদ্ভূত হয় না। জীব নিজ কর্ম্মানুসারে যখন দেহরূপ দেহ পরিগ্রহ করে, তখন ঐ কর্ম্মের বিপাক বশতঃ তাহার তদনুরূপ সংস্কারই উদ্ভূত হয়; অতীত সংস্কার অভিভূত থাকে। কোন মানবাত্মা মানবজন্মের পরেই নিজ কর্ম্মানুসারে বানরদেহ বা গণ্ডারদেহ লাভ করিলে, তখন তাহার বহুজন্মের পূর্বকালীন বানরজন্ম বা গণ্ডারজন্মে লব্ধ সংস্কারই উদ্ভূত হয় এবং উদ্ভূত দেহ লাভ করিলে বহুজন্মের পূর্বকালীন উদ্ভূতজন্মের সংস্কারই তখন উদ্ভূত হয়। সুতরাং তখন তাহার মনুষ্যোচিত রাগাদি জন্মে না। তাই বৈশেষিক-দর্শনে মহর্ষি কণাদ, “জাতবশেষাক্ষ” — (১২।১৩) এই সূত্রের দ্বারা গতি বা জন্মবিশেষও বে, ভক্ষ্যপোষাদি বিষয়ে

১। ন কর্ম্মাবিগাঢ়ি চৈরনাদিভাঃ।

উপপত্ততে চাপ্যপলভ্যতে চ।

বেদান্তদর্শন ২।১।৩৫।৩৬ সূত্র।

“লগাচাদামসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ” ইতি চ মন্তব্যঃ পূর্বকল্পসদৃশাং দর্শয়তি। স্মৃতাংগানা-
দিহঃ সগোষ্ঠোপগমভ্যতে “ন রূপমন্তেহ তথোপলভ্যতে, নাস্তো ন চাদিনং চ সম্প্রতিষ্ঠা”
(গীতা ১৫।৩) ইতি। পুরাণে চোক্তানঃপ্রতানাক্ষ কল্পানাং ন পরিমণ্ডিত্যতি স্থাপিতম্।
শাস্ত্রীরকভাষ্য।

বিভিন্নরূপ রাগের হেতু হয়, ইহা বলিয়াছেন। বোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও এই শাস্ত্র যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। (১) মহর্ষি কণাদ পূর্বে “অদৃষ্টোক্ত” (৬২।১২) এই সূত্রের দ্বারা বিশেষ করিয়া জীবের অদৃষ্ট-বিশেষকেও কোন কোন স্থলে রাগ ও ঘেষের অসাধারণ হেতু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অদৃষ্টবিশেষ বশতঃ সময়বিশেষে কোন স্থলে একে জীবের অভিভূত অতরূপ সংস্কারও যে উদ্ভব হইয়া থাকে, ইহাও বুঝা যায় এবং ইহার অনেক উদাহরণও প্রদর্শন করা যায়।

মূল কথা—জীবের প্রাক্তনসংস্কারব্যতীত জন্মের পরে তাহার বিষয়বিশেষে স কল্প ও তদ্বন্ধক রাগাদি জন্মিতে পারে না। আর এই যে বানরশিশু প্রসূত হইয়াই বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করে, কোন কোন পক্ষিশাবক ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই উড়িয়া যায়, হংস শাবক ললে সন্তরণ করে, গণ্ডারশিশু প্রসূত হইয়াই তাহার মাতার নিকট হইতে পলায়ন করে, ইহা তাহাদিগের সেই সেই প্রাক্তন জন্মের সংস্কার ব্যতীত উপপন্ন হয় না। গণ্ডারের তীক্ষ্ণধার জিহবার দ্বারা গণ্ডারশিশুর প্রথম গাত্রলেহন বড় কষ্টকর। তাই গণ্ডারশিশু প্রসূত হইয়াই প্রাক্তন গণ্ডারজন্মের সেই সংস্কারবশতঃ তাহার মাতা কর্তৃক প্রথম গাত্রলেহনের কষ্টকরতা স্মরণ করিয়া তখনই সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। পরে তাহার গাত্রচর্ম কঠিন হইলে অম্লসন্ধান করিয়া আবার তাহার মাতার নিকটে আসে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। এইরূপ মানবের হ্রায় বহু পশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবেরও নানা বিচিত্র কর্ম বা বিচিত্র স্বভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিলে তাহাদিগের পূর্বজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ জীবের নানারূপ স্বভাব বা বিচিত্র রূচিও কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। মস্তিষ্কের ভড় উপাদান বা পিতামাতার স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া উহার কোন সমাধানই করা যায় না।

১। তত্ত্বদ্বিপাকামুণ্ডণানমেবাভিবাঞ্ছিত্যসনানাং।

জাতি-দেশ-কালবাবহিতানামপ্যানন্তর্য্যঃ স্মৃতিসংস্কারোরেকরূপত্বাৎ ॥ বোগদর্শন-কৈবল্যপাদ ৮ম
ও ৯ম সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পরন্তু জীবমাত্রেরই যেমন প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মের পূর্বে ভক্ষ্য-
পেয়াদি বিষয়ে বিচিত্র রাগ জন্মিতে পারে না, তদ্রূপ, মানবগণের যে বিজ্ঞাবিশেষে
বিশিষ্ট অনুরাগ ও অধিকার, তাহাও প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মিতে পারে
না। কারণ, মানবগণের মধ্যে সকলেই সকল বিজ্ঞায় সমান অনুরাগী ও
অধিকারী হয় না। কেহ গণিতে বিরক্ত, কিন্তু ইতিহাসে অতীব অনুরক্ত।
কেহ আবার ইতিহাসকে উপহাস করিয়া গণিতের গণনায় মত্ত। কেহ
কর্কশ তর্কশাস্ত্রের চর্চায় সতত সে বিষয়ে একাগ্রচিত্ত, কেহ কেবল কোমল
কাব্য চর্চায় সতত নিরত। কেহ আবার অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সতত সংগীত
শিক্ষায় উন্নত। যে বিজ্ঞায় যাহার অধিক অনুরাগ জন্মে, সেই বিজ্ঞাতেই
তাহার অধিক অধিকার জন্মে, ইহাও সর্বসম্মত সত্য। কিন্তু কেন ঐরূপ
হয়? মানবগণের বিজ্ঞাবিশেষে অধিক অনুরাগ ও অধিকারের মূল কি?
ইহা বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে পূর্বজন্মে তাহার সেই বিজ্ঞার বিশেষ অভ্যাস
বা অনুশীলন জন্ত সংস্কারবিশেষই উহার মূল বলিয়া স্বীকার্য্য।

শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে মনুষ্যস্বরূপে
সকল মনুষ্য তুল্য হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞা ও মেধার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ
আছে। মনোযোগপূর্বক কোন বিজ্ঞার অভ্যাস করিলে সেই বিষয়ে প্রজ্ঞা
ও মেধার বৃদ্ধি হয়, ইহাও পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং কোন বিজ্ঞার অভ্যাস
বা অনুশীলন যে, সেই বিজ্ঞাবিশয়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধির কারণ ইহা অবশ্য
স্বীকার্য্য। তাহা হইলে যে সমস্ত মানবের ইহজন্মে কোন বিজ্ঞার অনুশীলনের
পূর্বে অথবা প্রারম্ভেই সেই বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ এবং প্রজ্ঞা ও মেধার
উৎকর্ষ বুঝা যায়, তাহাদিগের সেই বিষয়ে পূর্বজন্মের অভ্যাসই উহার কারণ
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সে বিষয়ের অভ্যাস বা অনুশীলন
ব্যতীত কখনই তাহাতে কাহারই বিশেষ অধিকার জন্মিতে পারে না, কারণ
ব্যতীত কার্য্য জন্মে না।

ফল কথা, মানববিশেষের যে বিজ্ঞাবিশেষে অত্যন্ত অনুরাগ এবং অল্প
উপদেশেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে বিশেষ অধিকার, তাহা তাহার
পূর্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেই বিষয়ে কিছু
উপদেশ পাইলেই তখন তদ্বারা তাহার সেই প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া

আর যে কালিদাস “কুমার-সম্ভবে” ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবিত্বশক্তিও ত কেবল ঐহিক সংস্কার নহে। ইহজন্মে শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা ত সকলে তাঁহার শ্রায় কাব্য রচনা করিতে পারেন না। মহামনীষী মন্মথ ভট্টও “কাব্য-প্রকাশের” প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

“শক্তিঃ কবিত্বগীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ। যাং বিনা কবিত্বং ন প্রদরেৎ,
প্রসূতঃ বা উপসহনীযঃ শ্রায়ঃ ॥”

কবিত্বের বীজরূপ সংস্কারবিশেষই কবিত্বশক্তি। উহা কেবল ঐহিক সংস্কার নহে। উহার মধ্যে প্রাক্তন সংস্কারই মূল ও প্রধান। ঐ শক্তি বা সংস্কার না থাকিলে কবিত্বের প্রকাশ বা কাব্যরচনা সম্ভবই হয় না। কবির কাব্যরচনায় যে শক্তি অত্যাৱশ্যক, তাহাকে বলে কবির কর্তৃত্বশক্তি। আর তাহার ঐ কাব্য বৃত্তিতে যে শক্তি অত্যাৱশ্যক, তাহাকে বলে বোদ্ধৃত্ব শক্তি। উহাও সংস্কারবিশেষ। উহা না থাকিলেও কাব্য বুঝা যায় না। তাই যাহার ঐ বোদ্ধৃত্ব শক্তি নাই, তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট কাব্যও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। সকলেই কাব্য-রসের আশ্বাদ বা অনুভব করিতে পারেন না। যাহাদিগের সে বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার উদ্ভূত হয়, সেই সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তিই কাব্যের রসাস্বাদ করিতে পারেন।

ফলকথা, কাব্যের রসাস্বাদে যেমন প্রাক্তন সংস্কারও আবশ্যক, তদ্রূপ কাব্য-রচনাতেও প্রাক্তন সংস্কারও আবশ্যক। অনেক ব্যক্তির যে সহস্রা-অদ্ভুত কবিত্বের প্রকাশ হয়, তাহাতে তাঁহাদিগের বিজাতীয় প্রাক্তন সংস্কারই প্রধান কারণ। এই যে সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে কত কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকবি এবং কত স্ত্রীকবি কত স্থানে কত প্রকারে সংস্কৃত ভাষায় অতিশীঘ্র বহু বহু সৃষ্টি সমগ্রা পূরণ করিয়া অত্যদ্ভুত কবিত্বের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং এই বঙ্গভূমিতে বহু বহু অপণ্ডিত কবিও বঙ্গভাষায় অশীঘ্র গুরুভাবপূর্ণ কত কত সঙ্গীতাদি রচনা ও সমগ্রাপূরণ করিয়া অতি বিস্ময়কর কবিত্বের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, উহা তাঁহাদিগের সে বিষয়ে পূর্বজন্মের বিজাতীয় সংস্কার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কেবল ইহজন্মে শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা তাহারই ঐরূপ শক্তিতে হইতে পারে না।

অনেকে বলেন যে, কবিত্বশক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতি ঈশ্বরদত্ত শক্তি। ঈশ্বরই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ঐগম্যস্ত শক্তি প্রদান করেন। আর নবজাত শিশুর যে, অহাংরেচ্ছা, তাহাও ত ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃই জন্মে। ঈশ্বরই তাহার জীবনরক্ষার্থ তখন তাহাকে ঐরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়া স্তন-পানাদিতে প্রবৃত্ত করেন। তাহার জীবন রক্ষার্থ তাহার যাতার স্তন ও তাহাতে দুগ্ধের সৃষ্টিও ত তিনিই করিয়াছেন। সুতরাং নবজাত শিশুর স্তনপানাদি বিষয়ে যে ইচ্ছা, তদ্বারাও পুরুজন্ম সিদ্ধ হইতে পারে না।

এতদ্বস্তরে বক্তব্য এই যে, নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার্থ ঈশ্বরই তাহাকে স্তনপানাদিতে প্রবৃত্ত করেন, ইহা সত্য, কারণ, তিনিই সর্গজীবের সর্বকর্মের কার্যদাতা। তিনি কর্ম না করাইলে কোন জীবই কোন কর্ম করিতে পারে না। আর কবিত্বশক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতিও তিনিই প্রদান করেন, ইহাও সত্য। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, সর্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বর সকল মানবকেই কবিত্ব-শক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতি প্রদান করেন না কেন? এবং সর্বত্রই সর্বজীবকেই যথাসময়ে তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে সমুচিত আহার প্রদান করেন না কেন? আর তিনি কোন সময়ে অনভিজ্ঞ সরল শিশুকেও বিষলিপ্ত স্তনচোষণে অথবা দূষিত দুগ্ধাদি পানে প্রবৃত্ত করিয়া তাহার জীবনান্ত করেন কেন? আর তিনি বিজ্ঞ মনবগণকেও সময়ে অসাপু কর্ম করাইয়া দুঃখ প্রদান করেন কেন? অর্থ্যামিরূপে তিনিই ত জীবের সর্বকর্মে প্রেরক। সুতরাং ইহার সমাধান করিতে হইলে পুরুজন্ম স্বীকার করিয়া ইহাই বলিতে হইবে যে, পরমেশ্বর সমস্ত জীবের পূর্বজন্মকৃত কর্ম জন্ত ধর্মাদর্শানুসারেই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম করাইতেছেন এবং তাহার ফল দান করিতেছেন। সর্বজীবের বিচিত্র শরীর-সৃষ্টি ও তাহাদিগের পূর্বজন্মকৃতকর্মফল ধর্মাদর্শনিমিত্তক। তাই মহর্ষি গৌতমও পরে বলিয়াছেন—

“পূর্বকৃতফলানুবন্ধাতঃপত্তিঃ” [৩২৩০]

অর্থাৎ পূর্বজন্মের বিচিত্র কর্মফল ব্যতীত জীবের বিচিত্র শরীর সৃষ্টি হইতে পারে না। সকলেই সকল সময়ে স্বেচ্ছানুসারে জন্ম লাভ করিতে পারে না। অনন্ত জীবের যে অনন্ত বিচিত্র জন্ম ও তন্মূলক অনন্ত বিচিত্র অবস্থা, তাহা

অত্ৰ কোনৰূপেই উপপন্ন হয় না। মহৰ্ষি গৌতম পৰে বিচাৰ পূৰ্বক উক্ত বৈদিক সিদ্ধান্তেৰ সমর্থন কৰিয়া তদ্বাৰাও আত্মাৰ নিত্যত্ব সমর্থন কৰিয়া গিয়াছেন। কাৰণ, অনন্ত জীবেৰ অসংখ্য বিচিত্ৰ শৰীৰ-সৃষ্টিৰ কাৰণৰূপে প্ৰাক্তন কৰ্মফল অৱশ্য স্বীকাৰ্য্য হইলে সমস্ত জীকই যে, অনাদিকাল হইতে নিজে কৰ্ম্মানুসাৰে মানবজন্ম লাভ কৰিয়াও শুভাশুভ কৰ্ম্ম কৰিয়াছে ও কৰিতেছে, ইহাও অবশ্য স্বীকাৰ্য্য। সুতৰাং সমস্ত জীবাত্মাই যে অনাদি কাল হইতে বিজ্ঞান আছে, ইহাও স্বীকাৰ্য্য। তাহা হইলে সমস্ত জীবাত্মাই নিত্যত্বই স্বীকাৰ কৰিতে হইবে। কাৰণ, অনাদি ভাবপদাৰ্থ জীবাত্মাৰ যেমন উৎপত্তি নাই, তদ্রূপ বিনাশেৰ কোন কাৰণ না থাকায় কখনও বিনাশও সম্ভৱই নহে। জীবেৰ জন্মপ্ৰবাহ বা জগতেৰ সৃষ্টিপ্ৰবাহ যে অনাদি ইহা পূৰ্বে বলিয়াছি।

পৰন্তু ইহাও প্ৰাধানপূৰ্বক দুৰ্বা আশঙ্ক যে, কৰ্ম্মেৰ অভ্যাস বাতীত কোন জীকই কোন কৰ্ম্ম কৰিতে পাৰে না। আমৰা ইহজন্মেও কৰ্ম্মেৰ অভ্যাসবশতঃই অনেক কৰ্ম্ম কৰিতেছি। যে কৰ্ম্মেৰ অভ্যাস নাই, তাহা কৰিতে পাৰি না। আবার যে সমস্ত কৰ্ম্ম অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা ইচ্ছা কৰিলেও পৰিত্যাগ কৰিতে পাৰি না। এইরূপ সমস্ত জীকই নিজেৰ অভ্যাসানুসাৰেই নানা কৰ্ম্ম কৰিতেছে। সুতৰাং সমস্ত জীকই যে পূৰ্বজন্মেৰ অভ্যাসবশতঃ নানা বিচিত্ৰ কৰ্ম্ম কৰিতেছে, ইহাও স্বীকাৰ্য্য। নচেৎ জীবেৰ কৰ্ম্মবিশেষে অধিক অনুৰাগ এবং বাল্যকাল হইতেই সেই কৰ্ম্মে অধিক প্ৰবৃত্তিও কখনই সম্ভৱ হইতে পৰে না। পিতাৰ হৰিনামে ৰুচি নাই, কিন্তু তাহাৰ তিন বৎসৰ বয়সেৰ পুল হৰিনাম শুনিবলৈ হাতে তালি দিয়া নৃত্য কৰে, ইহা আমৰাও দেখিয়াছি। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন সেই বালক ঐরূপ কৰে? ইহাৰ উত্তৰে নাস্তিক যতই তৰ্ক কৰিবেন, সেই সমস্ত কুতৰ্কেৰ কুজাপি প্ৰতিষ্ঠা হইবে না। পৰন্তু বিচাৰেৰ অসহ কশাধাৰে চূৰ্ণবিচূৰ্ণ হইয়া সেই সমস্ত তৰ্কই উড়িয়া যাইবে। কুতৰ্কেৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত সত্যেৰ অপলাপ কৰা যায় না। প্ৰকৃত সত্য এই যে, ঐ বালক তাহাৰ পূৰ্বজন্মেৰ অভ্যাস ও তনুলক স্মৃতি সংস্কৰ বশতঃই ঐরূপ কৰে। তখন তাহাৰ সেই প্ৰাক্তন সংস্কাৰ উদ্বুদ্ধ হয়। নচেৎ আৰু কোন কাৰণেই তাহাৰ ঐরূপ কাৰ্য্য সম্ভৱ হইতে পাৰে না।

আর এই বে, অনাদিকাল হইতে কত মানব নিরত অধ্যয়ন, দান ও তপস্বাদি কর্ম করিতেছে, তাহাও তাহাদিগের পূর্বজন্মের অভ্যাস বশতঃই করিতেছে। পিতার অধ্যয়নে অমুরাগ নাই, কোন বিদ্যাও নাই; কিন্তু পুত্র স্বেচ্ছায় সতত অধ্যয়নে নিরত। আবার বদ্ধমুষ্টি পিতার বালক-পুত্রও সতত দানে মুগ্ধহস্ত, ইহাও দেখা যায়। পিতা-মাতার সহস্র তিরস্কার ও বাধা সহ করিয়াও ভাগ্যবান পুত্র সতত তপস্বা ও ভগবদ্ভ্যানে নিরত, ইহারও বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন তাহারা ঐরূপ অধ্যয়ন, দান ও তপস্বা করে? সমস্ত মানবই বা তুল্যভাবে কেন ঐ সমস্ত সাধু কর্ম করে না? ভারতের শাস্ত্রবিদ্বাসী পূর্বাচার্যগণ সম্বন্ধে ইহার উত্তর বলিয়া গিয়াছেন—

“জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।

তেনৈবাব্যাসযোগেন তচ্চৈবাব্যাসতে নর ॥”

(“ভাষ্যী” টীকা (২।১।৩৪) বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃত বচন)

বস্তুতঃ মানবের জন্মে জন্মে যেরূপ দান, অধ্যয়ন ও তপস্বাদি সাধু কর্ম এবং হিংসা প্রভৃতি অসাধু কর্ম অভ্যস্ত, মানব সেই পূর্বাভ্যাস বশতঃই তদনুরূপ সাধু বা অসাধু কর্ম করিতে বাধ্য হয়, ইহাই সত্য। শ্রীভগবান্ও— এই মহাসত্য প্রকাশ করিতে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—“পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হুবিশোহপি সঃ।” (গীতা ৬।৪৪)। পূর্ব পূর্ব জন্মে সাধু বা অসাধু কর্ম করিতে করিতে তদবিষয়ে যেরূপ দৃঢ় সংস্কার জন্মে, পরজন্মে সেই সংস্কার উদ্ভূত হইয়াই মানবকে তজ্জাতীয় সাধু বা অসাধু কর্মে প্রবৃত্ত করে। শিশুপাল ইহজন্মেও পূর্ব পূর্ব জন্মের স্থায় জগতের পীড়ন করিয়াছিলেন, ইহার কারণ ব্যক্ত করিতে “শিশুপালবধ” কাব্যে মহাকাবি মাধব বলিয়াছেন—

“সতী চ যৌষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা।

সুমাংসমভ্যতি ভবান্তরেষপি।” ১।৭২।*

* উক্ত শ্লোকে “সতী চ যৌষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা”—এইরূপ পাঠ মহানিখিলের সম্মুখ বৃদ্ধা য়। কিন্তু “সাহিত্যদর্পণের” দশম পরিচ্ছেদে বিখ্যাত কবিরাজ “সতী চ যৌষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা”—এইরূপ পাঠের উল্লেখ করিয়া উক্ত শ্লোকে “দীপক” অলঙ্কারের উদ্বরণ প্রদর্শন

অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মাহরেও সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। শিশুপালের ঐরূপ প্রকৃতি বা স্বভাব তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের অভ্যাসজনিত সংস্কার-মূলক, ইহাই কবির বিবক্ষিত। ফল কথা, প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জীবের বিচিত্র প্রকৃতি বা কর্মপ্রবৃত্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং জীবের নানাবিধ প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি এবং তন্মূলক নানাবিধ কর্মদ্বারাও জীবের প্রাক্তন সংস্কার অনুমান-সিদ্ধ হয়। প্রাক্তন সংস্কার যে উহার ফল দ্বারা অনুমেয়, এই সিদ্ধান্ত স্মৃতিরূপ হইতেই ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশের প্রথম সর্গে মহামনা দিলীপের রাজ্যোচিত মন্ত্রগুপ্তির বর্ণন করিতে ঐ সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন—

“ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।”

বস্তুতঃ জীবের প্রাক্তন কর্ম যখন অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন জন্মান্তর-বাদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই উহা আমাদিগের সর্বশাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত। জীবের প্রাক্তন কর্ম ও জন্মান্তর—এই দুই মহাসত্যের বজ্রভিত্তির উপরে আমাদিগের সনাতন ধর্মের মহিমময় মহামণ্ডপ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। তবে প্রশ্ন হয় যে, পূর্বজন্মানুভূত কোন কোন বিষয়ের স্মরণ হইলে সমস্ত বিষয়েরই স্মরণ কেন হয় না, আমরা পূর্বজন্মে—কে ছিলাম, কোথায় কিরূপ ছিলাম, ইত্যাদি কোন বিষয়ই আমরা কেন স্মরণ করিতে পারি না। *

এতদ্বত্তরে পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবের যে জন্মে যে প্রাক্তন সংস্কার উদ্ভূত হয়, তাহাই তাহার সেই বিষয়ে স্মৃতি উৎপন্ন করে। উদ্ভূত সংস্কারই

করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পাঠে দুইটি “চ” শব্দের দ্বারা সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি এই উভয়েরই সমান প্রাধান্য বুঝা যায়। পরন্তু প্রকৃত স্থলে সতী স্ত্রীর সহিত শিশুপালের অসতী প্রকৃতির উপমাও কবির অতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় না।

* গর্ভোপনিষদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, নবম মাসে মাতৃগর্ভস্থ জীব যোগীর স্নায় পূর্ব পূর্ব ক্রম স্মরণ করিয়া অনেক অনুতাপ করে এবং চিন্তা করে যে, এবার যদি এই যোগি হইতে মুক্ত হই, তাহা হইলে সেই সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করিব। কিন্তু ভূমিষ্ট হইলেই তখন আবার বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ঐ সমস্ত ভুলিয়া যায়। গর্ভোপনিষদের ঐ কথা অনুসারেই শাস্ত্র বিবাসী শাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—“ছিলাম গর্ভে যখন যোগী তখন, তুমি পড়ে খেলায় যাটি”।

স্বৃতির কারণ। যে সমস্ত সংস্কার অভিভূত থাকে—তাহা কোন স্বৃতি জন্মাইতে পারে না। সংস্কার থাকিলেই যে সর্বদা সর্ববিষয়ে স্বৃতি জন্মিবে, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। আমরা ইহজন্মে অনুভূত সমস্ত বিষয়েরও কি সর্বদা স্মরণ করিতেছি? আবার ইহজন্মে অনুভূত কত কত বিষয়ও যে, আমাদের বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। গুরুতর পীড়া বশতঃ অনেকে অনেক স্মরণিচিত ব্যক্তিকেও এবং অনেক পরিজ্ঞাত বিষয়ও ভুলিয়া যায়। ক্রমে আবার সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে। এইরূপ জীবের মৃত্যু হইলে তখন সেই মৃত্যুই তাহার অনেক স্মৃচ্ সংস্কারও অভিভূত করে। কিন্তু পুনর্জন্ম বা দেহান্তরপ্রাপ্তি হইলে তখন আবার অনেক প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। যাহা সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহাকে সংস্কারের উদ্বোধক বলে। সেই উদ্বোধক বহু প্রকার। মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনে (৩৮৮১ সূত্রে) স্বৃতির কারণ সংস্কারের সেই সমস্ত উদ্বোধকের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বশেষে ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্টেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, বহুস্থলে জীবের অদৃষ্টবিশেষও তাহার সংস্কারবিশেষের উদ্বোধক হইয়া থাকে। যেমন নবজাত শিশুর জীবনরক্ষক অদৃষ্টবিশেষই তাহার স্তন্যপানাদি বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধক হয়। এইরূপ যে স্থলে অল্প কোন উদ্বোধক নাই, কিন্তু সংস্কারের উদ্বোধ হইয়াছে, সেখানে অদৃষ্ট-বিশেষকেই সেই সংস্কারের উদ্বোধক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ফল কথা, ইহজন্মে অনুভূত বহু বহু বিষয়েও যেমন সংস্কার থাকিলেও উদ্বোধকের অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার সকল সময়ে সেই সমস্ত বিষয়ের স্বৃতি জন্মায় না, তদ্রূপ অসংখ্য প্রাক্তন সংস্কার বিত্তমান থাকিলেও উদ্বোধকের অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ না হওয়ায় তাহা সেই সমস্ত বিষয়ে স্বৃতি জন্মায় না। কিন্তু অনেক প্রাক্তন সংস্কার যে, সময়বিশেষে কোন উদ্বোধক বশতঃ উদ্বুদ্ধ হইয়া পূর্বজন্মানুভূত অনেক বিষয়েরও স্বৃতি জন্মায়, ইহা সত্য। এ বিষয়ে পূর্বে অনেক উদাহরণ বলিয়াছি। অল্পরূপ স্থলেও ইহার উদাহরণ বলিতেছি।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিদেশে কোন স্থানে আমার অপরিচিত কোন এক ব্রাহ্মণ কোন পথে দূর হইতে আমাকে দেখিয়াই আমাকে ডাকিয়া তাঁহার

বাসায় লইয়া তিন মাস পর্যন্ত আমাকে তাঁহার নিকটে রাখিয়াছিলেন এবং বহু সমাদর ও অচিন্তিত উপকার করিয়াছিলেন। আবার কোন মহারাজাধিরাজও আমার সুপরিচিত কোন দরিদ্র যুবককে কোন সময়ে পথে দেখিয়াই তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বহু সমাদর করিয়া তাহার অধ্যয়নের সমস্ত ব্যবস্থা ও তাহার পল্লীগ্রামের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা পর্যন্তও করিয়াছিলেন, ইহাও আমি জানি। সেই যুবকের নিজমুখেও আমি ঐ সমস্ত বিশ্বয়কর ব্যাপার শুনিয়াছি।

আর ইহা ত অনেকেই জানেন যে সময়বিশেষে কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলেও তখনই কাহারও তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রীতি জন্মে। কতকালের সুপরিচিত পরমাত্মীয়ের শ্রায় তাহার সহিত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয়; তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। তাহার উপকার করিতে উৎকট প্রবৃত্তি জন্মে। কেবল মহুশ্যের মধ্যে নহে পখাদির মধ্যেও ঐরূপ হইয়া থাকে, ইহা সত্য। কিন্তু কেন এমন হয়? ভারতের মনস্তত্ত্ববিৎ চিন্তাশীল শাস্ত্রবিদ্যাসী মনীষিগণ বুঝিয়াছেন যে, উক্তরূপ স্থলে সেই ব্যক্তি তাহার সেই দৃষ্ট ব্যক্তির সহিত তাহার পূর্বজন্মের আত্মীয়তা স্বরণ করে। তখন তাহার সে বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার উদ্ভূত হয়। তাহার তখন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্মৃতি না হইলেও সামান্যতঃ এই ব্যক্তি আমার আত্মীয় বা প্রিয়, এইরূপ অস্ফুট স্মৃতি অবশ্যই জন্মে। অনেক সময়ে অস্ফুটভাবে কাহারও তাহাকে পুত্র বা ভ্রাতা প্রভৃতি বলিয়াও মনে হয়। ঐরূপ কখনও কেহ কোন ব্যক্তি-শেষকে দেখিলেই সেই ব্যক্তির প্রতি তাহার সহসা অত্যন্ত অপ্রীতি জন্মে। তাহাকে ঘোর শত্রু বলিয়া মনে হয় এবং তাহার সহিত সহসা কলহ উপস্থিত হয় এবং তাহার সংসর্গ-পরিহারে এবং কখনও তাহার অপকারেও উৎকট প্রবৃত্তি হয়, ইহাও অনেকে জানেন। স্মরণ উক্তরূপ স্থলেও তাহার সেই ব্যক্তির সহিত পূর্বজন্মের শত্রুতা বিষয়ে অস্ফুট স্মৃতি জন্মে, ইহাই স্বীকার্য। নচেৎ তখন তাহার ঐরূপ অবস্থা বা ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না।

এইরূপ কোন সময়ে কোন স্থানে কোন স্মৃদ্ধ দর্শন বা স্মধুর সংগীতাদি শ্রবণ করিলে সুখী ব্যক্তিও সহসা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন, ইহাও অনেকেই জানেন। কিন্তু কেন ঐরূপ হয়, ইহা সকলে চিন্তা করেন না।

ভারতের মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ চিন্তা করিয়া উহার কারণ বলিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপস্থলে তখন সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কাহারও সহিত তাহার পূর্বজন্মের সৌহৃদ্য স্মরণ করে। ভারতের অমরকবি কালিদাস “অভিজ্ঞান-শকুন্তল” নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ভারতের রাজা দুহন্তের দ্বারা ঐ মহা সত্যের ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন --

“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশচনিশায়া শকান্
পযুৰ্যুৎসুকোভবতিষং স্মৃতিতোহপি জন্তুঃ ।
তচ্চেতসা স্মরতি নুনমবোধ পূৰ্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননাতুর-সৌজদানি ॥”

আবার ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত সহস্র সহস্র স্ত্রীগণ নৃপতির মধ্যে ইন্দুমতী অগ্নি রাজাকেই কেন বরণ করিয়াছিলেন? ইহা সমর্থন করিতেও কালিদাস ভারতের ঐ সনাতন সত্য প্রচারের জন্ত রঘুবংশে বলিয়াছেন—“মনোহি জন্মান্তর-সংগ তজ্জং” (৭.১৫) মনই জন্মান্তর সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। অর্থাৎ অজ রাজার দর্শনের পরেই তাহার সহিত ইন্দুমতীর পূর্বজন্মের সেই সম্বন্ধ বিষয়ে সূপ্ত সংস্কার প্রবুদ্ধ হইয়া তাহার স্মৃতি উৎপন্ন করিয়াছিল।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, কাহারও কি কখন ও কোন উপায়ে পূর্ব জন্মের সমস্ত বার্তার স্মরণ হইয়াছে? তাহা কি সম্ভব? আমরা দৃঢ় বিশ্বাসে বলি, অবশ্যই সম্ভব। কারণ, ভগবান মনু বলিয়াছেন—

“বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈসবচ ।

অদ্রোহেণচ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌরুষিকীং” । মনুসংহিতা—৪।১৪৮।

অর্থাৎ সতত বেদাভ্যাস, শৌচ, তপস্তা ও সর্বভূতের অহিংসার দ্বারা মানব পূর্বজন্ম স্মরণ করে। ঐহাদিগের পূর্বজন্মের স্মরণ হয়, তাহার শাস্ত্রে “জাতিস্মর” নামে কথিত হইয়াছেন। পূর্বকালে অনেক তপস্বী ও যোগী “জাতিস্মর” হইয়াছিলেন। পুরাণ এবং ইতিহাসে অনেক জাতিস্মরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। মহা তপস্বী জড়-ভরতের মৃগ-জন্মলাভ হইলেও তখনই পূর্বজন্মের স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই মৃগজন্মের পরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ হইলেও তখন তাহার সেই প্রাক্তন মৃগজন্মের সম্পূর্ণ স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টম ও নবম

অধ্যায় পাঠ করিলে ইহা জানা যাইবে। আর যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

“সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূৰ্ব্বেজাতিবিজ্ঞানম্।”—৩।১৮

অর্থাৎ পূৰ্ব্বেজন্মের সেই সমস্ত অনুভব জন্ত সংস্কার এবং শুভাশুভ কৰ্ম্মজন্ত ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মরূপ সংস্কার—এই দ্বিবিধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ হইলে পূৰ্ব্বেজন্মের বিশেষ জ্ঞান জন্মে। যোগী তাঁহার যোগশক্তি দ্বারা ঐ সমস্ত সংস্কারেই চিত্ত ধারণা করিতে পারেন। পরে তাঁহার ঐ ধারণাই ধ্যানরূপে পরিণত হয় এবং পরে ঐ ধ্যান সমাধিরূপে পরিণত হয়। সেই সমস্ত সংস্কারে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যোগীর ধারণা, ধ্যান ও সমাধির ফলে তাঁহার ঐ সমস্ত অতীন্দ্রিয় সংস্কারেরও অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং তখন যে দেশে ও যে কালে যে কারণে তাঁহার ঐ সমস্ত সংস্কার জন্মিয়াছিল, সেই সমস্ত দেশ এবং কালাদিরও অবগু অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং যোগী তখন পূৰ্ব্বে পূৰ্ব্বেজন্মে কোথায় কিরূপ ছিলেন, ইত্যাদি সমস্তই জানিতে পারেন। এইরূপ তিনি তাঁহার ভাবী জন্মও জানিতে পারেন। যোগীর পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব ইহা সমর্থন করিতে— ভগবান্ আবট্য ও মহর্ষি জৈগীষব্যের সংবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি জৈগীষব্য ভগবান্ আবট্যের নিকটে তাঁহার দশমহাকল্পের জন্ম-পরম্পরার জ্ঞান বর্ণন করিয়াছিলেন। সংসারে সুখের অপেক্ষায় দুঃখই অধিক, সংগ্রহই জন্ম ও সাংসারিক সুখাদি সমস্তই দুঃখময়, ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ পূৰ্ব্বেকালে যে সাধনাবিশেষের ফলে অনেক জাতিস্মরণ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ঋষিগণের পরীক্ষিত সত্য। তাই মন্বাদি ঋষিগণ ঐ সত্য প্রকাশ করিয়া উহার উপায়ও বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালেও গোতমবুদ্ধদেব বোধি-বৃক্ষতলে সঙ্ঘোষি লাভ করিয়া তাঁহার অনেক জন্মের বার্তা বলিয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের “জাতক” গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এখনও অনেক জাতিস্মরণ যোগী জীবিত আছেন—সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে জানি না। কোন কোন সময়ে কোন দেশে কোন জাতিস্মরণের সংবাদ এখনও শুনা যায়। অবগু জাতিস্মরণমাত্রই যে, তাঁহার সমস্ত পূৰ্ব্বেজন্মের সম্পূর্ণ স্মরণ করিয়াছেন, তাহা নহে। যাহার

যে রূপ সাধনার ফলে পূৰ্ণজন্মের যে সমস্ত সংস্কার উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমস্ত সংস্কারজ্ঞাত সেই সমস্ত বিষয়েই স্মরণ হইয়াছে। অনেক সাধারণ মানবেরও যে, পূৰ্ণজন্মের অধিক সংস্কার উদ্ভূত হয়, ইহাও তাহার ফলের দ্বারা ই বুঝা যায় এবং ধ্যান দ্বারা যে ক্রমে অনেক বিস্মৃত বিষয়েরও স্মরণ হয়, ইহাও সকলেরই স্বীকার্য্য। আমরা দিগেরও অনেক সময়ে এমন ঘটে যে, কোন ব্যক্তিকে দেখিলেই তখন মনে হয়, ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাকে কোথায় দেখিয়াছি এবং তাহার পরিচয় কি, ইত্যাদি কিছুই মনে হয় না। পরে সেই বিষয়ে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে ক্রমে কিছু কিছু মনে হয় এবং অনেক সময়ে দীর্ঘকাল ধ্যানের পরে সেই চিস্তিত বিষয়ের সম্পূর্ণ স্মৃতিও হয়। এইরূপ যে যোগী তাঁহার সমস্ত প্রাক্তন সংস্কারেরই দীর্ঘকাল ধ্যান করিতে সমর্থ এবং সেই ধ্যান তাঁহার সেই সমস্ত বিষয়ে সমাধিক্রমে পরিণত হয়, তিনি যে কালে, সেই সমস্ত সংস্কারের প্রত্যক্ষই করিবেন, ইহা অসম্ভব হইতে পারে না। যোগশক্তির অসামান্য অদ্ভুত প্রভাবে সমস্তই হইতে পারে। সুতরাং যোগবলে সমস্ত পূৰ্ণজন্মের আলৌকিক প্রত্যক্ষও হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য্য। ফল কথা, যে রূপ সাধনার দ্বারা পূৰ্ণজন্মবার্তা জানিতে পারা যায়, তাহার অভাবেই সকলে উহা জানিতে পারে না। সাধনাবিশেষের দ্বারা অনেকেই উহা জানিয়াছেন অনেক যোগী যোগ-প্রভাবে সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজের সমস্ত পূৰ্ণজন্মের দ্বারা অপরের সমস্ত পূৰ্ণজন্মও জানিয়াছেন। আর যিনি নিত্য সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বদাই তাহা জানিতেছেন। তাই তিনি অজ্ঞানকে বলিয়াছিলেন—

বহুনি মে ব্যাতাতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তাং হং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেথ গরম্প ॥ গীতা ৪৫

পূৰ্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আত্মা দেহাদিভিন্ন ও নিত্য এই সিদ্ধান্তের মনন করিলে পূৰ্বজাত শ্রবণ-রূপজ্ঞান জ্ঞাত সংস্কার দূত হয়। তাহার পরে যোগশাস্ত্রোক্ত উপায়ে উক্তরূপে আত্মার ধ্যানাদি করলে সময়ে সেই মুমুক্শু যোগীর পূৰ্বোক্তরূপেই নিজের আত্মার আলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু ইহাও সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে চিত্তশুদ্ধি ও বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তিলাভে অধিকারই হয় না। সুতরাং মুক্তিলাভে অধিকারলাভের

জ্ঞান প্রথমে বহু কর্তব্য আছে। শ্রায় দর্শনে পরে (৪।২।৪৬) মহর্ষি গৌতমও তাহা বলিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ ও বলিয়াছেন—“আত্ম-কর্ম্মস্থ মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ” (৬২।১৬) অর্থাৎ মুক্তি-সম্পাদক সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলেই মোক্ষ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। মহামন্যবী শঙ্কর মিশ্র ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় কণাদোক্ত “আত্মকর্ম্মস্থ”—এই বহু বচনান্ত পদের দ্বারা মুমুকুর কর্তব্য শ্রবণ মননাদি ও শমদমাদি সম্পত্তির সহিত ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ও নিজের আত্ম সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে পরমাত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুমুকুর মুক্তিনাভেদ চরম কারণ আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। সুতরাং সেই পরমাত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে জ্ঞান প্রথমে তাঁহারও শ্রবণ ও মননরূপ উপাসনা কর্তব্য। তাই শ্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ সেই পরমাত্মা ঈশ্বরের মননরূপ উপাসনার জ্ঞান ঈশ্বর বিষয়েও বহু অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। মহা নৈয়য়িক উদয়নাচার্য্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোব্যো মন্তব্যঃ” - ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “আত্মন” শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকেও গ্রহণ করিয়া তাহারও যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা মননরূপ উপাসনা কর্তব্য, এবিষয়ে প্রমাণরূপে পরে স্মৃতি-বচনও উল্লেখ করিয়াছেন (১)। কিন্তু সংশয়ও পূর্বপক্ষের খণ্ডন ব্যতীত প্রকৃত সিদ্ধান্তের নির্ণয় সম্ভব না হওয়ায় মনন সম্ভব হয় না। তাই তিনি গৌতমতানুসারে বিচারপূর্বক পূর্বপক্ষ খণ্ডনও করিয়াছেন। উক্তরূপ মননই অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত “উহ নামক” প্রথ-সিদ্ধি। শ্রীমদব্যাচম্পতি মিশ্রও উহার উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ২)। মূলকথা জীবাত্মার শ্রায় পরমাত্মারও মনন শাস্ত্রসিদ্ধ। আর কণাদ ও গৌতমের মতে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই মুমুকুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার নহে। কারণ তাঁহারা বৈতান্দী। আবশ্যকবোধে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১। শ্রুতৌহি ভগবান্ বহুঃ শ্রুতি-স্মৃতি-তীতিহাস পুরাণাদিষু, ইদানীং সম্ভবোভবতি, শ্রোত্রব্যো মন্তব্য ইতি শ্রুতেঃ, “আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসসেনচ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগ মুক্তম” মিতীক্ষতেচ্চ। কুম্মাঙ্গলি।

২। উহন্তকঃ আগমাবিরোধিচ্ছানেনাগমার্শ-পরীক্ষণং সংশয়-পূর্বপক্ষনিরাকরণেনোত্তর পক্ষ স্বাবস্থাপনং, তদ্বদং মনন মাচক্ষতে আগমিনঃ। সাংখ্যতত্ত্ব কোমুদী ৫১।

চতুর্থ অধ্যায় ।

কণাদ ও গৌতম দ্বৈতবাদী

অদ্বৈত মতনিষ্ঠ কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিও বলেন যে, কণাদ এবং গৌতমেরও অদ্বৈতবাদই চরমসিদ্ধান্ত । তাঁহারাও অদ্বৈতবাদী । ব্যাখ্যা-কর্তারা অশ্রুত ব্যাখ্যা করিলেও তাঁহাদিগের অনেক সূত্রের দ্বারাও অদ্বৈতবাদই স্পষ্ট বুঝা যায় । কথটা কিন্তু নূতন নহে ।

কারণ, রঘুনাথ শিরোমণির ও পরে অদ্বৈতবাদ-সমর্থক কাশ্মীরক সদানন্দ যতি তাঁহার “অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে (১) দ্বৈতমতের প্রতিপাদক গিভিন্ন দর্শনকার ঋষিগণেরও সকলেরই অদ্বৈতবাদেই চরম তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে । কারণ, তাঁহারা সকলেই সর্বজ্ঞ, সূতরাং অভ্রাণ্ড । কিন্তু বাহ্যদৃষ্টি-তৎপর স্থূলদর্শী ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা নানাভাবে দ্বৈতমত প্রতিপাদক নানা দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । তদ্বারা স্থূলদর্শী বাহ্যদৃষ্টি-তৎপর ব্যক্তিদিগের নাস্তিকানিবৃত্তি করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য । কিন্তু ঐ সমস্ত দর্শনে তাঁহাদিগের উপদিষ্ট দ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তরূপে তাঁহাদিগের বিবক্ষিত নহে । তাঁহাদিগেরও অদ্বৈতবাদই সিদ্ধান্ত ।

কাশ্মীরক সদানন্দ যতির গ্রন্থে বঙ্গের গৌরবরবি মধুসূদন সরস্বতীও ‘মহিষ্যঃ স্তোত্রোঃ “জয়ী সাংখ্যং যোগঃ”—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বেদাদিসর্ব-শাস্ত্রগ্রন্থানভেদের বর্ণন করিয়া সর্বশেষে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়প্রদর্শনোদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তেই সর্বশাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য । কিন্তু প্রথমেই অদ্বৈতমার্গে সকলের প্রবেশ অসম্ভব বলিয়া অধিকারিবিশেষের জ্ঞান নানা শাস্ত্রে নানা মতের উপদেশ হইয়াছে । মহামনীরীষী মধুসূদন সরস্বতী গৌতমাদি

১ । সর্বসাং গ্রন্থানকর্তৃণাং মুনির্নান্য বক্ষ্যমাণবিবর্তাদ এব পর্য্যবসন্নেনাধিতীয়ে পরমেশ্বর এব বেদান্তপ্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যম্ । ন হিতে মনয়ো ভ্রান্তান্তর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বাৎ—কিন্তু বহিঃসু-প্রবণান্যাপ্যাত্তঃ পরমপুরুষার্থেইদ্বৈতমার্গে প্রবেশোন সম্ভবতীতি নাস্তি মন্যিবিরণায় তৈঃ গ্রন্থানভেদা দর্শিতা—ন তু তাৎপর্য্যেণ । --“অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি” প্রথমমূলঃ ।

ঋষিগণের কোন হুত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সদানন্দ যতি ঐ উদ্দেশ্যে শেষে গৌতমের দুইটি হুত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং নব্য-বৈয়াকরণ নানেশভট্টও সেই হুত্র উদ্ধৃত করিয়া কল্পনাবলে গৌতমের অদ্বৈতমতেই চরম সম্মতি বলিয়াছেন। সে সব কথা পরে বলিব।

কিন্তু এখানে প্রথমে বলা আবশ্যিক যে, পূর্বোক্তভাবে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়-ব্যাখ্যার দ্বারা কখনই সকল সম্প্রদায়ের চিরবিবাদ-নিবৃত্তির আশা নাই। কারণ, সকল সম্প্রদায়ই তাঁহাদিগের অভিমত মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া অগ্রাগ্র আৰ্হমতের পূর্বোক্তরূপ একটা উদ্দেশ্য বলিতে পারেন। সদানন্দ যতির পূর্বে নব্যসাংখ্যাচাৰ্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুও সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের প্রারম্ভে তাঁহার নিজ মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া উহার বিরুদ্ধ শ্রায়-বৈশেষিকা দি শাস্ত্রোক্ত মতের পূর্বোক্তরূপ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐরূপ সমন্বয়-ব্যাখ্যা কি অগ্র সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তথবা কখনও করিবেন? সদানন্দ যতিও ত নিজমত সমর্থনের জন্ত বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত কোন বচন উদ্ধৃত করিয়াও তাঁহার অভিমত সমন্বয়ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। কারণ, বিজ্ঞানভিক্ষু সদানন্দ যতির অভিমত অদ্বৈতমতকে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি উক্ত মতের খণ্ডনই করিয়াছেন।

ফল কথা, সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই যখন তাঁহাদিগের আচাৰ্য্যোক্ত মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং কোন সম্প্রদায়ই তাঁহাদিকে নিম্নাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন না তখন পূর্বোক্তভাবে সমন্বয়-ব্যাখ্যা ব্যর্থ। তাই ভগবান্ শঙ্করাচাৰ্য্যও ঐভাবে সমন্বয়-ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি সমস্ত ঋষিকেও তাঁহার শ্রায় অদ্বৈতবাদী বলিয়াও নিজ মত সমর্থন করেন নাই। পরন্তু তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রথমঃত্র-ভাষ্যে আত্মার স্বরূপবিষয়ে নানা মতভেদ প্রকাশ করিতে দ্বৈতবাদী ঋষিদিগের মতও প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরেও উক্ত বিষয়ে কপিল ও কণাদ প্রভৃতির দ্বৈতমত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠার জন্ত সেই সমস্ত আৰ্হমতেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীমদবাচস্পতি মিশ্রও কণাদ ও গৌতমের মত-ব্যাখ্যায় তাঁহাদিগের দ্বৈতমতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু তিনি “শ্রায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটিকা”

গ্রন্থে গৌতমের কোন কোন হুত্র দ্বারা অদ্বৈত মতের খণ্ডনও করিয়াছেন (১)। গৌতম যে অদ্বৈতবাদী নহেন, পরন্তু তিনি অদ্বৈতমতের বিরোধী, ইহা প্রতিপাদন করাই সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের উদ্দেশ্য। নচেৎ সেখানে তাঁহার ঐক্যে গৌতমের তাৎপর্যব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনই বুঝা যায় না।

পরন্তু বেদান্তদর্শনের চতুর্থ হুত্রভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর, যেখানে কোন অংশে নিজমত সমর্থনের জন্ত গৌতমের গ্রন্থদর্শনের “দুঃখ-জন্ম—” ইত্যাদি দ্বিতীয় হুত্রটি “আচার্য্য প্রণীত” বলিয়া সসম্মানে উদ্ধৃত করিয়াছেন সেখানেও “ভামতী” টীকায় শ্রীমদবাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, (২) গৌতমসম্মত তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু উক্ত স্থলে আচার্য্য শঙ্করের অভিমত নহে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপবিষয়ে আচার্য্য শঙ্কর গৌতমের মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ, গৌতম দ্বৈতাদী। সুতরাং তাঁহার মতে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না।

বস্তুতঃ মহর্ষি কণাদ ও গৌতমকে কখনই আমরা অদ্বৈতবাদী বলিয়া বুঝিতে পারি না। কারণ, অদ্বৈতমতে “জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ”। এক ব্রহ্মই প্রত্যেক জীবদেহে জীবভাবে অবস্থিত। সুতরাং সমস্ত জীবদেহেই জীবাত্মা বস্তুতঃ এক। কিন্তু জীবাত্মার উপাধি যে অন্তঃকরণ, তাহা প্রত্যেক জীবদেহে ভিন্ন এবং সুখ-দুঃখাদি সেই সমস্ত অন্তঃকরণেরই বাস্তবধর্ম্য। উহা আত্মার বাস্তব ধর্ম্য নহে। কিন্তু আত্মার উপাধি সেই অন্তঃকরণের ধর্ম্য সুখ-দুঃখাদিই আত্মাতে আরোপিত হয়, এজন্য ঐসমস্ত আত্মার উপাধিক ধর্ম্যনামে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে জীবাত্মা প্রত্যেক জীবদেহে ভিন্ন এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও সুখ-দুঃখাদিও সেই বিভিন্ন আত্মারই বাস্তব ধর্ম্য, ঐ সমস্ত অন্তঃকরণ বা মনের ধর্ম্য নহে। সুতরাং কণাদ ও গৌতমকে কিরূপে অদ্বৈতবাদী বলা যায়?—জীবাত্মা ও তাহার মুক্তির স্বরূপ ত বিষয়ে কণাদ-সম্প্রদায়ের মত প্রকাশ করিতে শারীরকভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ত বলিয়া

(১) গ্রন্থদর্শন চতুর্থ অঃ ১ম আঃ ১৯শ, ২০শ ও ৪১শ হুত্র ও তাৎপর্য্যটীকা দ্রষ্টব্য।

(২) তত্ত্ব জ্ঞানান্নিখ্যাত্তানাপার ইত্যেত্যবগ্ন্যত্রেণ হুত্রোপস্থাপঃ। নত্বকপাদসম্মতঃ তত্ত্বজ্ঞানবিহ সন্দতম্। “ভামতী”—১১১৪।

গিয়াছেন যে, (১) তাঁহাদিগের মতে জীবাশ্ম প্রতি শরীরে ভিন্ন, স্তত্রাং বহু এবং স্বভাবতঃ অচেতন, কিন্তু অতিস্থল মনের সহিত সংযোগবশতঃ সেই সমস্ত জীবাশ্মাতে জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি নববিধ বিশেষগুণ জন্মে এবং সেই সমস্ত বিশেষগুণের অত্যন্ত উচ্ছেদই তাঁহাদিগের মতে মুক্তি। বৃহদারণ্যকভাষ্যেও (৪।৩.২২) শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন—“যথেষ্টাদীনাশ্রয়শ্রুতঃ কল্পয়ন্তো বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ”।

অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা মহামনীষী মধুসূদন সরস্বতীও “ভগবদ্গীতা”র টীকায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের শ্রায় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের মতেও যে, জীবাশ্ম—জ্ঞান, স্মৃতি, হৃৎ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম এবং ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞান জগৎ সংস্কার, এই নববিধ বিশেষগুণবিশিষ্ট এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন নীত্য ও বিশ্বব্যাপী, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন (২)।

কিন্তু অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন কোন মহামনীষীও কণাদ ও গৌতমকে অদ্বৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা—জ্ঞান-স্মৃতি আশ্রয় ধর্ম, ইহা স্পষ্ট বলেন নাই এবং আশ্রয় নানাশ্রয় বা একত্ববিষয়ে গৌতম কোন কথা স্পষ্ট বলেন নাই, এইরূপ অনেক কথা লিখিয়াছেন (৩)।

১। “সতি বহুত্বং বিভূত্বং চ বটকুডাদিসমানাঃ দ্রব্যমাত্রাশ্রয়ঃ স্বতোহচেতনা আত্মানন্তরূপকরণাণি চাগ্নি মনাস্তচেতনানি। তদ্ব্যবস্থাপ্যং মনোদ্রব্যগাণ্ড সংযোগান্নবেচ্ছাদয়োঃ বৈশেষিকা আত্মগুণা উৎপত্তন্তে। তেচাচ্যতিক্রমণে প্রত্যেকমাত্মনঃ সমবয়স্তু, স সংসারঃ। তেষাং নবানামাত্মগুণা—নামত্যন্তানুংপাদো মোক্ষ ইতি কাণাদাঃ”। বেদান্তদর্শন ২।৩।৫০-হৃদয়ের শারীরক ভাষ্য।

২। “নবাত্মনো নীত্যত্বং বিভূত্বং চ ন বিবদামঃ, প্রতিদেহমেকবস্ত্র ন সহামহে। তথাহি, বুদ্ধি-স্মৃতি-হৃৎ-ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-ধর্ম-অধর্ম-ভাবনাত্মনববিশেষগুণবশতঃ প্রতিদেহং ভিন্না এবং নীত্য বিভবচাত্মান ইতি বৈশেষিকা মন্তন্তে। ইমমেব চ পক্ষং ত্যক্তিকমীমাংসকাদয়োহপি প্রতিপন্নঃ”। ভগবদ্গীতা—দ্বিতীয় অঃ, ১৪শ শ্লোকের টীকা।

৩। সর্বশাস্ত্রপারদর্শী মহামহোপাধ্যায় পূজাপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—“গৌতম ও কণাদ, জ্ঞান-স্মৃতি আশ্রয় ধর্ম, এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই।” “আত্মা নীত্যজ্ঞানধরূপ নহে বা নীত্যজ্ঞান নাই, ইহা গৌতম ও কণাদ বলেন নাই। টীকাকারেরা তাহা বলিয়াছেন। ধেরূপ বলা হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে স্বয়ংপূর্ণ বৃত্তিতে পারিবেন যে, শ্রায়াদি-দর্শনকর্তাদের মত বেদান্তমতের বিরুদ্ধ, ইহা বলিবার বিশেষ হেতু নাই। বলিতে পরা যায় যে, বেদান্তমত তাঁহাদিগের অতিমত। পরন্তু অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাবধানবিবক্ষন

কিন্তু তাহা হইলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী, কি কণাদ ও গৌতমের স্বত্র না দেখিয়াই অথবা উহার প্রকৃতার্থ না বুঝিয়াই কেবল ব্যাখ্যাকারদিগের কথানুসারেই পূর্বোক্ত ঐ সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন? ব্যাখ্যাকারদিগের ঐ সমস্ত মতই কি তাঁহাদিগের সেখানে খণ্ডনীয়? তাহা হইলে শারীরকভাবে কণাদসম্মত ‘আরম্ভবাদে’র খণ্ডন করিতে আচার্য্য শঙ্কর কণাদস্বত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন কেন? আর কণাদও গৌতমের স্বত্রের দ্বারা অদ্বৈত মত বুঝিতে পারিলে তিনি অদ্বৈতমত-সম্মানে তাহাও কি বলিতেন না?

স্বত্ততঃ কণাদ ও গৌতম যে দ্বৈতবাদী, ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। তাঁহাদের স্বত্রের দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহাদিগের অনেক স্বত্রের পধ্যালোচনা করা আবশ্যক। সংক্ষেপে তাহা স্বত্রভুক্ত করা যায় না। তথাপি এখানে আবশ্যকবোধে কিছু বলিতেছি। প্রাণঃ নপূরুষক বুঝিতে হইবে।

পূর্বোই বলিয়াছি যে, মহর্ষি গৌতম জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতিকে জীবাত্মার নিজেরই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন। তিনি যে স্মৃতির আশ্রয় বলিয়া দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ঐ স্মৃতিরূপ জ্ঞান যে, তাঁহার মতে আত্মার গুণ হইলেই উপপন্ন হয় নচেৎ ঐ স্মৃতির উপপত্তিই হয় না, ইহা তিনি “তদাত্মগুণত্বসদ্বাদপ্রতিবেঃ” (৩ : ১৪) এই স্বত্রের দ্বারা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি পূর্বোই বলিয়াছি। পরন্তু জ্ঞান যে, অন্তকরণ বা মনের গুণ নহে, ইহাও তিনি পরে স্পষ্ট বলিয়াছেন। এবং জ্ঞান আত্মারই ধর্ম, কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতি মনের ধর্ম, এই মত বিশেষেরও খণ্ডন করিয়া জ্ঞানজ্ঞাত ইচ্ছা প্রভৃতিও জ্ঞানের আশ্রয় আত্মারই ধর্ম, ইহাও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। (১) পরন্তু স্মরণরূপ

জ্ঞান-স্বখাদি আত্মধর্মরূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা তাঁহার বলিয়া বলেন নাই। তাদৃশ স্বল্প বিষয় শিষ্ট-গণ সহসা বুঝিতে পারিবে না, এই বিবেচনাতেই তাঁহার উহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন। “গৌতম আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই।” ফেলোসিপি’র লেকচার—পঞ্চম বর্ষ, ১৮০ পৃষ্ঠা।

১। “যুগপজজ্ঞেয়ানুপলক্ষে ন মনসঃ।

“জ্ঞেয়ত্বাৎস্বনিস্তত্বাদারম্ভনিবৃত্ত্যোঃ।”

“যথোক্তহেতুভাং পারলৌক্যাদকৃত্যভাগমাচ্চ ন মনসঃ।

“পরিশেষাদ যথোক্তহেতুপপত্তেচ্চ।”

স্মারদর্শন—ভূতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় অধিক, ১২শ-৩৪শ-৩৮শ ও ৩৯শ স্বত্র দ্রষ্টব্য।

জ্ঞান যে, চিরস্থায়ী আত্মারই বাস্তব ধর্ম, ইহা সমর্থন করিতে শেষে তিনি আবারও বলিয়াছেন—“স্বরূপস্থায়নোক্তস্বাভাব্যাং । (৩।১৪০) অর্থাৎ আত্মা জাত্ব স্বভাব। জ্ঞাতাই পূর্বে জানিয়াছে এবং পরে জানিবে এবং বর্তমান কালেও জানিতেছে। সুতরাং ত্রিকালীন জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানবত্তা চিরস্থায়ী জ্ঞাতা বা আত্মারই স্বভাব। অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম না হইলেও স্বকীয় ধর্ম—বাস্তব ধর্ম, উহা ঔপাধিক ধর্ম নহে। ফলকথা, মহর্ষি গৌতম শ্রায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে বিচারপূর্বক জ্ঞান যে, আত্মারই বাস্তব ধর্ম, উহা মনের ধর্ম নহে, ইহা সুস্পষ্ট সমর্থন করিয়াছেন। এবং পরে চতুর্থ অধ্যায়ে “প্রীতেরাশ্রয়ত্বাদ প্রতিবেধঃ” (৪।১৫১) ইত্যাদি শ্রুতের দ্বারা সূত্র ও ছন্দে যে, আত্মারই ধর্ম, ইহাও ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে তাঁহার উক্তরূপ মত অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, খুলিয়া বলেন নাই, এবং তাঁহার মত অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধ নহে, পরন্তু অদ্বৈতমত তাঁহারও অভিমত, এই সমস্ত কথা আমরা কিছতেই বুঝিতে পারি না।

পরন্তু মহর্ষি গৌতম শ্রায়র্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথমে আত্ম-পরীক্ষায় আত্মা, দেহাদি ভিন্ন ও নিত্য, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে যে সমস্ত যুক্তি বলিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার মতে জীবাত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, অর্থাৎ এক নহে—বহু, ইহাও সমর্থিত হইয়াছে। নচেৎ গৌতমের মতে অশ্রুত দৃষ্ট বিষয় আমি কেন স্বরণ করিতে পারি না? জীবের ভিন্ন ভিন্ন মন যে, স্বরণ করে না, স্বরণরূপ জ্ঞান যে মনের ধর্ম নহে, কিন্তু আত্মার বাস্তব ধর্ম, ইহাও ত গৌতম পরে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন। সুতরাং গৌতম যখন একের দৃষ্ট বিষয় অশ্রুত স্বরণ করিতে পারে না—এই সিদ্ধান্তানুসারে আত্মা দেহাদি ভিন্ন ও নিত্য, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন এবং স্বরণরূপ জ্ঞানকে আত্মারই ধর্ম বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে—আত্মা এক নহে,—আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন—বহু, ইহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। “শ্রায়বার্তিক”কার উদ্দ্যোতকরও গৌতমের শ্রুতানুসারে ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। (১)

১। বহুত্ব অতএব—“দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণঃ।” নাশ্বদৃষ্টমন্তঃ স্বরূপীতি। “শরীর-দ্বাহে পাতঙ্গাভাবা”দিত্তি, সেন্স সর্কাব্যবহা শরীরভেদে সত্ত্বতীতি।—শ্রায়বার্তিক।

আপত্তি হয় যে, সমস্ত জীবাশ্মাই যখন বিশ্বব্যাপী, তখন সমস্ত জীবদেহেই সমস্ত জীবাশ্মার সংযোগ-সম্বন্ধ আছে; তাহা হইলে অস্ত্রের দেহেও আমার আত্মাতে জ্ঞানাদি জন্মে না কেন? এতদ্বত্তরে মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন

শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোৎপত্তিনিমিত্তং কৰ্ম্ম । ৩২:৬৬ ।

তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বব্যাপী প্রত্যেক জীবাশ্মারই সমস্ত জীবদেহের সহিত সংযোগ থাকিলেও যে জীবাশ্মার অদৃষ্টবিশেষজ্ঞ তাহার যে শরীর-বিশেষের সৃষ্টি হয়, সেই শরীরের সহিতই সেই জীবাশ্মার বিলক্ষণ সংযোগ এবং তাহার সহিতই তাহার সেই মনের বিলক্ষণ সংযোগ জন্মে। তাহাতেও সেই অদৃষ্টবিশেষই নিমিত্ত। সেই অদৃষ্টবিশেষজ্ঞ যে শরীরের সহিত যে আত্মার ও মনের বিলক্ষণ সংযোগ জন্মে, সেই আত্মাকেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা বলে। শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই যখন জ্ঞানাদি জন্মে, তখন যে আত্মা, যে শরীরাবচ্ছিন্ন, সেই শরীরেই সেই আত্মাতে জ্ঞানাদি জন্মিবে; অথ শরীরের সহিত তাহার সংযোগ থাকিলেও সেই সমস্ত শরীর তাহার অদৃষ্টবিশেষজ্ঞ না হওয়ায় সেই আত্মা সেই সমস্ত শরীরাবচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং সেই সমস্ত শরীরে তাহাতে জ্ঞানাদি জন্মে না।

অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় গৌতমের উক্তরূপ উত্তর স্বীকার না করিলেও উক্ত সূত্রের দ্বারা গৌতমের মতে জীবাশ্মা যে, বিশ্বব্যাপী এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; নচেৎ তাহার উক্তরূপ উত্তর সঙ্গতই হয় না। ভাষ্যকার বাস্তুায়নও সেখানে গৌতমের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া তদনুসারেই তাহার ঐ উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু মহর্ষি গৌতম উহার পরে শুভাশুভ কর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও যে মনের গুণ নহে, উহাও আত্মারই গুণ, প্রত্যেক আত্মাই নিজকৃতকর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞাই নানাবিধ জন্মলাভ করে, ইহাও বিচারপূর্ব্বক স্পষ্ট সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে যিনি প্রত্যেক জীবদেহে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা স্বীকার করিয়া আত্মার বাস্তবভেদ স্বীকার করিয়াছেন এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তজ্জ্ঞাত সুখ ও দুঃখ, জীবাশ্মারই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন, আত্মার নিঃশব্দরূপ স্বীকারই করেন নাই, তাহাকে কিরূপে

অদ্বৈতবাদী বলা যায়? তাঁহার ঐ সমস্ত মত কি অদ্বৈতমতের একেবারেই বিরুদ্ধ নহে?

এইরূপ মহর্ষি কণাদের সূত্র দ্বারাও জীবাত্মা যে, প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। কিন্তু বুঝা যায়, তাহাও এখানে বলিতেছি। কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্বক বুঝিতে হইবে। বৈশেষিকদর্শনে কণাদ যথাক্রমে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন -

স্বথ-দুঃখ-জ্ঞান-নিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্ ॥ ৩।১১৯।

নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ ॥ * ৩২২০।

শাস্ত্র-সামর্থ্যাচ্চ ॥ ৩২২১।

কণাদ প্রথমে “স্বথ-দুঃখ—ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, শরীর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সমস্ত শরীরে আত্মা এক। কারণ, সমস্ত শরীরেই নির্বিশেষে স্বথ-দুঃখ ও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন আকাশে সর্বত্রই সমানভাবে শব্দের উৎপত্তি হওয়ায় শব্দের সমবায়িকারণ আকাশ এক বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ, আত্মাতেও সর্বশরীরেই স্বথ-দুঃখাদির উৎপত্তি হওয়ায় আকাশের তায় আত্মা ও বস্তুতঃ এক। উপাধিভেদে আকাশের ভেদের তায় আত্মারও ভেদ আছে, কিন্তু উহা কাল্পনিক ভেদ। কণাদ প্রথমে উক্ত পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়া পরে তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন—“নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ”। অর্থাৎ জীবাত্মা নানা, যেহেতু ব্যবস্থা আছে।

তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা আকাশের তায় এক বলা যায় না। কারণ, আত্মার ভেদসাধক বিশেষ হেতু আছে। আকাশের ভেদসাধক বিশেষ হেতু নাই। তাই কণাদ পূর্বে আকাশের একত্বসাধন করিতে সূত্র বলিয়াছেন—“শব্দলিঙ্গাবিশেষাদিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চ” (২২।৩০।) অর্থাৎ সর্বত্রই আকাশে শব্দ জন্মে। সুতরাং শব্দই আকাশের সাধক হেতু হওয়ায় আকাশের সাধক

* প্রচলিত “বৈশেষিকদর্শন” পুস্তকে “ব্যবস্থাতো নানা” এইরূপ সূত্র পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশস্তপাদভাষ্যের “তায়কন্দলী” টীকায় ব্রীধর ভট্ট এবং “হুত্তি” টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি “নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ”—এইরূপ সূত্রপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উহাই প্রকৃত সূত্রপাঠ বুঝা যায়। শঙ্করমিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও উক্তরূপ সূত্রপাঠ বুঝিতে পারা যায়।

হেতুর বিশেষ নাই এবং আকাশের ভেদসাধক কোন বিশেষ হেতুও নাই। এতএব আকাশ এক। কিন্তু আত্মার ভেদসাধক সূখ-দুঃখাদির ব্যবহাররূপ বিশেষ হেতু থাকায় আত্মা নানা, অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন। তাৎপর্য এই যে, সমস্ত জীবাত্মাতেই সূখ-দুঃখাদির উপপত্তি হইলেও তাহার “ব্যবস্থা” অর্থাৎ নিয়ম আছে। একের সূখ বা দুঃখ জন্মিলে তখন সকলেরই সূখ বা দুঃখ জন্মে না। কেহ যখন সূখী বা দুঃখী, তখন সকলেই সূখী বা দুঃখী নহে। এইরূপ কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ মূর্থ, কেহ পণ্ডিত, ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারে জীবাত্মার নানারূপ অবস্থার যে নিয়ম সর্বসম্মত, তাহাও জীবাত্মার ভেদসাধক হেতু। অর্থাৎ উহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন। কারণ, সমস্ত জীবদেহে একই আত্মা হইলে তাহার উক্তরূপ সূখ-দুঃখাদির ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপত্তি হয় না।

অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, আত্মার একত্বই শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন যুক্তির দ্বারাই ত আত্মার বাস্তব নানাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই মহর্ষি কণাদ পরে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—“শাস্ত্র-সামর্থ্যাচ্চ”। অর্থাৎ শাস্ত্রের সামর্থ্যপ্রযুক্তও আত্মা নানা (১)। তাৎপর্য এই যে, আত্মার নানাত্ব

১। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, কণাদের পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রের যোগে “ব্যবস্থাতঃ” “শাস্ত্র-সামর্থ্যাচ্চ” আত্মানো নানা—এইরূপ ব্যাখ্যাই তাঁহার অভিপ্রেত, কারণ, কণাদ তৃতীয় সূত্রে “চ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া উক্ত সূত্র যে তিনি দ্বিতীয় সূত্রোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্তই বলিয়াছেন অর্থাৎ ঐ সূত্রের দ্বারা আত্মার নানাত্ব সিদ্ধান্তেরই উপসংহার করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু কণাদের উক্ত সূত্রের দ্বারা ব্যবহারিক অবস্থায় আত্মা নানা, পরমার্থতঃ আত্মা এক, এইরূপ তাৎপর্য বুঝা যায় না। উক্ত সূত্রে ব্যবহারিক অবস্থার বোধক কোন শব্দপ্রয়োগও তিনি করেন নাই। পরন্তু দ্বিতীয় সূত্রে “আত্মানতঃ”—এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ করিয়াও আত্মার বাস্তব নানাত্বই যে তাঁহার সিদ্ধান্তরূপে স্থচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কাদিকার মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের স্বকৃতভাষ্যাদি পুস্তকে কণাদকেও অবৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত স্থলে কণাদের প্রথমোক্ত “সূখ-দুঃখ”—ইত্যাদি সূত্রটিকে তাঁহার সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ব্যবহারিক অবস্থায় আত্মা নানা, কিন্তু পরমার্থতঃ আত্মা এক, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কণাদেস্ত আকাশের একত্বপ্রতিপাদক সূত্রটির উল্লেখ করিয়া তুল্য যুক্তিতে কণাদের মতে আকাশের স্থার আত্মাও বস্তুতঃ এক, এইরূপ বলিয়াছেন। কণাদ কিন্তু আত্মার ভেদসাধক বিশেষ হেতু প্রদর্শন করিয়া আত্মা যে আকাশের স্থায় এক নহে, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্বে তাহা বলিয়াছি।

বোধক বহু শাস্ত্রবাক্যও আছে, যদ্বারা আত্মা যে নানা অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহাই বুঝা যায়; এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য আত্মার বাস্তব নানাত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ, কারণ, আত্মার বাস্তব নানাত্বই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু আত্মার একত্ব যুক্তিবাধিত, সুতরাং কোন শাস্ত্রই উহা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নহে। মহর্ষি কণাদ উক্ত সূত্রে “শাস্ত্র” শব্দের পরে যোগ্যতাবোধক “সামর্থ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, অর্থের যথার্থ-যোগ্যতা-জ্ঞান, যথার্থ শব্দবোধের কারণ; সুতরাং যে অর্থ অযোগ্য বা অসম্ভব, তাহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। সুতরাং যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য আত্মার একত্ব প্রতিপাদক বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার অগ্ররূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হইবে। সে কিরূপ, তাহা পরে বলিব।

পরন্তু কণাদ পরে বলিয়াছেন—“আত্মান্তরগুণানামাত্মান্তরগুণেষু কারণত্বাৎ” ৬।১।৫* প্রশস্তপাদভাষ্যের “শ্রায়কন্দলী” টীকাকার শ্রীধর ভট্ট এবং “সূক্তি” টীকাকার নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতিও কণাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি যে, জীবাশ্রয়ই গুণ, ইহার প্রমাণপ্রদর্শন করিতে কণাদের উক্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীধর ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দাতার দানজ্ঞ যে ধর্ম্ম, তাহা প্রতিগ্রহীতার ধর্ম্ম উৎপন্ন করে—এই মতের খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যেই মহর্ষি কণাদ উক্ত সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অগ্র আত্মার স্মৃ-জু-খাদি গুণ অপর আত্মার স্মৃ-জু-খাদি গুণের কারণ না হওয়ায় অগ্র আত্মাতে উৎপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ গুণ, অগ্র আত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ গুণের কারণ হয় না। শঙ্কর মিশ্র ও জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সরলভাবেই উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অগ্র আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি গুণ, অপর আত্মার স্মৃ-জু-খাদি গুণের কারণ হয় না। যে ব্যাখ্যাই হউক,—কণাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও স্মৃ-জু-খাদি যে, জীবাশ্রয়ই গুণ এবং জীবাশ্রয় যে, প্রতি শরীরে বস্তুতঃই ভিন্ন, ইহা তাঁহার উক্ত সূত্রের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। উক্ত সূত্রে দুইবার “আত্মান্তর” শব্দের প্রয়োগ দ্বারাও প্রত্যেক জীবদেহে জীবাশ্রয় বাস্তব

* প্রচলিত বৈশেষিকবর্ণন পুস্তকে “আত্মান্তর-গুণানামাত্মান্তরগুণেষু কারণত্বাৎ” এইরূপ সূত্রপাঠ আছে। শঙ্কর মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও ঐরূপ সূত্রপাঠ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু শ্রীধর ভট্ট ও জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ঐ সূত্রের পরভাগে “আত্মান্তর গুণেষু কারণত্বাৎ”—এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করায় ইহাই প্রাচীন সমস্ত ও দ্রুত পাঠ বলিয়া বুঝা যায়।

ভেদই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং আত্মার একত্বপ্রতিপাদন করিতে কণাদের পূর্বোক্ত “স্বথ-দুঃখ”—ইত্যাদি স্বত্রটি যে, তাঁহার পূর্বপক্ষ স্বত্র এবং তিনি পরে দুই স্বত্রের দ্বারা আত্মার একত্ববাদের খণ্ডন করিয়া নানাত্ববাদ বা দ্বৈতবাদই যে, সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য।

অরণ রাখা আবশ্যক যে, যে স্বত্র দ্বারা কোন পূর্বপক্ষ প্রকাশ করা হয়, তাহার নাম পূর্বপক্ষ-স্বত্র। সেই পূর্বপক্ষরূপ মত, স্বত্রকারের নিজমত নহে। উহা তাঁহার খণ্ডনীয় মতান্তর। সুতরাং যে সমস্ত স্বত্র পূর্বপক্ষস্বত্র বলিয়াই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, তাহাও সিদ্ধান্তস্বত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে অশ্রান্ত স্বত্রের সামঞ্জস্য কখনই হইতে পারে না। কারণ, স্বত্রকারের খণ্ডিত বা অসম্মত মতকেও তাঁহার মত বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনরূপেই তাহার সমস্ত সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।—আবশ্যকবোধে এখানে ইহার আর একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি—

মহর্ষি গৌতম শ্রায়দর্শনে দুইটি স্বত্র বলিয়াছেন—

স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ-প্রমাণপ্রমেয়াভিমানঃ ॥ ৪১২:৩১ ॥

মায়া-গন্ধর্কনগর-মৃগতৃষ্ণিকাবদ্বা ॥ ৪১২:৩২ ॥

উক্ত দুই স্বত্র দ্বারা গৌতম পূর্বপক্ষরূপে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যেমন স্বপ্নে বিষয় না থাকিলেও তাহার অভিমান বা ভ্রম হয়, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমেয় না থাকিলেও তাহার ভ্রম হয়। অথবা যেমন ঐন্দ্রজালিকের মায়া বশতঃ দৃষ্ট সেই সমস্ত বিষয় না থাকিলেও দর্শকদিগের সেইরূপ ভ্রম হয় এবং আকাশে গন্ধর্কনগর না থাকিলেও গন্ধর্কনগর বলিয়া ভ্রম হয়, এবং মরীচিকা জল না হইলেও জল বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমেয় বলিয়া কোন পদার্থ বস্তুতঃ না থাকিলেও ইহা প্রমাণ, ইহা প্রমেয়, এইরূপ ভ্রম হয়। অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার শ্রায় জাগ্রদবস্থায় অন্তর্ভূত সমস্ত বিষয়ও অসৎ, সুতরাং সেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানও ভ্রম। স্বপ্নাদিস্থলের শ্রায় সর্বত্রই অসত্যেরই ভ্রম হইতেছে। গৌতম পরে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে স্বত্র বলিয়াছেন—

“হেতুভাবাদিসিদ্ধিঃ” (৪১২:৩৩)। অর্থাৎ হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বোক্ত মত সিদ্ধ হইতে পারে না। গৌতম পরে আরও কতিপয় স্বত্রের দ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন

করিয়াছেন। সুতরাং তাহার পূর্বোক্ত দুইটি হত্র যে, পূর্বপক্ষ হত্র, ইহা নিঃসন্দেহেই বুঝা যায়। সমস্ত ব্যাখ্যাকারও তাহাই বুঝিয়াছেন।

কিন্তু “অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি” গ্রন্থে কাশীরক সদানন্দ যতি গৌতমেরও অদ্বৈত মতই চরম সিদ্ধান্ত, ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে শেষে গৌতমের পূর্বোক্ত দুইটি হত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদনুসারে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন কোন মহামনীষীও ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন (১)। কিন্তু আমরা ইহা একেবারেই বুঝিতে পারি না। কারণ, পূর্বপক্ষ-হত্রের দ্বারা হত্রকারের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায় না। গৌতম পূর্বপক্ষরূপে যে মতের প্রকাশ করিয়া পরে বিচারপূর্বক উহার খণ্ডন করিয়াছেন, সেই মতই তাঁহার সিদ্ধান্ত মত, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। পরন্তু গৌতমের ঐ দুই হত্রোক্ত মত যে, বেদান্তের অদ্বৈত মতই নিশ্চিত, ইহাও ত আমরা বুঝিতে পারি না। স্বপ্ন এবং মায়াদি দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়াও তাহা বুঝা যায় না। কারণ, যাহারা বিজ্ঞানমাত্রবাদী, যাহাদিগের মতে জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা নাই, তাঁহারাও স্বপ্নাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগের উক্তমত খণ্ডন করিয়া “অনির্বাচ্যবাদ” সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সমর্থিত অদ্বৈত মতে জগৎপ্রপঞ্চ, সৎও নহে,—অসৎও নহে। সৎ বা অসৎ বলিয়া উহার নির্বচন করা যায় না। কিন্তু—বিজ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয় অসৎ। জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তাই নাই। উক্তরূপ বিজ্ঞানবাদও অতি প্রাচীন মত। বিষ্ণুপুরাণেও (৩।১৮) উক্ত মতের প্রকাশ হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও (২।২।২৮।২৯) উক্ত মতের খণ্ডন হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর সেখানে “বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ”—এই হত্রের দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিতে স্বপ্নাদি জ্ঞান এবং জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞান যে তুল্য নহে, ইহা বুঝাইয়া—বিজ্ঞানবাদীর প্রদর্শিত স্বপ্নাদি যে, তাঁহার উক্ত মত-সমর্থনে দৃষ্টান্তই হয় না, ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন।

১। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাব চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—“এই সকল হত্র স্পষ্ট ভাষায় বেদান্তমতের অনুবাদ করিতেছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তার অবশ্য হত্রগুলির তাৎপর্য্য অন্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন”। কেলোসিপের লেক্চার—পঞ্চম বর্ষ, ৪৭ পৃষ্ঠা।

ফল কথা, পূর্বোক্ত দুইটি পূর্বপক্ষ-স্বত্রে গৌতম যে সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পূর্বপক্ষরূপে যে মতের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানবাদ। তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু মহামনীষী নাগেশ ভট্ট—ইহা স্বীকার করিয়াও গৌতমকেও অদ্বৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে “বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুসা” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, (১) গৌতম, বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করায় এবং উক্ত স্থলে বাচস্পতি মিশ্রও গৌতমের স্বত্রের দ্বারা সেইরূপ ব্যাখ্যা করায় “অনির্বাচ্যবাদ” যে, গৌতমের স্বত্রসম্মত, ইহা অর্থতঃ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ গৌতম শ্রুতিমূলক অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন নাই—কিন্তু বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমতেই তাঁহার সম্মতি স্থচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্তস্থলে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু মহর্ষি গৌতম, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করাতেই যে, কিরূপে তাঁহার অদ্বৈতমতে সম্মতি বুঝা যায়, ইহা ত আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর। দ্বৈতবাদী অন্ত্যাত্ম আচার্য্যও ত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। তাই বলিয়া কি তাঁহাদিগকেও অদ্বৈতবাদী বলিতে পারা যায়? আর বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাই বা তাহা কিরূপে বুঝা যায়? পরন্তু বাচস্পতি মিশ্র যে, অত্র গৌতমের মতব্যাখ্যায় তাঁহার কোন কোন স্বত্র দ্বারা অদ্বৈতমতের খণ্ডনই করিয়াছেন, তাহাও ত দেখা আবশ্যক। সর্বশাস্ত্রদর্শী নাগেশ ভট্ট যে তাহা দেখেন নাই, ইহা আমি বলিতে পারি না। সুতরাং মুদ্রিত “বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুসা” গ্রন্থে যেরূপ কথা পাইয়াছি, তাহা নাগেশ ভট্টের নিজেরই কথা কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ হয়।

সে যাহা হউক, শেষ কথা, কণাদ ও গৌতমের স্বত্রের দ্বারা তাঁহার যে অদ্বৈতবাদী নহেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, তাঁহার পরমাণুর নিত্য স্বীকার করিয়া “আরম্ভবাদে”রই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিত্য পরমাণুদ্বয়ের সংযোগজন্ম প্রথমে “দ্যবুক” নামক দ্রব্য জন্মে, পরে ঐ

১। গৌতমোহপি—“স্বপ্নবিষয়াভিমানবদয়ঃ প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানঃ।” “মায়া-গন্ধর্ব্বনগর-মৃগতৃক্ষিকাবয়া।” “হেতুভাবাদিসিদ্ধিরিত্যাহঃ”.....“এবঞ্চ অনির্ব্বচনীয়তাবাদস্ত স্বত্রসম্মতত্বমর্থ্যাহত্ব-প্রায়ম্, তন্তুশ্রুতিমূলকত্বেন “হেতুভাবাদিসিদ্ধি”রিত্যনেন খণ্ডনাসম্ভবত্।”—“মঞ্জুসা—তিত্ত্বনিরূপণ”—কাশী চৌধাঙ্গা সংস্কৃত সিরিষ, ৮৭২।৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্রব্যকত্রয়ের সংযোগ জ্ঞাত “ত্রসরেণু” নামে দ্রব্য জন্মে। এইরূপে দ্রব্যাদি ক্রমে সমস্ত জ্ঞাত দ্রব্যের সৃষ্টি হয়,—এই মতের নাম “আরম্ভবাদ”। আচার্য্য শঙ্কর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে উহা বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত বা কাণাদমত বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাঁহার মতে উহা যে, গৌতমের মত নহে, তিনি গৌতমের মতের প্রতিবাদ করেন নাই, ইহা কিন্তু বলা যায় না। কারণ, মহর্ষি গৌতম শ্রায়দর্শনে কণাদের অপেক্ষায় সূক্ষ্মপক্ষে পরমাণুর নিত্য ও “আরম্ভবাদে”র সমর্থন করিয়াছেন। “আরম্ভবাদে”র ব্যাখ্যায় পরে তাহা দেখাইব। তবে বৈশেষিক-দর্শনে প্রথমে মহর্ষি কণাদই “আরম্ভবাদে”র প্রকাশ করায় উক্ত মত প্রথমে বৈশেষিকমত বা কাণাদমত বলিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করে। সেই প্রসিদ্ধি অনুসারেই আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ঐরূপই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। *

আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের মতে পরব্রহ্মের শ্রায় আকাশ, কাল, দিক্ ও জীবাত্মা—এই সমস্ত দ্রব্যপদার্থও বিশ্বব্যাপী ও নিত্য এবং পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্বিধ পরমাণু অতি সূক্ষ্ম ও নিত্য এবং ঐ পরমাণু-সমূহই জ্ঞাতদ্রব্যের মূল উপাদানকারণ। কণাদ ও গৌতমের উক্ত মত প্রকাশ করিতে আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরচার্য্য ও “মানসোল্লাস” গ্রন্থে বলিয়াছেন—

“কালাকাশদিগাত্মানো নিত্যাশ্চ বিভবশ্চ তে।

চতুর্বিধাঃ পরিচ্ছিন্না নিত্যাশ্চ পরমাণবঃ ॥”

“ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহস্তথা নৈয়ায়িকা অপি” দ্বিতীয় অঃ ;

কিন্তু উক্ত “আরম্ভবাদ” অবৈতবাদের অতিবিরুদ্ধ। কারণ, অবৈতবাদে পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নিত্য নহে এবং মায়াসহিত পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই জগতের মূল উপাদান-কারণ। কিন্তু “আরম্ভবাদে” কাল ও আকাশ প্রভৃতির

* বৃহদারণ্যকোষেও (৪।৩।২২) আচার্য্য শঙ্কর “বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ”—এইরূপে প্রথমে বৈশেষিক সম্প্রদায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যে (২য় অঃ) শঙ্কর “অত্র কাণাদাদয়ঃ পশুস্তি”—ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যে মতের উল্লেখ পূর্বক প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা কণাদের শ্রায় গৌতমেরও মত। তাই সেখানে শঙ্করও উক্ত মতের যুক্তি বলিতে পরে গৌতমের শ্রায় দর্শনের “যুগপজ্জ্ঞানানুপপত্তি ম’নোল্লাসঃ” (১।১।১৬) এই হত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। হত্রাং শঙ্কর যে, গৌতমের কোন হত্রের উল্লেখ পূর্বক তাঁহার মতের প্রতিবাদ করেন নাই—ইহাও সত্য নহে।

শ্রায় পরমাণুসমূহ ও নিত্য এবং পরমাণুসমূহই জগদ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ। অদ্বৈতবাদে আত্মা এক, “আরম্ভবাদে” আত্মা বহু। অদ্বৈতবাদে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্য বা জ্ঞান, তাহার গুণ নহে, কিন্তু “আরম্ভবাদে” আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নহেন, কিন্তু চৈতন্য বা জ্ঞান, তাহার গুণ। তন্মধ্যে পরমাণুর চৈতন্য নিত্য, জীবাণুর চৈতন্য অনিত্য। সুতরাং সময়বিশেষে—জীবাণু জড়। অদ্বৈতবাদে জীবাণু বস্তুতঃ নিঃশূন্য; জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ-দুঃখাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম, কিন্তু “আরম্ভবাদে” জীবাণু সগুণ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ-দুঃখাদি জীবাণুরই বাস্তুব-গুণ। অদ্বৈতবাদে অনাদি মিথ্যা বা অনির্লক্ষণীয় “মায়া” স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু “আরম্ভবাদে” ঐরূপ “মায়া” স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং “আরম্ভবাদে” জগৎ সত্য, কিন্তু অদ্বৈতবাদে মায়ামূলক জগৎ মিথ্যা বা অনির্লক্ষ্য।

যদি বল, কণাদ ও গৌতম প্রভৃতি সর্বজ্ঞ ঋষিগণ অধিকারবিশেষের জন্ত নানারূপ দ্বৈতমতের প্রকাশ করিয়াছেন ও তাঁহারা সকলেই ছিলেন—অদ্বৈতবাদী, যেহেতু অদ্বৈতবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ঐরূপ অনুমান করিলে যাহাদিগের মতে দ্বৈতবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত, তাঁহারাও ত ঐ কথা বলিয়া সমস্ত ঋষিকেই দ্বৈতবাদী বলিয়াই অনুমান করিতে পারেন; এবং তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তৎকালে বৌদ্ধভাবাপন্ন মানবগণের নাস্তিক্যানিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগের সংস্কারানুসারে বৌদ্ধভাবেই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনিও ছিলেন—দ্বৈতবাদী! আধুনিক কোন গ্রন্থকারও ইহা বলিয়াছেন। ফল কথা, ঐভাবে নিজ নিজ মতানুসারে অনুমান করিয়া উক্ত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায় না। যথার্থ অনুমান করিতে হইলে প্রথমে প্রকৃত হেতু সিদ্ধ করা আবশ্যিক। হেতু ও হেতুভাসের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কোন বিষয়েই যথার্থ অনুমান করা যায় না। কিন্তু তথাপি আমরা নানা বিষয়ে নিজ বুদ্ধি-অনুসারে নানারূপ অনুমান করি। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও কল্পনার ঘনাকারে সাময়িক বুদ্ধি অনুসারে কত বিষয়ে কতপ্রকার অনুমান করিতেছেন, ইহা অনিবার্য্য। কারণ, মানবের চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধি বিচিত্র। মহাকবি ভারবি যথার্থ ই বলিয়াছেন,—“বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।”

পঞ্চম অধ্যায় *

কণাদ ও গৌতমের মত তাঁহাদিগের

বুদ্ধিকল্পিত নহে।

শিষ্য। কণাদ ও গৌতমের মতে জীবাত্তা যে, প্রত্যেক জীবদেহে বস্তুতঃই ভিন্ন, স্ততরাং পরব্রহ্ম হইতেও বস্তুতঃ ভিন্ন এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, ধর্মাদর্শ ও স্নেহঃখাদি যে, জীবাত্তারই বাস্তব গুণ, ইহা আমি বুঝিয়াছি; এবং পূর্বাচার্য্যগণ যে, কণাদ ও গৌতমের সমস্ত সূত্রের পর্যালোচনা ও সামঞ্জস্য বিচার করিয়াই তাঁহাদিগের ঐক্যপই সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়েও আমার সংশয় নাই। কিন্তু কণাদ ও গৌতম তর্ক দ্বারা কেন যে, ঐ সমস্ত ঋতিবিরুদ্ধ মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ত আমি বুঝিতেছি না। তর্ক দ্বারা কখনও আত্মতত্ত্ব-নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ, তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। শারীরিক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, প্রথমে এক তার্কিক তর্ক দ্বারা যাহা নির্ণয় করেন, পরে তদপেক্ষায় বুদ্ধিমান্ অপর তার্কিক অন্তরূপ তর্ক দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়া অশ্রুত সমর্থন করেন, পরে আবার অত্র তার্কিক তর্ক দ্বারা তাহাও খণ্ডন করিয়া অশ্রুত মত সমর্থন করেন, ইহা সর্বত্রই দেখা যায়। স্ততরাং তর্কের কুত্ৰাপি প্রতিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি নাই। একই সময়ে একই স্থানে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত তার্কিক উপস্থিত করিয়া তর্ক দ্বারা সকলের ঐক্যমতো কোন তত্ত্ব-নির্ণয় করাও একেবারেই অসম্ভব। স্ততরাং আলৌকিক অচিন্ত্য তত্ত্বের নির্ণয় করিতে হইলে একমাত্র ঋতিকেই আশ্রয় করিতে হইবে। যে তত্ত্ব ঋতিসিদ্ধ, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। প্রকৃত সত্য। তাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন—“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তান্তর্ক্যেণ যোজয়েৎ।” যে সমস্ত পদার্থ অচিন্ত্য, যাহা লৌকিক বুদ্ধিগম্যই নহে, তাহা তর্কের

* অনেক পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া এই অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায় গুরু-শিষ্যের বাদপ্রতিবাদ ছলে লিখিত হইয়াছে।

বিষয়ই নহে। সুতরাং তর্কের দ্বারা তাহার নির্ণয় হইতে পারে না। সুতরাং কণাদ ও গৌতম তর্কের দ্বারা যে সমস্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিরূপে গ্রহণ করা যায়? আর অক্ষপাদ গৌতম প্রণীত শ্রায়-দর্শন এবং কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে যে, কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ আছে, তাহা পরিত্যাগ্য, ইহা ত শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে।

গুরু। কোন্ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে? আর শাস্ত্রে উহা কথিত হইলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ তাহা বলেন নাই কেন? তাঁহার কি, সে শাস্ত্রবচন জানিতেন না? আর যদি পরবর্তী বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত পরাশরোপপুরাণের বচনকে (১) শাস্ত্র বলিয়া তুমি গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহার উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-বচনের অপরাধ কি? সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের প্রারম্ভে বিজ্ঞানভিক্ষু “মায়াবাদমসচ্ছাত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ”—ইত্যাদি যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ সমস্ত বচনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত “মায়াবাদ”কে অবৈদিক ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হইয়াছে। কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যও ঐ সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু “অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি” গ্রন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি “সাংখ্যভাষ্যকৃষ্ণিশ্চৈদাহতং—এই কথা বলিয়া সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত “অক্ষপাদপ্রণীতে চ”—ইত্যাদি বচনদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিলেও বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত “মায়াবাদ-মসচ্ছাত্রং—ইত্যাদি বচনের কোনই আলোচনা বা উল্লেখই করেন নাই।

যদি বল বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত অদ্বৈতবাদের নিন্দাবোধক ঐ সমস্ত বচন অসঙ্গত ও বিরুদ্ধার্থ বলিয়া উহা প্রমাণ হইতেই পারে না। পরবর্তী কালে ঐ সমস্ত বচন রচিত হইয়া পদ্মপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমিও বলি, তথাস্ত। কিন্তু তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী সদানন্দ যতি, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত

১। “অক্ষপাদ প্রণীতে চ কণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ।

ত্যাভ্যাঃ শ্রুতিবিরুদ্ধাংগঃ শ্রুতৈকশরণৈনুভিঃ ॥

জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।

শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতো হি তো” ॥

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত বচন।)

পরশরোপপুরাণের বচনকে ক্রমে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহাও ত বুঝা আবশ্যক। উক্ত বচনে কথিত হইয়াছে যে, শ্রায়, বৈশেষিক এবং সাংখ্য ও যোগদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে। জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসাদর্শন ও ব্যাসের বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ নাই। কারণ, তাঁহারা উভয়েই শ্রুতির পারগামী। কিন্তু অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মতেও কি জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসাদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অংশই নাই? তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর জৈমিনির কোন কোন মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন কেন? বেদান্তদর্শনের “দেবতাদিকরণে”র ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর দেবতাদিগেরও বিগ্রহ বা দেহ আছে এবং তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার আছে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে জৈমিনির যে বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা কি শঙ্করের মতে শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে? তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও যে, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারেন না, ইহা তুমি প্রাণধান পূর্বক চিন্তা কর। আর আচার্য্য শঙ্কর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ উক্ত বচন কেন উদ্ধৃত করেন নাই, ইহাও তুমি চিন্তা কর।

পরন্তু ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক যে, শ্রায়াদি দর্শনের মতকে বেদান্তমতের অবিরুদ্ধ বলিয়া সমন্বয় সমর্থন করিতে গেলে বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করাই যায় না। আর উহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে জৈমিনির পূর্বমীমাংসাদর্শনের কোনও মতও যে পরিত্যাগ্য নহে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ উক্ত বচনে জৈমিনির দর্শনেও বেদবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই, ইহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে অগ্রান্ত দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদান্ত-দর্শনের মতেরই অনুসরণ কর্তব্য, ইহাও ত বলা যায় না (১)।

১। অদ্বৈতবাদী মহামহোপাধ্যায় পূজাপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় শ্রায়াদি দর্শনের মতকে বেদান্তমতের অবিরুদ্ধ বলিয়াও পূর্বের বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত পরশরোপপুরাণের “অক্ষপাদশ্রুতীতে চ” ইত্যাদি বচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়া এবং ওদন্তসারে জৈমিনির দর্শনে বেদবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই, ইহা বলিয়াও লিখিয়াছেন—

“পরশর বলিতেছেন—অগ্রান্ত দর্শনে কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধও আছে। এ অবস্থায় মহাজ্ঞানদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ পূর্বক নিঃশঙ্কচিত্তে আমরা বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্টপাতের আশঙ্কা

আর বেদান্তদর্শনের যে প্রকৃত মত কি, সে বিষয়েও ত বহু প্রাচীন মত আছে। পরে বিজ্ঞানভিক্ষুও তাঁহার নিজমতানুসারে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত পূর্বোক্ত বচনানুসারে নিঃশঙ্কচিত্তে বেদান্তদর্শনের কোন মতের অনুসরণ কর্তব্য, ইহাও ত আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি না। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনকে আশ্রয় করিলেই বা সকল বিবাদ নিবৃত্তির আশা কোথায়?

অবশ্য তোমার কথিত “অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবাঃ”—ইত্যাদি বচন, আন্তিকমাত্রেরই গ্রাহ্য। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কথিত হইয়াছে—

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবান্তান্ন তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভাঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যশ্চ লক্ষণম্” ॥ ৫।১২

অত্বে উক্ত বচনের পরাধিকার “নাপ্রতিষ্ঠিততর্কেণ গন্তীরার্থশ্চ নিশ্চয়ঃ”—এইরূপ পাঠ আছে, ইহা উক্ত শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারা গন্তীর তত্ত্ব অর্থাৎ অতি দুর্জয়ের অচিন্ত্য অলৌকিক তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে না। “তর্ক” শব্দের অর্থ এখানে অনুমান। শ্রুতিনিরপেক্ষ নিজ বুদ্ধিমান্ত-কল্পিত তর্ক এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক, উহাকেই বলে কুতর্ক। বেদান্তদর্শনের “তর্কা-প্রতিষ্ঠানাং,—ইত্যাদি হ্রদেও ঐ কুতর্কেরই প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করও কঠোপনিষদের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“ন হি কুতর্কশ্চ প্রতিষ্ঠা কচিং বিদ্যতে।” পূর্বেও তাঁহার কথা বলিয়াছি। কৃষ্ণপুরাণেও কথিত হইয়াছে—“শ্রুতিসাহায্য রহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ।” অর্থাৎ অলৌকিক আত্মাদি তত্ত্ব শ্রুতির সাহায্যশূন্য বা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে।

কিন্তু মহর্ষি কণাদ ও গৌতম যে শ্রুতি জানিতেন না, অথবা জানিয়াও তাহার কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল তর্কের দ্বারাই ঐ সমস্ত মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, অথবা তাঁহারা শাস্ত্র অপেক্ষাও অনুমান প্রমাণরূপ তর্ককে প্রবল বলিয়াছেন, ইহা ত আমরা বলিতে পারি না। কারণ, তাঁহারাও

নাই। বরং বেদান্তদর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া—অত্বে দর্শনের মতের অনুসরণ করিলে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা আছে, ইহা সাংস সহকারে বলিতে পারা যায়।” “ফেলোসিপের লেক্চর” পঞ্চমবর্ষ ৭১ পৃষ্ঠা ও ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকার করেন নাই। তাই গৌতম কোন বিষয়ে অপরের ঋতিবিরুদ্ধ কোন অনুমানের আশঙ্কা করিয়া “ঋতিপ্রামাণ্যচ্চ”—(৩।১।৩১) এই সূত্রের দ্বারা সেই অনুমানের যে প্রামাণ্যই নাই, ইহাও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ মহাবি কণাদও আত্মার নানাত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পরে আবার সূত্র বলিয়াছেন— “শাস্ত্র-সামর্থ্যাচ্চ”। পূর্বে ইহা বলিয়াছি। কিন্তু তিনি শাস্ত্রের কোন অপেক্ষা না করিলে অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমানেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিলে যেখানে পরে আবার ঐ সূত্রটি বলিবেন কেন? তিনি বৈশেষিকদর্শনে আরও অনেক স্থলে অনেক সূত্রের দ্বারা কোন কোন বিষয়ে বেদকেই প্রমাণরূপে স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্ররাং কণাদ ও গৌতমের ঐ সমস্ত মত যে, তাঁহাদিগের বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত, ইহা কিরূপে বলা যায়?

তবে কণাদ ও গৌতমের দর্শন মননশাস্ত্র বলিয়া তাহাতে প্রধানতঃ মননের উপকরণ তর্কই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই তাহাতে বেদার্থব্যাখ্যার দ্বারা আত্মাদি পদার্থের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যাখ্যাত ঐ সমস্ত মতও বেদমূলক। কারণ, সমস্ত আর্ষমতেরই মূল বেদ। ঋষিগণ বেদবাক্যানুসারেই নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কালে অনেক বেদবাক্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অনেক বেদবাক্য অশ্রুপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং অনেক বাক্য অশ্রু সম্প্রদায় প্রকৃতবেদ-বাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সেই সমস্ত বাক্যও যে, প্রকৃত বেদবাক্যই নহে, ইহাও ত আমরা বলিতে পারি না। এই যে প্রাচীন দ্বৈতবাদের প্রচারক পরমবৈষ্ণব আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদের স্পষ্ট প্রতিপাদক অনেক ঋতিবাক্য প্রদর্শন করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত বাক্য কি তিনি নিজেই রচনা করিয়াছিলেন? তিনি কি প্রতারণা? তাহা হইলে কি ব্যানতীর্থ প্রভৃতি বহু মহামনীষী তাঁহার মত গ্রহণ করিতেন? এবং ভারতের সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতেন? আমরা ইহা কখনই সম্ভব মনে করি না। মধ্বাচার্য্যের উল্লিখিত সেই সমস্ত ঋতিবাক্য গোড়ায় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব-গোস্বামী ও প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অশ্রু সম্প্রদায় তাহা গ্রহণ না

করিলেও উহা যে, তাঁহার গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত এবং সুপ্রাচীনকালেও উহা দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে শ্রুতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাই আমরা বুঝি। মূলকথা সুচিরকাল হইতেই বেদমূলক গ্রন্থ ও বৈশেষিক শাস্ত্র আছে। কণাদ ও গৌতম উহা লাভ করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা উহার কর্ত্তা নহেন, কিন্তু প্রকাশক। গ্রন্থশাস্ত্র যে, অক্ষপাদ গৌতমের সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি উহার শ্রষ্টা নহেন—ইহা ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও সর্বশেষে বলিয়া গিয়াছেন। আর অদ্বৈতবাদী যে সদানন্দ মতি, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত বচনানুসারে গ্রন্থ বৈশেষিকদর্শনের কোন কোন অংশকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, তিনিও ত পরে বলিয়াছেন যে, (১) গৌতম প্রভৃতি মুনিগণ গ্রন্থাদি শাস্ত্রের স্মারক, কিন্তু তাঁহারা নিজে বুদ্ধির দ্বারা ঐ সমস্ত শাস্ত্রের কর্ত্তা নহেন।

পরন্তু সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বেদের নানা “অর্থবাদ” বাক্যকে শাস্ত্র করিয়া তাহার নানারূপ ব্যাখ্যার দ্বারাও অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ নানা মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত মত ও তাহার প্রতিপাদক সাংখ্যাদি দর্শন প্রাচীনকালে “প্রবাদ” নামেও কথিত হইয়াছে। ‘বাক্যপদীয়’ গ্রন্থে মহামনীষী ভট্টহরিণ্ড ঐরূপ বলিয়াছেন (২) যোগদর্শন-ভাষ্যে (৫২১) ব্যাসদেবও বলিয়াছেন—“সাংখ্যযোগাদয়স্ত প্রবাদাঃ” (১)। সুতরাং বেদার্থের ব্যাখ্যাভেদেও যে অনেক মতভেদের প্রকাশ হইয়াছে ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে কোন মত যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং কোনমত শ্রুতিসম্মত, ইহাই বা আমরা কিরূপে বলিতে পারি? শ্রুতিপ্রামাণ্যবাদী কোন আচার্য্যই ত শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানরূপ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই।

সত্যবটে, একই সময় একই স্থানে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত তार्কিককে উপস্থিত করিয়া তর্ক দ্বারা সকলের ঐকমত্যে কোন সিদ্ধান্ত-নির্ণয় একেবারেই

১। গৌতমাদিমুনীনাং তত্তচ্ছাস্ত্র-স্মারকম্বেব শ্রুতে, ন তু বুদ্ধিপূর্ব্বককর্ত্তব্যং। তদ্ব্তং — “ব্রহ্মাজ্ঞা স্ববিপর্য্যস্তাঃ স্মারকা ন তু কারকা” ইতি। “অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি” ১ম মুদ্রণ।

২। “তত্ত্বার্থবাদরূপাণি নিশ্চিত্য স্ববিকল্পজাঃ।

একত্বিনাং দ্বৈতিনাঞ্চ এবাদা বহুধা মতাঃ” ১।

১। সাংখ্যাস্ত যোগাস্ত ত এবাদয়ো যেষাং বৈশেষিকাদি-এবাদানাং, তে সাংখ্যযোগাদয়ঃ প্রবাদাঃ। (বাচস্পতি মিশ্র-কৃত টীকা)।

অসম্ভব। কিন্তু ঐরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বেদব্যাখ্যাসমর্থ পণ্ডিতগণকে একত্র উপস্থিত করিয়া সকলের ঐকমত্যে প্রকৃত বেদার্থ-নির্ণয় করাও ত এবেবারেই অসম্ভব। তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে গেলে যেমন তार्কিকের বুদ্ধিভেদমূলক তর্কের ভেদপ্রযুক্ত নানা মতভেদ অবশ্যস্বাবী, তদ্রূপ বেদের ব্যাখ্যা দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে গেলেও ত ব্যাখ্যাভেদে নানা মতভেদ অবশ্যস্বাবী। কারণ, বিচার ব্যতীত অতি দুর্য্যোধ বেদার্থ-নির্ণয় হইতেই পারে না। তর্ক ব্যতীতও বেদার্থ-বিচার হইতে পারে না। বেদার্থে বিবাদ হইলে দেখানে যে, তর্ক-বিশেষের দ্বারা ই প্রকৃতার্থ নির্ধারণ করিতে হইবে, ইহা ত আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন এবং পরে তিনি মনু-বচনের দ্বারাও উহা সমর্থন করিয়াছেন (২)। সুতরাং বেদার্থ নির্ণয়ে তর্ক যখন সকলেরই অপরিহার্য্য, তখন তর্কের ভেদে বেদার্থ-বিষয়েও মতভেদ অবশ্যই হইবে। নির্বিবাদে সেই বেদার্থ-নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্তও কেহ কাহারও তর্ককে বেদবিরুদ্ধ বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্য তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্ত শ্রুতিদেবীকে আশ্রয় করিয়াই বা সকল বিবাদ-নিবৃত্তির আশা কোথায়?

শিষ্য। আপনি কণাদ ও গৌতমের পূর্বোক্ত মতকেও শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিবেন না, ইহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—“অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ” (৭।৩।১৫)। এবং পূর্বে কাম ও সঙ্কল্পাদির উল্লেখ করিয়া কথিত হইয়াছে—“এতৎ সর্বং মন এব।” পরেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—“যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা য়েহস্ত হৃদিপ্রিতাঃ”। সুতরাং ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীবাত্মা যে অদ্বন্দ্ব অর্থাৎ নিগুণ নিলেপ এবং

(২) শ্রুতার্থ-বিপ্রতিপত্তৌ চাখ্যভাস-নিরাকরণেন সম্যগর্থ-নির্ধারণং তর্কোপেব বাধ্যবৃত্তিরূপেণ ত্রিযতে। মনুরপি চৈবং মন্ততে—

“প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধঃগম্।

ত্রয়ং হৃদিভিত্তং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সুনা” ইতি

“আর্যং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদ-শাস্ত্রাবিরোধিনা।

যন্তর্কেণামৃসম্বন্ধে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।” (২২শ অঃ ১০৫—১০৬)

ইতি চ ব্রুবন। শারীরক ভাষ্য—২।১।১১।

ইচ্ছাবিশেষরূপ কাম এবং তাহার কারণ জ্ঞান ও তাহার ফল সুখ-হঃখাদি যে, মনেরই ধর্ম, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। আর জীবাত্মা যে পরব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন, ইহা ত শ্রুতির “তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি”—ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ মহাবাক্যের দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং কণাদ ও গৌতমের পূর্বোক্ত মত যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, ইহা ত আমি বুঝিতেছি না।

গুরু। কথা অনেক। সমস্ত শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সংক্ষেপে ত্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য ষষ্ঠ্যমতি তোমাকে বলিতেছি।

প্রথম কথা—“অসঙ্গোহয়ং প্রকৃষঃ”—এই শ্রুতি-বাক্যে “অসঙ্গ” শব্দের অর্থ নিজস্ব নির্বিকার। উহার দ্বারা আত্মা যে, বস্তুতঃ নিগুণ, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা অসঙ্গ অর্থাৎ সংখ্যাতরূপ নহে। আত্মা অসংহত পুরুষ, ইহাই তাৎপর্য। বাহ্যতে নানাবস্তুর সঙ্গ বা সংলগ্ন থাকে, তাহাই সংহত পদার্থ। কিন্তু আত্মা ঐরূপ নহে। আত্মা নানাবস্তুর সমষ্টিরূপ নহে।

আর যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—“এতৎ সর্বং মন এব”,—ইহার দ্বারাও কামাদি যে, মনেরই ধর্ম, ইহা প্রতিপন্ন হয় না! কারণ, সেখানে মন, বাক্য ও প্রাণকে জীবাত্মার জ্ঞানাদির প্রধান সাধন বলিবার জন্য প্রথমে মনের সহিত জীবাত্মার বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত জীবাত্মার যে জ্ঞানাদি জন্মে না, ইহাই কথিত হইয়াছে এবং “মনসা হেব পশুতি, মনসা শৃণোতি”—এই বাক্যের দ্বারা মন যে, জীবাত্মার দর্শনাদি জ্ঞানের প্রধান সাধন, ইহাই কথিত হইয়াছে। পরে কামাদির উল্লেখ করিয়া কথিত হইয়াছে—“এতৎ সর্বং মন এব।” (১)। উক্ত বাক্যের দ্বারা কামাদিকে মনই বলা হইয়াছে, মনের ধর্ম বলা হয় নাই। কারণ ও কাণ্ডের অভেদ প্রকাশের দ্বারা কামাদির উৎপাদক কারণসমূহের মধ্যে

১। ত্রীণ্যন্তেনৈকরূপতেনৈব মনোবাচং প্রাণং তাত্ম্যন্তেনৈকরূপতাপ্তত্র মনো অভূবদর্শমন্তত্র মনো অভূবৎ নাশ্রোষমিতি, মনসা হেব পশুতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিরীর্ষ্যার্জুরিত্যেতৎ সর্বং মন এব। বৃহদারণ্যক ১।৫।৩।

মনের প্রাধাত্যখ্যাপনই ঐরূপ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। উহাকে বলে ঔপচারিক প্রয়োগ। যেমন অত্রত্রও শ্রুতি বলিয়াছেন—“অন্নং বৈ প্রাণিনাং প্রাণাঃ”। ফলকথা, উক্ত বাক্যের দ্বারা জ্ঞানাদি যে, মনেরই ধর্ম, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু উক্ত বাক্যের দ্বারা জ্ঞান যে, আত্মারই ধর্ম, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, জীবাত্মাই মনের দ্বারা দর্শন ও শ্রবণ করিলে সেই জ্ঞান তাহাতেই জন্মে, জীবাত্মাই সেই জ্ঞানের আশ্রয়, ইহাই বুঝা যায়।

পরন্তু জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণনায় প্রশ্ন উপনিষদে কথিত হইয়াছে—“এষ হি দ্রষ্টা, স্পষ্টা, শ্রোতা, ব্রাহ্মা, রসয়িতা, মত্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।” ৪।২।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে “দ্রষ্টা” ইত্যাদি পদের দ্বারা জীবাত্মাই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞাত সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কর্তা এবং অত্রাত্ম সমস্ত জ্ঞানেরও কর্তা, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মা ঐ সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় না হইলে তাহাকে উহার কর্তা বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানের আশ্রয়ত্বই জ্ঞানের কর্তৃত্ব। পরে কথিত হইয়াছে—“বিজ্ঞানাত্মা” ভাষ্যকার শঙ্করও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“বিজ্ঞানাত্মা বিজ্ঞানং কর্তৃকারকরূপং, তদাত্মা তৎ স্বভাবো বিজ্ঞাত্ব স্বভাব ইত্যর্থঃ”। বিজ্ঞানই জীবাত্মার সারভূত গুণ, এজ্ঞ অনেকস্থলে উহা “বিজ্ঞান” নামেও কথিত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে। বেদান্ত দর্শনে বাদরায়ণও বলিয়াছেন—“তদগুণ সারত্বাত্ত্ব তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ” (২।৩।২২)। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“তদগুণ-সারত্বাদ্ বিজ্ঞান-গুণসারত্বা দাত্ত্বনো বিজ্ঞান মিতি ব্যপদেশঃ। বিজ্ঞানমেবাস্তু সারভূতো গুণঃ”

এইরূপ জীবদেহে জীবাত্মাই শুভাশুভ কর্মের কর্তা এবং তাহার ফল-ভোক্তা। তাই শাস্ত্রে জীবাত্মার সম্বন্ধেই শুভাশুভ কর্মের বিধি ও নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ও অর্জুনকে বলিয়াছেন—“নিয়তং কুরু কৰ্ম্মস্বং”—গীতা। প্রশ্নোপনিষদের পুরুষোক্ত শ্রুতিবাক্যেও জীবাত্মাকে কর্তা বলা হইয়াছে। তদনুসারে বেদান্তদর্শনেও “কর্তা শাস্ত্রার্থবদ্ব্যং” (২।৩।৩৩) ইত্যাদি কতিপয় সূত্রের দ্বারা জীবাত্মার কর্তৃত্ব সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ সেখানে ঐ সমস্ত সূত্রের দ্বারা আত্মার বাস্তব কর্তৃত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়া ভগবদগীতাতেও যে, আত্মার বাস্তব কর্তৃত্বের অভাব শ্রীভগবানের বিবক্ষিত

নহে, ইহাও বলিয়া তাঁহার নিজের ঐ ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন (১) তিনিও প্রাশোপনিষদের পূর্বোক্ত শ্রুতি বাক্যানুসারে জীবাশ্মার জ্ঞানাদি গুণবত্তা সমর্থন করিয়াছেন। জ্ঞানও কর্তৃক রূপ প্রযত্ন আত্মার গুণ হইলে ইচ্ছাও তাহারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়।

অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—“যদা সৰ্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেষশ্চ হৃদি-প্রিতাঃ” (৪।৪।৭)। কিন্তু তৎপূর্বে “আত্মনস্ত কামায়”—এইরূপ বাক্যও ত বহুবার কথিত হইয়াছে। সুতরাং তদ্বারা ইচ্ছাবিশেষরূপ কাম ও কাম্যমুখ যে, আত্মার ধর্ম, ইহাও ত সরলভাবেই বুঝা যায়। শ্রায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহাই বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা-বিশেষরূপ কাম সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবাশ্মারই ধর্ম। এবং জ্ঞান, প্রযত্ন ও সুখ-দুঃখাদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবাশ্মারই ধর্ম। কিন্তু মনের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত জীবাশ্মাতে ঐ সমস্ত জন্মে না। সুতরাং আত্মসংযুক্ত মনেও ঐ সমস্ত আত্মধর্ম পরম্পরাসম্বন্ধে থাকে। তাই সেই পরম্পরাসম্বন্ধ-তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—“কামা যেষশ্চ হৃদি-প্রিতাঃ”। এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—“আত্মনস্ত কামায়।” এইরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ তাৎপর্য্যেই

১। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ ভগবদ্গীতার “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে” (৩।২৭)—এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জীবাশ্মার বাস্তব কর্ত্তৃত্বই নাই, সর্বজীবেরই আমি কর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞান, ভ্রম, ইহা উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সম্বন্ধ-প্রযুক্তই জীবাশ্মার সাংসারিক কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব। নচেৎ কেবল জীবাশ্মা কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য। ভগবদ্গীতার পরে “তত্রৈব সতি কর্ত্তারমাত্মনঃ কেবলস্ত যঃ” (১৮।১৬) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ঐ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করা হইয়াছে। রামানুজ ভগবদ্গীতার অষ্টাশ্র শ্লোকের উল্লেখ করিয়াও তাঁহার ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। শ্রায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদিগের মতে উক্ত শ্লোকে “প্রকৃতি” শব্দের অর্থ জীবের অদৃষ্ট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহা জীবের অদৃষ্টবিশেষেরই নাম। সেই অদৃষ্ট জন্ত জীবের জ্ঞান ও ইচ্ছা-বিশেষরূপ গুণ উৎপন্ন হওয়ায় জীব নানা কর্ম্ম করে। ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—“গুণাধ্বজা যঃ ফলকশ্চ কর্ত্তা কৃতস্ত তশ্চৈব ফলোপভোক্তা” (শ্বেতাশ্বতর ৫।৭) ফলকথা, আমি কর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞান জীবের ভ্রম নহে। কিন্তু আমিই কর্ত্তা, আমার কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন, এইরূপ জ্ঞানই ভ্রম। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ মিতি মন্যতে।”

লোকে আমার জ্ঞান, আমার ইচ্ছা, আমার সুখ, আমার দুঃখ, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। এবং পরস্পরাসম্বন্ধবিশেষ-তাৎপর্য্যে আমার মনের জ্ঞান, মনের ইচ্ছা, মনের সুখ, মনের দুঃখ,—এইরূপও প্রয়োগ হইয়া থাকে। আত্মাতে উৎপন্ন সুখ সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনে না থাকিলেও মনে উহার পরস্পরাসম্বন্ধ বিশেষ গ্রহণ করিয়া নৈয়ায়িক গ্রন্থকার বিখ্যাত পঞ্চাননও “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”র প্রারম্ভে প্রয়োগ করিয়াছেন—“মনসো মুদং বিতমুতাং ।”

মূল কথা, জীবাত্মা যে নিঃশূর্ণ, জ্ঞানাদি যে, তাহার বাস্তব গুণ নহে, ইহা কণাদ ও গৌতম স্বীকার করেন নাই। আমি জানিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি প্রকার সার্বজনীন বোধকে তাঁহারা ভ্রম বলেন নাই। মীমাংসক প্রভৃতি আরও অনেক সম্প্রদায়ও জ্ঞানাদিকে আত্মারই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন। আর আত্মাতে বস্তুতঃ কোন গুণ পদার্থই না থাকিলে স্বৈরাচারের উপনিষদে “বুদ্ধেগুণেনাত্মগুণেনৈব,” ইত্যাদি-(৫৮) বহু শ্রুতিবাক্যের কিরূপে উপপত্তি হইবে? ইহাও তুমি চিন্তা করিবে।

আর যে তুমি “তত্ত্বমসি” এবং “অহং ব্রহ্মাস্মি”—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছ, তৎ সম্বন্ধে নব্য জ্ঞান বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারা জীব ও পরব্রহ্মের অভেদই তত্ত্ব, ইহা উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু “সোহং”—অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইরূপে ধ্যানের কর্তব্যতাই উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ উক্তরূপে আত্মোপাসনা বিধানই ঐ সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। প্রাচীন মীমাংসক সম্প্রদায় নিজ মতানুসারে উপনিষদের সমস্ত অর্থবাদ বাক্যেরই উপাসনা ক্রিয়া বিশেষেই তাৎপর্য্য বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান-বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন নাই।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকে আরুণি ও তৎপুত্র খেতকেতুর সংবাদে ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে। সেই পরব্রহ্মই সমস্ত জীবদেহে জীবরূপে অল্প প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই সেখানে “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি,”—এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। এবং সেখানে প্রথমে “সদেব সৌম্যেদ মগ্র আসীৎ”—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা সেই সংস্বরূপ পরব্রহ্মের উপদেশ করিয়া উপসংহারে অনেকবার কথিত হইয়াছে, “ঐতদাত্মমিদংসর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্ব

অসি ষ্ঠেকতো”। অর্থাৎ আকর্ণি তাঁহার পুত্র ষ্ঠেকতুকে বলিয়াছেন যে, এই সমস্তই সেই ব্রহ্মস্বক, সেই ব্রহ্ম সত্য, তিনি আত্মা, হে ষ্ঠেকতো! ত্বং তং (ব্রহ্ম) অসি, অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম আছ। সুতরাং উক্ত ঋতিবাক্যের দ্বারা জীব যে, সেই পরব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃই অভিন্ন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আর উক্ত (তত্ত্বমসি) বাক্যে “অসি” এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকায় উহা আরও স্পষ্ট বুঝা যায়। নচেৎ ঐ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা সরল ভাবে যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাই কি প্রকৃতার্থ বলিয়া গ্রাহ্য নহে?

গুরু। জীবাত্মা যে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, ইহাও ত বহু শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা সরলভাবেই বুঝা যায়। আর বল দেখি,—শাস্ত্রবাক্য আছে—“সর্ববাত্মময়ী ঘণ্টা”। উক্ত বাক্য দ্বারা ঘণ্টা যে, সমস্ত বাত্ম হইতে অভিন্ন, ইহাই কি তুমি বুঝিবে? এবং শাস্ত্রবাক্য আছে—“শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ।” কিন্তু শালগ্রাম শিলা—য হা হরিপূজার প্রতীক, তাহা কি বস্ত্ততঃই স্বয়ং হরি? উক্ত বাক্যের দ্বারা সরলভাবে তাহাই ত বুঝা যায়। আবার বৃষোৎসর্গ কার্যে সেই বৃষকে প্রদক্ষিণ করিয়া যজমান যে মন্ত্র পাঠ করিবেন, তাহার প্রথমে আছে—“ধর্মোহসি ত্বং চতুষ্পাদঃ” (১)। উক্ত বাক্যে “অসি”, এই ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কি বুঝিবে, সেই বৃষ বস্ত্ততঃই চতুষ্পাদ ধর্ম? বস্ত্ততঃ সেই বৃষ চতুষ্পাদ ধর্ম নহে। কিন্তু বৃষোৎসর্গকর্ত্তা সেই যজমান তখন সেই বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্মরূপে ভাবনা করিবেন, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। এইরূপ যিনি শালগ্রাম শিলায় ৬হরিপূজাদি করিবেন, তিনি তখন সেই শালগ্রাম-শিলাকে স্বয়ং হরি বলিয়া ভাবনা করিবেন, ইহাই “শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ”,—এই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য। এইরূপ যিনি পূজক, তিনি ঘণ্টাকে সমস্ত বাত্মরূপে ভাবনা করিবেন, এবং অল্প বাত্ম না থাকিলেও কেবল ঘণ্টাবাত্মদ্বারাও তাঁহার পূজাসিদ্ধ হইবে, ইহাই “সর্ববাত্মময়ী ঘণ্টা”—এই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য। অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্যেই শাস্ত্রে ঐ সমস্তবাক্য কথিত হইয়াছে। ঐরূপ

(১) “ধর্মোহসি ত্বং চতুষ্পাদস্তত্বে প্রিয়াস্বিমাঃ। চতুর্গাংপোষণার্থায় মরোৎস্টান্ত্ৰা সহ”। ইত্যাদি মন্তপুর্বাণোক্ত মন্ত্র স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত—“ছন্দোগ বৃষোৎসর্গতত্ত্বে” দ্রষ্টব্য।

বাক্যকে বলে “অর্থবাদ।” শাস্ত্রে বিধিবাক্য কথিত না হইলে অনেকস্থলে অর্থবাদ বাক্যের দ্বারাই বিধিবাক্য বুঝিতে হয়।

এইরূপ “সর্ববাত্মময়ী ঘণ্টা” এই অর্থবাদবাক্যের শ্রায় “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম,” “ব্রহ্মেবেদং সর্বং,” “ঐতদাত্মমিদং সর্বং,” “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ”—ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্যের দ্বারাও ঐরূপে ভাবনারূপ উপাসনার বিধিও বুঝিতে পারি। এবং “শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ,” “ধর্মোহসি ত্বং চতুষ্পাদঃ”—ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যের শ্রায় “তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি,” “সোহহং”—ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যের দ্বারা ঐরূপে ভাবনারূপ উপাসনার বিধিও বুঝিতে পারি। অর্থাৎ মুমুক্শু সাধক সমগ্র ভগৎকে এবং নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবেন। তিনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম না হইলেও “সোহহং”—অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। মৈত্রী উপনিষদে “সোহহং ভাবেন পূজয়েৎ” (২।১) এইরূপ বিধিবাক্যও কথিত হইয়াছে। তোমার কথিত ছান্দোগ্য উপনিষদেও পূর্বে “সর্বং” খন্দিং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত”—এই বাক্যে “উপাসীত” এই ক্রিয়া পদের দ্বারা উক্তরূপে উপাসনার বিধানই হইয়াছে। নচেৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে “উপাসীত” এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অনাবশ্যক। আর ছান্দোগ্য উপনিষদে পরে “মনো ব্রহ্মে-তুপাসীত (৩.১৮) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বিশেষরূপে মনঃ প্রভৃতি অনেক পদার্থে যে ব্রহ্ম ভাবনারূপ উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ইহা ত আচার্য্য শঙ্কর ও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনিও উহাকে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস বলিয়াছেন। যাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে, তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধিই ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস। বেদান্ত-দর্শনেও “ব্রহ্মদৃষ্টিকংকর্ষণং” (৪।১।৫) এই সূত্রের দ্বারা উক্তরূপ ব্রহ্মদৃষ্টি সমর্থিত হইয়াছে। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করও সেখানে উপনিষদের অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি সেখানে বিষ্ণুপ্রতিমায় বিষ্ণুবুদ্ধিকে উহার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। নিগুণ ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শঙ্করও শাস্ত্রানুসারে শালগ্রাম-শিলায় হরিপূজার কর্তব্যতা সমর্থন করায় অথ প্রসঙ্গে পূর্বেও বলিয়াছেন—“যথা শালগ্রামে হরিঃ”। শারীরক ভাষ্য (১।২।৭)।

ফলকথা শ্রায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে সমস্ত জীব ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন পদার্থ হইলেও তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্তব্য। সর্বজীবে ব্রহ্ম ভাবনাও সাধকের প্রধান

উপাসনা। সমস্ত জীবকে এক ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিলে সমস্ত জীবে অভেদ বুদ্ধি জন্মে। উহা ভ্রমবুদ্ধি হইলেও উহার ফলে সাধকের ভেদবুদ্ধিমূলক রাগ-দ্বेषাদি দোষের ক্ষয় হওয়ায় চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি হয়। তাই শাস্ত্রে সর্বজীবে ব্রহ্ম-ভাবনারূপ উপাসনার উপদেশ হইয়াছে। অবশ্য বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ইহা বলেন নাই। তাঁহাদিগের মত বুঝা যায় যে, উপনিষদে “ঐতদাত্মামিদং সর্বং”, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরব্রহ্মের স্তিতিরূপ অর্থবাদ। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎ ও জীবে পরব্রহ্মের বাস্তব ভেদভাব বিবক্ষিত নহে, কিন্তু অভেদমুখে তদীয়ত্বই বিবক্ষিত। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ ও জীব সেই পরব্রহ্মের অধীন, তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত, ইহাই তাৎপর্য।

সত্যবটে, ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্তস্থলে পূর্বে কথিত হইয়াছে, “অনেন জীবেনাত্মনানু প্রবিষ্ঠ নামরূপে ব্যাকরবাণি”। কিন্তু উহার দ্বারা সেই পরব্রহ্মই যে, সমস্ত জীবদেহে জীবরূপে অল্প প্রবিষ্ট হইয়াছেন—ইহা কিরূপে বুঝিবে? তিনি নিত্য মুক্ত হইয়াও পুনঃ পুনঃ সংসার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুণ্য পাপের ফল ভোগ করিতেছেন, ইহা কিরূপে উপপন্ন হইবে? তাঁহার ঐ জীবভাব অনির্কচনীয় অবিজ্ঞা-কল্পিত মিথ্যা, সুতরাং তাঁহার বন্ধন ও মুক্তদুঃখ ভোগাদি সমস্তই মিথ্যা, ইহা বলিলে সেই মিথ্যা অবিজ্ঞা কোথায় থাকে, ইহা বক্তব্য। নিত্য সর্বস্বত্ব সেই পরব্রহ্মে অবিজ্ঞা থাকিতে পারে না। তিনি অবিজ্ঞার বশবর্তী নহেন, ইহা সর্বসম্মত। সেই অবিজ্ঞা জীবে থাকে, জীবই তাহার বশবর্তী, ইহাও উক্ত মতে বলা যায় না। কারণ উক্তমতে সেই অবিজ্ঞাই পরব্রহ্মের জীবভাবের কল্পক। প্রলয়কালে সেই জীবভাবের অভাবে জীব না থাকায় তখন ঐ অবিজ্ঞা কোথায় থাকিবে? পরব্রহ্মের জীবভাব যেমন ঐ অবিজ্ঞাকে অপেক্ষা করে, তদ্রূপ ঐ অবিজ্ঞাও নিজের আশ্রয় লাভের জন্ত জীবভাবকে অপেক্ষা করায় — “অন্তোত্মাশ্রয়” দোষ অনিবার্য। এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের কথার উত্তরে শ্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বহু বক্তব্য আছে। সংক্ষেপে তাহার কিছুই বলা যায় না। পূর্বোক্তরূপ অবিজ্ঞার খণ্ডনে শ্রীভাষ্যে (২।১।১৫) রামানুজের পাণ্ডিত্য পূর্ণ বিচার বুঝিলে শ্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অনেক কথাও জানিতে পারিবে।

ফল কথা—পরব্রহ্ম নিজেই সমস্ত জীবদেহে জীবরূপে এবং সেই জীবের অন্তর্ধ্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজেই নিজের নিয়ন্তা হইয়াছেন, ইহা অত্র সম্প্রদায়ের মতে কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্বোক্ত “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি”—এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা তাঁহারা পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করেন নাই (১)। অনেকে পরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মরূপেই সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তিনিই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত সৃষ্টি ও সেই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের নাম ও রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন। “বেদান্ত পরিভাষা” গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজা, ধর্মরাজ ও হিরণ্যগর্ভদ্বারা সৃষ্টাদি প্রতিপাদন করিতে উক্ত শ্রুতি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বৈতবাদী প্রাচীন সম্প্রদায় উক্ত শ্রুতি বাক্যে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন। গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীও বিচার পূর্বক বলিয়াছেন—“তন্মাদনেন জীবেনাত্মনানু প্রবিশ্রেতি সহার্থে এব তৃতীয়া”।

তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর সমস্ত জীবদেহের সৃষ্টি করিলে তখন যে জীবদেহে যে জীবাত্মার প্রাক্তন কর্ম ফলানুসারে বিলক্ষণ সংযোগরূপ প্রবেশ হয়, তখন, সর্বদর্শী তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ সেই জীবাত্মার সহিত সেই জীবদেহে তাহার অন্তর্ধ্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরে তাহার সম্বন্ধে সৃষ্ট পদার্থের নাম ও স্বরূপ ব্যক্ত করেন। তাঁহার অন্তর্ধ্যামিত্বব্যতীত জীবের নামরূপাদি কোন বিষয়েই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব প্রযুক্তই সর্বজীবের দ্রষ্টৃত্বাদি সম্ভব হয়। এবং সৃষ্টিরজন্ত প্রথমে তিনিই ঈক্ষণ করেন। তাঁহার উপরে

১। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে—“ঈশরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্নিতি” (২৯।৩৪)। কিন্তু সেখানে টীকাকার শ্রীধর স্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্ধ্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্য ইত্যর্থঃ”। পরে দশম স্কন্ধে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—“কৃষ্ণমেন মবেহি ভু মাত্মান মখিলাত্মনাং” (১০।১৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত আত্মার আত্মা, ইহা বলিলে তিনিই যে সমস্ত জীবাত্মা নহেন, কিন্তু তিনি সমস্ত জীবাত্মার এক অন্তর্ধ্যামী আত্মা, ইহাই বুঝা যায়। তাই শ্রীধর-স্বামীও তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত স্থলে পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অথবা তাহা হইতে ভিন্ন সৃষ্টির জন্ত ঈশ্বর সমর্থ দ্রষ্টা দ্বিতীয় আর কেহ নাই। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—“নামোহৈ তোস্তু দ্রষ্টা”। “এতমেবা দ্বিতীয়ং”—ইত্যাদি। ফল কথা, সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর সমস্ত জীবদেহের হৃদয়দেশে অন্তর্য্যামি রূপেই অন্তঃপ্রবিষ্ট হন। তাঁহার সেই অন্তর্য্যামনই তাঁহার অন্তঃপ্রবেশ। এবং নিত্যসিদ্ধসর্বব্যাপী জীবাত্ত্বার সেই হৃদয়দেহরূপ উপাধির সহিত বিলক্ষণ সংযোগই তাহার হৃদয়রূপ গুহায় প্রবেশ। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই উভয় আত্মার সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—“গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাক্কে” (কঠ ৩।১)। তন্মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি সমস্ত জীবাত্ত্বার আত্মা। সমস্ত জীবাত্ত্বা তাঁহার শরীর সদৃশ। এক তিনিই তাহাতে আত্মত্বরূপে অধিষ্ঠিত। তাই শ্রুতি তাঁহাকে “আত্মহ” আত্মা ও “সর্বভূতান্তরাত্ত্বা” বলিয়াছেন। এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ও তাৎপর্য্য বুঝিয়া তদনুসারে অতীত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের “বহুত্যাং প্রজায়েত”—এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারাও পরমেশ্বর যে অসংখ্য জীবরূপেও বহু হইয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। ত্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে পরমেশ্বর প্রথমে পতি-পত্নীরূপে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রাদিরূপে বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া সেই সমস্ত প্রকৃষ্ট দেহাদি ধারণ করেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে “প্রজায়েত”—এই পদের দ্বারা তাঁহার সেই সমস্ত প্রকৃষ্টদেহধারণ এবং সমস্ত জীবদেহে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠানই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ব্রহ্মাদিরূপে বহু বা অসংখ্য হইলেও বস্তুতঃ তিনি একই। অদ্বিতীয় একই তিনি সৃষ্টাদি কার্য্যের জন্ত তাঁহার ইচ্ছা শক্তিরূপ মায়া বশতঃ বহুরূপে বহু হইয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত উপাধিমূলক ভেদ যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাস্তব ভেদ নহে। উপনিষদেও নানাস্থানে নানারূপে তাঁহার নানা উপাধিমূলক ভেদ বর্ণন করিয়া আবার সেই সমস্ত ভেদের অবাস্তব প্রকাশ করিতেই নানারূপে পুনঃ পুনঃ সেই পরমেশ্বরের একত্ব ঘোষিত হইয়াছে। তিনি ভিন্ন আর কিছুই বাস্তব সত্তা নাই, ইহা সেই সমস্ত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। আর সেই পরমেশ্বরই সমস্ত জীবও জগতের সর্বত্র অন্তর্য্যামিরূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত পদার্থেরই একমাত্র নিয়ন্তা হওয়ায় ঐ তাৎপর্য্যে

তিনি জীব ও জগৎ হইয়াছেন এইরূপ কথাও বলা হইয়াছে। যেমন কোন মহাশক্তি পুরুষ কোন রাজার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার একমাত্র নিয়ন্তা হইলে লোকে তখন তাঁহাকে বলে তিনিই সর্বময় কর্তা, তিনিই রাজা হইয়াছেন। ঐরূপ বাক্যকে বলে ঔপচারিক বাক্য। উপনিষদে অনেকস্থলে অনেক ঔপচারিক বাক্য এবং অনেক রূপকের ও প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং বিচার করিয়াই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। লক্ষণা স্বীকার করিয়া ও কষ্ট কল্পনা করিয়া শ্রুতির ঐ সমস্ত বাক্যের অতরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যার কারণ কি? জীব ও পরব্রহ্মের বাস্তব ভেদ প্রমাণ সিদ্ধ হইলে অবশ্য বাধ্য হইয়া ঐ সমস্ত মহাবাক্যের অতরূপ তাৎপর্য কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু জীব ও পরব্রহ্মের ভেদই যে সত্য, এবিষয়ে উপনিষদে কি প্রমাণ আছে? পরব্রহ্ম হইতে জীবের ঔপাধিক কল্পিত ভেদ ত অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন। সেই কল্পিত ভেদ বশতঃই সংসার কালে জীবের সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে এবং সেই কল্পিত ভেদানুসারেই শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধের উপদেশ হইয়াছে এবং অনেক স্থলে সেই কল্পিত ভেদই কথিত হইয়াছে।

গুরু। তাহাইহলে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও “তদ্বাসি”—এই মহাবাক্যে “তৎ” পদ বাচ্য ও “ত্বং” পদবাচ্য অর্থের ভেদ বশতঃ মুখ্যার্থের বাধ স্বীকার করিয়া তৎপদ ও ত্বং পদের লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন কেন? তাঁহাদিগের মতে সেই ভেদ ত সত্য নহে। আর অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মতেও কি উপনিষদে সমস্ত বাক্যেরই মুখ্যার্থ বা যথাক্রমার্থের ব্যাখ্যা হইয়াছে ও হইতে পারে? মুণ্ডক উপনিষদে শেষে কথিত হইয়াছে, “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”। কিন্তু অদ্বৈত মতে যখন জীবের ব্রহ্মভাব স্বতঃ সিদ্ধই আছে, তখন তাহার আবার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি কিরূপে বলা যায়? সুতরাং অদ্বৈতমতে মুক্তপুরুষের অবিচ্চার নিবৃত্তিই তাঁহার ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি বলিতে হইবে। সেই অবিচ্চানিবৃত্তিই তাহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের ফল। উহা ভিন্ন ব্রহ্মপ্রাপ্তি আর কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। মুণ্ডক উপনিষদের ভাষ্যে প্রথমে আচার্য্য শঙ্কর নিজেই ইহা

বলিয়াছেন * । তাহা হইলে উক্ত মতে “ব্রহ্মৈব ভবতি”—এই বাক্যের
 স্বার্থার্থ—রক্ষা হইয়াছে কি ? আর শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে যে, মুক্ত
 আত্মার পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে, তাহার ও কি মুখ্য অর্থে উপপত্তি
 হইতে পারে ? নির্বিকার বিশ্বব্যাপী আত্মার কোন পদার্থে লয়প্রাপ্তি অসম্ভব ।
 স্তত্রাঃ অদ্বৈতমতে সেই সমস্ত স্থলেও সেই লয় প্রাপ্তি বলিতে অবিচ্ছাদি
 উপাধির নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে । আর মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয়
 মুণ্ডকের প্রথমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ বলিয়া তৃতীয় শ্রুতিবাক্যের “ব্রহ্মৈব
 ভবতি” কথিত হইয়াছে—“তদাবিধান্ পুণ্য পাপে বিশ্ব নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ।
 কিন্তু মুক্ত পুরুষ সেই পরমেশ্বরের পরম সাম্যলাভ করিলে তখনও সেই
 পরমেশ্বর হইতে তাঁহার ভেদ থাকে, ইহা বুঝা যায় । কারণ বস্তুতঃ ভিন্ন
 পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্যই “সাম্য” শব্দের মুখ্য অর্থ । তাহা হইলে পরমাত্মা হইতে
 জীবাত্মার ভেদ যে নিত্য সত্য, কখনও উহার নাশ হয় না, ইহা অবশ্যই
 বুঝা যায় । কিন্তু অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় ঐ “সাম্য” শব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ
 করেন নাই কি ? আর “সাম্য” শব্দের একত্ব বা অভেদ অর্থ গ্রহণ করিলে
 “সাম্য” শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি ? ইহাও ত চিন্তা করা আবশ্যক ।

শ্রায়-বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, মুণ্ডক উপনিষদে পূর্বে উক্ত
 স্থলে যখন “সাম্য” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তখন শেষে “ব্রহ্মৈব ভবতি”—এই
 বাক্য যে, ঔপচারিক বাক্য, ইহাই বুঝা যায় । অর্থাৎ যেমন রাজার বহু সাদৃশ্য
 প্রাপ্তি বশতঃ প্রধান রাজপুরুষকে লোকে রাজাই বলে, তদ্রূপ মুক্তপুরুষ
 পরব্রহ্মের বহু সাদৃশ্য লাভ করায় শ্রুতি বলিয়াছেন—“ব্রহ্মৈব ভবতি” । উক্ত-
 মতে ইহার দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের জন্ত “মানসোল্লাসে” সুরেশ্বরও বলিয়াছেন—“রাজ
 ব দ্রাজ পুরুষে” । ‡

* “অথপর্য যমাতদক্ষর মধিগম্যতে” (মুণ্ডক উপ ১।৫।) ন চ পরপ্রাপ্তের বগমার্থস্ত
 ভেদোহস্তি । অবিচ্ছাদ্য অপায় এবহি পর প্রাপ্তি নীর্ণাস্তরং । শব্দর ভাষ্য ।

‡ মধ্যখণ্ডের মতানুসারে গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য বগদেব বিদ্যাবূষণ মহাশয় সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে
 বলিয়াছেন, যে, “ব্রহ্মৈব ভবতি” এই বাক্যে “এব” শব্দের সাদৃশ্য অর্থই গ্রাহ্য । কোবকার
 অমর সিংহ অব্যয় বর্ণে “এব” শব্দকে সাদৃশ্য বাচকও বলিয়াছেন । তাহা হইলে “ব্রহ্মৈব ভবতি”
 এই বাক্যের দ্বারা “ব্রহ্ম সদৃশো ভবতি” এইরূপ অর্থই বুঝা যায় এবং উহা গোঁগাও হয় না ।

আরও দেখ, কঠোপনিষদের প্রথম বল্লীর শেষে কথিত হইয়াছে—

“যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধ মাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।

এবং মুনেক্ষিজানত আত্মা ভবতি গোতম” ।

উক্ত ঋতি বাক্যের দ্বারা সরল ভাবে ইহাই বুঝা যায় যে, যেমন কোন শুদ্ধ (নির্মল) জলে অপর শুদ্ধ জল নিঃক্ষিপ্ত হইলে সেই জল “তাদৃগেব ভবতি” অর্থাৎ সেই পূর্বস্থ জলের সদৃশই হয়, ব্রহ্মজ্ঞ মুনির আত্মা অর্থাৎ মুক্ত আত্মা “এবং” অর্থাৎ তাদৃশই হন। স্মৃতরাং সংসার কালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদই থাকে, কিন্তু মুক্তিকালে অভেদ হয়, এই যে, মতান্তর আছে, তাহাও ঋতিসম্মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ উক্ত ঋতিতে দৃষ্টান্তবাক্যে “তদেব ভবতি” এইরূপ না বলিয়া বলা হইয়াছে—“তদৃগেব ভবতি”। স্মৃতরাং উহার দ্বারা মুক্ত আত্মা যে, ব্রহ্মই হন না, কিন্তু ব্রহ্মের সদৃশ হন, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ তাহাই বুঝিয়াছেন। তবে ব্রহ্মের সহিত তখন মুক্ত আত্মার ঐক্য সাদৃশ্য প্রাপ্তি হয়, এবিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদে অবশ্য নানা মত আছে।

মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী স্বন্দপুরাণের রচনের দ্বারা উক্ত ঋতিবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, মুক্তি হইলে সেই মুক্ত আত্মার যে তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হয়, তাহা মিশ্রতারূপ তাদাত্ম্য। অভেদরূপ তাদাত্ম্য নহে। কারণ পরব্রহ্মের যে স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি নিত্য বিশেষণ আছে, তাহা মুক্তিকালে ও জীবাত্মাতে সম্ভব হয় না। কোন ভলে অপর জল নিঃক্ষিপ্ত হইলেও তখন সেই উভয় জলের মিশ্রতারূপ তাদাত্ম্যই হয়, কিন্তু অভেদরূপ তাদাত্ম্য হয় না। কারণ, তখন সেই জল-মিশ্রণে পূর্বস্থ জলের বুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সেই মিশ্রতা রূপ তাদাত্ম্য বশতঃ তখন সেই উভয় জলের অবিভাগ হওয়ায় ভেদ প্রতীতি হয় না। *

* শ্রীজীবগোস্বামী “দর্শনসংবাদিনী” গ্রন্থে বেদান্তসূত্রের মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াই লিখিয়াছেন—“যথা লোকে উদকমুদাকান্তরেণৈকীভূত মিথিব্যবহ্রিয়মাণমপি ভিন্ন বস্তুভ্রাত্তদন্ত ভূতমেব ভবতি, নতুতদেব ভবতী তেবংস্তাদজ্ঞাপি। তথাচঋতিঃ, “যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধ মাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি……স্বান্দেচ “উদকং তুদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। নচৈতদেব ভবতি, যতাবুদ্ধিঃ প্রভায়াতঃ। এবমেবহি জীবোহপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মন। প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণাৎ”। “তত্ত্বসমুদ্রের টীকায় রাধা মোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য স্বন্দ পুরাণের উক্ত রচনে “তাদাত্ম্য” শব্দের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন “তাদাত্ম্য মিশ্রতাং”। “নাসৌ ভবতীতি ন পরমাত্মা ভবতি ॥”

পরন্তু খেতাবতর উপনিষদে “সর্কাজীবে সর্কসংহে” ইত্যাদি (১৬) মন্তব্যে পরাধে কথিত হইয়াছে—

“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারক মত্বাভূততত্তেনাসুতদ্বমতি” ।

উক্ত প্রতিবাক্যের দ্বারা মুমুক্শু যে, নিজের আত্মা এবং তাহার প্রেরক সেই অন্তর্ধ্যায়ী পরমাত্মাকে পৃথকরূপে জানিয়া মুক্তিলাভ করেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। তাই সেই উভয় আত্মার ভেদ প্রদর্শন করিতে পরে কথিত হইয়াছে—“জ্ঞাজ্যোদ্যাবজা বীশানীশৌ” (১৯) অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই অজ (নিত্য) । তন্মধ্যে জীবাত্মা অজ্ঞ অর্থাৎ অসর্গজ বা ভ্রান্ত । পরমাত্মা সর্গজ এবং পরমাত্মা ঈশ, জীবাত্মা অনীশ । জীবাত্মাও পরমাত্মার উক্তরূপ ভেদ জ্ঞানকে কখনই জীবের সংসার চক্রে ভ্রমণের হেতু বলা যায় না । সুতরাং পূর্বে “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারক মত্বা”—এই বাক্যের দ্বারা যে, জীবের সংসারচক্রে ভ্রমণের হেতু কথিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না । পরন্তু শেষোক্ত প্রতিবাক্যে “দ্বৌ” এই পদের দ্বারাও জীবাত্মাও পরমাত্মার বাস্তব ভেদই প্রকটিত হইয়াছে । নচেৎ “দ্বৌ” এই পদের প্রয়োজন কি? পরন্তু পরে কথিত হইয়াছে—“নিত্যোনিত্যানাং চেতন চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” (৬১৩) । উক্ত প্রতিবাক্যে “চেতনানাং” এই বহু বচনান্তপ্রয়োগের দ্বারা এবং পরেও “বহুনাং” এই বহুবচনান্ত “বহু” শব্দপ্রয়োগের দ্বারা জীবাত্মা যে, বস্তুতঃই বহু, সুতরাং সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই সমস্ত জীবাত্মার চেতন অর্থাৎ অন্তর্ধ্যায়ী আত্মা এবং এক তিনিই সমস্ত জীবাত্মার কামবিধাতা অর্থাৎ কর্মফল-দাতা, ইহাই বুঝা যায় । এইরূপ আরও অনেক প্রতিবাক্য ও নানায়ুক্তির দ্বারা বিশিষ্টা দ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদই সমর্থন করিয়াছেন ।

শিষ্য । সুপ্রাচীনকাল হইতেই উপনিষদের নানারূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা হইয়াছে, সত্য । বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণ ও অনেক পূর্বসূচীর নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের মত বিশেষণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । প্রাচীনকাল হইতে বাদরায়ণের বেদান্ত সূত্রেরও অনেকরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বিভিন্ন মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । কিন্তু ভগবদ্গীতার ভগবদ্ভাক্যের দ্বারা ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার

বাস্তব অভেদই স্পষ্ট বুঝা যায়। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাশ্মার যে অবিনাশিত্বও সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে, তদ্বারা জীবাশ্মা যে পরব্রহ্মেরই লক্ষণ বিশিষ্ট, স্তত্রাং পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহাই বুঝা যায়। পরন্তু পরে ত্রয়োদশঅধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ জীবকেই ক্ষেত্রজ বলিয়া পরেই বলিয়াছেন—“ক্ষেত্রজ্ঞঃপি মাংবিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত”। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়েও তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ”। সমস্ত জীব তাহারই অংশ হইলে তাহা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। ভগবদ্গীতার দ্বারা যে সিদ্ধান্ত বুঝা যায়, তাহাই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রাহ্য নহে ?

শুঙ্ক। অবশ্যই গ্রাহ্য, শিরোধার্য্য। কিন্তু ভগবদ্গীতার দ্বারা যে জীবও ঈশ্বরের বাস্তব অভেদই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়, ইহাও কি আমরা বলিতে পারি। ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্তবিষয়েও ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পূর্বাচাৰ্য্যগণের বিভিন্ন মত আছে। আর ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাশ্মার অবিনাশিত্বও সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা পরব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া জীবাশ্মা পরমাত্মা হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন, ইহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ পরমাত্মার শ্রায় জীবাশ্মাও সর্বব্যাপী অবিনাশী হইলে তাহাও ত বলিতে হইবে এবং সেখানে তাহাই প্রতিপাদ্য। আর জীবাশ্মায় পরমাত্মার ঐ সমস্ত সাদৃশ্যবশতঃই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীবাশ্মাকেও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু পরব্রহ্ম বলা হয় নাই।

পরন্তু শ্রীভগবান্ সেখানেই অৰ্জুনকে বলিয়াছেন—“ন হেবাং জাতু নাং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বে বয় মতঃ পরং” (২।১২)। উক্তস্থলে শ্রীভগবান্ প্রথমে তাঁহার নিজের পৃথক্ নির্দেশ করায় এবং পরেও “সৰ্বে বয়ং”—এইরূপ বলায় অৰ্জুন ও সেই নৃপতিবর্গের আত্মা যে তাহা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর জীবাশ্মা তাহা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলে তিনি সেখানে জীবাশ্মার চির স্থায়িত্ব প্রতিপাদন করিতে অৰ্জুনকে স্পষ্ট ভাষায় ইহাই কেন বলেন নাই যে, তুমি এবং এই নৃপতিবর্গ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে, কারণ, এই সমস্ত আত্মাই তত্ত্বতঃ আমা হইতে অভিন্ন, আমিই এই সমস্ত শরীরেই

জীবরূপে অবস্থিত। শ্রীভগবান্ পরেও “বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জুন” ইত্যাদি (৪।৫) শ্লোকে অর্জুনের আত্মা হইতে তাহার নিজের পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন। এবং পরে “উত্তমঃ পুরুষ স্তম্ভঃ পরমাশ্চে ত্যুদাহতঃ। যোলোকএয়মাবিশ্ণু বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ (১৫।৭) এই শ্লোকের দ্বারা ত্রিলোক ধারক অব্যয় পরমাশ্চা ঈশ্বর রূপ উত্তম পুরুষ যে, তাহার পূর্বোক্ত ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ হইতে ভিন্ন, ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ উক্ত শ্লোকে “তু” শব্দ ও “অন্ত” শব্দের দ্বারা সমস্ত জীব যে, সেই উত্তম পুরুষ হইতে তদ্ভিত্তিঃ ই ভিন্ন, ইহাই বুঝিয়াছেন।

অবশ্য শ্রীভগবান্ জীবকে তাঁহার অংশ বলিয়াছেন। কিন্তু “অংশ” শব্দের মুখ্য অর্থ খণ্ড বা অবয়ববিশেষ। সূত্ররাং নির্বিকার নিরবয়ব পরমেশ্বরের অবয়ব বা খণ্ড রূপ মুখ্য অংশ সম্ভব নহে। “অংশো নান্যব্যপদেশাৎ” (২।৩।৫৩) ইত্যাদি বেদান্তসূত্রোক্ত “অংশ” শব্দের অর্থব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার শঙ্করও বলিয়াছেন ‘অংশইবাংশো নহি নিরবয়বস্ত মুখ্যোহংশঃ সম্ভবতি’। অর্থাৎ নিরবয়ব পরব্রহ্মের অবয়ব বা খণ্ড রূপ অংশ সম্ভব না হওয়ায় ঐ সূত্রোক্ত “অংশ” শব্দের অর্থ অংশতুল্য। সূত্ররাং ভগবদগীতার “মমৈবাংশো জীবলোকে” ইত্যাদি (১৫।৭) শ্লোকেও “অংশ” শব্দের অর্থ অংশ তুল্য অর্থাৎ ঐ স্থলে অংশ শব্দটী অংশতুল্য অর্থে গৌণ শব্দ। তাহা হইলে ঐ গৌণ অংশ শব্দের দ্বারা জীব যে পরমেশ্বর হইতে তদ্ভিত্তিঃ অভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু উহার দ্বারা পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত জীবের প্রভুভূতাবৎ সম্বন্ধই প্রকটিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। অর্থাৎ সমস্ত জীব পরমেশ্বরের কার্য্য সম্পাদক উপকার্য্য ভূতা। যেমন রাজা তাঁহার আশ্রিত ও কার্য্য সম্পাদক আমাত্যাদি ভূতাগণকে তাঁহার অংশ বলেন, তদ্রূপ, জগৎস্বামী পরমেশ্বরও সমস্ত জীবকে তাঁহার কার্য্য সম্পাদক ভূত্য বলিয়া তাঁহার অংশ বলিয়াছেন এবং আমাদিগের শরীরের অংশ গুলি যেমন শরীর-সাধ্য কার্য্যের সম্পাদক, তদ্রূপ, সমস্ত জীবও পরমেশ্বরের কার্য্যসম্পাদক বলিয়া অংশ তুল্য। কিন্তু অবয়ব রূপ মুখ্য অংশ নহে। কারণ নিরবয়ব পরমেশ্বরের পক্ষে তাহা সম্ভবই নহে। নীমাংসাচার্য্য পার্থসারথিমিশ্র ও ‘শাস্ত্রদীপিকা’র তর্কপাদে ভগবদগীতার ঐকধার

ঐক্যই তাৎপর্যব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহা যে প্রাচীনমত, ইহাপূর্বোক্ত বৈদান্ত সূত্রের ভাষ্য আচার্য্য শঙ্করের কথার দ্বারাও বুঝা যায়। জ্ঞান-বৈশেষিক সম্প্রদায়ও ঐক্য তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন। *

সত্যবটে, শ্রীভগবান “ইদং শরীরং কৌন্তেয়” (১৩।২) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা জীবকেই ক্ষেত্রজ বলিয়া পরেই বলিয়াছেন—“ক্ষেত্রজঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেণ ভারত”। কিন্তু সেখানে পূর্বোক্ত শ্লোকে “ইদং শরীরং”—এইস্থলে এক বচন প্রয়োগ হইয়াছে কেন, ইহা প্রথমে চিন্তা করা আবশ্যক। এবং ঐ শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাও প্রনিধান পূর্বক বিচার করিয়া বুঝা আবশ্যক। সেই সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ হইলে সেখানে উহার খণ্ডনের জন্য আচার্য্য শঙ্করের বহু প্রয়াস পূর্বক বহু বিচারের প্রয়োজন কি? তাহাও চিন্তা করা আবশ্যক। আর সেখানে পূর্ব শ্লোকোক্ত জীবরূপ ক্ষেত্রজই শেযোক্ত শ্লোকে “ক্ষেত্রজ” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হইলে “ক্ষেত্রজং তঞ্চ মাংবিদ্ধি”—এইরূপ কেন বলেন নাই? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক।

দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় কিন্তু শেযোক্ত শ্লোকে “ক্ষেত্রজ” শব্দের দ্বারা অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই বুঝিয়াছেন। তিনি সমস্ত জীবের সমস্ত শরীররূপ ক্ষেত্র সমূহ এবং শুভাশুভ সমস্ত কর্মরূপ বীজ ও জানেন, এই অর্থে শাস্ত্রে তিনিও ক্ষেত্রজ ও “ক্ষেত্রী” বলিয়া কথিত হইয়াছেন। মহাভারতের শাস্তি পর্বে সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মার বোধক “ক্ষেত্রজ” শব্দের উক্তরূপ অর্থ কথিত

* জীবের অণুজবাদী মধ্যার্চ্য্য বরাহপুরাণের বচনানুসারে পরমেশ্বরের স্বাংশ ও বিভিদ্ভাংশ, এই দ্বিবিধ অংশ বলিয়া মন্তব্য কর্তব্য বরাহাদি অবতারগণকে তাঁহার স্বাংশ বা স্বরূপাংশ বলিয়াছেন এবং সমস্ত জীবকে তাঁহার বিভিদ্ভাংশ বলিয়া তাহা হইতে স্বরূপতঃ ভেদই সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারে গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও উক্ত দ্বিবিধ অংশ বলিয়াছেন এবং তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের (৬।৭।৬১) বচনানুসারে জীবকে পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি বলিয়া অংশ বলিয়াছেন। তাই বলদেব বিভাভূষণ মহাশয় সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থের অষ্টমপাদে লিখিয়াছেন—“সচ তদ্ভিন্নোহপি তচ্ছবিত্ত্বেন তদংশে নিগততে”। শ্রীচৈতন্যদেবও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ প্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—“গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানেন। হেন জীব অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?”। চৈঃ চৈঃ মধ্য বষ্ট পঃ ॥

হইয়াছে (১) । তদনুসারে টীকাকার বিখ্যাত চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাক্ষরণ
স্বাক্ষর্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন প্রজাগণ তাঁহাদিগের নিজ
নিজ ক্ষেত্রকেই জানে, কিন্তু রাজা সেই সমস্ত ক্ষেত্রকেই জানেন । তজ্জন,
প্রত্যেক জীব নিজ নিজ শরীর রূপ ক্ষেত্রকে আত্মা বলিয়া জানে, এই অর্থেই
পূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে । কিন্তু সেই সমস্ত জীবের স্বামী সর্বজ্ঞ
পরমেশ্বর সমস্ত জীবের সমস্ত শরীর রূপ সমস্ত ক্ষেত্রকেই জানেন । তিনি
সর্বজীবেরই শরীর রূপ সমস্ত ক্ষেত্রেই হৃদয় দেশে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত
আছেন । তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান্ পরে বলিয়াছেন—“ক্ষেত্রজ্ঞাণি
মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত” । এবং ঐ তাৎপর্য্যেই তিনি পূর্বেও বলিয়াছেন—
“অহমাত্মা শুড়াকেশ সর্ব-ভূতায়স্থিতঃ” ! (১০।১০) শ্রীধর স্বামীও সেখানে
ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“হে শুড়াকেশ সর্বেষাং ভূতানা মাশবেষন্তঃ করণেষু
সর্বজ্ঞত্বাদি গুণৈ নির্যন্তু ত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহং” । বস্তুতঃ শাস্ত্রে অনেক স্থলে
জীবাত্মার ত্রায় পরমাত্মরূপ বিশেষ অর্থেও “আত্মান্” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে
এবং সেই পরমাত্মারই বাস্তব একত্ব এবং জীবের দেহও অন্তঃকরণাদি রূপ
উপাধি ভেদে ঔপাধিক বহুত্ব কথিত হইয়াছে । সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার
সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—“একধাবহুধাচৈব দৃশ্যতে জলজন্তবঃ” । জীবাত্মার
ত্রায় সেই অন্তর্যামী পরমাত্মাও জীবের দেহস্থ পুরুষ । তাই শ্রীভগবান্ তাঁহার
সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—“পরমাত্মেতিচাপ্যুক্তোদেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ” । গীতা—
১০।২৩ । পরন্তু শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ” ॥ গীতা ১৪।২

অর্থাৎ পূর্বোক্ত তত্ত্ব-জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তপুরুষগণ আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত
হইয়া পুনঃ সৃষ্টিতেও পুনর্জন্ম লাভ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন
না । মুক্ত পুরুষে পরমেশ্বরের ঐ সাধর্ম্যই অন্তত্ব “মদ্ভাব” ও “ব্রহ্মভাব” প্রভৃতি
শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে । দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই ভগবদগীতার

১ । ক্ষেত্রাণিহি শরীরাণি বীজাণি শুভাশুভাঃ ।

তানি বেত্তিঃস্বযোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥

উক্ত শ্লোকে “সাধর্ম্য” শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই জীবাত্মা ও পরমেশ্বরের বাস্তব ভেদই সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, বিভিন্ন পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্যই “সাধর্ম্য” শব্দের মুখ্য অর্থ। আচার্য্য শঙ্কর ও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, “মমসাধর্ম্যমাগতাঃ” এই বাক্যের দ্বারা মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত, এই অর্থই বুঝিতে হইবে, কিন্তু আমার সমানধর্ম্যতা প্রাপ্ত, এই অর্থ বুঝা যায় না। কারণ গীতাশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। টীকাকার আনন্দগিরিও উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—
“সাধর্ম্যাত্ম মুখ্যতঃ গীতা শাস্ত্রবিরোধঃ শ্রাদিত্যাহ ন দ্বিতি”।

কিন্তু উক্ত শ্লোকে “সাধর্ম্য” শব্দের সাদৃশ্যরূপ মুখ্য অর্থ গ্রাহ্য নহে, এ বিষয়ে আচার্য্য শঙ্কর যে হেতু বলিয়াছেন, তাহা ত সর্বসম্মত নহে। সুতরাং যে হেতু, অসিদ্ধ বা বিবাদগ্রস্ত, তদ্বারা উক্ত “সাধর্ম্য” শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রাহ্য নহে—ইহা সিদ্ধ করা যায় না। অতএব প্রাধান্যবশতঃ উক্ত “সাধর্ম্য” শব্দের মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য বলিয়া উহার দ্বারা জীবাত্মা ও ঈশ্বরের বাস্তবভেদই সিদ্ধ হয়। কারণ তত্ত্বজ্ঞানী মুক্তপুরুষগণ পরমেশ্বরস্বরূপ না হইয়া পরমেশ্বরের সদৃশ হইলে তখনও পরমেশ্বরের সহিত তাহার ভেদ থাকায় ঐ ভেদ যে কল্পিত নহে, উহা নিত্য, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানী মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মস্বরূপত্বই লাভ করেন, ইহাই বিবক্ষিত হইলে—“মৎস্বরূপত্বমাগতাঃ” এইরূপ বাক্য না বলিয়া “মমসাধর্ম্যমাগতাঃ”—এই বাক্য কেন বলা হইয়াছে? আর মুক্তপুরুষগণ সকলেই পরব্রহ্মস্বরূপই হইলে তখন ত তাঁহাদিগের ব্যবহারিক উপাধিক ব্যক্তি-ভেদও থাকে না। সুতরাং উক্ত মতে “মমসাধর্ম্যমাগতাঃ”—এই বাক্যে বহু বচন প্রয়োগও ত উপপন্ন হয় না।

শিষ্য। মহাভারতে বহু পুরুষবাদের উল্লেখ পূর্বক উহার খণ্ডন করিয়া এক পুরুষ বাদই সিদ্ধান্তরূপে কথিত হইয়াছে, ইহাও ত আচার্য্য শঙ্কর দেখাইয়াছেন।

গুরু। শারীরিক ভাষ্যে (২:১১) আচার্য্য শঙ্কর মহাভারতের শান্তি পর্বের কএকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ মহাভারতের ঐ স্থানের সমস্ত শ্লোকের পর্যালোচনা করিয়া তাহা বুঝেন নাই। গোড়ীয় বৈষ্ণবআচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী

“সৰ্বসংবাদিনী” গ্রন্থে মহাভারতের সেই সমস্ত শ্লোকের দ্বারাও বৈতমতই সমর্থন করিয়াছেন। আমরাও মহাভারতের ঐস্থলে দেখিতে পাই,— বৈশম্পায়নের নিকটে জনমেজয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আত্মা কি বহু, অথবা এক? এবং কোন্ পুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষের যোনি অর্থাৎ জীবদেহাদির উৎপাদক কে? এতদ্বত্তরে বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন যে, সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ের মতে পুরুষ বহু। তাঁহারা এক মাত্র পুরুষ স্বীকার করেন না। পরে ঐ বহু পুরুষ স্বীকার করিয়াই বলিয়াছেন যে, বহু পুরুষের একমাত্র যোনি সেই গুণাধিক পুরুষের ব্যাখ্যা করিব। কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্ম চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া সামান্তরূপে ও বিশেষরূপে নানাশাস্ত্র বলিয়াছেন। কিন্তু বেদব্যাস বিস্তরতঃ যে পুরুষের একত্ব বলিয়াছেন, তাহা আমি তোমাকে বলিব। পরে সেই এক পুরুষকে সমস্ত আত্মার সাক্ষিভূত অন্তর্ঘামী মহাপুরুষ বলিয়াছেন সুতরাং মহাভারতে ঐ স্থলে যে, বৈতমত খণ্ডিত হইয়াছে,—ইহা ত আমরাও বুঝিতে পারি না। পরন্তু বুঝিতে পারি যে, উক্তস্থলে অধ্যাত্ম-চিন্তাশ্রিত কপিল কণাদ ও গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণের বিভিন্নরূপ বৈতমত প্রতিপাদক সকলশাস্ত্রেরই সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। কারণ সেখানে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন—

“উৎসর্গণা পবাদেন ঋষিভিঃ কপিলাদিভিঃ।

অধ্যাত্ম-চিন্তামাত্রিত্য শাস্ত্রাণ্যুত্তানি ভারতঃ।

সবাসত্ত্ব যদব্যাসঃ পুরুষৈকত্ব মুক্তবান্।

ভক্তেহহং সম্প্রবক্ষ্যামি প্রসাদাদমিতৌজসঃ।

মমাস্তুরাত্মা তব চ যেচাত্মে দেহি-সংজ্ঞিতাঃ।

সৰ্বেষাং সাক্ষিভূতাহসৌ ন গ্রাহঃ কেনচিৎকচিৎ।

তত্ত্বৈকত্বং মহত্বঞ্চ সচৈকং পুরুষঃ স্মৃতঃ।

মহাপুরুষ শব্দঃ স বিভূর্ত্যেকঃ সনাতনঃ।

শাস্তিপূৰ্ব্ব ৩৫০—৩৫১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

শাস্ত্রদর্শনে আরম্ভবাদ

শিষ্য । আপনি বলিয়াছেন—কণাদের গ্রাম গোতমও আরম্ভবাদী ।
“পরমাণুকারণবাদে”র নামই ত আরম্ভবাদ । উক্ত মতে পরমাণু নিত্য । কিন্তু
সাংখ্যসূত্রকার মহর্ষি কপিল স্পষ্টই বলিয়াছেন—“নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্ব-
শ্রুতেঃ” (৫।৮৭) অর্থাৎ পরমাণু নিত্য নহে, যেহেতু পরমাণুর কার্য্যত্ব
বা অনিত্যত্ব বিষয়ে শ্রুতি আছে । কিন্তু পরমাণুর অনিত্যত্ব শ্রুতি-সিদ্ধ
হইলে সেই শ্রুতিবিরুদ্ধ কোনও অনুমান দ্বারাও ত পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ
হইতে পারে না ।

গুরু । পরমাণু যে অনিত্য, ইহা কোন্ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়,
তাহা ত সাংখ্যসূত্রকার বলেন নাই । সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও
তাহা দেখাইতে পারেন নাই । কিন্তু উক্ত সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে,
যদিও কালবশে লোপাদি প্রযুক্ত আমরা এখন সেই শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাই না,
তথাপি আচার্য্য কপিল মহর্ষির উক্ত সূত্র এবং “অথ্যো মাত্ৰা বিনাশিত্বো
দশাঙ্গানাম্ ঋষাঃ স্মৃতাঃ” (১।২৭) এই মনুস্মৃতির দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ববোধক
সেই শ্রুতিবাক্য অনুমেয় । বিজ্ঞানভিক্ষুর বিবক্ষা এই যে,—পূর্বোক্ত কপিল-
সূত্ররূপ স্মৃতি ও মনুস্মৃতি যখন শ্রুতিমূলক, তখন উহার দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব-
বোধক সেই মূলশ্রুতির অনুমান করা যায় । প্রত্যক্ষ শ্রুতির গ্রাম অনুমিত
শ্রুতিও সকলেরই স্বীকার্য্য । শ্রুতির যে সমস্ত অংশ বিলুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া
গিয়াছে, ঋষিগণের স্মৃতির দ্বারা তাহার অনুমান হওয়ার উহাকে বলে অনুমিত
শ্রুতি । বস্তুতঃ পূর্বস্মীমাংসাদর্শনে (১।৩।৩) মহর্ষি জৈমিনিও স্মৃতির দ্বারা
শ্রুতির অনুমান বলিয়া অনুমিত শ্রুতিও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ।

কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর ঐ কথার উত্তরে প্রথমে বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত
সাংখ্যসূত্রটি যে মহর্ষি কপিলেরই সূত্র, ইহা অনেকেরই সম্মত নহে । বিজ্ঞান-
ভিক্ষু তাহা বলিলেও সাংখ্য-শাস্ত্রের যে অনেক অংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,

ইহা তিনিও প্রথমে বলিয়াছেন (১)। আর যদি উক্ত সাংখ্যসূত্রটিকে মহর্ষি কপিলের সূত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াই উহার দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব-বোধক কোন মূল প্রতিবাক্যের অনুমান করা যায়, তাহা হইলে মহর্ষি গৌতমের সূত্র দ্বারাও পরমাণুর নিত্যত্ব-বোধক কোন মূল প্রতিবাক্যের অনুমান করা যাইবে না কেন? মহর্ষি গৌতম পূর্বে অন্য প্রসঙ্গে “নাগুনিত্যত্বাৎ” (২।২।২৪) এই সূত্রের দ্বারা পরমাণু যে নিত্য, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন, এবং পরে বিচার পূর্বক পরমাণুর নিরবয়বত্ব সমর্থন করিয়া নিত্যত্বই সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং গৌতমের সেই সমস্ত সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব-বোধক সেই মূল প্রতিবাক্য অনুমান করিতে পারি এবং গৌতমের ব্যাখ্যাত “আরম্ভবাদে”র মূলভূত সেই প্রতি কালবশে বিলুপ্ত হওয়ায় আমরা তাহা দেখিতে পাই না—ইহাও বিজ্ঞান-ভিক্ষুর হ্রায় বলিতে পারি। কপিলের সাংখ্যসূত্র প্রতিমূলক, কিন্তু গৌতমের হ্রায়সূত্র প্রতিমূলক নহে, ইহা ত কখনই সর্বসম্মত হইবে না।

আর বিজ্ঞানভিক্ষু যে, “অধ্যো মাত্রা বিনাশিতো দশাঙ্কানাঞ্চ যাঃ স্মৃতাঃ”—এই মনুস্মৃতির দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব বুঝিয়াছেন, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, উক্ত মনুস্মৃতি “দশাঙ্কানাঞ্চ মাত্রাঃ”—এই বাক্যের দ্বারা দশের অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চভূতের যে সমস্ত মাত্রা বা সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ সাংখ্যাদি শাস্ত্রোক্ত পঞ্চতন্মাত্রা, তাহারই বিনাশিত্ব কথিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত “মাত্রা” অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রার সূক্ষ্মত্ব প্রকাশ করিতেই “অধ্যাঃ” এই বিশেষণ পদের দ্বারা উহাকে অণু-পরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। উক্ত স্মৃতির প্রথমে গুণবাসক “অণু” শব্দেরই স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত “অণী” শব্দের প্রথমার বহুবচনে “অধ্যাঃ” এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্বোক্ত পরমাণু অর্থে “অণু” শব্দের প্রয়োগ হয় নাই, ইহা বুঝা আবশ্যক।

ফল কথা, উক্ত মনুস্মৃতির দ্বারা কণাদ ও গৌতমের সম্মত পরমাণুর অনিত্যত্ব বুঝা যায় না। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেঘাতিথি প্রভৃতিও উক্ত মনুস্মৃতির দ্বারা সেইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারাও উক্ত মনুস্মৃতি

১। “কালার্ভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানম্বধাকরম্।

কলাবশিষ্টং ভূয়োহপি পুরস্ক্রিয়ো বচোহয়মুভৈঃ।”

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের প্রারম্ভে বিজ্ঞানভিক্ষুর শ্লোক।

“মাত্রা” শব্দের দ্বারা সাংখ্যাদি-শাস্ত্র-সম্মত পঞ্চতন্মাত্রই গ্রহণ কারয়াছেন। পরন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে পঞ্চম ভূত নিত্য আকাশের মূল কোন স্বল্পভূত নাই। কিন্তু সাংখ্যাদি মতে আকাশেরও মূল তন্মাত্র (শব্দতন্মাত্র) আছে। উক্ত মনুবচনেও “মাত্রা” শব্দের দ্বারা আকাশের সেই স্বল্প অংশরূপ তন্মাত্রও গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যাদি-শাস্ত্রসম্মত পঞ্চতন্মাত্রই কণাদও গৌতমের সম্মত পরমাণু নহে। তাহা হইতে উৎপন্ন কোন স্বল্প ভূতও পরমাণু নহে। কিন্তু পৃথিব্যাदि চতুর্ভূতের যাহা সর্বাংশে স্বল্প অংশ যাহার উৎপত্তি, বিনাশ এবং কোনরূপ পরিণাম বা বিকারও নাই, তাহাই কণাদ ও গৌতমসম্মত পরমাণু। উহার উৎপত্তি ও বিনাশের কোন কারণ না থাকায় উহা নিত্য।

য। ত্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায় কি, উক্তরূপ নিত্য পরমাণুর বোধক কোন শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন? অথবা তাঁহারাও সেই শ্রুতির অন্তর্ধানই করিয়াছেন?

শুক্র। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য খেতাখতর উপনিষদের “বিখতশ্চক্ষু-রুত”—ইত্যাদি স্প্রশসিদ্ধ মন্তকেই (১) আরম্ভবাদের মূল শ্রুতি বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতি-মন্তের তৃতীয় পাদে যে “পতত্র” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার অর্থ পরমাণু। পরমাণু-সমূহ গতিশীল, সুতরাং গত্যর্থ “পত” ধাতু-নিম্পন্ন ঐ “পতত্র” শব্দটি ঐ পরমাণুর বৈদিক সংজ্ঞা। উক্ত শ্রুতিমন্তের পরার্কিবাক্যে “পতত্রৈঃ পরমাণুভিঃ সংজনয়ন্ সমুৎপাদয়ন্ সংধমতি সংযোজয়তি”—এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্বে সেই নিত্য পরমাণু-সমূহে অধিষ্ঠান করতঃ সেই সমস্ত পরমাণুর দ্বারা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে তাহাতে সংযোগ উৎপন্ন করেন। ফল কথা উক্ত শ্রুতিমন্তে “পতত্র” শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত নিত্য পরমাণু। পরমাণুগুলি পক্ষীর ‘পতত্রের’

১। “বিখতশ্চক্ষুরুত বিখতো মুখো বিখতো বাহরুত বিখতঃ পাং। সাংবাহভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ”। খেতাখতর। ৩৩।

“হর্ন্তেন পরমাণুরূপপ্রধানাধিষ্টেয়ঃ, তে হি গতিশীলভাং পতত্রব্যপদেশাঃ, পতন্তীতি। “সংধমতি” “সংজনয়তি”তি চ ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ, তেন সংযোজয়তি সমুৎপাদয়তিত্বার্থঃ।”

(“স্বায়কুসুমাল্লি”—পঞ্চমস্তবক তৃতীয় কারিকাব্যাখ্যার শেষভাগ দ্রষ্টব্য)

(পক্ষের) ভায় বায়ুর সাহায্যে উড়িতেছে, সুতরাং পক্ষসদৃশ বলিয়াও উক্ত মন্ত্রে উহা “পতত্র” নামে কথিত হইতে পারে ।

অবশ্য উদয়ানাচার্য্যের উক্তরূপ ব্যাখ্যা অগ্র সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই ও কখনও করিবেন না, ইহা স্বীকার্য্য । কিন্তু শ্রুতির ব্যাখ্যাভেদেও যে অনেক মতভেদ হইয়াছে, ইহা ত পূর্বেই বলিয়াছি । আর বিভিন্ন মতের সমর্থক অন্তান্ত আচার্য্যগণও যে, শ্রুতির ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে কষ্ট কল্পনাও করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনেক স্থলে গোণ বা লাক্ষণিক অর্থেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও ত অস্বীকার করা যাইবে না । সে যাহা হউক, পূর্বোক্তরূপ পরমাণু যে অনিত্য, এ বিষয়ে কোন শ্রুতি প্রদর্শন করিতে না পারিলেও পরমাণুর নিত্যত্বসাধক অনুমানকে ত তুমি শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিতে পারিবে না, সুতরাং অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা বলিলে তোমার আর কি বক্তব্য আছে ?

শিষ্য । অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই বা কিরূপে পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে ? সর্বাণ্যপেক্ষা হস্ত দ্রব্যকেই ত আপনি পরমাণু বলিয়াছেন ? কিন্তু যাহার অবয়ব বা অংশ নাই, তাহাতে ত সংযোগ জন্মিতে পারে না । কারণ, কোন দ্রব্যে অপর দ্রব্যের সংযোগ জন্মিলে সেই দ্রব্যের কোন অংশেই সেই সংযোগ জন্মে । সর্বাংশে কোন সংযোগ জন্মে না । কিন্তু আপনার কথিত পরমাণুর বখন কোন অংশ বা অবয়বই নাই, তখন তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ সম্ভবই নহে । সুতরাং উহাতে সংযোগ স্বীকার করিতে গেলেই উহার অংশ স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলেই ত আর উহাকে আপনি পরমাণু বলিতে পারেন না । পরন্তু আপনার কথিত পরমাণুর কোন অংশ না থাকায় উহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলেও সেই সংযোগজন্ত যে দ্রব্য জন্মিবে, তাহাও ত সেই পরমাণু-পরিমিতই হইবে, তাহা ত স্থূল হইতে পারে না । সুতরাং “পরমাণুকারণবাদ”ও উপপন্ন হয় না । শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন ।

গুরু । পরমাণু খণ্ডন করিতে বিজ্ঞানবাদী মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই ঐ সমস্ত কথা বিশদভাবে বলিয়াছিলেন । আমি এখানে তাঁহাদিগের কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি । প্রখ্যাতবৌদ্ধাচার্য্য বহুবল্লু তাঁহার “বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতাসিদ্ধি” গ্রন্থে “বিংশতিকা” কারিকার মধ্যে বলিয়াছেন—

“ন তদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ পরমাণুশঃ ।

ন চ তে সংহতা স্বপ্নাৎ পরমাণুর্ন সিধ্যতি ॥

ষট্কেন যুগপদ যোগাৎ পরমাণোঃ যড়ংশতা ।

ষষ্ঠাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ শ্রাদণুমান্রকঃ ॥” •

প্রথম কারিকার দ্বারা হীনযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈভাষিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সম্মত বাহ্যবিষয়ের সত্তা খণ্ডন করিতে বহুবছ বলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের স্বীকৃত বাহ্য-বিষয়কে অবয়বিরূপ একও বলা যায় না, অনেকও বলা যায় না এবং সংহত অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা মিলিত পরমাণুসমষ্টিরূপও বলা যায় না । কারণ পরমাণুই সিদ্ধ হয় না । কেন সিদ্ধ হয় না? ইহা সমর্থন করিতে দ্বিতীয় কারিকার দ্বারা বলিয়াছেন যে, পরমাণু স্বীকার করিয়া তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলে পরমাণুই সিদ্ধ হয় না । কারণ, মধ্যস্থিত কোন একটি পরমাণুতে যখন তাহার উর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুর্দিক, এই ছয় দিক হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সংযুক্ত হয়, তখন সেই পরমাণুর “যড়ংশতা” অর্থাৎ ছয়টি অংশ আছে, ইহা স্বীকার্য্য । কারণ, সেই পরমাণুর একই প্রদেশে একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সংযোগ হইতে পারে না । যে প্রদেশে এক পরমাণুর সংযোগ জন্মে, সেই প্রদেশেই তখনই আবার অন্য পরমাণুর সংযোগ সম্ভব হয় না । সুতরাং উক্তস্থলে সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি অংশ বা প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সেই ছয়টি পরমাণুর সংযোগ জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য । তাহা হইলে আর উহাকে পরমাণু বলা যায় না । কারণ, যাহার অংশ নাই, যাহা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ।

আর যদি সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর একই প্রদেশে যুগপৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা যায়, অথবা পরমাণুর কোন অংশ না থাকিলেও তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে—“পিণ্ডঃ শ্রাদণুমান্রকঃ”,—অর্থাৎ সেই সপ্ত পরমাণুর সংযোগজন্ম যে পিণ্ড বা দ্রব্য, জন্মিবে অথবা সেই সংযুক্ত সপ্ত পরমাণুসমষ্টিরূপ যে পিণ্ড বা দ্রব্য, তাহা স্থূল হইতে পারে না, সুতরাং তাহা দৃশ্য হইতে পারে না । কারণ কোন

• বহুবছুর অস্বাভাবিক কারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা বহীর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সংস্পাদিত “স্মারদর্শনের” পঞ্চম খণ্ডে ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাহার সহিত অপর দ্রব্যের সংযোগ প্রযুক্তই সেই দ্রব্যের প্রথিমা বা স্থূলত্ব হইতে পারে। কিন্তু যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা কোন অংশই নাই, তাহাতে অপর দ্রব্যের সংযোগই হইতে পারে না। আর তাহা স্বীকার করিলেও তজ্জন্ত সেই দ্রব্যের স্থূলত্ব সম্ভবই হয় না। সূতরাং তাহার দৃশ্যত্বও সম্ভব নহে। অতএব কোনরূপেই পরমাণু সিদ্ধ না হওয়ায় বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন পরমাণু নাই, সূতরাং বাহ্যবিষয়ও নাই। অতএব জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞেয় বিষয়ের সম্ভাব্য নাই।

কিন্তু ইহা গৌতমের অজ্ঞাত কোন নূতন কথা নহে। গৌতম নিজেই প্রথমে পূৰ্ণপক্ষরূপে পরমাণুর সাব্যস্তত্ব সমর্থন করিতে শেষসূত্রে (৪।২।২৪) পূৰ্ণোক্তকথাও বলিয়াছেন এবং উক্ত পূৰ্ণপক্ষের খণ্ডন করিতে পরে সিদ্ধান্ত-সূত্র বলিয়াছেন—

“অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানুপপত্তেচ্চাপ্রতিষেধঃ” ॥৪।২।২৫॥

অর্থাৎ পরমাণুর যে নিরবয়বত্ব, তাহার প্রতিষেধ করা যায় না, অর্থাৎ পূৰ্ণোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাব্যস্তত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ হয় না? তাই বলিয়াছেন—“অনবস্থাকারিত্বাৎ।” অর্থাৎ পূৰ্ণোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর অবয়ব বা অংশ আছে, ইহা সিদ্ধ হইলে ঐ হেতুর দ্বারা সেই অবয়বের অবয়ব আছে এবং সেই অবয়বেরও অবয়ব আছে—এইরূপে অনন্ত অবয়বপরম্পরার সিদ্ধির আপত্তি হয়। ঐরূপ আপত্তির নাম “অনবস্থা।” সূতরাং পূৰ্ণপক্ষবাদীর ঐ হেতু অনবস্থা-দোষের প্রযোজক হওয়ায় উহার দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূৰ্ণপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, প্রমাণ সিদ্ধ “অনবস্থা” যে দোষ নহে, ইহা ত গৌতমেরও স্বীকার্য্য। সূতরাং পূৰ্ণোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর অবয়ব এবং সেই অবয়বের অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব সিদ্ধ হওয়ায় পরমাণু সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রে পরে বলিয়াছেন—“অনবস্থানুপপত্তেচ্চ”। অর্থাৎ উক্তরূপ অনবস্থার উপপত্তি ও না হওয়ায় উহা স্বীকার করা যায় না।

তাৎপর্য্য এই যে, যে অনবস্থা প্রমাণ দ্বারা উপপন্ন হওয়ায় অবশ্য স্বীকার্য্য এবং যাহা স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না সেই অনবস্থাই স্বীকার করা যায়। কারণ, সেই অনবস্থা প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া উহা দোষই নহে। কিন্তু

পূৰ্ণোক্তরূপ অনবস্থা স্বীকার করা যায় না। কারণ, যদি পরমাণুর অবয়ব এবং সেই অবয়বের অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব স্বীকার করা যায়, অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব বিভাগের কুত্ৰাপি অন্তই না থাকে, তাহা হইলে পৰ্ব্বতের অবয়ববিভাগের যেমন কুত্ৰাপি অন্ত নাই, তদ্রূপ সৰ্বপের অবয়ববিভাগেরও কুত্ৰাপি অন্ত না থাকায় সৰ্ষণ ও পৰ্ব্বত উভয়ই অনন্তাবয়ববিশিষ্ট হওয়ায় ঐ উভয়েরই তুল্যতা স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ সৰ্ষণ ও পৰ্ব্বতের গুরুত্ব ও পরিমাণ তুল্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, সৰ্ষণের গুরুত্ব ও পরিমাণ অপেক্ষায় পৰ্ব্বতের গুরুত্ব ও পরিমাণ যে অধিক, ইহা প্রমাণসিদ্ধ সত্য। ঐ সত্যের অপলাপ করিয়া নিজমতসমর্থনের জন্ত সৰ্ষণ ও পৰ্ব্বতকে কখনই তুল্যপরিমাণ বলা যায় না। এইরূপ অত্যাশ্রয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যকেই সমপরিমাণ বলা যায় না। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সৰ্ষণের অবয়ব-পরম্পরার বিভাগ করিতে করিতে এমন কোন ক্ষুদ্র অংশে ঐ বিভাগের শেষ হয়, যাহার আর বিভাগ বা অংশ নাই। সেই অতিক্ষুদ্র অংশই পরমাণু। এইরূপ পৰ্ব্বতের অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পরারও বিভাগ হইলে সৰ্ব্বশেষে যে অতি সূক্ষ্ম অংশে ঐ বিভাগের শেষ হয়, তাহাই পরমাণু। তাহা হইলে সৰ্ষণের অবয়ব-পরম্পরার সংখ্যা হইতে পৰ্ব্বতের অবয়বপরম্পরার সংখ্যাধিক্যবশতঃ সৰ্ষণ হইতে পৰ্ব্বত বড়, ইহা উপপন্ন হওয়ায় ঐ উভয়ের তুল্যপরিমাণত্বের আপত্তি হইতে পারে না।

শিষ্য। একটি সৰ্ষণের অংশ এবং তাহার অংশ প্রভৃতি অবয়বপরম্পরার সম্পূর্ণ বিভাগ হইলে ত সৰ্ব্বশেষে কিছুই থাকে না, তখন ত শূন্যই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং আপনার কথিত পরমাণু নামক অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

গুরু। সৰ্ষণের অবয়বপরম্পরার সম্পূর্ণ বিভাগ হইলে সৰ্ব্বশেষে যদি কিছুই না থাকে; তাহা হইলে সেই চরম বিভাগ কোথায় থাকিবে? সেই চরম বিভাগেরও তা আশ্রয় দ্রব্য থাকা আবশ্যক। আর দৃষ্টান্তরূপে শ্রুতিও ত বলিয়াছেন—“বালাগ্র শতভাগশ্চ শতধা কল্লিতশ্চ”। (খোতাম্বতর উপ) কিন্তু কোন কেশাগ্রের শতাংশের শতাংশের অংশ অলীক হইলে তাহা ত

ঐ স্থলে দৃষ্টান্ত বলাই যায় না। সুতরাং চরম বিভাগের আশ্রয় অতি সূক্ষ্ম পরমাণু যে অবশ্য আছে, ইহাশ্রুতির পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধ হয়। মহর্ষি গৌতমও সর্বাভাববাদীর মত খণ্ডন করিতে পূর্বে বলিয়াছেন—
 “ন প্রলয়োহ্ণুসদ্ভাবাৎ” ॥৪২।১৩॥ অর্থাৎ জ্ঞাত্র দ্রব্যের অবয়ব পরম্পরার চরম বিভাগের পরে আর কিছুই থাকে না, ইহা বলা যায় না। কারণ পরমাণুর সত্তা আছে। গৌতমের তাৎপর্যব্যক্ত করিতে বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন—
 “বিভাগস্ত চ বিভজ্যমান হানি নোপ পশ্যতে”। তাৎপর্য এই যে, যে দ্রব্যবয়ের বিভাগ জন্মে, তাহাকে বলে বিভজ্যমান দ্রব্য। বিভাগমাত্রই সেই দ্রব্যদ্বয়ে জন্মে ও থাকে। সুতরাং যাহা চরম বিভাগ, তাহাও কোন দুইটি দ্রব্যে জন্মিবে ও থাকিবে। অতএব চরম বিভাগ জন্মিয়াছে কিন্তু তাহার আধার সেই বিভজ্যমান দুইটি দ্রব্য নাই, অর্থাৎ সেই চরম বিভাগের পরে আর কিছুই থাকে না—ইহা কখনই উপপন্ন হয় না। কারণ, নিরাশ্রয় বিভাগ অসীক। সুতরাং সেই চরমবিভাগেরও আশ্রয় দুইটি দ্রব্য অবশ্য স্বীকার্য হওয়ায় পরমাণু সিদ্ধ হয়। কারণ, সেই দুইটি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যই দুইটি পরমাণু। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগজ্ঞাত্র সর্বপ্রথম যে দ্রব্য জন্মে, তাহার নাম “দ্ব্যণুক” এবং সেই দ্ব্যণুক-ত্রয়ের সংযোগজ্ঞাত্র পরে যে, দ্বিতীয় দ্রব্য জন্মে তাহার নাম “ত্রসরেণু”। ঐ ত্রসরেণুই স্থূল জ্ঞাত্র-দ্রব্যের মধ্যে প্রথম দ্রব্য। প্রথমে উহাতেই স্থূলত্ব বা মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ জন্মে। ঐ যে গবাক্ষরন্ধে সূর্য্য-কিরণের মধ্যে গতিশীল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু দেখা যাইতেছে,—উহার নাম “ত্রসরেণু”। “ত্রস” শব্দের অর্থ জড়গম। সুতরাং মনে হয়, জড়গম বা গতিশীল রেণু বলিয়া ঐ অর্থে “ত্রসরেণু” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যাহা হউক, উহা যে সুপ্রাচীন পারিভাষিক সংজ্ঞা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, মনু বলিয়াছেন—

“জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।

প্রথমঃ তৎপ্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে” ॥৮।১৩২ *

* মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও বলিয়াছেন “জালসূর্য্য মর্য্যচিহ্নং এতরেণু রজঃ সূক্ষ্মং” (আচার অধ্যায় ৩৬০ শ্লোক) সেখানে টীকাকার অপসার্কও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“গবাক্ষ-প্রবিষ্টাদিত্যকরণেষু যৎসূক্ষ্মং বৈশেষিকোক্ত নীঃ। দ্ব্যণুক ত্রায়রন্ধঃ দৃশ্যতে রজঃ, তৎ ত্রসরেণুরিতি সম্বাদিত্তিঃ সূক্ষ্মং”। “বীরমিত্রোদয়” স্মৃতিবিশেষেও (২২৪ পৃঃ) ঐ ব্যাখ্যাই দেখা যায়।

পরমাণুর পরিচয় প্রকাশ করিতে মহর্ষি গৌতম নিজেও বলিয়াছেন—

“পরংবা ক্রটেঃ” ॥ ৪।২।১৭।

অর্থাৎ ক্রটিয় পরই পরমাণু। বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত “ত্রসরেণুর” অপর নামই “ক্রটি”। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত “ক্রটি” বা ত্রসরেণুকেই চরম সূক্ষ্ম দ্রব্য বলিয়াছেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—“ক্রটাবেব বিশ্রামাৎ।” অর্থাৎ তাঁহার মতে জন্তু-দ্রব্যের অবয়ব-পরম্পরার যে বিভাগ, তাহার, ঐ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম। ঐ “ত্রসরেণুর” আর কোন অংশ না থাকায় উহাই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দ্রব্য ও নিত্য। কিন্তু মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত সূত্রে “পর” শব্দ ও অবধারণার্থক “বা” শব্দের প্রয়োগ করিয়া “ক্রটি” অর্থাৎ ত্রসরেণুর পরই পরমাণু, “ত্রসরেণুই পরমাণু নহে, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরম্পর পরমাণু, যে অতীন্দ্রিয়, ইহা তিনি পূর্বে স্পষ্টই বলিয়াছেন (১)। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের—“তত্ত্ব কাৰ্য্যং লিঙ্গং” [৪।১।২] এই সূত্রের দ্বারাও মূল কারণ পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত মতানুসারে চরকসংহিতাতেও শস্ত্রীরের মূল অবয়ব পঃমাণুসমূহের অতীন্দ্রিয়ত্ব স্পষ্ট কথিত হইয়াছে, (১) সূত্রাং রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মত তাঁহার নিজমত, উহা কণাদ ও গৌতমের সম্মত মত নহে।

শিষ্য। গৌতম প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলেন নাই কেন? ঐ ত্রসরেণুরও যে অবয়ব বা অংশ আছে, সে বিষয়ে শ্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য্যগণ কি কোন প্রমাণ বলিয়াছেন?

গুরু। পরমাণুপঞ্জবাদী বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় শেষে গবাক্ষরকুণ্ডত স্বর্য্যকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলিয়া পরমাণুপঞ্জের প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উত্তোতকর “শ্রায়বার্ত্তিক” তাঁহাদিগের উক্ত মতেরও উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, দৃশ্যমান ত্রসরেণুর অবয়ব বা অংশ

১। সেনাবনবৎগ্রহণমিচ্ছাত্তীন্দ্রিয়ত্বাদণুনাং।” শ্রায়দর্শন ২।১।৩৬শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২। “শরীরাবয়বান্ত পরমাণুভেদেন পরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যতি-বহুত্বাদতিসৌম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ।”

আছে। যেহেতু, উহা আবাদিগের বহিরিঙ্গিয় গ্রাহ। অর্থাৎ বহিরিঙ্গিয়গ্রাহঃ
দ্রব্যমাত্রই সাব্যস্ত, ইহা দৃশ্যমান বহু দ্রব্যেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তদদৃষ্টান্তে
ত্রসরেণুর অবয়ব বা অংশ আছে, ইহা অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ। উক্তোক্তকরের উক্তরূপ
অনুমানের অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী ত্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ—
“ত্রসরেণুঃ সাব্যস্তঃ, চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ”—ইত্যাদি প্রকার অনুমানপ্রয়োগ
করিয়া ত্রসরেণুর সাব্যস্তবত্ত্ব সাধন করিয়াছেন।

রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন যে, উক্তরূপে অনুমান করিলে ঐ ত্রসরেণুর
অবয়বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বেই অবয়ববিভাগের
বিশ্রাম বা অন্ত সম্ভব না হওয়ায় পরিমাণও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং উক্তরূপ
অনুমান অপ্রয়োজক হওয়ায় উহা গ্রাহ্য নহে। এতদ্ব্যতীত গৌতমমতের সমর্থক
নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, “ত্রসরেণু”তে অবয়ববিভাগের বিশ্রাম স্বীকার
করিয়া উহাকেই সর্বোপেক্ষা হ্রস্ব নীত্য দ্রব্য বলিলে উহার যে পরিমাণ, তাহাও
নীত্য বলিতে হইবে। কিন্তু উহা নীত্য পরিমাণ বলা যায় না। কারণ, উহা
গগনাদি বিশ্বব্যাপী দ্রব্যের ত্রায় সর্বোৎকৃষ্ট পরিমাণ নহে। উহা সর্বপাদি ক্ষুদ্র
দ্রব্যের ত্রায় অপকৃষ্ট মহৎ পরিমাণ, সুতরাং উহা নীত্য হইতে পারে না।
কারণ, সর্বপ বা ঘটাদি দ্রব্যের যে মহৎ পরিমাণ, তাহা অনেক অবয়বরূপ দ্রব্যের
সম্বন্ধ প্রযুক্তই হইয়া থাকে। সুতরাং তদদৃষ্টান্তে গগনাদিগত সর্বোৎকৃষ্ট
পরিমাণ ভিন্ন আর সমস্ত মহৎ পরিমাণই যে, অনেক অবয়বরূপ দ্রব্যের সম্বন্ধ
প্রযুক্ত, ইহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। তাহা হইলে ঐ দৃশ্যমান ত্রসরেণুর
অবয়ব আছে এবং তাহারও অবয়ব আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ ঐ ত্রসরেণু
যদি নিরবয়ব হয় অর্থাৎ উহাতে যদি অনেক অবয়বরূপ দ্রব্যের সম্বন্ধ না থাকে,
তাহা হইলে উহাতে সর্বপাদির ত্রায় অপকৃষ্ট মহৎ পরিমাণ থাকিতে পারে না—
এইরূপ অনুকূল তর্ক থাকায় পূর্বোক্ত অনুমানকে অপ্রয়োজক বলা যায় না।
অনুকূল তর্কশূন্য অনুমান বা হেতুকেই অপ্রয়োজক বলে। কিন্তু উক্তরূপ
অনুমানের দ্বারা ত্রসরেণুর অনন্ত অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, অনন্ত
অবয়ব স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত অনবস্থাদোষ হওয়ায় অবয়ববিভাগের কোন
অবয়বে যে বিশ্রাম বা অন্ত স্বীকার করিতেই হইবে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি,
এবং উক্তরূপ অনবস্থা যে স্বীকার করা যায় না, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি।

সুতরাং ঐ ত্রসরেণুর অবয়ববিভাগের যে স্থানেই তুমি বিশ্রাম স্বীকার করিবে, তাহাই পরমাণু বলিয়া তোমার স্বীকার করিতে হইবে। শ্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায় বিচারপূর্বক ত্রসরেণুর অবয়বের (ছ্যাণ্কেয়) অবয়বেই বিভাগের বিশ্রাম স্বীকার করিয়া উহাকেই পরমাণু বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত যুক্তিবশতঃ নিরবয়ব পরমাণু অবশ্যস্বীকার্য্য হইলে সেই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং সৃষ্টি হইতে পারে না এবং কোনকালে সমস্ত পরমাণুর বিভাগ না হইলেও প্রলয় হইতে পারে না। সৃষ্টির পরে প্রলয়ও শাস্ত্র ও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু পরমাণুদ্বয় পূর্বে সংযুক্ত না হইলে তাহার বিভাগ সম্ভবই হয় না।

শিষ্য। পরমাণুবাদ সমর্থন করিতে কেহ কেহ বলেন যে, কোন পরমাণুরই অপর পরমাণুর সহিত সংযোগ জন্মেই না। কিন্তু পরমাণু-সমূহ এমন ভাবে পরস্পরের অতি নিকটস্থ হয়, যাহাতে উহা সংযুক্ত বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু পরমাণুবাদী কোন পূর্বাচার্য্য কি ঐরূপ কথা বলিয়াছেন?

গুরু। তুমি কি পরমাণুবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথা বলিতেছ? তাঁহাদিগের কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তবে প্রাচীনকালে পরমাণুপুঞ্জবাদী বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন সম্প্রদায় যে পুঞ্জীভূত পরমাণু-সমূহের মধ্যে কোন পরমাণুই অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না, অর্থাৎ পরমাণু-সমূহের পরস্পর সংযোগই জন্মে না, এইরূপ মতের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধগ্রন্থ “তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা”য় বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীলের উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি এবং পরমাণুপুঞ্জবাদী কোন বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় যে সংযোগকে কোন অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতেন না, তাঁহাদিগের মতে দ্রব্যদ্বয়ের বিশেষ প্রত্যাসক্তি অর্থাৎ নিকটবর্তিতাবিশেষই সংযোগ, ইহাও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি। বাৎস্যায়ন (২১১৩৬শ স্তত্রভাষ্যে) বিশেষ বিচার পূর্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এখন কেহ কেহ কণাদের পরমাণুবাদের সমর্থন করিতেও তোমার কথিত ঐরূপ কথাও বলিয়া থাকেন, ইহা আমিও শুনিয়াছি।

কিন্তু আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের উক্তরূপ মত নহে। তাঁহারা পরমাণুপুঞ্জবাদীও নহেন। তাঁহাদিগের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে প্রথমে “দ্যগুক” নামক অবয়বী জন্মে এবং ঐ দ্যগুকত্রয়ের সংযোগে “ত্রসরেণু” নামে অবয়বী জন্মে। এইরূপে ক্রমশঃ স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম অবয়বী জন্মে। শ্রায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম বিশেষ বিচার দ্বারা পরমাণুপুঞ্জবাদ খণ্ডন করিয়া অতিরিক্ত অবয়বীর উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কথা এই যে, দৃশ্যমান ঘটাদি দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জমাত্র হইলে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়। প্রত্যেক পরমাণুই যখন অতীন্দ্রিয়, তখন মিলিত পরমাণুপুঞ্জও অতীন্দ্রিয়ই হইবে। কারণ, ঐ পরমাণুপুঞ্জ ত সেই অতীন্দ্রিয় পরমাণু হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। অতএব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ-জন্ম ঐ পরমাণুদ্বয় হইতে ভিন্ন পৃথক্ দ্রব্যের উৎপত্তিই স্বীকার্য্য। উহাই প্রথম উৎপন্ন অবয়বী। উহাতে সেই পরমাণুদ্বয়ই সমবায়িকারণ বা উপাদানকারণ এবং উহার সংযোগ অসমবায়িকারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ অসমবায়িকারণ ব্যতীত সেই “দ্যগুক” নামক প্রথম অবয়বী জন্মিতে পারে না। সুতরাং পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য্য। আর ঐ পরমাণুদ্বয়ের পূর্বসংযোগ ব্যতীত যে, উহার বিভাগ হইতে পারে না এবং উহার বিভাগ ব্যতীতও “দ্যগুকে”র নাশ সম্ভব না হওয়ায় কখনও প্রলয় হইতে পারে না, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি।

শিষ্য। দৃশ্যমান ঘটপটাদি দ্রব্যের যে সংযোগ, উহা সেই সমস্ত দ্রব্যের সর্বাংশে জন্মে না, কিন্তু অংশবিশেষই জন্মে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তদদৃষ্টান্তে—সংযোগমাত্রই যে অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ উহা নিজের আশ্রয়-দ্রব্যের অংশবিশেষেই জন্মে, ইহাও ত অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। তাহা হইলে আপনার কথিত অংশশূন্য পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ যে সম্ভবই হয় না।

গুরু। তুমি সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ দেখিয়া সংযোগমাত্রই তাহার আশ্রয়দ্রব্যের অংশবিশেষেই জন্মে, সুতরাং নিরংশ দ্রব্যের সংযোগ জন্মিতেই পারে না, ইহা অনুমান করিতে পার না। কারণ, নিরংশ পরমাণু অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তাহার সংযোগও ঐ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। আর তুমি যেমন সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগকে ঐরূপ দেখিতেছ, তদ্রূপ সেই

সমস্ত দ্রব্যের নিজ নিজ অবয়ব-সমূহের পরস্পর সংযোগও ত দেখিতেছি এবং সেই সমস্ত অবয়বের বিভাগ হইলে যে সেই পূর্বেোৎপন্ন সংযোগের ধ্বংস হয়, ইহাও দেখিতেছি। সুতরাং ভদ্রদৃষ্টান্তে সেই সমস্ত দ্রব্যের যে চরম অবয়ব বা চরম সূক্ষ্ম অংশ, তাহাও অপর চরম অবয়বের সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই অতি সূক্ষ্ম অবয়বদ্বয়ের বিভাগ হইলেই সেই সংযোগের ধ্বংস হয়, ইহাও ত অনুমানসিদ্ধ। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নিরবয়ব দ্রব্যদ্বয়েও সংযোগ জন্মে। কিন্তু উহার অংশ না থাকায় ঐ সংযোগ সাবয়ব দ্রব্যের শ্রায় অংশ-বিশেষে জন্মে না। কারণ, উক্ত স্থলে ঐরূপ সংযোগ সম্ভবই হয় না। কিন্তু নিরবয়ব দ্রব্যদ্বয়ের যে সংযোগই সম্ভব হয় না, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আর মহর্ষি কণাদ ও গৌতমের মতে ত ঐরূপ নিয়ম বলাই যায় না। কারণ, তাঁহাদিগের মতে আত্মার শ্রায় মনও নিরবয়ব দ্রব্য। কারণ, মনও পরমাণুর শ্রায় অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু তাঁহারা মনের সহিত আত্মার সংযোগ স্বীকার করিয়াছেন। আর যাহারা সর্বব্যাপী নিরবয়ব আকাশের সহিতও আত্মার সংযোগ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ও ত সংযোগমাত্রই যে সেই দ্রব্যের প্রদেশবিশেষেই জন্মে, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করেন নাই। ফল কথা, নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার্য হইলে অপর পরমাণুর সহিত উহার সংযোগও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে না, ইহাই কণাদ ও গৌতমের মূলকথা। তাঁহাদিগের মতে সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ দেখিয়া ঐ দৃষ্টান্তে সংযোগমাত্রই তাহার আশ্রয়-দ্রব্যের অংশবিশেষেই জন্মে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং যে দ্রব্যের কোন অংশ নাই, তাহাতে সংযোগ জন্মিতেই পারে না, ইহাও বলা যায় না।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের “আত্মতত্ত্ব-বিবেকের” টীকায় নবানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি উদয়নাচার্যের কথার সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যে দ্রব্যদ্বয়ে সংযোগ জন্মে, তাহাতে স্বরূপতঃ সেই দ্রব্যদ্বয়ই কারণ, কিন্তু সেই দ্রব্যের অবয়ব বা অংশ তাহাতে কারণ নহে। সুতরাং কোন সংযোগই তাহার আধার-দ্রব্যের অংশকে অপেক্ষা করে না। তবে যে দ্রব্যের অংশ আছে, তাহাতে অংশবিশেষেই সংযোগ জন্মে। কারণ, সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ উহার প্রদেশবিশেষাবচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। কিন্তু নিরবয়ব

দ্রব্যের সংযোগ ঐরূপ নহে। কারণ, সেই দ্রব্যের কোন প্রদেশ বা অংশই নাই। তবে যুগপৎ অনেক মূর্ত দ্রব্যের সহিত পরমাণুর যে সংযোগ জন্মে, তাহাও বিভিন্ন দিগ্বিশেষেই জন্মে, অর্থাৎ পরমাণুর প্রদেশ না থাকিলেও পূর্ব পশ্চিম প্রভৃতি দিগ্বিশেষেই তাহাতে অল্প পরমাণু বা অত্যল্প মূর্ত দ্রব্যের সংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় ঐ সংযোগও অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা বলা যায়। কারণ, যেমন দেশবিশেষাবচ্ছিন্ন পদার্থকে “অব্যাপ্যবৃত্তি” বলে, তদ্রূপ দিগ্বিশেষাবচ্ছিন্ন পদার্থও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। উক্ত স্থলে সেই দিগ্বিশেষের কিন্তু পরমাণুর কোন কল্পিত প্রদেশ নহে। উহা পূর্ব পশ্চিমাदि সত্য দিক্। ফলকথা, সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিলেও উক্তরূপে তাহারও উপপত্তি হইতে পারে। কেহ কেহ সংযোগ বিশেষের ব্যাপ্যবৃত্তিও স্বীকার করিয়াছেন।

শিষ্ট। পরমাণুর কোন অংশ বা প্রদেশ না থাকিলে তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ জন্ম কোন দ্রব্য জন্মিলেও তাহাতে ত প্রক্ষিমা বা স্থলত্ব জন্মিতে পারে না, সুতরাং পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলেও কিরূপে স্থলদ্রব্যসৃষ্টির উৎপত্তি হইবে, তাহা ত আপনি বলেন নাই। আর পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার করিলে পরমাণুদ্বয় এবং ততোহধিক পরমাণুর পরস্পর সংযোগও ত স্বীকার্য। তাহা হইলে পরমাণুদ্বয় এবং ততোহধিক পরমাণুর সংযোগেই বা কোন দ্রব্য জন্মিবে না কেন? এবং দ্ব্যণুকদ্বয়ের সংযোগে যেমন “ত্রসরেণু” নামক দ্রব্য জন্মে, তদ্রূপ, দ্ব্যণুকদ্বয়ের সংযোগেই বা কোন দ্রব্য জন্মে না কেন? ইহাও ত বক্তব্য।

গুরু। অবশ্য বক্তব্য। প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, আকস্মবাদী ত্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ হয় না। অর্থাৎ বহু পরমাণুর সাক্ষাৎ সংযোগে কোন দ্রব্য জন্মে না। শ্রীমদ্ বাচস্পতিমিশ্র “তাৎপর্য-টীকা” ও “ভামতী” টীকায় [২২।১১] বৈশেষিক সম্প্রদায়ের “পরমাণুবাদ” প্রক্রিয়ার বর্ণন করিতে তাহাদিগের উক্ত সিদ্ধান্তের যুক্তি বলিয়াছেন যে, যদি কোন ঘটের নির্বাহক সমস্ত পরমাণুকেই সেই ঘটের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ বলা যায়, তাহা হইলে যখন যুগ্মগরাঘাতে সেই ঘট চূর্ণ হয়, তখন একেবারে সেই সমস্ত পরমাণুগুলিরই পরস্পর বিভাগ হইবে।

কারণ, দ্রব্যের উপাদানকারণ যে সমস্ত অবয়ব, তাহার বিভাগ বা বিনাশ ব্যতীত তাহাতে উৎপন্ন সেই দ্রব্যের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। কিন্তু পরমাণু-সমূহের নিত্যত্ববশতঃ তাহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় উহার বিভাগ জ্ঞতই ঐ স্থলে সেই ঘট্টের বিনাশ বলিতে হইবে। কিন্তু যদি সেখানে যুদ্গরাঘাতে সেই ঘট্টের উপাদান সমস্ত পরমাণুরই পরস্পর বিপ্লবে বা বিভাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেখানে তখন আর সেই ঘট্টের কোন অবয়বেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, সেই পরমাণুগুলি সমস্তই অতীন্দ্রিয়। কিন্তু যুদ্গরাঘাতে ঘট্ট চূর্ণ হইলেও সেখানে দেহী ঘট্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব-চূর্ণ মৃত্তিকাদি দেখা যায়। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, সেই ঘট্টের নির্বাহক সেই সমস্ত পরমাণুগুলিই সেই ঘট্টের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ নহে। কিন্তু পরমাণু-সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমেই ঘট্টের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহা হইলে ঘট্ট চূর্ণ হইলেও সেখানে তখনই সমস্ত পরমাণুর বিভাগ হয় না, ইহা বলা যায়। কারণ সেই সমস্ত পরমাণুই সেই ঘট্টের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ নহে।

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইলে পরমাণুত্রয় বা ততোহধিক পরমাণুর সংযোগে কোন দ্রব্য জন্মে না, ইহাও স্বীকার্য্য। সুতরাং মধ্যস্থিত কোন পরমাণুতে ছয় দিক্ হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ সংযুক্ত হইলেও সেই সংযোগজ্ঞাত সেখানে কোন দ্রব্যই জন্মে না। কারণ, সেই সপ্ত পরমাণু বহু পরমাণু বলিয়া উহাও কোন দ্রব্যের সাক্ষাৎ উপাদানকারণই হয় না। সুতরাং বহুবন্ধু যে বলিয়াছেন— “পিণ্ডঃ শ্রাদ্ধমাাত্রকঃ”—অর্থাৎ উক্ত স্থলে উৎপন্ন সেই দ্রব্য পরমাণুমাত্র পরিমিতই হয়, উহা স্থূল হইতে পারে না—এই কথাও “শিরো নাস্তি শিরোব্যাপা”র শ্রায় হইয়াছে। কারণ, বহু পরমাণুর সংযোগে কোন দ্রব্যই জন্মে না।

এবং পরমাণুত্বের সংযোগে যে “দ্ব্যণুক” নামক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, উহা স্থূল হয় না অর্থাৎ উহাতে যে মহৎ পরিমাণ জন্মে না, ইহা ত স্বীকৃতই হইয়াছে। কারণ, মহর্ষি কণাদ উপাদানকারণের বহুত্বসংখ্যা অথবা মহৎ পরিমাণ অথবা “প্রচয়” অর্থাৎ শিথিল সংযোগবিশেষকেই জ্ঞাতদ্রব্যের

মহৎপরিমাণের কারণ বলিয়াছেন। (১) কিন্তু দ্ব্যণুকনামক প্রথমোৎপন্ন দ্রব্যের উপাদান-কারণ যে পরমাণুবয়, তাহাতে বহুত্ব সংখ্যাও নাই, মহৎপরিমাণও নাই এবং তাহাতে তুলপিণ্ডের ছায় শিখিল সংযোগবিশেষও নাই। সুতরাং কারণের অভাবে ঐ “দ্ব্যণুক” নামক দ্রব্যে মহৎপরিমাণ জন্মে না। কিন্তু উহাতেও পরমাণুবয়ের দ্বিষ্ট-সংখ্যাজ্ঞ অণুপরিমাণই জন্মে। তাই ঐ দ্ব্যণুকও অণু বলিয়াই কথিত হইয়াছে এবং ঐ দ্ব্যণুক নামক তিনটি অণুদ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন, এই অর্থে পূর্বোক্ত “ত্রসরেণু”, “ত্র্যণুক” নামেও কথিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ত্রসরেণুর উপাদানকারণ দ্ব্যণুকত্রয়ের যে বহুত্বসংখ্যা, তজ্জ্ঞাই ঐ ত্রসরেণুতে মহৎপরিমাণ বা স্থূলত্ব জন্মে; তাই ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়। কারণের অভাবে দ্ব্যণুকে মহৎপরিমাণ উৎপন্ন না হওয়ায় দ্ব্যণুকের প্রত্যক্ষ হয় না।

এইরূপ “দ্ব্যণুক”বয়ের সংযোগজ্ঞ কোন দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও তাহাতে স্থূলত্ব বা মহৎপরিমাণ জন্মিতে পারে না। কারণ, ঐ দ্ব্যণুকদ্বয়ে বহুত্বসংখ্যা ও মহৎপরিমাণ প্রভৃতি পূর্বোক্ত কারণত্রয়ের কোনটিই নাই। সুতরাং দ্ব্যণুকদ্বয়ের সংযোগ জ্ঞ কোন দ্রব্য জন্মিলে উহাও সেই দ্ব্যণুকমাত্র-পরিমিতই হইবে, উহা স্থূল হইতে পারে না। অতএব দ্ব্যণুক-দ্বয়ের সংযোগ জ্ঞ কোন দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার ব্যর্থ বলিয়া উহা স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগজ্ঞাই “ত্রসরেণু” নামক প্রথম স্থূল দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহারই উপাদানকারণরূপে প্রথমে অণুপরিমাণ “দ্ব্যণুক” নামক দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। নচেৎ উপাদান-কারণের অভাবে ত্রসরেণুর উৎপত্তি হইতে পারে না। একেবারে ষট্‌পরমাণুই উহার সাক্ষাৎ উপাদান-কারণ বলা যায় না। কারণ, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ হয় না, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। তাই ত্রসরেণুর উপাদানকারণ দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুকের উপাদানকারণ পরমাণু, ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ পরমাণুর আর

(১) “কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ।” শারীরক ভাষ্যে (২১।১১) আচার্য্য শঙ্করের উক্ত কণাদসূত্র। প্রচলিত বৈশেষিক দর্শন পুস্তকে “কারণবহুত্বাচ্চ” (৭।১।১) এইরূপ সূত্র দেখা যায়। শঙ্কর মিশ্রের পূর্বে হইতেই উক্ত কণাদসূত্র বিকৃত হইয়াছে, ইহা তাহার ব্যাখ্যাৎ দ্বারাও বুঝা যায়।

অবয়ব বা অংশ না থাকায় উহার উপাদানকারণ নাই। সুতরাং পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় উহার নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়।

আরম্ভবাদের মূল অসংকার্যবাদ

এখানে ইহাও বলা অত্যাবশ্যক যে কণাদ ও গৌতম সংকার্যবাদ গ্রহণ না করিয়া অসংকার্যবাদই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। (১) তাঁহাদিগের মতে কোন কার্যই উৎপত্তির পূর্বে কোনরূপেই সং নহে, কিন্তু অসং,—এই জ্ঞাত উক্ত মতের নাম “অসংকার্যবাদ”। উক্তমতে উপাদানকারণের নাম সমবায়িকারণ। তাহাতে উৎপন্ন কার্যের সহিত তাহার সমবায় নামক সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। উক্তমতে কার্যোৎপত্তির পূর্বে সং অর্থাৎ বিद्यমান—উপাদানকারণে অসং অর্থাৎ পূর্বে অবিद्यমান কার্যের যে উৎপত্তি, তাহার নাম “আরম্ভ”। তাই উক্ত মত “আরম্ভবাদ” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্বোক্ত অসংকার্যবাদই উক্ত আরম্ভবাদের মূল। অসংকার্যবাদ গ্রহণ করিলে পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের উপপত্তি হয় না। তাই কণাদ ও গৌতম পরিণামবাদ প্রভৃতি গ্রহণ করেন নাই। মীমাংসক সম্প্রদায়ও অসংকার্যবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে শ্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে বিশেষ এই যে, প্রলয়ের পরে মহেশ্বরের পুনঃ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা বশতঃ জীবগণের অদৃষ্ট সমষ্টি জ্ঞাত প্রথমে আবার পরমাণু-দ্বয়ের সংযোগ জনক ক্রিয়া জন্মে। মহেশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃই তখন জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিরূপ প্রকৃতি অচেতন পদার্থ হইলেও পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন করে। (২)

শিষ্য। “অসংকার্যবাদ” কিরূপে স্বীকার করা যায়। যাহা অসং, তাহার কি উৎপত্তি হইতে পারে? তাহা হইলে আকাশকুসুম প্রভৃতির ও উৎপত্তি হয় না কেন? আর যে পদার্থ পূর্বে তাহার উপাদান কারণে কোনরূপেই বিद्यমান থাকে না, তাহার উৎপত্তি হইলে তিল হইতে তৈলের শ্রায় বালুকা হইতেও তৈলের উদ্ভব কেন হয় না? পরন্তু যে কারণ হইতে যে কার্যের উদ্ভব হয়, সেই কারণের সহিত সেই কার্যের সম্বন্ধ থাকা

(১) বৈশেষিক দর্শনে “ক্রিয়াস্তম্ভ-ব্যপদেশাভাষ্যপ্রাগমণ্যং” (৯।১।১) শ্রায়দর্শনে “উৎপাদ-ব্যয় অর্শনাৎ”। “বুদ্ধিসিদ্ধান্ত তদসং” (৪।১।—৪।১।৪২ হৃদ্র উক্ত্য।)

(২) বৈশেষিক মতে সৃষ্টি সংহার বিধি প্রশস্ত পাদ ভাস্ক্রে উক্ত্য।

আবশ্যক। হুতরাং কার্য্যমাত্রই বে, তাহার উপাদানকারণে পূর্বেও বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। শ্রীভগবান্ ও স্পষ্ট বলিয়াছেন—“নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত্যঃ” (গীতা—২।১৬), অর্থাৎ অসত্যের উৎপত্তি নাই এবং সত্যের বিনাশ নাই।

শুধু। “সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী”তে সাংখ্য মতানুসারে “সংকার্য্যবাদ” সমর্থন করিতে বাচস্পতিমিশ্রও ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগবদ্গীতার ঐস্থলে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে সংকার্য্য-বাদের উল্লেখ অনাবশ্যক ও অসঙ্গত। ঐ শ্লোকের দ্বারা আত্মাতে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান শীত উষ্ণ প্রভৃতির সত্তা নাই এবং সংস্রবাব আত্মার অভাব অর্থাৎ কখনও বিনাশ নাই, ইহাই কথিত হইয়াছে। টীকাকার শ্রীধরস্বামীও সরলভাবে উক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মীমাংসাকাব্য পার্থসারথিমিশ্রও “শাস্ত্রদীপিকার” তর্কপাদে ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের উল্লেখ পূর্বক আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে মধ্যে ঐ শ্লোকের দ্বারা যে সংকার্য্যবাদের কখন সংগত হয় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার রামানুজ ঐ শ্লোকের ভাষ্যে স্পষ্টই লিখিয়াছেন—“অত্র সংকার্য্যবাদশাসংগতত্বান্নতং-পরোহয়ংশ্লোকঃ”।

আর যে বলিয়াছ, যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। তদ্ব্তরে বক্তব্য এই যে, যাহা একেবারে অসৎ অর্থাৎ অলীক, তাহার কখনও উৎপত্তি হইতে পারে না ইহা সত্য, কিন্তু ঘটাদি কার্য্যত একেবারে অসৎ বা অলীক নহে। উৎপত্তির পরে যাহার সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহাকে ত অলীক বলা যায় না। যদি বল, উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদি কার্য্যের সত্তা না থাকিলে তখন ধর্ম্মী না থাকায় অসৎ-রূপ ধর্ম্মও তাহাতে থাকিতে পারে না। কিন্তু সংকার্য্যবাদীর মতে কি উৎপত্তির পূর্বেও ঘটের উপাদান সেই—মুক্তিকায় ঘটরূপেই ঘট বিদ্যমান থাকে? তাহা হইলে সেই মুক্তিকার দ্বারাও ঘটের কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না কেন? আর তাহা হইলে সেই ঘটের উৎপাদনের জন্ত কারণের ব্যাপারের প্রয়োজন কি? সেই ঘটত সেই মুক্তিকায় বিদ্যমানই আছে। যদি বল, তখন ঘটরূপে ঘট তাহাতে বিদ্যমান থাকে না, তাহা হইলে তখন ঘটের অসত্তা ত স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ ঘটত্ব বিশিষ্ট দ্রব্যই “ঘট” শব্দের বাচ্য। হুতরাং সেই ঘট

রূপ ধর্মী না থাকিলেও তাহাতে অসম্বরূপ ধর্ম স্বীকার্য্য। কালভেদে অসম্বরূপ সত্ত্বরূপ ধর্মবয় স্বীকারে কোন বাধা নাই।

আর যে বলিয়াছ, তিল হইতে যেমন তৈলের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ বালুকা হইতে তৈলের উদ্ভব হয় না কেন? এতদ্বত্ত্বরে অসংকার্য্যবাদী সম্প্রদায়ের বস্তুত্ব এই যে, তিল তৈলের কারণ, বালুকা তৈলের কারণই নহে। তিল হইতে তৈলের উৎপত্তি দেখিয়াই তাহাতে তৈলের কারণত্ব-নিশ্চয় হইয়াছে, কিন্তু বালুকা হইতে তৈলের উৎপত্তি না দেখায় তাহাতে তৈলের কারণত্ব নিশ্চয় হয় নাই। আর সংকার্য্যবাদী সম্প্রদায়ই বা পূর্বে কিরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন যে, সেই মৃত্তিকাবিশেষেই সেই ঘট বিদ্যমান থাকে, সূত্রাদিতে উহা বিদ্যমান থাকে না। তাঁহারাও ত মৃত্তিকাবিশেষ হইতেই ঘটের উৎপত্তি দেখিয়াই উহা নিশ্চয় করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহারাও উহা কখনও জানিতে পারিতেন না। তাহা হইলে মৃত্তিকাবিশেষই ঘটের উপাদান কারণ বলিয়া তাহাতেই অবিচ্ছিন্ন ঘটের উৎপত্তি হয়, সূত্রাদি ঘটের উপাদান কারণ না হওয়ায় তাহাতে ঘটের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ বলিবার বাধা কি আছে?

পরন্তু সংকার্য্যবাদী সম্প্রদায়ের কথা এই যে, মৃত্তিকাবিশেষে সেই ঘট পূর্বেও বিদ্যমান থাকিলেও তাহা হইতে উহার আবির্ভাবের জন্মই কারণের ব্যাপার আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা হইলে সেই আবির্ভাবকেও অসৎই বলিতে হইবে। কিন্তু সংকার্য্যবাদী নিজ সিদ্ধান্ত-ভঙ্গ-ভয়ে তাহা বলিতে না পারিয়া সেই আবির্ভাবকেও সং বলিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার মতে সেই আবির্ভাবের জন্মও কারণের ব্যাপার অনাবশ্যক হয়। কারণ পূর্বে সেই ঘটের ন্যায় তাহার আবির্ভাবও বিদ্যমান থাকিলে কিসের জন্ম কুন্তকার প্রযত্ন করিবে? যদি বলিতে হয় যে, সেই আবির্ভাবের আবির্ভাবের জন্মই কুন্তকার প্রযত্ন করে, তাহা হইলে ত সেই আবির্ভাবকে অসৎই বলিতে হইবে। তাহা বলিতে না পারিলে সেই আবির্ভাবের আবির্ভাবও তাহারও আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাবস্বীকারে সংকার্য্যবাদীর মতে অবস্থাদোষ অনিবার্য্য।

কিন্তু সেই ঘটকে পূর্বে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার উৎপত্তির জন্ম কারণের ব্যাপার আবশ্যক ও সার্থক হয়। এবং সেই ঘটের উৎপত্তি ও বস্তুত্ব সেই ঘট হইতে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া সেই উৎপত্তির উৎপত্তি ও তাহার উৎপত্তি

স্বীকারে অনবস্থা দোষ হয় না। কারণ, সেই সমস্ত উৎপত্তি ও বস্তুত: সেই ঘট হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও ঘটমাত্রগত ঘটন্য নামক ধর্ম এবং উৎপত্তিমাত্রগত উৎপত্তিত্ব নামক ধর্মের ভেদ থাকায় “ঘটোৎপত্তি” শব্দের প্রয়োগ করিলে অর্থ পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ একধর্মরূপে একই পদার্থের পুনরুক্তি হইলেই অর্থ পুনরুক্ত দোষ হইয়া থাকে। যেমন “ঘট: কলসঃ”—এই রূপ প্রয়োগ করিলে ঘটন্য ও কলসন্য একই ধর্ম বলিয়া অর্থ পুনরুক্ত দোষ হয়! কিন্তু “ঘট উৎপত্ততে” এইরূপ প্রয়োগ করিলে অর্থ পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, ঘটের উৎপত্তি বস্তুত: সেই ঘট হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও উৎপত্তি মাত্রহীত তাহা হইতে অভিন্ন পদার্থ নহে। সূত্ররাং উৎপত্তি মাত্রন্য যে উৎপত্তিত্ব নামক ধর্ম, তাহা ঘটন্য হইতে ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় পূর্কোক্ত বাক্যে অর্থপুনরুক্ত দোষ হইতে পারে না। এইরূপ আরও অনেক স্থান বিচার করিয়া ত্রায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় “অসংকার্যবাদ”ই সমর্থন করিয়াছেন। সংকার্যবাদের ত্রায় উক্ত অসংকার্যবাদও অতিপ্রাচীন মত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বেদ স্তুতির মধ্যে (৮৭।২৫) উক্ত অসংকার্যবাদেরও প্রকাশ হইয়াছে।

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর জগতের

উপাদান কারণ নহেন

পূর্কোক্ত “আরম্ভবাদে” নিত্য পরমাণুই জগদ্রব্যের মূল উপাদান কারণ। পরমেশ্বর তাহাতে কেবল নিমিত্ত কারণ। উপাদান কারণ বিষয়ে নিজমত ব্যক্ত করিতে মহর্ষি গৌতম পূর্কোই বলিয়াছেন—

“ব্যক্তাদ্ ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যাং ।৪।১।১১।।

অর্থাৎ ব্যক্ত (ইন্দ্রিয় গ্রাহ) ভূত হইতেই তজ্জাতীয় ব্যক্ত ভূত সমূহের যে উৎপত্তি হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। পরমাণু সমূহ ব্যক্ত পদার্থ না হইলেও ব্যক্ত জাতীয়। তাই ভাস্কর ঐ ব্যক্ত শব্দের দ্বারা পরমাণু পর্য্যন্তই গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, রূপাদি গুণ বিশিষ্ট সৃষ্টিকাদি স্থলভূত হইতে তজ্জাতীয় অস্থ স্থলভূতের (ঘটাদি দ্রব্যের) উৎপত্তি যখন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তখন তদৃষ্টান্তে অন্তর্ধান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই সমস্ত ব্যক্ত ভূতের সজাতীয় স্থলভূত অর্থাৎ পরমাণু হইতেই দ্রাব্যাদিক্রমে সমস্ত জগদ্রব্যের উৎপত্তি হয়।

বদিও গৌতমের মতে মূল উপাদান পরমাণু সমূহ অব্যক্ত পদার্থ, কিন্তু তিনি যে কপিলাদি সমস্ত মূল প্রকৃতিরূপ অব্যক্ত স্বীকার করেন নাই, অর্থাৎ তাঁহার মতে সেই অব্যক্ত প্রকৃতি উপাদানকারণ নহে, ইহা সূচনা করিতেই তিনি উক্ত সূত্রে বলিয়াছেন—“ব্যক্তাং”। পরন্তু গৌতম উক্ত সূত্রের দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন যে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ও জন্মদ্রব্যের উপাদান কারণ নহেন। কারণ, উপাদান কারণের যে রূপরসাদি বিশেষ গুণ, তজ্জাত্যই তাহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যে তজ্জাতীয় বিশেষ গুণ জন্মে। যেমন মৃত্তিকাস্থ রূপরসাদি বিশেষ গুণ জন্ম সেই মৃত্তিকা নির্মিত ঘটাদি দ্রব্যে তজ্জাতীয় রূপরসাদি বিশেষ গুণ জন্মে। রক্তসূত্র নির্মিত বস্ত্রে সেই সমস্ত সূত্রের রক্তরূপ জন্ম তজ্জাতীয় রক্তরূপ জন্মে। কিন্তু নীলসূত্র নির্মিত বস্ত্রে রক্তরূপ জন্মে না। কারণ, তাহার উপাদান কারণ সেই সমস্ত নীল সূত্রে রক্তরূপ নাই। সুতরাং ঐসমস্ত দৃষ্টান্তানুসারে পরমাণুস্থ রূপরসাদি বিশেষ গুণই তজ্জাত্য দ্ব্যণু নামক দ্রব্যে তজ্জাতীয় রূপরসাদি বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে—ইহা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয় এবং পরমাণুতেও যে রূপরসাদি কতিপয় গুণ আছে, ইহাও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয়। (১)

কিন্তু পরমাণু পরমেশ্বরে ঐ রূপরসাদিগুণ কোন প্রমাণ-সিদ্ধই নহে। সুতরাং তাঁহাকে জন্মদ্রব্যের উপাদান কারণ বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে তাহা হইতে উৎপন্ন জন্মদ্রব্যে রূপরসাদি জন্মিতে পারে না। পরন্তু তাহাতে যে নিত্য চৈতন্যরূপ বিশেষ গুণ আছে, তজ্জাত্য ঐসমস্ত দ্রব্যে চৈতন্যোৎপত্তি হইতে পারে। আর ঈশ্বর নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, এই মতেও ত তিনি চেতন পদার্থ। সুতরাং তিনি জড় দ্রব্যের উপাদান কারণ হইতে পারেন না। কারণ জড় দ্রব্যই অপর জড় দ্রব্যের উপাদান হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আর পরমেশ্বর জগদাকারে পরিণত হন, ইহা বলিলেও জগতের চেতনোৎপত্তি অনিবার্য। বস্তুতঃ নির্বিকার পরমেশ্বরের উক্তরূপ

১। “মানসোল্লাস” গ্রন্থে হরেশ্বরচার্য্যও “আরম্ভবাদে”র বর্ণনায় বলিয়াছেন—“পরমাণুগত। এব গুণা রূপরসাদয়ঃ। কার্য্যে সমান জাতীয় মারভন্তে গুণান্তরং”। টীকাকার রামতীর্থ লিখিয়াছেন—“সমান জাতীয়মিতি বিশেষ গুণাভিপ্রায়ঃ” ইত্যাদি। অবৈতবাদী কোন কোন নব্য গ্রন্থকার বিশেষ গুণের কোন লক্ষণই হয়না বলিয়া উক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ বিশেষ গুণের নির্দোষ লক্ষণ বলিয়াছেন।

পরিণাম সম্ভবই নহে। কোন মণি বিশেষ যে অবিকৃত থাকিয়াও প্রত্যহ স্বর্ণ প্রসব করিত, ইহা স্বীকার করিলেও সেখানে ঐ মণি বিশেষ যে সেই সমস্ত স্বর্ণের উপাদান কারণ, অর্থাৎ সেই মণি বিশেষই সেই সমস্ত স্বর্ণরূপে পরিণত হয়, ইহা স্বীকার করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই পরন্তু অনেক বাধক আছে। আর বলবৎ প্রমাণ ব্যতীত কেবল ঐরূপ একটা দৃষ্টান্ত-দ্বারাও উক্ত রূপ ঐশ্বর-পরিণামবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না।

শিষ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদে “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ও “তস্মান্নাএতস্মাদান্মন আকাশঃ সমুতঃ”—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা পরব্রহ্মই আকাশাদি ভূতের উপাদান কারণ, ইহাই বুঝা যায়। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” এই শ্রুতিবাক্যে “যতঃ” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা সেই ব্রহ্ম যে আকাশাদি ভূতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণ পাণিনি সূত্র বলিয়াছেন—“জনকর্তৃঃ প্রকৃতিঃ”। পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে আরুণি ও তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুর সংবাদে “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদি এবং “যথা সৌম্যৈকেন মৃশিণেন সর্বং মৃয়ং বিজ্ঞাতং তাদ্ বাচ্যরম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং”—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারাও সেই ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণ, ইহা বুঝা যায়। কারণ, তিনি উপাদান কারণ না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান এবং সে বিষয়ে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের উপপত্তি হইতে পারে না। তবে তিনি নিমিত্ত কারণও বটেন। কিন্তু তিনি যে কেবল নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন, এই শ্রুতি বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত কিরূপে গ্রহণ করা যায়? শ্রুতি বিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত যে, গ্রাহ্য নহে, ইহাত আপনিও বলিয়াছেন।

গুরু। শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যনির্ণয়ে সহায়রূপে তর্ক যে অত্যাবশ্যক, স্মৃতরাং শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যাতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণের তর্কের ভেদ প্রযুক্ত অনেক শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য বিষয়ে যে নানা মত ভেদ হইয়াছে এবং তাহা অবশ্যই হইবে, ইহাও ত আমি পূর্বে বলিয়াছি। যাহাদিগের মতে চেতন পদার্থে জড় জগতের উপাদানত্ব যুক্তি বিরুদ্ধ, তাঁহারা তোমার কথিত ঐদমস্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঐশ্বরের জগদুপাদানত্ব

বুঝেন নাই। আর পানিগির “জনিকর্তৃঃ প্রকৃতিঃ”—এই হুত্রে ও তাঁহাদিগের মতে “প্রকৃতি” শব্দের অর্থ হেতুমাত্র (১)। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ হইলেও “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”—এই শ্রুতি বাক্যে “যতঃ” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ অসামুদ্রিক।

আর শ্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে আকাশের কোন অবয়ব বা অংশ না থাকায় উপাদান কারণের অভাবে উহার উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা “আকাশঃ সমুতঃ”—এই শ্রুতিবাক্যে “সমুত” শব্দের দ্বারা আকাশের পক্ষে অভিব্যক্তিরূপ গোণউৎপত্তিই বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন ভূগর্ভে আকাশ বিद्यমান থাকিলেও তাহার প্রকাশ থাকে না, কিন্তু মৃত্তিকা খনন করিলে সেই বিদ্যমান আকাশেরই প্রকাশ হয় এবং সেখানে খননকারীর প্রতি পূর্বে “আকাশঃ কুরু” অর্থাৎ আকাশ কর—এইরূপ গোণ প্রয়োগ হয় এবং মৃত্তিকা খননের পরে আকাশের প্রকাশ হইলে “আকাশো জাতঃ” অর্থাৎ আকাশ হইয়াছে—এইরূপ গোণ প্রয়োগও হয়, তদ্রূপ প্রলয়কালে আকাশের প্রকাশ থাকে না, সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর প্রথমে সেই আকাশের প্রকাশ করিয়া তদনন্তর বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি করেন, ইহাই “আকাশঃ সমুতঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য। উক্ত শ্রুতিবাক্যে “সমুত” শব্দটি বায়ু প্রভৃতির পক্ষে মুখ্যার্থ হইলেও আকাশের পক্ষে গোণার্থ। পরন্তু বৃহদারণ্যক

১। “সিদ্ধান্ত কোমুদী”র ভট্টোজি দাক্ষিতও এই হুত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“জায়মানন্ত হেতুরপাদানং শ্রায়ং। ব্রহ্মণঃ প্রজাজায়ন্তে”। “তদ্ব্যবধিনী” ব্যাখ্যাকার জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী এই স্থলে লিখিয়াছেন—“ইহ প্রকৃতি এইং হেতুমাত্রপরমিতি বৃত্তিকৃৎসং, “পূত্রাং প্রমোদো জায়তে” ইত্যাদ্যহরণং”। উক্ত মতানুসারে “শব্দশক্তি-প্রকাশিকা” গ্রন্থে কারক প্রকরণে অপাদান ব্যাখ্যায় ঋগবীশ তর্কালঙ্কারও “ধর্মাদ্বৈতপদ্ধতে হুতং” এবং “দণ্ডাজায়তে ঘটঃ” এইরূপ প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। “ব্যুৎপত্তিবাদ” গ্রন্থের পঞ্চমী প্রকরণে গদাধর ভট্টাচার্য্যও পানিগির উক্ত হুত্রে “প্রকৃতি” শব্দের অর্থ কারণ মাত্র, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তিনি উহা সমর্থন করিতে ভট্টিকাব্যের প্রথম সর্গে “প্রাক্কেকরীতোভরতন্ততোহভূৎ” এবং “বারোজাতঃ” “দণ্ডাদঘটো জায়তে” ইত্যাদি প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। গদাধর সেখানে নিজ মতানুসারে মনুসংহিতার “আদিত্যাজায়তে গৃষ্টি বৃষ্টেরন্ন ততঃ প্রজাঃ” (৩।৭৩) এবং ভাগবতের “ততঃ সমুদপৈজাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ (১।৩১২) এবং ভগবদ্গীতার “সদ্বৎসঃজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে” (২।৩২) এই সমস্ত প্রয়োগ ও প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

উপনিষদে “বায়ুশাস্ত্ররীক্ষিতদমৃতং” (২।৩।৩) এই শ্রুতি বাক্য এবং আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত “আকাশং সর্বগতশ্চ নিত্যঃ”—এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা আকাশের নিত্যত্বও কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সমস্ত শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় “আকাশঃ সমুতঃ” এই শ্রুতিবাক্যে “সমুতঃ” শব্দ যে গোণার্থ, ইহাই বুঝা যায়। বেদান্তদর্শনেও দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রারম্ভে কতিপয় সূত্রের দ্বারা ইহা সম্বিত হইয়াছে। সেখানে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর নিজ মতানুসারে পূর্বপক্ষরূপে উক্ত মতের সমর্থন করিতে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত পূর্বোক্ত সমস্ত কথাই বলিয়াছেন এবং — “আকাশঃ সমুতঃ”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “সমুতঃ” শব্দটী যে আকাশের পক্ষে গোণার্থ বলা যায়, ইহাও তিনি সেখানে বেদান্তসূত্রানুসারে উদাহরণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং উহা পরবর্তী ত্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অভিনব কল্পনা নহে। তবে উক্ত মত থওনে আচার্য্য শঙ্কর সেখানে বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্মই আকাশাদি জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান কারণ না হইলে সেই এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। ছান্দোগ্যউপনিষদে যে, এক ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান ও তাহার দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে, তাহা সংগত হয় না। সুতরাং উপনিষদের ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্মই আকাশাদি জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান কারণ, সুতরাং সেই ব্রহ্মই সত্য, তাহাতে জগৎ প্রপঞ্চ কল্পিত মিথ্যা। কারণ, উপাদান কারণ হইতে তাহার কার্যের বাস্তব পৃথক্ সত্তা নাই। সুতরাং উপাদান কারণের জ্ঞান হইলেই সর্ববিজ্ঞান হইয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্করের নিজমত সমর্থনে ইহা প্রধান কথা।

পূর্বোক্ত কথায় ত্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য এই যে, উপাদান কারণে যেমন কার্যের স্থিতি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সৃষ্টি সংহার কর্তা সর্বাশ্রয় সেই পরমেশ্বরেরও সমস্ত কার্যের স্থিতি ও বিনাশ হওয়ায় তিনি নিমিত্ত কারণ হইলেও উপাদান কারণের সদৃশ। তাই তাঁহার সর্বাশ্রয়ত্ব প্রকাশের জগুই শাস্ত্রে অনেক স্থলে তিনি উপাদান কারণের ত্রায় কীর্তিত হইয়াছেন। তাহাতে “প্রকৃতি ও “যোনি” প্রভৃতি শব্দেরও গোণ প্রয়োগ হইয়াছে এবং অনেক স্থলে অনেক রূপক অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার সর্বাশ্রয়ত্ব ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতিই ব্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি জগতের

উপাদান কারণ নহেন। কারণ যিনি জগতের কর্তা, তিনি জগতের নিমিত্ত কারণই হইবেন। কার্যের কর্তা, পুরুষকে কেহ ঐ কার্যের উপাদান বলে না। ঘটের কর্তা কুস্তকার ঘটের নিমিত্ত কারণ বলিয়াই লোকসিদ্ধ। কিন্তু সেই জগৎকর্তা পরমেশ্বরই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্তা এবং তিনি সমস্ত জগতের অন্তর্ধ্যামী ও চরম আশ্রয়। সুতরাং তিনি অতীত কর্তা হইতে বিলক্ষণ কর্তা বলিয়া জগতের অসাধারণ নিমিত্ত কারণ। তাঁহার সেই অসাধারণ নিমিত্ত কারণই শাস্ত্রে নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে। যোগজসম্মিকর্ষ দ্বারা যোগী যখন তাঁহাকে সর্বাশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার সেই এক ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সমস্তই বিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়। আর অনুরূপেও সেই পরমেশ্বরের যথার্থ দর্শনরূপ বিজ্ঞান হইলে তখন তাঁহার অমুগ্রহে সেই যোগীর সর্ববিজ্ঞান অবশ্যই হইতে পারে। আর সেই পরমেশ্বরের দর্শন হইলেই তাঁহার অমুগ্রহে যোগীর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ায় তখন তাঁহার আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। সুতরাং ঐ তাৎপর্য্যেও সেই পরব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান কথিত হইতে পারে। ফলকথা, পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ না হইলেও যখন তাঁহার দর্শনরূপ বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞানের ফলে সর্ববিজ্ঞানের উপপত্তি হইতে পারে, তখন ছান্দোগ্যউপনিষদের পূর্বোক্ত কথার দ্বারা তাঁহার জগদুপাদানও সিদ্ধ হয় না।

অবশ্য ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐস্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য পরে কথিত হইয়াছে “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ বাচীরভুগং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈত্যোব সত্যং”। কিন্তু ঐ স্থলে সমস্ত মৃন্ময় পাত্রের উপাদান মৃৎপিণ্ডই যে, “মৃৎপিণ্ড” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত, ইহা বলা যায় না। যে কোন এক মৃৎপিণ্ডও সমস্ত মৃন্ময় পাত্রের উপাদান হইতেই পারে না। পরন্তু ঐস্থলে পরে কথিত হইয়াছে—“যথা সৌম্যৈকেন নখনিকৃন্তুনে সর্বং কাষ্যায়সংবিজ্ঞাতং শ্রাৎ”। অর্থাৎ একটি নখনিকৃন্তন (নখছেদক অস্ত্র নরুণ) বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত কাষ্যায়স (ইম্পাত লৌহ নির্মিত অস্ত্র) বিজ্ঞাত হয়। কিন্তু সেই নখছেদক অস্ত্র ত সমস্ত কাষ্যায়সের উপাদান নহে। তাই ভাস্কর্য্যকার শঙ্করও ঐ স্থলে বাধ্য হইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“নখ নিকৃন্তনেনোপলক্ষিতেন কাষ্যায়স পিণ্ডেনেত্যর্থঃ”। কিন্তু ঐরূপ লক্ষণ

স্বীকারে কোন প্রয়োজন বুঝা যায় না এবং তাহা হইলে ঐ স্থলে “নখনি-
কুন্তন” শব্দ প্রয়োগেরও সার্থকতা থাকে না। ফলকথা যে কোন একটি
নখ ছেদক অস্ত্র স্বখন সমস্ত কাষ্যায়সের উপাদান নহে, তখন উক্ত স্থলে সেই
এক মৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যে উপাদান কারণরূপেই গৃহীত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না।
তবে কিরূপে এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে সমস্ত মৃন্ময় পাত্রের জ্ঞান হইতে পারে ?
এতদ্বত্তরে স্থায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পক্ষে এক প্রকার বক্তব্য এই যে, কোন
এক মৃৎপিণ্ড প্রত্যক্ষ করিলে তখন তাহাতে যে মৃত্তিকাত্ব ধর্মের প্রত্যক্ষ হয়,
তাহা সমস্ত মৃন্ময় পাত্রেরই সামান্য ধর্ম। হতরাং কোন মৃৎপিণ্ডে মৃত্তিকাত্বরূপ
সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষ হইলে তজ্জন্ত যে সমস্ত মৃন্ময় পাত্রে চক্ষুঃসংযোগ নাই,
তাহারও এক প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। এবং কৃষ্ণ লৌহ নির্মিত যে কোন দ্রব্যে
কৃষ্ণলৌহরূপ সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষ হইলে তজ্জন্ত অত্যাগ সমস্ত কৃষ্ণলৌহেরও
এক প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। অন্যান্য সমস্ত মৃন্ময়পাত্রও কৃষ্ণলৌহে চক্ষুঃ-
সংযোগরূপ লৌকিকসন্নির্কর্ষ না থাকায় সেই সমস্ত অংশে উহা অলৌকিক
প্রত্যক্ষ এবং পূর্বোক্ত সামান্য ধর্মের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানই উহার কারণ
অলৌকিক সন্নির্কর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কেন ঐরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ
স্বীকার্য, তাহা পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় বলিব। তাহা হইলে বুঝা যায়
যে, উক্তরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ উক্তস্থলে পরব্রহ্মের যোগজসন্নির্কর্ষ জন্য
অলৌকিক প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে। কারণ, উহাতে লোক-
সিদ্ধ আর কোন দৃষ্টান্তই বলা যায় না। অর্থাৎ যে কোন এক মৃৎপিণ্ড দেখিলে
আমাদিগের যেমন সমস্ত মৃন্ময় পাত্রেরই প্রত্যক্ষ জন্মে, তদ্রূপ যোগীর যোগজ
অলৌকিক সন্নির্কর্ষ জন্ত সেই পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইলে তখন তাহার সমস্তই
প্রত্যক্ষ হয়। তখন তাহার অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত
(সাক্ষাৎকৃত) হয়। তাৎপর্য্য এই যে, তখন তাহার আর কিছুই শ্রোতব্য
মন্তব্য ও সাক্ষাৎ কর্তব্য থাকে না।

পরন্তু জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর চিরস্থায়ী পদার্থ। কিন্তু তাহার সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই
অস্থায়ী, হতরাং তাঁহাকেই প্রধানতঃ জানিতে হইবে—ইহা প্রকাশের জন্ত
উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরে আবার দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে—“বাচারভুগং
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং”। “বাচা” শব্দের অর্থ বাক্য,

“আরম্ভণ” শব্দের অর্থ উৎপত্তি। যাহার সম্বন্ধে বাক্য মাত্রের উৎপত্তি হয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে ক্লীবলিঙ্গ “বাচারম্ভণ” শব্দের অর্থ বিনশ্বর বস্তু। যাহা বিকৃত হয় এই অর্থে “বিকার” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় জন্মদ্রব্য। ঘটাদিদ্রব্যরূপ বিকারের বিনাশ হইলে তখন তজ্জাতীয় অপর বিকারের উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু সেই বিনষ্ট বিকারের পুনরুৎপত্তি সম্ভবই নহে। সুতরাং তখন কেবল তাহার সম্বন্ধে বাক্য মাত্রেরই উৎপত্তি হয়। সেই বস্তু স্বরূপের আর উৎপত্তি হয় না। সুতরাং বিনশ্বর বস্তু যে ঘটাদি বিকার, তাহা “নামধেয়” মাত্র অর্থাৎ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ফলকথা উক্ত শ্রুতি বাক্যে পরে “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং” এই বাক্যের দ্বারা স্থল বিকার দ্রব্যের বিনশ্বর বা অস্থায়িত্বই প্রকটিত হইয়াছে এবং উহার পরে “মুক্তিকেত্যেব সত্যং” এই বাক্যের দ্বারা ঘটাদি বিকারের মূল মৃত্তিকার স্থায়িত্বরূপ সত্যত্বই প্রকটিত হইয়াছে। উপাদান কারণই সত্য, কিন্তু তাহার কার্য ঘটাদি বিকার মিথ্যা অর্থাৎ উপাদান কারণ হইতে উহার বাস্তব পৃথক্ সত্তা নাই—ইহা উক্ত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। পরন্তু ঐরূপই তাৎপর্য্য হইলে উক্ত শ্রুতি বাক্যে “মৃত্তিকা” শব্দের পরে “ইতি” শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি? “মৃত্তিকেব সত্যং” ইহা কেন কথিত হয় নাই? কেহ কেহ ঐ “ইতি” শব্দকে প্রকার বা বিশেষণ বোধক বলিয়া উক্ত বাক্যের দ্বারা মৃত্তিকাত্বই সত্য, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বৈতবাদী শ্রায় বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় আরও নানারূপে উক্ত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে শাস্ত্রে অনেক স্থলে যে, এই সংসার মায়াময় অসৎ, ইত্যাদি কথিত হইয়াছে, তাহারও তাৎপর্য্য এই যে, এই সংসারে ভোগ্য সমস্ত বিষয়ই অস্থায়ী অনিত্য। সাধকের বৈরাগ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উক্তরূপে সংসারের ধ্যানের জন্মই শাস্ত্রে ঐরূপ অনেক বর্ণন হইয়াছে। কিন্তু তদ্বারা সংসার বা জগৎপ্রপঞ্চ যে বস্তুতঃই ইন্দ্রজালাদির শ্রায় অসত্য, ইহা সিদ্ধান্ত বুঝা যায় না। অসত্য অসৎ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অনিত্য বা অস্থায়ী ইহাও প্রকটিত হয়। অবাস্তবত্ব ও অস্থায়িত্ব সর্বত্র এক পদার্থ নহে। আর জগতের অবাস্তবত্বরূপ অসত্যত্ব যে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে, ইহা প্রকাশ করিতে শ্রীভগবান্ ও বলিয়াছেন—

“অসত্যমপ্রতিষ্ঠে জগদাহরনীশ্বরং (গীতা—১৬।৮)।

আর শাস্ত্রে সেই জগৎ কর্তা মহেশ্বরের সৰ্বাশ্রয় ও সৰ্বাস্থায়ী ও সৰ্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ করিতেই অনেক স্থলে অনেকরূপ বর্ণন হইয়াছে। শ্রীভগবান্ নিজেও তাঁহার অনেক বিভূতির বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বারাও তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থেরই বাস্তব পৃথক্ সত্তাই নাই, ইহাই বিবক্ষিত নহে। তিনিই সৰ্বাশ্রয় সৰ্বাস্থায়ী ও সৰ্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই বিবক্ষিত। তাই শ্রীভগবান্ নিজেই স্পষ্টই বলিয়াছেন—“মন্তঃ পরতরং নাশ্র্যঃ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সৰ্ব্ব মিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।” (গীতা—৭।৭)।

উক্ত শ্লোকে “পরতরং” এই পদে উৎকর্ষ বোধক “তরপ্” প্রত্যয়ের প্রয়োগ বশতঃ উহার অর্থ বুঝা যায় শ্রেষ্ঠ। শ্রীধরস্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“পরতরং শ্রেষ্ঠং”। সূত্রের তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, ইহাই তিনি বলিয়াছেন। তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, ইহা তিনি বলেন নাই। পরন্তু উক্ত শ্লোকের শেষে “সূত্রে মণিগণাইব” - এই দৃষ্টান্ত বাক্যের দ্বারা সেই মণিসমূহের আশ্রয় সূত্র হইতে মণিসমূহ যেমন বস্তুতঃই ভিন্ন পদার্থ, তজ্জপ, জগৎপ্রপঞ্চের আশ্রয় সেই পরমেশ্বর হইতে জগৎপ্রপঞ্চও বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। অবশ্য অবৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর সর্বত্র নিজ মতেই ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদের ভাষ্যেও তিনি তাঁহার নিজ মত বিশেষরূপেই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতে অশ্রান্ত সম্প্রদায়ে অশ্রান্তরূপ ব্যাখ্যাও যে প্রচলিত ছিল, ইহাও স্বীকার্য্য। পরে তত্ত্ববাদের গুরু আনন্দতীর্থ (মধ্বাচার্য্য) জগতের সত্যতা সমর্থন করিতে হৈত পক্ষেও উপনিষদের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সকল ব্যাখ্যা বা সকল মত কখনই সকলের রুচিকর হইতেই পারে না। কারণ মানবগণের প্রকৃতিঃ বৈচিত্র্য বশতঃ চিরকাল হইতেই বুদ্ধি ভেদ হইতেছে। তাই শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যেও নানা মতভেদ হইয়াছে। সেই পরমেশ্বরের আদেশে অনেক মহর্ষি এবং তাঁহার রূপাশ্রয় অনেক আচার্য্যও বিভিন্ন মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছায় সূচিরকাল হইতে কত মতের যে প্রকাশ ও প্রচার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। অনেক মানব শাস্ত্রাধ্যয়নাদি না করিয়াও উপদেশ পরম্পরানুসারে অনেক মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আবার সেই পরমেশ্বরের মায়ায়

মোহিতবুদ্ধি অনেক মানব নিজের কৰ্ম ও কৃতি অল্পসারে নানাবিধ বিরুদ্ধ
শ্রেয়ঃ ও উপদেশ করিয়াছেন। উদ্ধবের প্রমোদে শ্রীভগবান্ নিজেই ইহা
বলিয়াছেন—

“এবং প্রকৃতি বৈচিত্র্যাদ্ ভিত্তস্তে মতয়োনাং।

পারম্পর্যেণ কেবাকিৎ, পায়ণ্ডমতয়োহপরে ॥

মন্মায়া-মোহিত ধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষৰ্ভ।

শ্রেয়োবদন্ত্যনেকাস্তং যথা কৰ্ম যথা কৃতি ॥

শ্রীমদভাগবত ১১।১৪।৮।৯।

শিষ্য। নানামতভেদের অন্ধকারে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিতে না
পারিয়া যাহারা সতত সংশয়াত্মা, তাঁহাদিগের শ্রেয়ঃ কি ?

গুরু। যুধিষ্ঠিরের ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন
যে, (১) সতত গুরুপূজা এবং বুদ্ধগণের সৰ্ব্বতোভাবে উপাসনা ও বহু
শাস্ত্রের শ্রবণই তাহাদিগের শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ শাস্ত্রে নানামত থাকিলেও পূর্বের
সকল মতেরই সাধনার পদ্ধতি ছিল। মতভেদ প্রযুক্ত প্রকৃত অধিকারী
কখনই সংশয়াত্মা হইয়া সাধনা ত্যাগ করেন নাই ও করেন না।
কারণ, তিনি জানেন—“সংশয়াত্মা বিনশ্চতি” (গীতা)। গুরু ও বুদ্ধগণের
উপাসনা ও শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া নিজের অধিকার ও কৃতি অল্পসারে শাস্ত্রোক্ত
যে মতে যাহার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, তিনি গুরুর উপদেশানুসারে সেই মত গ্রহণ
করিয়াই সাধনা করিয়াছেন এবং সাধনার প্রভাবে ক্রমে তাহার সিদ্ধান্ত
নিশ্চয়ও দৃঢ় হইয়াছে। এই রূপ সাধনার প্রভাবে কালে যখন সাধকের
সেই পরমেশ্বরে পরাভক্তি জন্মে, সাধক যখন তদগত চিত্ত ও তদগত
প্রাণ হইয়া সততপ্রীতি পূর্বক তাঁহার ভজন করেন, তখন তিনি তাদৃশ
ভক্ত সাধককেই “বুদ্ধি যোগ” প্রদান করেন। তাই তিনি তাদৃশ ভক্তগণের

১। যুধিষ্ঠির উবাচ। অতৎস্বজ্ঞস্ত শাস্ত্রাণাং সততং সংশয়াত্মনঃ।

অকৃত ব্যবসায়স্ত শ্রেয়োক্রহি পিতামহ ॥

ভীষ্ম উবাচ। গুরুপূজাচ সততং বুদ্ধানাং পৰ্য্যুপাসনং।

শ্রবণকৈব শাস্ত্রাণাং কুটংহং শ্রেয় উচ্যতে ॥

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ষ, ২৮৭ অঃ।

সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—“দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন যামুপযাস্তিতে (গীতা-১০।১০)। তিনি কৃপা করিয়া “বুদ্ধিযোগ” প্রদান না করিলে কেহই তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রকৃত ভবজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। তাই তিনিই শাস্ত্রে জ্ঞানদাতা ও মুক্তিদাতা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া নিজমায়ায় সকল জীবকে মোহিত করেন, সকল জীবের হৃদয়দেশে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত থাকিয়াও যিনি গূঢ় বা অপ্রকাশ আছেন, তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই নিকটে কান্তর প্রার্থনা ব্যতীত প্রকৃততত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না। তিনিই সমাধিনামক বৈশ্বের সাধনার প্রভাবে তাঁহাকে দেবীমূর্তিতে দর্শন দিয়া তাঁহার প্রার্থনামুসারে তাঁহাকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। সাধনার প্রভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হইয়া ঐ জ্ঞান প্রার্থনা করিলে তিনি সকলকেই উহা প্রদান করেন। তাই মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যের শেষে ঋষি বলিয়াছেন—

“তয়ৈব মোহতেবিশ্বং সৈববিশ্বং প্রসূয়তে ।

সা যাচিতাচ বিজ্ঞানং তুষ্ঠা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি” ॥



সপ্তম অধ্যায়

স্বাভাবিকতায় ঈশ্বর

কণাদ ও গৌতমের মত ব্যাখ্যা করিতে আমরা এ পর্যন্ত অনেকবার জগৎকর্তা ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া অনেক কথা বলিয়াছি। সুতরাং কণাদ ও গৌতম তৎসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা বলা আবশ্যক। প্রথমে গৌতমের কথাই বলিব।

শ্রায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আত্মিক মহর্ষি গৌতম যথাক্রমে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফলাদর্শনাৎ। ৪।১।১৯।

ন পুরুষকর্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ। ৪।১।২০।

তংকারিতত্বাদহেতুঃ। ৪।১।২১।

ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতির মতে উক্ত প্রথম সূত্রটি পূর্বপক্ষ সূত্র। গৌতম প্রথমে উক্ত সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষরূপে এই মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন যে, জীবের কর্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বরই কারণ। যেহেতু জীবের কর্মের বৈফল্য দেখা যায়। অর্থাৎ জীব কর্ম করিলেও যখন অনেক সময়ে তাহা বিফল হয়, তখন জীবের কর্ম কারণ নহে। ঈশ্বরই স্বেচ্ছানুসারে জগতের সৃষ্টিাদি ও সর্বজীবের সুখ দুঃখাদি বিধান করেন।

বস্তুতঃ জীবের কর্মাদি নিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্টিাদির কারণ, ইহাও একটি সুপ্রাচীন মত। প্রাচীনকালে উহারই নাম ছিল “ঈশ্বরবাদ”। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ “মহাবোধি জাতকে” উক্ত মতের বর্ণন আছে (জাতক পঞ্চম খণ্ড—২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। “বুদ্ধ চরিতে” (২৫৩) অংশবোধ ও উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। “সুশ্রুত সংহিতা”র শারীর স্থানেও (১।১১) “স্বভাববাদ” “কালবাদ” “যদুচ্ছাবাদ” ও “নিয়তিবাদে”র সহিত উক্ত “ঈশ্বরবাদে”রও উল্লেখ হইয়াছে। চতুর্বিধ মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের অন্ততম নকুলীশ পাণ্ডপত সম্প্রদায় উক্ত মতই সমর্থন পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। “সর্বদর্শন সংগ্রহে” মাধবাচার্য্য উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপূর্বে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও “শ্রায়

কুম্মাঙ্গলি"র প্রথমে উক্ত মতকে মহাপাণ্ডপত সম্প্রদায়ের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত প্রথম সূত্র দ্বারা গৌতম উক্ত মত প্রকাশ করিয়া কর্মবাদীর মত প্রকাশ করিতে দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন—“ন পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলানিবপত্তেঃ”। অর্থাৎ ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্টাদির কারণ নহেন। যেহেতু জীবের কর্ম ব্যতীত ফল নিষ্পত্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে জীবের কর্ম জন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টানুসারেই জীব যখন ফলভোগ করে, সেই অদৃষ্টজনক কর্ম না করিলে জীব যখন তাহার ফলভোগ করে না, তখন জীবের শুভাশুভ কর্ম জন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই জগৎ সৃষ্টাদির কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন।

গৌতম পূর্বোক্ত মতদ্বয়ই খণ্ডন করিতে পরে সিদ্ধান্ত সূত্র বলিয়াছেন “তৎকারিতত্বাদহেতুঃ”। অর্থাৎ পূর্বোক্ত মতদ্বয়ের সাধকরূপে যে হেতু কথিত হইয়াছে, তাহা অহেতু, অর্থাৎ উক্ত মতের সাধক হেতু হয় না। কেন উহা অহেতু? তাই বলিয়াছেন—“তৎকারিতত্বাৎ”। “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত ঈশ্বরই গৃহীত হইয়াছেন। অর্থাৎ জীবের সমস্ত কর্ম ও তাহার ফল যখন ঈশ্বরকারিত, তখন কেবল ঈশ্বরই কারণ, অথবা কেবল অদৃষ্টই কারণ, ইহা বলা যায় না। কিন্তু জীবের কর্ম ও ঈশ্বর উভয়ই জগৎ সৃষ্টাদির নিমিত্ত কারণ, ইহাই বক্তব্য। তাৎপর্য্য এই যে জীবের কর্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া ঈশ্বরই স্বেচ্ছানুসারে জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিলে তাহার বৈষম্য (পক্ষপাত) এবং নৈয়ুর্গ্য (নির্দয়তা) দোষের অপরিহার্য্য আপত্তি হয়। সুতরাং ঈশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই জগতের সৃষ্টাদি করেন্ অর্থাৎ তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম সাপেক্ষ কর্তা, ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্রুতি ও তাহাই বলিয়াছেন। তদনুসারে বেদান্ত দর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও স্পষ্ট বলিয়াছেন—“বৈষম্য নৈঘূর্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি”। ২।১।৩৪।

বস্তুতঃ শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—“এষহেব সাধু কর্ম্মকারয়তি তং য মেভ্যোলোকেভ্য উল্লিনীষত এষ উ এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি, তং য মশোনিনীষতে” (কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৩।৮) “পুত্রোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন” (বৃহদারণ্যক ৩।২।১৩) “কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ” (খৈতখতর ৬।১১) “সবাস্র মহানজ আত্মানাদো বহুদানঃ” (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৪)

পূর্বোক্ত প্রতিবাক্যের দ্বারা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, সেই পরমাশ্রয়ী পরমেশ্বরই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম করাইতেছেন। জীব কর্মের কর্তা, ঈশ্বর সেই সমস্ত কর্মেরই কারয়িতা অর্থাৎ হেতুকর্তা বা প্রযোজক কর্তা। আর তিনিই জীবের সর্ব কর্মসাধ্যক অর্থাৎ সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা এবং তিনিই জীবের “বস্তুদান” অর্থাৎ সর্বকর্মের ফলদাতা। সুতরাং জীবের কর্ম জন্ত ধর্মার্থরূপ অদৃষ্ট যে নিজেই তাহার ফলদান করে, তাহাতে ঈশ্বর অনাবশ্যক, ইহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে। কিন্তু সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহেই অর্থাৎ সর্ব জীবের সমস্ত অদৃষ্টে তাহার অধিষ্ঠান বশতঃই সেই সমস্ত অদৃষ্ট ফলজনক হয়—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গৌতমও পূর্বোক্ত সূত্রের দ্বারা উক্ত শ্রোত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ও গৌতমের উক্ত রূপই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১)।

গৌতম মতের ব্যাখ্যাতা মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য “শ্রায় কুসুমাজলি”র প্রথম স্তবকে বিচার পূর্বক যুক্তির দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবের শুভাশুভ কর্মজন্য ধর্মার্থরূপ অদৃষ্ট আছে, এবং ঈশ্বরই সেই সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা, ইহা স্বীকার্য। সুতরাং জীবের অদৃষ্ট সমষ্টির অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার্য। তাৎপর্য এই যে, যেমন কুঠার প্রভৃতি অচেতন পদার্থ কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই ছেদনাদি ক্রিয়ার কারণ হয়, তদ্রূপ জীবের অদৃষ্টসমষ্টিরূপ অচেতন পদার্থও কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই জগৎ সৃষ্টিাদির কারণ হইতে পারে। কারণ কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন পদার্থ কখনই কার্য জনক হয় না, হইতে পারে না। কিন্তু অসর্বজ্ঞ মূঢ় জীব কখনই তাহার অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্বে তাহার চৈতন্যও থাকে না। সুতরাং যিনি অনাদিকাল হইতে অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকার অসংখ্য অদৃষ্টের প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে কোন্ অদৃষ্টের কিরূপ ফল হইবে, ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছেন এমন কোন সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান্ অনাদি সর্বজ্ঞ পরম পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য। তিনিই জীবের সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা।

১। পুরুষকারমীমংসোহমুখাতি ফলায় পুরুষন্ত যতমানস্তেষাং ফলং সম্পাদয়তীতি। বদা ন সম্পাদয়তি, তদা পুরুষ-কর্ম্মাফলং ভবতীতি। উন্মাদীষরকারিত্ত্বাদহেতুঃ পুরুষ-কর্ম্মাভাবে ফলানি-
শ্বেতেরিতি। উক্ত হজ্রেয় ভাষ্য।

সুতরাং তিনিই জীবের সর্বকর্মের ফলদাতা। তাই শ্রুতি তাহাকেই বলিয়াছেন—“কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাস ” ।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রসঙ্গ হয় যে, জীবের কোন কর্মেই তাহার স্বেচ্ছানুসারে স্বাধীন কর্তৃত্ব না থাকিলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরও মানবগণকে নানারূপ কর্তব্যের উপদেশ করিয়াছেন কেন ? এবং তিনি জীবকে দুঃখজনক কর্ম করান কেন ? এবং ঈশ্বরই জীবকে পাপ কর্ম করাইলে তজ্জন্ত জীবের অপরাধ হইবে কেন ? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, মানবগণের কোনকর্মে বস্তুতঃ স্বাধীন কর্তৃত্ব না থাকিলে ও অনেকস্থলেই স্বাধীন কর্তৃত্বের অভিমান থাকায় তাহাদিগকে সাধু ও অসাধুকর্ম এবং তাহার শুভাশুভ ফলের উপদেশ করা কর্তব্য। নচেৎ তাহাদিগের ঐ সমস্ত কর্মাদি বিষয়ে অজ্ঞতা নিবৃত্তি হইতে পারে না। তজ্জ-মানবগণের পক্ষে কর্মবিশেষে পরাধীন প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিও উপদেশ সাপেক্ষ। সুতরাং প্রত্যু যেমন তাহার অধীন ভূতগণকে পূর্বে বিশেষরূপে তাহার কর্তব্য ও অকর্তব্যের উপদেশ করেন, তদ্রূপ আদিগুরু পরমেশ্বরও মানবগণকে নানারূপ কর্তব্য ও অকর্তব্যের উপদেশ করিয়াছেন। তদ্বারা তিনি যে জীবের পূর্ব-জন্মকৃত ও শুভাশুভ কর্মজন্ত ধর্মাদ্ব্যনুসারেই জগতের সৃষ্টিাদি করেন অর্থাৎ তিনি জীবের ধর্মাদ্ব্যনুসাপেক্ষ কর্তা, এই সিদ্ধান্তও প্রকটিত হইয়াছে।

আর পূর্ব জন্মের যে কর্মের ফলে ইহ জন্মে যে জীব, যে অসাধু কর্ম করিয়া যে কালে তাহার যে ফলভোগ করিবে, তাহা সর্বজীবের সর্বকর্মাধ্যক্ষ সর্বজ্ঞ সেই পরমেশ্বরই জানেন এবং তিনিই জীবের সেই কর্মেরও ফলদাতা। সুতরাং জীবের পূর্বজন্মকৃত সেই কর্মানুসারে জীবকে সেই কর্মফল দানের জন্ত তিনি জীবকে সেই অসাধু কর্ম ও করান এবং জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মের সেই সমস্ত কর্মও তৎপূর্ব পূর্বজন্মের কর্মানুসারেই তিনি করাইয়াছেন। সৃষ্টিপ্রবাহ বা জীবের সংসার অনাদি, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। সমস্ত জীবের সমস্ত জন্মেই বিচিত্র শরীর সৃষ্টি যে তাহাদিগের কোন পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল ধর্মাদ্ব্যনুসারে, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে মহর্ষি গৌতম পূর্বেই বলিয়াছেন—“পূর্বকৃত ফলানুবন্ধাত্ত্বংপত্তিঃ” । ৩।২।৩০।*

* কেহ কেহ বলেন যে, গৌতমের মতেও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জীবের অতীত শুভাশুভ কর্মানুসারেই জগতের কর্তা এবং জীবের স্বদুঃখবিধাতা; অর্থাৎ গৌতম জীবের শুভাশুভ কর্মজন্য ধর্ম ও অধর্ম

কিন্তু ঈশ্বর জীবের সর্বকর্মের কারয়িতা হইলেও জীব নিজে তাহার কর্তা স্বতরাং যে অবস্থায় যে সমস্ত মানবের পক্ষে যে সমস্ত কর্ম পাপজনক বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, তাহারা ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া সেই কর্ম করিলেও তজ্জন্ত তাহাদিগের অপরাধ বা পাপ অবশ্যই হইবে। নচেৎ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া সাধু কর্ম করিলে তজ্জন্ত পুণ্যই বা হইবে কেন? স্বতরাং যেমন পিতার আদেশে বাধ্য হইয়া পুত্র কোন কুকর্ম করিলে তাহার ও তজ্জন্ত অপরাধ হয় এবং সেজন্ত তাহার পক্ষেও রাজদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তদ্রূপ, মানবগণ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া অসাধু কর্ম করিলেও তজ্জন্ত তাহাদিগের অপরাধ অবশ্যই হইবে এবং ঈশ্বরও তাহাদিগের পূর্বে পূর্নকৃত কর্মানুসারেই তাহাদিগকে অনাদিকাল হইতে যথাকালে সেই সমস্ত অসাধু কর্মেও প্রেরিত করিতেছেন কারণ, তিনিই জীবের সর্বকর্মের ফলদাতা।

পূর্বোক্ত “এষহেব সাধুকর্ম কারয়তি”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে গোতমের ন্যায় বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াছেন—“পরাত্তুত্চশ্রুতেঃ” (২।৩।৪১)। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য পূর্বে সেখানে জীবের কর্তৃত্বকে তাঁহার উপাধিনিমিত্তক বলিয়া সমর্থন করিলেও পরে উক্ত সূত্রানুসারে সেই কর্তৃত্বকেও তিনি ঈশ্বরের অধীন বলিয়াছেন। জীবের কোন কর্মেই তাহার কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে। ক্রিয়মাণকর্মে জীবের স্বাধীন কর্তৃত্ব আছে, ইহা বলিলে ফলতঃ সকল কর্মেই জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন বলা হয়। কারণ, মানব যে জন্মে যে সমস্ত কর্ম

নামক আয়ত্ত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু উক্ত সূত্রে গোতম “পূর্নকৃত” শব্দের পরে “ফল” শব্দের প্রয়োগ করায় তিনি যে পূর্নকৃত শুভাশুভ কর্মজন্ত ধর্ম ও অধর্ম নামক ফলও স্বীকার করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও উক্ত সূত্রে “পূর্নকৃত” শব্দ ও “ফল” শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“পূর্নশরীরে বা প্রবৃত্তিরীতি-বুদ্ধি শরীরান্তরূপা, তৎপূর্নকৃতং কর্মোক্তং, তন্ত ফলং তজ্জন্মিতৌ ধর্মোঁধর্মোঁ”। গোতম ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেও “শরীরদাহে পাতকান্তাবাৎ” (১।৪) এই সূত্রে “পাতক” শব্দের দ্বারা অধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে ৪১শ সূত্রেও সংস্কারের উদ্বোধকসমূহের উল্লেখ করিতে সর্বশেষে ধর্ম ও অধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন স্বতরাং নৈয়ায়িক সম্প্রদায় গোতমের সূত্রানুসারেই ধর্ম ও অধর্মকে জীবাত্মার গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে মহর্ষি কণাদ ও শ্রীশ্রী ও অধর্মরূপ অদৃষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য প্রশস্তপাদ প্রভৃতিও ধর্ম ও অধর্ম জীবাত্মার গুণ বলিয়া গিয়াছেন।

করে, সেই জন্মে তাহার সেই সমস্ত কৰ্ম্মই “ক্রিয়মাণ কৰ্ম্ম” নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত কৰ্ম্মে জীবের স্বাধীন কর্তৃত্ব পূর্বোক্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া উহা সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই উক্ত বেদান্ত হত্বের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্করও স্পষ্ট বলিয়াছেন—“সৰ্ব্বাশ্বেষ প্রবৃত্তি স্বীকরোহেতুকর্ত্তেতি শ্রুতে রবসীযতে তথাহি শ্রুতিভবতি—এষেব সাধুকৰ্ম্ম কারয়তি”—ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবের সমস্ত কৰ্ম্মই অন্তর্ধামী ঈশ্বর হেতুকর্ত্তা অর্থাৎ প্রযোজক কর্ত্তা—এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। সুতরাং উহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। আচার্য্য শঙ্কর সেখানে উহার পরবর্ত্তি বেদান্ত হত্বের ভাষ্যেও আশঙ্কিত দোষ খণ্ডনের জন্য স্পষ্ট বলিয়াছেন যে (১) জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও জীব সেই সমস্ত কৰ্ম্ম অবশ্যই করে, নচেৎ ঈশ্বর তাহার কারয়িতা বা প্রযোজক কর্ত্তা হইতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বর জীবের পূর্ব পূর্ব কৰ্ম্মানুসারেই অনাদিকাল হইতে জীবকে কৰ্ম্ম করাইতেছেন। জীবের সংসার অনাদি বলিয়া সমস্তজীবের সমস্তজন্মেই ঈশ্বর জীবের পূর্বজন্মকৃত কৰ্ম্মানুসারে অত্র কৰ্ম্মের প্রযোজক কর্ত্তা হইতে পারেন।

পূর্বোক্ত বেদান্ত হত্বোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্কর শেষে ইহাও বলিয়াছেন—“তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি”। অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহহেতুক তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষসিদ্ধি সম্ভব হয়। কারণ উহাও শ্রুতি সিদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর যাহাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেও তিনিই মুক্তি সম্পাদক সাধুকৰ্ম্ম করান,—ইহাও “এষেব সাধুকৰ্ম্ম কারয়তি” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সুতরাং জীবের সাধারের জায় মুক্তিও সেই ঈশ্বরের অধীন, ইহাও উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। তাহা হইলে গৌতমের উক্ত হত্বের দ্বারা তাহার মতেও মুক্তিও যে ঈশ্বরের অধীন, তাহার অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তি জনক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতেই পারে না, ইহাও অবশ্য বুঝা যায়। কারণ গৌতম ও “এষেব সাধুকৰ্ম্ম কারয়তি”—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারেই পূর্বোক্ত হত্বে বলিয়াছেন—“তৎকারিত্বাৎ”।

১। “নৈব দোষঃ, পরায়ন্তংপি হি কর্ত্ত্ব্যে করোত্যেব জীবঃ। কুর্কন্তুহি তমোহরঃ কারয়তি। অপিচ পূর্বপ্রযত্নমপেক্ষাদানাকারয়তি, পূর্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্বকরারয়দিত্যানাদিত্যাং সংসারস্তেত্যনবদ্যং”—শারীরক ভাষ্য ২।৩।৪২।

সুতরাং উক্ত বেদান্ত সূত্রের দ্বারা আচার্য্য শঙ্কর পূর্বোক্ত যে সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারা অবশ্যই সূচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর কণাদ ও গৌতমের মতেও যে, পরমেশ্বরের অনুরূপেই সৃষ্টির কারণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। শঙ্করাচার্য্য বিরচিত—“সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহে”ও তাহা কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই পরমেশ্বরই জ্ঞানদাতা সৃষ্টিদাতা। তাঁহার অনুরূপ ব্যতীত কাহারই সৃষ্টি হইতে পারে না। তাই দেবগণও সেই বিশ্বমোহিনী মহামায়ার স্তব করিতে তাঁহাকে বলিয়াছেন,—“সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্ন ভুবি সৃষ্টিহেতুঃ”। “স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে”। (চণ্ডী)।

অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, কণাদ তাঁহার কথিত দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থের মধ্যে এবং গৌতম তাঁহার কথিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কেন? তাঁহারা যে আত্মার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ত জীবাত্মা। কারণ পরে আত্মনিরূপণে তাঁহারা জীবাত্মারই তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। এতদ্বত্তে আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, গৌতম প্রমেয় পদার্থের মধ্যে “আত্মন” শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি আত্মার লক্ষণসূত্রের দ্বারা পরমাত্মা ঈশ্বরের লক্ষণও বলিয়াছেন। শ্রায় সূত্রসূতিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় তাহা বলিব। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন উক্ত স্থলে কোন কারণে ঈশ্বরের ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার মতেও ঈশ্বরও আত্মা, তিনি জীবাত্মা হইতে ভিন্ন পরমাত্মা। কারণ বাৎস্তায়ন পরে গৌতমের “তৎকারিত্বাদ-হেতুঃ”—এই সূত্রের ভাণ্ডে শেষে গৌতম সম্বত ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন—“গুণবিশিষ্ট মায়াস্তরমৌৎসবঃ। তথাশ্রবকলাং কলান্তরানুপপত্তিঃ”। অর্থাৎ জ্ঞানাদি গুণবিশিষ্ট যে আত্মাস্তর, তিনি ঈশ্বর। আত্মার প্রকার হইতে তাঁহার অল্প প্রকারের উপপত্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা দুই প্রকার,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যিনি ঈশ্বর, তিনি আত্মারই দ্বিতীয় প্রকার। কারণ তাহাতেও আত্মত্ব আছে, তাই শাস্ত্রে তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। বাৎস্তায়ন পরে সেখানে আত্মার অস্তিত্ব-সাধক জ্ঞান যে ঈশ্বরেও আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরও জ্ঞান রূপগুণ বিশিষ্ট, ইহাও সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ঈশ্বরও

আত্মন শব্দের বাচ্য হওয়ায় প্রমেয় পদার্থের বিভাগ স্বত্রে গৌতমোক্ত “আত্মন” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত দ্বিবিধ আত্মাই বুঝা যায়।

এইরূপ বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষিকণাদও নববিধ দ্রব্যপদার্থের উল্লেখ করিতে “আত্মন” শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার পদার্থ গণনার ন্যূনতা হয়। তাই সেখানে “উপকার” টীকাকার শঙ্কর-মিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার “কণাদরহস্য” গ্রন্থেও কণাদোক্ত আত্মার ব্যাখ্যা করিতে জীবাত্মা ও সর্বজ্ঞ পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মা বলিয়া পরে প্রমাণ দ্বারা সর্বজ্ঞ পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও কণাদোক্ত পৃথিব্যাदि নববিধ দ্রব্যপদার্থের উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন—‘তদ্ব্যতিরেকেণাত্মন্ত সংজ্ঞানভিধানাৎ’। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের উপদেশের নিমিত্ত প্রবৃত্ত মহর্ষি কণাদ পূর্বোক্ত নববিধ দ্রব্যপদার্থ হইতে ভিন্ন কোন দ্রব্যের নাম না বলায় তাঁহার মতে নববিধই দ্রব্য পদার্থ। তাহা হইলে প্রশস্তপাদের মতেও কণাদ যে, দ্রব্য পদার্থের মধ্যে “আত্মন” শব্দের দ্বারা পরমাত্মা ঈশ্বরকেও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। নচেৎ প্রশস্তপাদ পরে যে সৃষ্টি সংহার কর্ত্তা মহেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার মতে কণাদোক্ত কোন পদার্থ, ইহা বলা আবশ্যক। তাই প্রশস্তপাদের পূর্বোক্ত উক্তির সমর্থন করিতে “শ্রায়কন্দলী” টীকাকার শ্রীধরভট্ট শেষে বলিয়াছেন—‘ঈশ্বরোহপি বুদ্ধিগুণত্বাদিষ্টেব’। অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান যাহার গুণ, তাহা “আত্মন” শব্দের বাচ্য। নিত্যজ্ঞানরূপ বুদ্ধি যখন ঈশ্বরের গুণ, তখন ঈশ্বরও আত্মাই, তিনি আত্মা হইতে অত্র জাতীয় কোন দ্রব্য নহেন (১)। সুতরাং কণাদোক্ত দ্রব্য পদার্থের মধ্যে “আত্মন” শব্দের দ্বারা ঈশ্বরও গৃহীত

১। কণাদোক্ত রূপাদি গুণপদার্থ যে দ্রব্য পদার্থেই থাকে, ইহা গুণের লক্ষণে কণাদ নিজেই বলিয়াছেন। তদ্ব্যতীত সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ক, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চ সামান্ত্র গুণ দ্রব্য মাত্রেরই গুণ, সুতরাং ঈশ্বরেরও গুণ ইহা বুঝা যায়। আর অগণ্য কর্ত্তা ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রবৃত্ত এই তিনটি বিশেষ গুণ অবশ্যই আছে। তাহা হইলে রূপাদি চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে ঈশ্বরে অষ্টগুণ আছে ইহা বুঝা যায়। তাই কথিত হইয়াছে “মহেশ্বরেষ্টৌ”। প্রাচীন কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রবৃত্ত অধীকার করিয়া বড়গুণ বলিয়াছিলেন। উদ্যোতকর ও শ্রীধরভট্ট উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত মত স্বীকার করেন নাই।

হইয়াছেন। ফলকথা বৈশেষিক সম্প্রদায়ও সুপ্রাচীন কাল হইতেই কণাদেব
সুত্রানুসারেই জগতের নিমিত্ত কারণ নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর সমর্থন করিয়াছেন।
তাই শারীরক ভাষ্যে (২।২।৩৭) আচার্য্য শঙ্করও লিখিয়াছেন—“তথা
বৈশেষিকাদয়োঃপি কেচিৎ কথঞ্চিৎ স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণমীশ্বর—
মিতিবর্ণয়ন্তি” ।

তাহা হইলে কণাদ ও গৌতম আত্মার তত্ত্ব পরীক্ষা করিতে পরমাত্মা
ঈশ্বরেরও তত্ত্ব পরীক্ষা করেন নাই কেন ? এতদ্বত্তরে প্রথম বক্তব্য
এই যে, কণাদ ও গৌতম তাঁহাদিগের কথিত সমস্ত পদার্থেরই বিচার দ্বারা
তত্ত্ব পরীক্ষা করেন নাই। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থের তত্ত্ব পরীক্ষা প্রয়োজন
বুঝিয়াছেন, তাহারই তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে,
তাঁহাদিগের মতে মুমুক্শুর নিজের আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার সাক্ষাৎকারই
সংসার নিদান মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হইয়া থাকে।
তাই তাঁহারা সেই আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়রূপে ঋতিবিহিত পূর্ব্ব কর্তব্য
আত্মমনন নির্বাহের জন্ত জীবাত্মা যে, দেহাদি ভিন্নও নিত্য, এই বিষয়েই
বিশেষরূপে অনুমানপ্রমাণরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কারণ সেখানে
উহাই তাঁহাদিগের প্রতিপাত্ত। সুতরাং সেখানে পরমাত্মা ঈশ্বরের তত্ত্ব পরীক্ষা
না করায় তাঁহারা যে ঈশ্বর—তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না, ইহা
প্রতিপন্ন হয় না। তৃতীয় বক্তব্য এই যে, গৌতম শ্রায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে
পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপে ঈশ্বরতত্ত্ব-পরীক্ষাও করিয়াছেন। এবং
কণাদও জীবাত্মার পরীক্ষার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে অল্প প্রসঙ্গে পরমাত্মা ঈশ্বর
বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করায় তদ্বারা সামান্যতঃ ঈশ্বরের তত্ত্বপরীক্ষাও
করিয়াছেন। তাই পরে তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার তত্ত্ব পরীক্ষা করিতে তিনি
কেবল জীবাত্মারই তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন।

এখন কণাদ কি প্রসঙ্গে কিরূপে ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন
করিয়াছেন, তাহাও এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি। কণাদ বায়ুর অস্তিত্ব
সাধক অনুমান প্রদর্শন করিয়া তাহার “বায়ু” এই সংজ্ঞা বা নাম বিষয়ে
প্রমাণ প্রকাশ করিতে সূত্র বলিয়াছেন—“তস্মাদাগমিকং” (২।১।১৭)। অর্থাৎ
পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা বায়ু পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও উহার

নাম যে বায়ু, তাহা সিদ্ধ হয় না। অতএব উহার বায়ু এই নাম “আগমিক” অর্থাৎ বেদ প্রমাণ সিদ্ধ। কণাদেব এই কথায় প্রশ্ন হইবে যে, বেদে “বায়ু” এই নামের উল্লেখ থাকিলেও তদ্বিষয়ে সেই বেদবাক্য প্রমাণ হইবে কেন? ঐ নাম যে, যেকোন ব্যক্তির স্বেচ্ছা কল্পিত নহে, ইহা কিরূপে বুঝিব? তাই কণাদ সেখানেই পরে দুইটি স্থান বলিয়াছেন—

সংজ্ঞাকর্মত্বস্বদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গং ॥২:১।১৮।

প্রত্যক্ষ প্রবৃত্ত্বাংসংজ্ঞা কর্মণঃ ॥২:১।১৯।

প্রথম স্থত্রের দ্বারা কণাদ বলিয়াছেন যে, বায়ু প্রভৃতি পদার্থের যে সংজ্ঞাকর্ম বা নামকরণ, তাহা কিন্তু আমাদের হইতেও বিশিষ্ট পুরুষগণের লিঙ্গ বা অস্তিত্ব সাধক। দ্বিতীয় স্থত্রের দ্বারা উহাই সমর্থন করিতে কণাদ বলিয়াছেন যে, যেহেতু সংজ্ঞাকর্ম বা নামকরণ কর্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞাত। তাৎপর্য্য এই যে, বেদে বায়ু, স্বর্গ, ও দেবতা প্রভৃতি যে অসংখ্য নামের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা ঐ বায়ু প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভব হয় না। অর্থাৎ যাহারা ঐ সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহারা কখনই ঐ সমস্ত নাম নির্দেশ করিতে পারেন না। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থের ঐরূপ সংজ্ঞাকর্ম বা নামকরণ দ্বারা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয় যে, আমাদের হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদার্থের নাম করণে সমর্থ সর্বদর্শী মহেশ্বর ও ব্রহ্মা প্রভৃতি ঈশ্বর আছেন।

কণাদ স্থত্রের ব্যাখ্যাতা শঙ্কর মিশ্র কণাদেব উক্ত উভয় স্থত্রই “সংজ্ঞাকর্ম” শব্দে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারা সংজ্ঞা ও কর্ম অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্যগুণাদি কার্য্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যিনিই বেদোক্ত বায়ু প্রভৃতি নামের কর্তা, তিনিই দ্যগুণাদি কর্ম বা কার্য্যের কর্তা, ইহা সূচনা করিবার জন্যই মহর্ষি কণাদ উক্ত স্থলে সমাহার দ্বন্দ্বের প্রয়োগ করিয়াছেন। শঙ্করমিশ্র পরে কণাদেব তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটপটাদি কার্য্যের ন্যায় সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন যে দ্যগুণাদি কার্য্য, তাহার ও অবস্থা কোন কর্তা আছেন এবং তিনি অতীন্দ্রিয়দর্শী অনাদিসর্বস্বত্ব ইহা অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। কারণ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্যগুণকের উপাদান কারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণুর প্রত্যক্ষ ব্যতীত দ্যগুণকের কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না এবং সমস্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীতও তাহাদিগের সেই সেই নাম

নির্দেশ করাও সম্ভব হয় না। অতএব অনুমান প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, ঋগ্বেদাদি কার্যের কর্তা এবং সমস্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থের সংজ্ঞাকর্তা নিত্য সর্বজ্ঞ আছেন। তিনিই বেদকর্তা মহেশ্বর এবং তিনিই চতুর্ভুজদন ব্রহ্মার দেহাদি সৃষ্টি করিয়া সেই শরীরে আবিস্ট হইয়া বেদের প্রচার করেন। এবং প্রজা সৃষ্টির পরে তিনিই দেহ বিশেষ ধারণ করিয়া কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা উপদেশ করেন। কারণ তিনি ভিন্ন প্রথম শিক্ষক আর কেহ হইতে পারেন না। ফলকথা পূর্বোক্তস্থলে কণাদ ঈশ্বরের নাম ও অত্যান্ত তত্ত্বের উল্লেখ না করিলেও তিনি যে জগৎকর্তা বেদকর্তা নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

কণাদের ন্যায়, মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগদর্শনে “তত্ত্ব নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং” (১।২৫) এই সূত্রের দ্বারা নিজ মতানুসারে জগতের নিমিত্ত কারণ নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধক অনুমান প্রমাণই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বারা গেই ঈশ্বরের নাম ও অত্যান্ত তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান হয় না-ইহা বলিয়া ভাষ্যকার ব্যাসদেব সেখানে বলিয়াছেন—“তত্ত্ব সংজ্ঞাদিবিশেষ প্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্যায়েষ্য”। অর্থাৎ সেই ঈশ্বরের নাম ও অত্যান্ত তত্ত্ব বেদাদি শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে। বৈশেষিক দর্শনের পূর্বোক্ত স্থলে কণাদেরও উক্তরূপ তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। পরন্তু সেখানে পরে কণাদের পূর্বোক্ত “তন্মাদাগমিকং”—এই সূত্রের অনুবৃত্তি বুঝিয়া কণাদ যে বায়ুর ন্যায় মহেশ্বরের নামাদিও “আগমিক” বলিয়া বেদাদি শাস্ত্র হইতেই তাহা জানিতে বলিয়াছেন-ইহাও অবশ্য বুঝা যায়। সূত্রগ্রন্থে কোন কোন স্থলে পূর্বকথিত সূত্রেরও পরে অনুবৃত্তি সূত্রকারের অভিमत থাকে—এবং সূত্রকার ঋষিদিগের স্বাক্ষর সূত্রের দ্বারা বহু অর্থ স্থচিত হয়, এই জন্যই উহার নাম সূত্র।*

পরন্তু ইহাও জানা আবশ্যক যে কোন শাস্ত্রকার শাস্ত্রান্তরোক্ত যে মতের ঋণওন করেন নাই, অথবা যে সমস্ত মত তাঁহার মতের বিরুদ্ধ, তাহা তাঁহার নিজেরও সম্মত, ইহা “অনুমত” নামক তত্ত্বযুক্তির দ্বারা বুঝা যায়। সূত্রতৎসংহিতার উত্তরতন্ত্রে তত্ত্বযুক্তি অধ্যায়ে ৩২ প্রকার তত্ত্বযুক্তি ও তাহার উদাহরণ কথিত

* ত্রীমহাচম্পতি সিন্ধু লিখিয়াছেন—সূত্রকথার্থ সূচনাদন্তবতি। যথাঃ—“লঘুনি সূচিভাষ্যনি স্বাক্ষর পদানিচ। সর্বতঃ সার ভূতানি সূত্রাগ্যাহম’নীযিৎ.” ইতি। “ভাসভী” ১।১।১।

হইয়াছে। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের শেষেও সেই সমস্ত তত্ত্ব যুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটির নাম “অনুমত”। ভ্রাত্যদর্শনের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যশেষে বাৎস্তায়নও বলিয়াছেন—“পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতমিতিহি তত্ত্ব-যুক্তিঃ”। অর্থাৎ অপরের মত খণ্ডিত না হইলে তাহা “অনুমত”,—ইহা তত্ত্ব যুক্তি। বাৎস্তায়ন সেখানে শাস্ত্রাস্তরোক্ত মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে গৌতমের ও সম্মত ইহা সমর্থন করিতেই সর্ব শেষে ঐ কথাও বলিয়াছেন। কারণ গৌতম ইন্দ্রিয় বিভাগ সূত্রে মনের উল্লেখ না করিলেও তিনি মনের ইন্দ্রিয়ত্বের খণ্ডনও করেন নাই। সুতরাং বাৎস্তায়নের ঐ কথাষুসারে কণাদ ও গৌতম ঈশ্বর বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে যে সকল মতের খণ্ডন করেন নাই, অর্থাৎ যে সমস্ত মত তাঁহাদিগের মতের অবিরুদ্ধ, তাহাও তাহাদিগের সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং শাস্ত্রাস্তর হইতেই তাহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেই সমস্ত বিষয় কণাদ ও গৌতমের প্রতিপাদ্য না হওয়ায় তাঁহারা তাহার উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু শাস্ত্রাস্তরোক্ত যে সমস্ত মত কণাদ ও গৌতমের মতবিরুদ্ধ বলিয়া বুঝা যায়, তাহাও কণাদ ও গৌতমের সম্মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাই ভ্রাত্য বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সেই সমস্ত মত গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা কণাদ ও গৌতমের মত সমর্থনের জন্য সেই সমস্ত মতের প্রতিবাদও করিয়াছেন। যেমন ঈশ্বর যে নিত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, এবং বস্তুতঃই নিগুণ, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। কারণ, কণাদ ও গৌতমের মতে জ্ঞানও আনন্দ স্বরূপতঃ বিভিন্ন গুণপদার্থ। যাহা জ্ঞান, তাহা আনন্দ হইতে স্বরূপতঃই ভিন্ন। কণাদ গুণপদার্থের লক্ষণ বলিতে উহাকে দ্রব্যাপ্রিত ও গুণশূন্য বলিয়াছেন এবং তাঁহার মতে পরমাত্মা ঈশ্বর দ্রব্যপদার্থের অন্তর্গত, সুতরাং তাঁহাতেও গুণপদার্থ আছে, তিনি সগুণ। জ্ঞান যে, আত্মারই গুণ ইহা গৌতম বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে নিত্যজ্ঞান পরমাত্মার গুণ, ইহা বুঝা যায় অর্থাৎ সেই সর্বজ্ঞ পরমাত্মা সর্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞানের আশ্রয়, কিন্তু তিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ নহেন (১)।

১। বৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরিও “ষড়দর্শন সমুচ্চয়” গ্রন্থে নৈয়ায়িক দর্শনের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—

আক্ষপাদ মতে দেবঃ সৃষ্টি সংহার কৃচ্ছিবঃ।

বিভূনিত্যৈক সর্বজ্ঞো নিত্য বুদ্ধি সমাশ্রয়ঃ”।

গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ও দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানাদি গুণ শূন্য ঈশ্বর কোন প্রমাণেরই বিষয় না হওয়ায় তাদৃশ ঈশ্বরকে কেহই উপপাদন করিতে সমর্থ নহেন। অর্থাৎ প্রমাণাত্মক নিগূর্ণ নির্কির্শেষ ব্রহ্ম সিদ্ধই হয়না। পরন্তু শাস্ত্র দ্বারাও ঈশ্বর যে, সর্ববিষয়ক জ্ঞানের আশ্রয়, অর্থাৎ সর্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞান তাঁহার গুণ, ইহাই বুঝা যায়। বাৎস্তায়নের তাৎপর্য এই যে, “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যন্ত জ্ঞানময়ঃ তপঃ” (মুণ্ডক ১।১।২) এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর যে সামান্ত্রিকতঃ ও বিশেষতঃ সর্ববিষয়ক নিত্য-জ্ঞানের আশ্রয়, ইহাই বুঝা যায়। বায়ুপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে ও মহেশ্বরের ষড়ঙ্গের বর্ণনায় সর্বজ্ঞতাকে তাঁহার প্রথম অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের ত্রায় তাঁহাতে নিত্য বর্তমান বলা হইয়াছে এবং জ্ঞান প্রভৃতি দশটি অব্যয় পদার্থ যে, সতত তাঁহাতে বর্তমান আছে, ইহাও পরে কথিত হইয়াছে। যোগদর্শন ভাষ্যের (১।২৫) টীকায় শ্রীমদাচম্পতি মিশ্র ও বায়ুপুরাণের সেই সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। ঈশ্বরের সেই সর্ববিষয়ক জ্ঞানরূপ গুণও তাঁহার মায়াকল্পিত বলিলে উহা অব্যয় বা নিত্য বলা যায় না। কিন্তু বায়ু পুরাণে কথিত হইয়াছে—“অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে”।

অবশ্য শাস্ত্রে অনেকস্থলে অনেক প্রকারে পরব্রহ্মের নিগূর্ণত্ব ও কথিত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, শাস্ত্রে অনেকস্থলে পরব্রহ্মের অতি দুজ্ঞেয়ত্ব প্রকাশ করিতে নানারূপ বর্ণন হইয়াছে। কেবলরূপেই তাঁহার নির্দেশ করা যায় না, তিনি অনির্দেশ, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, এইরূপ অনেক কথাও বলা হইয়াছে। আবার অনেকস্থলে অধিক রী বিশেষ কোন অবস্থায় তাঁহাকে নিগূর্ণ বলিয়া ধ্যান করিবেন—এই তাৎপর্য্যেও তাঁহার নিগূর্ণত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মের নিগূর্ণত্বরূপে ধ্যানাদিই নিগূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা। আর শাস্ত্রে অনেকস্থলে সেই পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় নাই, এই অর্থে তাঁহাকে নিগূর্ণ বলা হইয়াছে। বিষ্ণু পু্রাণে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—“সব্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃত্য গুণাঃ” (১।২।৪৩)। বৈষ্ণব দার্শনিকগণও উক্ত বচন এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তি অনুসারে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি গুণত্রয় এবং প্রাকৃত, হয় কোন গুণ নাই, ইহাই শাস্ত্রোক্ত নিগূর্ণ ব্রহ্মের তাৎপর্য্য বলিয়াছেন। ত্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে

জীবের বিভিন্নপ্রকার বিজাতীয় অদৃষ্ট বিশেষের নামই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এবং সর্বজীবের অদৃষ্ট সমষ্টিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। *

সত্য বটে, শ্রুতি বলিয়াছেন—“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”। “বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাং,” “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাং”। কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে জ্ঞান ও আনন্দ, বিরুদ্ধ স্বভাব পদার্থ বলিয়া যাহা জ্ঞান স্বরূপ, তাহা আনন্দ স্বরূপ হইতে পারে না। সাংখ্য প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ও আত্মার আনন্দ রূপতা স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যস্বত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন—“নৈকস্থানন্দ-চিহ্নপত্বে দ্বয়োর্কিরোধাতঃ”। “দুঃখনিবৃত্তে গোঁঃ” (৫।৬৭)। অর্থাৎ আত্মাতে নিরবচ্ছিন্নদুঃখাভাব থাকায় সেই অর্থে তাহাতে “আনন্দ” শব্দের গোঁ প্রয়োগ হইয়াছে। আত্মা আনন্দ স্বরূপও নহে, তাহাতে আনন্দরূপ গুণও নাই। আত্মার সগুণত্ববাদী ঋগ্বৈবেশেষিক সম্প্রদায়ের অনেক প্রাচীন আচার্য্যও “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” এই শ্রুতি বাক্যে “আনন্দং” এই ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগের দ্বারা ব্রহ্ম আনন্দ বিশিষ্ট (আনন্দস্বরূপ নহেন), এবং তাহার সেই আনন্দও নিরবচ্ছিন্ন নিত্য দুঃখাভাবরূপ, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু “ন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্তভট্ট এবং নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপ আনন্দ ও সমর্থন করিয়াছেন। তাই রঘুনাথ শিরোমণি নিজমতানুসারে

* “শ্রায়কুসুমাবলি”র প্রথম স্তবকের শেষ শ্লোকে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জীবগণের বিচিত্র যে সমস্ত অদৃষ্ট, তাহা সৃষ্টাদি কার্য্যে পরমেশ্বরের সহকারিকারূপে শক্তি বিশেষ। উহা সত্যি হুজের বলিয়া শাস্ত্রে “মায়ী” নামেও কথিত হইয়াছে। এবং উহা সৃষ্টাদি কার্য্যে মূল বা প্রধান কারণ বলিয়া “প্রকৃতি” নামেও কথিত হইয়াছে এবং উহা তত্ত্বজ্ঞানরূপে বিদ্যানাথ বলিয়া “অবিদ্যা” নামেও কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বিষ্ণু পুরাণেও কথিত হইয়াছে—“অবিদ্যা কর্ণ সংজ্ঞাতা তৃতীয়া শক্তিরিহ তে” (৬।৭।৬১)। অর্থাৎ জীবের কর্ণ বা অদৃষ্টরূপে যে অবিদ্যা, তাহা পরমেশ্বরের তৃতীয়শক্তি। অবশ্য শাস্ত্রে “মায়ী” “প্রকৃতি” ও “অবিদ্যা” শব্দের অনেক অর্থে—প্রয়োগ হইয়াছে। পরমেশ্বরের যে অবটনবটন-পটীয়াসী ইচ্ছাশক্তি, তাহাও “মায়ী” নামে অনেক স্থলে কথিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে উহারই নাম “আত্মমায়ী”। আর পরমেশ্বরের জীবের অদৃষ্ট সমষ্টিরূপে মায়ার অধিষ্ঠাতা, এই অর্থে শ্রুতি তাহাকে “মায়ী” বলিয়াছেন। “তস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ”। “নায়ান্তু প্রকৃতিঃ বিদ্যাম্মায়িনন্ত মহেশ্বরঃ”। (শেতাশ্বতর উপ)

তঁাহার “দীপ্তি”র মঙ্গলাচরণশ্লোকে বলিয়াছেন—“অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে” । *

পরন্তু ইহাও বলা যায় যে বিজ্ঞান ও আনন্দই পরমেশ্বরের সারভূত বা প্রধানতম গুণ, এজন্যই তিনি শাস্ত্রে “জ্ঞান” “বিজ্ঞান” ও “আনন্দ” নামেও কথিত হইয়াছেন। রামানুজের ব্যাখ্যাসূত্রে “তদ্বৎসারস্বাত্ম তদ্ব্যাপদেশঃ প্রাজ্ঞব্যং” (২।৩.২৯) এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা ও ঐক্লপ তাৎপর্য বুঝা যায়। কিন্তু ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকের প্রারম্ভে তাৎপর্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র অবৈত মতের ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন করিয়া গৌতমের মতের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন—“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতিরানন্দ চৈতন্য-শক্ত্য-ভিপ্রায়ঃ”। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ নহেন, কিন্তু তিনি নিত্য চৈতন্যশক্তি বিশিষ্ট ও নিত্য আনন্দশক্তি বিশিষ্ট, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য। পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের স্বাভাবিক অনন্ত শক্তির মধ্যে তঁাহার চৈতন্য ও আনন্দ শক্তিই প্রধান, ইহা প্রকাশ করিতেই শ্রুতি তঁাহার স্বরূপ বর্ণনে পূর্বোক্ত তাৎপর্যে বলিয়াছেন—“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”। পরমেশ্বরের সেই স্বাভাবিক চৈতন্যশক্তি ব্যতীত জীবের কখনই চৈতন্য জন্মিতে পারে না এবং তঁাহার সেই স্বাভাবিক আনন্দ শক্তি ব্যতীত জীবের কখনই কোন আনন্দ জন্মে না। তাই উক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহাই স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—“কোহেবাগ্নাং কঃ প্রাণাং যদেষ আকাশ আনন্দো নস্তাং, এষেহেবানন্দয়তি”। ‘আকাশতে প্রকাশতে’ অর্থাৎ—সতত যিনি নিত্য প্রকাশ বা নিত্য জ্ঞানের

* রঘুনাথশিরোমণির উক্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কেহ অনেকবার তাঁহাকে অবৈতমতাসূত্রাগী বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। পরে তিনি আবার তঁাহার “অবৈত সিদ্ধি”র ভূমিকায় (১১৫ পৃষ্ঠার) ইহাও লিখিয়াছেন যে, “জগদীশ অদ্বিতীয় নৈরায়িক হইলেও, অবৈত বেদান্তের অনুসরণী ছিলেন। কারণ, শিরোমণির “অখণ্ডানন্দবোধায়” পদের অবৈত পর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন”। কথাটা কিন্তু একেবারেই অসত্য। কারণ টীকাকার জগদীশ প্রথমেই শিরোমণির ঐ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“অখণ্ডো নিত্যো আনন্দ বোধো যন্ত তস্মৈ”। আর রঘুনাথ শিরোমণি নিজেই যে, “আন্তর্য্য বিবেক”র টীকার শেষে “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সর্বজ্ঞ পরব্রহ্ম নিত্যজ্ঞান ও নিত্যআনন্দই সমর্থন করিয়াছেন—ইহাও সেথা আবশ্যক। সুতরাং তঁাহার পূর্বোক্ত “অখণ্ডানন্দবোধায়”—এই বাক্যে যাহাতে নিত্য আনন্দ ও নিত্য জ্ঞান আছে, এই অর্থ বহুব্রীহি সমাসই যে, তঁাহার অভিপ্রেত, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

আশ্রয় এই অর্থে উক্ত প্রতিবাক্যে পরমেশ্বরকে “আকাশ” বলা হইয়াছে। এবং সর্বজীবের আনন্দক এই অর্থে “আনন্দ” বলা হইয়াছে। পদ্মে “এষহেবানন্দয়তি”—এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত তাৎপর্যই সুব্যক্ত করা হইয়াছে। এবং তৎপূর্বে “আনন্দঃ ব্রহ্মণো বিদ্বান্” এই প্রতিবাক্যে ব্রহ্ম ও তাহার আনন্দের ভেদই কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই মতে “রসোবৈ সঃ”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যও রসশব্দের অর্থ আনন্দ শক্তি বিশিষ্ট। বাচস্পতি মিশ্রের পূর্বোক্ত উক্তির দ্বারা উহাই যে নৈয়ারিক সম্প্রদায়ের প্রাচীন ব্যাখ্যা, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। বাহ্য ভয়ে এখানে উক্ত মতে অত্যাশ্রয় প্রতি বাক্যের ব্যাখ্যা ও বিশেষ বিচার সম্ভব নহে।

প্রকৃত কথা এই যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ অতি দুর্জ্ঞেয়। বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া এবং তাঁহাতে নানা বিরুদ্ধ ভাবের বর্ণন করিয়া তাঁহার সেই অতি দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রকাশের দ্বারা তাঁহার রূপা ব্যভীত যে, কোন রূপেই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের দর্শন হয় না—ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। কত সাধক যে, কত প্রকারে তাঁহার ধ্যানাদি করিয়া অবস্থা বিশেষে কত প্রকারে তাঁহার দর্শন করিয়াছেন, এবং অনেকে তখন সেই রূপেই তাঁহার স্তুতিও করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করা অসম্ভব। কত সাধক নিজের আচার্য্যের উপদেশানুসারে তাঁহাকে অদ্বিতীয় জ্ঞান স্বরূপ বলিয়াই ধ্যানাদি করায় সময়ে তাঁহাকে সেই জ্ঞান স্বরূপ দর্শন করিয়া সেই রূপেই তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে (১।৪) সনন্দনের সেই রূপ স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ নিজ আচার্য্যের উপদেশানুসারে কত সাধক তাঁহাকে নিত্য জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াও ধ্যানাদি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদী মাধবাচার্য্যও সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে “সর্বদর্শনসংগ্রহে”র প্রারম্ভে তাঁহাকে নমস্কার করিতে বলিয়াছেন—“নিত্য জ্ঞানাশ্রয়ং বন্দে নিঃশ্রেয়সনিধিঃ শিবং”।

বস্তুতঃ অনেকে ধ্যান যোগের দ্বারা, অনেকে সাংখ্য যোগের দ্বারা, অনেকে কর্ম যোগের দ্বারা, নিজের আত্মাতে সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার দর্শন করেন। কিন্তু অত্র অনেক নিম্নাধিকারী শাস্ত্রোক্ত সেই ধ্যান যোগাদি না জানিয়া অত্যাশ্রয় আচার্য্যগণের নিকটে যে কোনরূপে সেই পরমেশ্বরের ধ্যানাদির উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই রূপেই তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারাও সেই

উপদেশে দৃঢ়-শ্রদ্ধা ও সেই উপাস্তদেবে পরাভক্তির প্রভাবে কালে তাঁহার দর্শন পাইয়া জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ করেন। তাই তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

অত্রে ত্বেবমজানন্তুঃ শ্রদ্ধাত্রেভ্যুপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ” ॥ গীতা—১৩।২৬ ।

আর করুণাময় তিনিই হইয়াও বলিয়াছেন—“যে যথামাং প্রপত্ত্বন্তে তাংস্তুধৈব ভজাম্যহম্” । গীতা—১৮।১১ । সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক, তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় নিবেদন করিলে তিনি তখন অবশুই রূপা করিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করান। সাধক তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হন। তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার নিকটেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সুচিরকাল হইতেই নানা সাধক নানা পথে যাত্রা করিয়াছেন। কারণ মানবগণের রুচির বৈচিত্র্য বশতঃ সকল পথেই সকলের রুচিও অধিকার সম্ভব হয় না। তাই মানবগণের বিচিত্র রুচিও অধিকারানুসারে সেই মহেশ্বরের প্রাপ্তির জন্য তিনিই নানা শাস্ত্র দ্বারা নানা মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন বর্ষাকালে সরল ও বক্র নানা পথে ধাবমান সমস্ত জলই ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইয়া পরে সেই এক মহাসমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সাধকগণ নিজ নিজ বিচিত্র রুচি অনুসারে আচার্য্যের উপদেশে বেদাদি শাস্ত্রোক্ত ভিন্ন ভিন্ন মতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবলম্বন করিলেও কালে সেই পরমেশ্বরে পরাভক্তির প্রভাবে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় নিবেদন করিলে সকলেই তখন এক তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরম ভক্ত গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত তাঁহারই রূপায় ঐ মহা সত্যের উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মহিম্নঃ-স্তুত্রে তাঁহাকে ঐ কথাও বলিয়াছেন। আমরা ভক্তিহীন অনধিকারী হইলেও সেই পুষ্পদন্তের কথাই বলি, হে মহেশ্বর ?

“ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি

প্রভিন্বে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্য মিতি চ ।

রুচীনাং বৈচিত্র্যা, দৃজুকুটিল নানাপথজুমাং

নৃণামে কো গম্যন্তুমসি পয়সামর্গব ইব” ।

অষ্টম অধ্যায়

ন্যাসদর্শনে প্রমাণ পদার্থ

মহর্ষি গৌতম ত্রায় দর্শনে প্রথম সূত্র বলিয়াছেন—

“প্রমাণ—প্রমেয়—সংশয়—প্রয়োজন—দৃষ্টান্ত—সিদ্ধান্তাবয়ব—
তর্ক — নির্ণয়—বাদ — জল্প - বিতণ্ডা—হেতুভাস—ছল—জাতি—
নিগ্রহ স্থানানাং তত্ত্ব-জ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধিগমঃ” ॥

অর্থাৎ (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন (৫)
দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০)
বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেতুভাস, (১৪) ছল, (১৫)
জাতি ও (১৬) নিগ্রহস্থানের অর্থাৎ উক্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান
প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয় ।

এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, উক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ প্রকার পদার্থ ভিন্ন
জগতে আর কোন পদার্থই নাই, ইহা গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারা বিবক্ষিত
নহে । কণাদোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ ও তাঁহার সম্মত পদার্থ । ভাষ্যকার
বাংলায়নও তাহা বলিয়াছেন । পরে প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় সে কথা বলিব ।
উক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাফাৎ ও পরস্পরায়
মুক্তিলাভে আবশ্যক, —এই মাত্রই উক্ত সূত্রের দ্বারা গৌতম বলিয়াছেন এবং
সেই জন্তই তিনি পরে যথাক্রমে ত্রায়দর্শনের প্রতিপাদ্য ঐ সমস্ত পদার্থেরই
লক্ষণাদি বলিয়াছেন । তন্মধ্যে প্রথমোক্ত প্রমাণ পদার্থই সকল পদার্থের
ব্যবস্থাপক । কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থই সিদ্ধ হয়না । তাই গৌতম
সর্বপ্রথমে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়া উহার তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের
উদ্দেশ্যে প্রথমে উহার প্রকারভেদ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

“প্রত্যক্ষানুমানোপমান—শব্দাঃ প্রমাণানি” । ১।১।৩।

গৌতম উক্ত সূত্রে “প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই তাঁহার সম্মত প্রমাণের সামান্য
লক্ষণ ও স্থচনা করিয়াছেন (১) । কারণ, “প্রমীয়তে এভিঃ,” এইরূপ

ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্র পূর্বক “মা” ধাতুর উত্তর অনট প্রত্যয় সিদ্ধ “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা যে সমস্ত পদার্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের করণ, তাহাই প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়। প্র পূর্বক “মা” ধাতুর অর্থ “প্রমা” অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানরূপ প্রকৃষ্ট জ্ঞান। কিন্তু প্রমাণ জ্ঞান কোন পদার্থের অনুভূতি এবং তজ্জ্ঞান পরে তাহার যথার্থ স্থিতি এই দ্বিবিধ যথার্থ জ্ঞানের মধ্যে পূর্বজাত যথার্থ অনুভূতিই প্রমাণের লক্ষণে গ্রাহ্য। কারণ, স্থিতির করণ সেই পূর্বজাত অনুভূতির বাহ্য করণ, তাহাই সেই অরণীয় বিষয়ে প্রমাণ হওয়ায় স্থিতির করণ সেই সমস্ত অনুভূতিকে আর সেবিষয়ে প্রমাণ বলা অনাবশ্যক। যে পদার্থ পূর্বেই কোন প্রমাণের দ্বারা অধিগত হইয়াছে, সেই পদার্থের অরণ হইলে তখন সে বিষয়ে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ প্রস্তুত হয় না। সুতরাং গৌতমোক্ত ঐ “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা যথার্থ অনুভূতির করণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বাহ্য যে বিষয়ে যথার্থ অনুভূতির করণ বা সাধন, তাহাই সেবিষয়ে প্রমাণ। গৌতমের মতে সেই অনুভূতি চতুর্বিধ যথা—(১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমিতি, (৩) উপমিতি, ও (৪) শব্দ বোধ। সুতরাং তাঁহার মতে উক্ত চতুর্বিধ অনুভূতির করণ প্রমাণ ও যথাক্রমে (১) “প্রত্যক্ষ” (২) “অনুমান” (৩) উপমান ও (৪) “শব্দ” নামে চতুর্বিধ। তাই গৌতম বলিয়াছেন—

“প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি”। ১।১।৫॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এখন পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয়ের লক্ষণ বলা আবশ্যক। তাই গৌতম পরে তাঁহার প্রথমোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ প্রকাশের জন্ত বলিয়াছেন—

“ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিবর্ষণোৎপন্নং জ্ঞান মব্যপদেশ্য

মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং” ॥ ১।১।৪ ॥

জ্ঞান, রসনা, চক্ষু, শ্রোত্র, এবং মন, এই বড়িয়ারই উক্ত হৃদয়ে “ইন্দ্রিয়” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভিন্ন

১। “জ্ঞানমগ্নরী”কার জগন্ত ভট্ট ও গৌতমের উক্ত রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—

“একেনানেন হৃদয়ে দ্বয় কাহ মহায়নি।

প্রমাণানাং চতুঃ সংখ্যং তথা সামান্য লক্ষণং” ॥

ভিন্ন সমস্ত বিষয়ই “অর্থ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। সেই সমস্ত “অর্থ” অর্থ্যং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয় বিশেষের যে সন্নির্কর্ষ অর্থ্যং সম্বন্ধ বিশেষ, তাহাই “ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নির্কর্ষ”। সেই ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নির্কর্ষ জন্ত যে অব্যভিচারি জ্ঞান অর্থ্যং যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গৌতম উক্ত সূত্রের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া তদ্বারা সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের যাহা করণ, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা সূচনা করিয়াছেন। কারণ, যাহা পূর্বোক্ত প্রমাণের করণ, তাহাই প্রমাণ, ইহা পূর্বে “প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই স্থচিত হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণের মতে কার্য্যের যাহা চরম কারণ, তাহাই মুখ্য কারণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নির্কর্ষই পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের চরম কারণ বলিয়া উহাই মুখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এবং সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হান-বুদ্ধি, উপাদান-বুদ্ধি ও উপেক্ষা-বুদ্ধির চরম কারণ হওয়ায় উহাও প্রমাণ হইয়া থাকে। কারণ, কোন বিষয়ের যথার্থ প্রত্যক্ষের পরে সেই বিষয় ত্যাগ বলিয়া বুঝিলে ত্যাগ করে এবং উপাদেয় অর্থ্যং গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিলে গ্রহণ করে এবং উপেক্ষা বলিয়া বুঝিলে উপেক্ষা করে। যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করে তাহার নাম হান-বুদ্ধি, এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদান বা গ্রহণ করে তাহার নাম উপাদান-বুদ্ধি এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা করে তাহার নাম উপেক্ষা-বুদ্ধি। পূর্বোক্ত হানাদি-বুদ্ধিই প্রমাণের চরম ফল। সুতরাং উহার করণ যে প্রমাণ জ্ঞান, তাহাও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য। অনেকের মতে মহর্ষি গৌতম ঐ তাৎপর্য্যেই উক্ত সূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাকেই চরম প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রযোজক ইন্দ্রিয়কেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের চরম কারণ যে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নির্কর্ষ এবং তজ্জন্ত যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাহাই মুখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ পরে বিচারপূর্বক ইহাই বলিয়াছেন যে, যাহা কোন ব্যাপারের দ্বারা কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহাই কারণের মধ্যে “করণ”—নামক কারণ। কিন্তু যে কারণ কোন ব্যাপারকে অপেক্ষা

না করিয়াই কার্য উৎপন্ন করে, সেই নির্ক্যাপার চরম কারণ “করণ” নহে। সূত্রের বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষরূপ যে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিবন্ধ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করণ না হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়ই সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ, পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবন্ধ সেই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হওয়ায় তদ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ই সেই প্রত্যক্ষের করণ হইয়া থাকে। তাই “চক্ষুশা পশুতি”—“ব্রাহ্মণে জিহ্বতি” ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। ঐ সমস্ত প্রয়োগে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই দর্শনাদি প্রত্যক্ষের করণরূপে প্রযুক্ত হয়। কারণ যাহার ব্যাপারের অনন্তর ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বিবক্ষিত হয়, তাহাই করণ। “বাক্যপদীয়” গ্রন্থে শাস্ত্রিকশিরোমণি প্রাচীন ভট্টহরিও বলিয়াছেন—“ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তি র্ঘদ্যাপারাদনন্তরং। বিবক্ষ্যতে তদাত্ত্ব করণং তৎ প্রকীৰ্ত্তিতং”।

বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতির মতে গৌতমের পূর্বোক্ত সূত্রে “অব্যপদেশঃ” ও “ব্যবসায়াত্মকং”—এই দুই পদের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ, ইহাই স্থচিত হইয়াছে। “অব্যপদেশঃ” বলিতে নির্বিকল্পক এবং “ব্যবসায়াত্মক” বলিতে সন্নিবন্ধক। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ (১) নির্বিকল্পক ও (২) সন্নিবন্ধক। যে প্রত্যক্ষে কোন পদার্থ বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে বিষয় হয় না, তাহার নাম নির্বিকল্পক। “বিকল্প” শব্দের অর্থ বিশেষ্য বিশেষণ ভাব। সূত্রের যে প্রত্যক্ষে কোন পদার্থেরই বিশেষ্য বিশেষণ ভাব নাই এই অর্থে “নির্বিকল্পক” শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। যেমন ঘট পদার্থের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিবন্ধ জন্মিলে প্রথমে ঘট ও তদগত ঘটত্ব ধর্ম বিষয়ে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে। অর্থাৎ সেই প্রত্যক্ষে ঘটত্ব ধর্ম ঘটের বিশেষণরূপে বিষয় হয় না। কারণ উহা ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘট, ইত্যাকার প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু অবিশিষ্টভাবে ঘট ও ঘটত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষ। উক্তরূপ প্রথম জাত প্রত্যক্ষ “আলোচন” নামেও কথিত হইয়াছে। বালক ও মূক প্রভৃতির জ্ঞানের শ্রায় উক্তরূপ জ্ঞানকে কোন শব্দাদির দ্বারা—ব্যপদেশ বা প্রকাশ করা যায় না। তাই উক্তরূপ জ্ঞান “অব্যপদেশঃ” নামেও কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত স্থলে প্রথমে যে উক্তরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই জন্মে, ইহা স্বীকার্য। কারণ উক্ত স্থলে ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘট,—এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে পূর্বে ঘটত্বরূপ বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবশ্যক। কারণ বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত বিশিষ্ট

প্রত্যক্ষ জন্মিতেই পারে না। যে ব্যক্তি গৃহে ঘট দেখে নাই সে কখনই এই গৃহ ঘটবিশিষ্ট,—এইরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পূর্বে ঘট ধর্মের প্রত্যক্ষ না হইলেও ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘট—এইরূপ সবিবল্লক প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ায় তৎপূর্বে পূর্বোক্তরূপ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য। ঐ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন পদার্থ বিশেষ্য ও বিশেষণ না হওয়ায় উহার মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ ঐরূপ প্রত্যক্ষ জন্মিলেও কেহই উহা মনের দ্বারা বুঝিতে পারে না। তাই উহা অতীন্দ্রিয় বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পরেই ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘট ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার নাম সবিবল্লক প্রত্যক্ষ ও “ব্যবসায়িক” প্রত্যক্ষ। ঐ ব্যবসায়রূপ প্রত্যক্ষের পরে মনের দ্বারা উহার যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা ‘অনুব্যবসা’র নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপ অনুমিতি প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষও “অনুব্যবসায়” নামে কথিত হইয়াছে।

কোন মতে পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিবর্ষ জন্য প্রথমে যে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিবর্ষের ব্যাপার হওয়ায় তদ্বারা ঐ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিবর্ষই সবিবল্লক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। সুতরাং পূর্বোক্ত নব্য মতেও ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিবর্ষ সবিবল্লক প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায় উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায় ইহাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সন্নিবৃত্ত হইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাজনক ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। “প্রত্যক্ষ” শব্দের অন্তর্গত “অক্ষ” শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। “প্রতিগতং বিষয় সন্নিবৃত্ত মক্ষং” এইরূপ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ ঐ প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থই বুঝা যায় এবং অত্ররূপ ব্যুৎপত্তিতে “প্রঃক্ষ” শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ রূপ জ্ঞান এবং সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় এই অর্থদ্বয় ও বুঝা যায়। তাই “প্রত্যক্ষ” শব্দের উক্ত অর্থত্রয়েই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

এখন এখানে গৌতমোক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিবর্ষ কিরূপ, তাহা বলা আবশ্যক। তৎপূর্বে বলা আবশ্যক যে, কণাদ ও গৌতমের মতে বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষে অন্তঃকরণই বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গত হইয়া সেই বিষয়াকারে পরিণত হয় না—কারণ, তাঁহাদিগের মতে জীবের দেহস্থ মনই অন্তঃকরণ এবং উহা পরমাণুর

তায় অতিস্থল নিত্য দ্রব্য। ঐ মনের কোন পরিণাম বা বিকার হইতে পারে না। পরিণামী কোন নিত্য পদার্থ নাই। সুতরাং মনের বিষয়াকারে পরিণাম সম্ভবই নহে। কিন্তু বাহ্য দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষ হলে প্রথমে সেই প্রত্যক্ষের কর্তা জীবাশ্ম তাহার মনের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগ বিশিষ্ট হয় এবং পরে সেই মনই সেই প্রত্যক্ষজনক ইন্দ্রিয় বিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, পরে সেই ইন্দ্রিয় সেই গ্রাহ্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ মনের সহিত আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ এবং সেই ইন্দ্রিয় বিশেষের সহিত মনের সংযোগ এবং সেই গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধরূপ কোন সন্নিবন্ধ, জন্যপ্রত্যক্ষের কারণ। অবশ্য আরও অনেক কারণ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবন্ধকেই প্রধানকারণরূপে গ্রহণ করিয়া গৌতম পূর্বোক্ত স্বরে জ্ঞানপ্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—“ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিবন্ধোৎপন্নং জ্ঞানং”।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ ক্রিয়া ও জাতি প্রভৃতি পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব নহে (১) তাই গৌতম উক্ত বাক্যে “সংযোগ” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া “সন্নিবন্ধ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার দ্বারা সংযোগ সম্বন্ধের তায় অত্যাশ্রিত সম্বন্ধ বিশেষও গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের যেখানে যেরূপ সম্বন্ধ সেই প্রত্যক্ষের জনক হয়, তাহাই সেই স্থলে “ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবন্ধ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন আশাচাৰ্য্য উদ্যোতকর—লৌকিক প্রত্যক্ষের জনক উক্ত লৌকিক সন্নিবন্ধকে ষট্ প্রকার বলিয়াছেন : যথা—(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত সমবায় (৩) সংযুক্ত সমবেত সমবায় (৪) সমবায় (৫) সমবেত সমবায় (৬) বিশেষণ বিশেষ্য ভাব অর্থাৎ বিশেষণতা।

বহিঃসিদ্ধির মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই দ্রব্য বিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মে। সেই প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যবিশেষের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয় ও

মহর্ষি কণাদ গুণ পদার্থের মধ্যে সংযোগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং দ্রব্য পদার্থকেই গুণের আশ্রয় বলিয়াছেন এবং তৎপরে গুণ ও ক্রিয়াকে নিগুণ বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মতে গুণাদিপদার্থে সংযোগরূপ গুণ জন্মে না, দ্রব্য পদার্থেই অপর দ্রব্যের সংযোগরূপ গুণ জন্মে। বৈশেষিক দর্শন ১ম অঃ ১ম অঃ ষষ্ঠ, ১৫শ ১৬শ ১৭শ স্বত্র দ্রষ্টব্য।

স্বগিজ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধই স্বাক্রমে সেই দ্রব্যের চাক্ষুষ ও স্বাচ প্রত্যক্ষের কারণ ইঙ্গিতার্থ সন্নিবর্তন। কণাদ ও গৌতমের মতে চক্ষুরিঙ্গিত্য তৈজস পদার্থ। প্রদীপের ন্যায় উহার প্রভা বা রশ্মি আছে। সেই রশ্মি বহির্গত হইয়া সেই গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় তদ্বারা তাহার সহিত চক্ষুরিঙ্গিত্যের সংযোগ রূপ সন্নিবর্তন জন্মে। অত্যাশ্চর্য্য বহিরিঙ্গিত্য স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়াই তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সন্নিবর্তন হয়। পরে প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে গৌতমের কথা বলিব।

চক্ষুরিঙ্গিত্যের দ্বারা যেমন ঘটে প্রত্যক্ষ জন্মে, তদ্রূপ, সেই ঘটস্থ রূপ এবং সেই রূপস্থ রূপত্বাদি জাতির ও প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু সেই রূপাদির সহিত চক্ষুরিঙ্গিত্যের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় “সংযুক্ত সমবায়” নামক দ্বিতীয় প্রকার এবং “সংযুক্ত সমবেত সমবায়” নামক তৃতীয় প্রকার সন্নিবর্তন স্বীকৃত হইয়াছে। কণাদোক্ত “সমবায়” নামক সম্বন্ধ গৌতমেরও সম্মত। তাঁহা-দিগের মতে ঘটের রূপ সেই ঘটে সমবায় সংক্ষেপে বিদ্যমান থাকে এবং রূপস্থ নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতিও সেই রূপে সমবায় সম্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে। তাহাদিগের মতে ঘটের রূপ সেই ঘট হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং রূপত্বাদি জাতিও সেই রূপ হইতে ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং উক্ত মতে চক্ষুঃ সংযুক্ত ঘটের সহিত তাহার রূপের এবং সেই রূপের সহিত রূপত্বাদি জাতির তাদাত্ম্য সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় রূপের প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ সংযুক্ত তাদাত্ম্য এবং রূপত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ সংযুক্ত তাদাত্ম্য-বিশিষ্টের তাদাত্ম্যকে সন্নিবর্তন বলা যায় না। তাই ঞ্চায়বৈশেষিক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সম্মত উক্ত উভয় সন্নিবর্তন স্বীকার না করিয়া ঘটের রূপের প্রত্যক্ষে (২) “চক্ষুঃ সংযুক্ত সমবায়”কে ইঙ্গিতার্থ সন্নিবর্তন বলিয়াছেন এবং রূপত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে (৩) “চক্ষুঃ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়”কে ইঙ্গিতার্থ সন্নিবর্তন বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে চক্ষুঃ সংযুক্ত ঘটের সহিত তাহার রূপের সমবায় নামক সম্বন্ধ থাকায় সেই রূপের সহিত চক্ষুরিঙ্গিত্যের (২) “সংযুক্ত-সমবায়” নামক সন্নিবর্তন সম্ভব হয় এবং সেই রূপের সহিত রূপত্বাদি জাতির সমবায় সম্বন্ধ থাকায় সেই রূপত্বাদির সহিত চক্ষুরিঙ্গিত্যের (৩) “সংযুক্ত-সমবেত সমবায়” নামক সন্নিবর্তন সম্ভব হয়।

যে পদার্থে বাহ্য সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, সেই পদার্থে তাহাকে “সমবেত” বলা হয়। চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট ঘটে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান যে রূপ, তাহাতে রূপত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় সেই রূপত্বাদি জাতিতে—চক্ষুঃ সংযুক্ত ঘটে সমবেত সেই রূপের যে সমবায় সম্বন্ধ আছে, তাহাই ঐ স্থলে “সংযুক্ত সমবেত সমবায়” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। সংযুক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযোগ বিশিষ্ট দ্রব্য। বাহ্য সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান, তাহার সমবায় নামক সম্বন্ধই উক্ত “সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়” শব্দের অর্থ। এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ এবং তদগত গন্ধত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে এবং রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রস ও তদগত রসত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ ও তদগত স্পর্শত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে বথাক্রমে পূর্বোক্ত রূপ (২) “সংযুক্ত সমবায়” এবং (৪) “সংযুক্ত সমবেত সমবায়,” ইন্দ্রিয়াধ-সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে।

এইরূপ অন্তরীন্দ্রিয় মনের দ্বারা আমি স্মৃখী, আমি হৃংখী, আমি জানিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে জীবগণ নিজ নিজ আত্মাতে উৎপন্ন স্মৃখ, হৃংখ, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও দেহ নামক বিশেষ গুণের যে মানস প্রত্যক্ষ করে, তাহাতে মনঃ সংযুক্ত সমবায়ই ইন্দ্রিয়াধ-সন্নিকর্ষ। এবং তখন জীবের নিজ আত্মারও যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে সেই আত্মার সহিত তাহার সেই মনের বিলক্ষণ সংযোগই ইন্দ্রিয়াধ-সন্নিকর্ষ। এবং স্মৃখাদিগত স্মৃখত্ব, হৃংখত্ব প্রভৃতি জাতির যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে মনঃ সংযুক্ত সমবেত-সমবায়ই তৃতীয় প্রকার ইন্দ্রিয়াধ-সন্নিকর্ষ। মনঃ সংযুক্ত সেই আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে তাহার স্মৃখ হৃংখাদি গুণ বিদ্যমান হওয়ায় এবং তাহাতে স্মৃখত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় সেই সমস্ত জাতির সহিত মনের উক্তরূপ সন্নিকর্ষ (সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়) সম্ভব হয়।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষে সেই শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধই চতুর্থ প্রকার সন্নিকর্ষ এবং সেই শব্দগত শব্দত্ব, তীব্রত্ব, মন্দত্ব প্রভৃতি জাতির প্রত্যক্ষে তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের (৫) সমবেত-সমবায়ই পঞ্চম প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, কণাদ ও গৌতমের মতে আকাশ স্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন শব্দ সেই আকাশেরই বিশেষগুণ এবং তাহার সহিত সেই

শব্দের “সমবায়” নামক সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ আকাশে উৎপন্ন ও তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে বিद्यমান সেই শব্দেরই তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং সেই শব্দের সহিত তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ রূপ সন্নিবন্ধ ঘটে এবং সেই শব্দস্থ শব্দস্থ তীব্রত্ব ও মন্দত্ব প্রভৃতি জাতির সহিত “সমবেত—সমবায়”রূপ সন্নিবন্ধ ঘটে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিद्यমান যে শব্দ, তাহার সমবায় সম্বন্ধই উক্ত স্থলে “সমবেত সমবায়” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে।

এইরূপ প্রত্যক্ষ বিষয় পদার্থের সমবায় নামক সম্বন্ধেরও প্রত্যক্ষ হয় এবং অনেক অভাব পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়। তাই সমবায় সম্বন্ধ ও অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব অর্থাৎ বিশেষণতা নামক ষষ্ঠপ্রকার সন্নিবন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে (১)। ঐ বিশেষণতা অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ নহে, উহা বিশেষণ ও বিশেষ্য স্বরূপ। অর্থাৎ যে বিশেষণতা সম্বন্ধে কোন পদার্থে সমবায় সম্বন্ধ বিद्यমান থাকে, সেই বিশেষণতা সেই বিশেষণ-ভূত সমবায় সম্বন্ধ স্বরূপ, উহা হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সুতরাং স্বাতন্ত্র্য স্বরূপ সম্বন্ধেই সমবায় সম্বন্ধ বিद्यমান থাকায় সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধ ও তাহার সম্বন্ধ প্রভৃতির আপত্তিরূপ অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ কোন অভাব পদার্থ, যে কালে যে আধারে বিद्यমান থাকে, তৎকালীন সেই আধাররূপ বিশেষ্যই সেই অভাবের সম্বন্ধ। সেই আধার হইতে সেই অভাব ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু তৎকালীন সেই আধার—স্বরূপ সম্বন্ধেই তাহাতে সেই অভাব থাকে এবং প্রত্যক্ষের সমস্ত কারণ থাকিলে পূর্বোক্ত বিশেষণতা বা স্বরূপ সম্বন্ধবিশেষরূপ সন্নিবন্ধ জন্য তাহার প্রত্যক্ষ হয়। এই সমস্ত বিষয়

১। উক্ত সন্নিবন্ধের ব্যাখ্যায় “স্থায়বার্ত্তিকে” উদ্যোতকর বলিয়াছেন—“সমবায়োচ্চাভাষে বিশেষণ বিশেষ্য ভাবাদিতি”। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থ ও তাহার প্রত্যক্ষতা প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ও সম্মত বুঝা যায়। কিন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায় সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের মতে: সমবায় সম্বন্ধ অনুমেয়। বৈশেষিক দর্শনের “উপস্থারে” (৭২২৮) শব্দর মিশ্র বলিয়াছেন—“প্রত্যক্ষ: সমবায় ইতি নৈয়ায়িকা; তদপ্যমুপপন্নং, সমবায়োহতীন্দ্রিয়ঃ”— ইত্যাদি। বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আত্মকে কণাদ অভাব পদার্থ ও তাহার প্রত্যক্ষতা সমর্থন করিয়াছেন। স্থায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আত্মকে (৮৯১০১১১২) সহর্ষি গোতমও তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

ভালরূপ বুঝিতে হইলে “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী” প্রভৃতি মূলগ্রন্থ গুরু নিকটে পাঠ করা আবশ্যক। ঐ সমস্ত বিষয়ে বহু বক্তব্য ও বিচার্য আছে। সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না।

এখন অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ আলৌকিক সন্নিকর্ষও সংক্ষেপে বলিব। পূর্বোক্ত ষট্ প্রকার সন্নিকর্ষ লৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ। কিন্তু অলৌকিক প্রত্যক্ষও স্বীকার্য হওয়ায় তাহার কারণ অলৌকিক সন্নিকর্ষও স্বীকার্য। সেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ ত্রিবিধ, ইহা কথিত হইয়াছে। যথা (১) সামান্তলক্ষণ (২) জ্ঞানলক্ষণ ও (৩) যোগজ্ঞ। *

(১) সামান্ত ধর্ম্য বাহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ, এই অর্থে “সামান্য লক্ষণ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—সামান্ত-ধর্ম্য স্বরূপ। বহু পদার্থের বাহা সামান্য ধর্ম্য বা এক ধর্ম্য, তাহাই তাহার সামান্য ধর্ম্য। যেমন ঘট মাত্রের সামান্ত ধর্ম্য ঘটত্ব,—গো মাত্রের সামান্ত ধর্ম্য গোত্ব, মনুষ্য মাত্রের সামান্ত ধর্ম্য মনুষ্যত্ব ইত্যাদি। যে কে ন পদার্থে তাহার সামান্ত ধর্ম্যের প্রত্যক্ষ হইলে তখন সেই জায়মান সামান্ত ধর্ম্যই “সামান্তলক্ষণ” সন্নিকর্ষ। কোন স্থলে সামান্তধর্ম্যবিষয়ক প্রত্যক জ্ঞানই সামান্ত লক্ষণ সন্নিকর্ষ হয়। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা—কোন পদার্থে তাহার সামান্ত ধর্ম্যের প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সামান্ত ধর্ম্যের আশ্রয় সমস্ত পদার্থেরই প্রত্যক্ষ জন্মে।

যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন গোপদার্থে গোমাত্রের সামান্য ধর্ম্য গোত্বের প্রত্যক্ষ জন্মিলে তখন সমস্ত গো পদার্থেরই প্রত্যক্ষ জন্মে ইহাই স্বীকার্য। নচেৎ সেখানে কোন দ্রষ্টার গোমাত্রই শূঙ্গ-বিশিষ্ট কি না এইরূপ যে সংশয় জন্মে, তাহা জন্মিতে পারে না। কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সেই গো পদার্থে শূঙ্গ দর্শন হওয়ায় সেই গো পদার্থে তাহার শূঙ্গ বিষয়ক সংশয় সম্ভবই নহে। সুতরাং অত্যান্ত গো পদার্থকে বিষয় করিয়াই তাহার শূঙ্গ-সংশয় জন্মে, ইহাই স্বীকার্য। কিন্তু সেই সমস্ত গো পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাহাতে শূঙ্গের সংশয় হইতে পারে না। কারণ ধর্ম্যের প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাহাতে কোন ধর্ম্যের

* “অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষ ত্রিবিধঃ পরিকীর্্তিতঃ।

সামান্ত লক্ষণোজ্ঞান লক্ষণো যোগজ্ঞত্বা” ॥ তাৎপার্যিচ্ছেদ ॥

প্রত্যক্ষাত্মক সংশয় সম্ভবই হয় না। এইরূপ পাকশালায় ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধের নিশ্চয় করিলেও ধূম মাত্রই বহ্নির ব্যাপ্য কি না—এইরূপ সংশয় যে কাহারও জন্মে, তাহাতেও অত্যাশ্চর্য সমস্ত ধূমরূপ ধর্ম্মীর প্রত্যক্ষ আবশ্যক। নচেৎ সেই সমস্ত ধূমকে বিষয় করিয়া তাহাতে বহ্নির ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রত্যক্ষাত্মক সংশয় সম্ভবই হয় না। কিন্তু পূর্বেোক্ত উভয় স্থলে অত্যাশ্চর্য গো পদার্থ ও অত্যাশ্চর্য ধূম পদার্থের সহিত চক্ষুরিন্দিয়ের সংযোগরূপ লৌকিক সন্নিবন্ধ না হওয়ায় সেই সমস্ত গো পদার্থ ও ধূম পদার্থের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত উভয় স্থলে প্রথমে গোত্র ও ধূমত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষের পরেই সেই সামান্যধর্ম্মের আশ্রয় সমস্ত গো এবং সমস্ত ধূমেরই প্রত্যক্ষ জন্মে এবং অত্যাশ্চর্য গো পদার্থ ও অত্যাশ্চর্য ধূম পদার্থ বিষয়ে উহা অলৌকিক প্রত্যক্ষ, ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে সেই প্রত্যক্ষ বিষয় গোত্র ও ধূমত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মই সেই স্থলে সেই অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ অলৌকিক সন্নিবন্ধ, ইহাও স্বীকার্য। সেই গোত্ররূপ সন্নিবন্ধ গোমাত্রেই আছে এবং ধূমত্বরূপ সন্নিবন্ধও ধূম মাত্রেই আছে। “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”কার বিশ্বনাথ পরে সর্বত্র সামান্য ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিবন্ধ বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ উক্ত সামান্য লক্ষণ সন্নিবন্ধ এবং তজ্জন্ত উক্তরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে প্রথমে পাকশালায় ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষ করিয়া ধূমত্বরূপে ধূম সামান্যে বহ্নিত্বরূপে বহ্নি সামান্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। কারণ পর্কতাঙ্গি স্থানস্থ বহ্নি ও ধূমের প্রত্যক্ষ ব্যতীত সেই ধূমের সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভবই হয় না। তাহা না হইলেও পর্কতীয় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের অভাবে সেই ধূম দেখিয়া পর্কতে বহ্নির অনুমিতি হইতে পারে না। সুতরাং পাকশালায় ধূম বিশেষ ও বহ্নি বিশেষের দর্শন করিলে তখন সমস্ত ধূম ও সমস্ত বহ্নিরই যে প্রত্যক্ষ জন্মে এবং সেই প্রত্যক্ষ যে অত্যাশ্চর্য ধূম ও অত্যাশ্চর্য বহ্নি বিষয়ে এক প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ, এবং তাহাতে পূর্বেোক্তরূপ সামান্য ধর্ম্ম বা তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অলৌকিক সন্নিবন্ধরূপ কারণ, ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে প্রথমে ধূমত্বরূপে ধূম সামান্যে বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব হওয়ায় তাহার ফলে পরে পর্কতাঙ্গি

কোনস্থানে কোন ধুম বিশেষ দর্শন করিয়াও বহ্নিকরূপে বহ্নির অমুমিতি হইতে পারে। হতরাং অমুমানে প্রামাণ্যবাদী মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ হুত্রে “সন্নিকর্ষ” শব্দের দ্বারা যে, উক্তরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ ও সূচনা করিয়াছেন ইহাও বুঝা যায়। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রায়চার্যগণ বিশেষ বিচার পূর্বক উহা সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত “সামান্য লক্ষণ” সন্নিকর্ষই “সামান্য লক্ষণ প্রত্যাসত্তি” নামে তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ সন্নিকর্ষের অপর নাম প্রত্যাসত্তি। পরে দীপ্তিতীকার রঘুনাথ শিরোমণি স্বাধীন মতামুসারে উহা অস্বীকার করিলেও উহা যে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত প্রাচীনসিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই! *

জ্ঞান বিশেষ স্বরূপ যে, অলৌকিক সন্নিকর্ষ, তাহার নাম (২) জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ বা জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যাসত্তি। মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ হুত্রে “সন্নিকর্ষ” শব্দের দ্বারা উক্ত সন্নিকর্ষও যে তাঁহার সম্মত, ইহা সূচনা করিয়াছেন। কারণ, উক্ত হুত্রে তিনি “ব্যভিচারি” এই পদের প্রয়োগ করিয়া ব্যভিচারী

* অনেক বলেন যে, উক্ত “সামান্য লক্ষণ প্রত্যাসত্তি” পরবর্তী গঙ্গেশ উপাধ্যায়েরই উদ্ভাবিত। কিন্তু ইহা সত্য নহে। কারণ, গঙ্গেশের বহু পূর্ববর্তী টীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়মতের ব্যাখ্যায় উহা সমর্থন করিয়াছেন। উহা অস্বীকার করলে ধুমাদি হেতুতে সামান্যতঃ ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের আশা নষ্টকরক বিবাহ করাইয়া মুদ্ধা রমণীর পুত্র প্রার্থনার ন্যায় নিফল, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। তাই “ঋণন ঋণ ঋণ” গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাপ্তি প্রভৃতি পদার্থ ঋণন করিতে গঙ্গেশের পূর্ববর্তী শ্রীহর্ষও বাচস্পতিমিশ্রের এই কথা উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন—“ইন্দিয়ণ সামান্য লক্ষণা প্রত্যাসত্ত্যা ব্যাপ্তি গ্রহণ কালে সর্কাস্তজ্জাতীয় ব্যতয়ো গৃহন্তে, বদনভাগমে বণ্ডক মুদাহ মুদাহা পুত্র প্রার্থনমিবেতি বাচস্পতি রূপালস্তমবাদীদিতি চেৎ?” শ্রীহর্ষ সেখানে উহা ঋণন করিতে বলিয়াছেন যে, সামান্য লক্ষণ প্রত্যাসত্তি স্বীকার করিলে তোমার কোন পদার্থে সমস্ত পদার্থের সামান্য ধর্ম প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি কোন ধর্মের প্রত্যক্ষ চিত্র সমস্ত পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় তোমাকেও সর্বজ্ঞ বলা যায়। এতদন্তরে বক্তব্য এই যে, সমস্ত পদার্থেরই প্রত্যেকের বিশেষধর্মরূপে বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত কাহাকেও সর্বজ্ঞ বলা যায় না। উক্তরূপ বিশেষ জ্ঞানই সর্বজ্ঞতা। তাই “সঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উক্ত বিশেষ জ্ঞান বোধের জন্যই আবার বলা হইয়াছে—“সর্ববিৎ”-। “সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে” বিশ্বনাথও উক্ত আশ্রিত্যের উল্লেখ পূর্বক ঋণন করিতে লিখিয়াছেন— “প্রমেয়ভেদ সকল প্রমেয়ে জ্ঞাতোহপি বিশিষ্য সকল পদার্থ না মজ্জাতাত্ত্বেন সার্কজ্যা ভাবাৎ”।

প্রত্যক্ষ (১) অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কারণ যে, প্রত্যক্ষ ভ্রমণ নহে—
ইহাই প্রকাশ করায় তাহার মতে ভ্রমাত্মক বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ ও যে, ইন্দ্রিয়ার্থ
সম্বন্ধে জ্ঞান, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, তাহা না হইলে সেই ভ্রমাত্মক
বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ বারণের জন্য উক্ত সূত্রে “অব্যভিচারি”—এই পদ প্রয়োগ
অনাবশ্যক হয়। কিন্তু সেই ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ হলে সেই স্থানে সেই বিষয়ের
সত্তা না থাকায় তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন লৌকিক সম্বন্ধ সম্ভব হয় না।
যেমন কেহ কোন স্থানে রজ্জুকে সর্প বলিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলে তখন
সেখানে বস্তুতঃ সেই সর্পরূপ বিষয় না থাকায় তাহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের
সংযোগ সম্বন্ধ ঘটে না, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির
স্থানান্তরে পূর্বদৃষ্ট সর্পের স্মরণরূপ জ্ঞানই তাহার উক্তরূপ প্রত্যক্ষের কারণ
অলৌকিক সম্বন্ধ, ইহা স্বীকার্য্য।

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি কখনও অস্ত্র সর্প দেখে নাই, সর্পত্ব ধর্ম্ম বাহার
প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তদ্বিশয়ে বাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংস্কার নাই, সেই ব্যক্তির
রজ্জুতে সর্প বা সর্পত্বের ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্ত্র সর্প
দেখিয়াছে, তাহার কোন সময়ে ইদৃশরূপে দৃষ্ট রজ্জুতে পূর্বদৃষ্ট সেই সর্পের
সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান তদ্বিশয়ক পূর্বজ্ঞাত সংস্কার উদ্ভূত হইয়া তখন সর্পত্বরূপে

১। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন গৌতমোক্ত এই “অব্যভিচারি” পদের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন—
“বদ তস্মিৎ স্তুতিতি তদব্যভিচারি।—বতু তস্মিৎস্তুতিতি তদব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিতি”। যে পদার্থ
বাহ্য নহে সেই পদার্থকে তাহা বলিয়া যে জ্ঞান অর্থাৎ অস্ত্র পদার্থের অস্ত্র প্রকারে যে ধ্যান বা জ্ঞান,
তাহাই ভ্রম জ্ঞান, ইহা বাৎস্তায়নের উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়। যেমন রজ্জুকে “অয়ং সর্পঃ”—
এইরূপে প্রত্যক্ষ করিলে অস্ত্র পদার্থের অস্ত্র প্রকারেই ধ্যান বা জ্ঞান হয়। তাই শ্রায় বৈশেষিক
সম্প্রদায় ভ্রম জ্ঞানকে “অস্ত্রাধা ধ্যান” নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং অনেকে “বিপর্য্যাত ধ্যান” নামেও
উল্লেখ করিয়াছেন। কণাদ ও গৌতম প্রভৃতি “বৈবর্তবাদ” গ্রহণ না করায় তাহার ভ্রম বা অধ্যাস
স্থলে মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয় বিষয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া “অনির্ব্বচনীয় ধ্যান” স্বীকার করেন নাই।
শ্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তা আচার্য্যগণ বিশেষ বিচার পূর্বক পূর্বোক্ত অস্ত্রাধা ধ্যানবাদেরই
সমর্থন করিয়াছেন। যোগদর্শনেও “বিপর্য্যাত” নামক চিত্ত বৃত্তিও অস্ত্রাধা ধ্যান, ইহা যোগব্যক্তিক
(১৮) বিজ্ঞান ভিক্ষু ও স্পষ্ট বলিয়াছেন। মীমাংসাত্মক ভট্ট কুমারিলও অস্ত্রাধা ধ্যান বা ধ্যান
সুপ্রাচীনকাল হইতে ইহা নানারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শারীরক ভাষ্যরসে অধ্যাসের ব্যাখ্যায় আচার্য্য
শঙ্কর প্রথমে উক্ত মতের উল্লেখ করিতে উক্ত মত অস্ত্র পদার্থে অস্ত্র ধর্ম্মেরই অধ্যাস হয়, ইহা বলিয়াছেন

সেই সর্পের স্বরূপ জ্ঞান। সেই স্বরূপ জ্ঞানের পরেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার -“অয়ং সর্পঃ”—এইরূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং উক্ত স্থলে সর্পস্বরূপে স্থানান্তরস্থ সর্পের যে স্বরূপাত্মক জ্ঞান, অবশ্য জন্মে, তাহাতে সেই ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রযোজক হওয়ায় সেই সর্পরূপ বিষয়ের সহিত তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উক্ত জ্ঞানরূপ সন্নিবন্ধ বলা যায়। কারণ, তখন তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রযুক্ত সেই স্বরূপাত্মক জ্ঞানের বিষয়—স্থানান্তরস্থ সর্পে থাকে। এইরূপ আরও অনেক স্থলে অতরূপেও উক্ত জ্ঞান লক্ষণ সন্নিবন্ধ জ্ঞাত বিষয় বিশেষের যথার্থ প্রত্যক্ষও জন্মে এবং তাহা স্বীকার্য।

কিন্তু অনুমিত্যাদি বিশিষ্ট জ্ঞানের পূর্বে উহার কারণ যে বিশেষণ পদার্থের জ্ঞান জন্মে, তাহা উক্তরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষের জনক জ্ঞান লক্ষণ সন্নিবন্ধ নহে। কারণ, সেই সমস্ত বিশেষণ জ্ঞানের পরে প্রত্যক্ষ জন্মে না। সুতরাং তাহাতে প্রত্যক্ষ জনক সন্নিবন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জনক কোন প্রকার লৌকিক সন্নিবন্ধ না থাকিলেও কোন বিশেষণ জ্ঞানের পরেই তাহার প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ, সেই স্থলে সেই বিশেষণ পদার্থ জ্ঞানই কেবল সেই বিষয়ে অলৌকিক প্রত্যক্ষের জনক দ্বিতীয় প্রকার অলৌকিক সন্নিবন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উহারই নাম জ্ঞান লক্ষণ সন্নিবন্ধ। সুতরাং জ্ঞান লক্ষণ সন্নিবন্ধ স্বীকার করিলে যে অনুমিত্যাদি জ্ঞানও ঐ সন্নিবন্ধ জ্ঞাত প্রত্যক্ষই হইবে অর্থাৎ অনুমিত্যাদি বিজাতীয় জ্ঞানের উচ্ছেদ হইবে, ইহা বলা যায় না। কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় তাহা বলিলেও নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায় জ্ঞান লক্ষণ সন্নিবন্ধের যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে উক্তরূপ আপত্তি হইতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের বহু সূক্ষ্ম বিচার আছে।

যোগীদিগের যোগজ সন্নিবন্ধ বিশেষই তৃতীয় প্রকার অলৌকিক সন্নিবন্ধ। যোগিগণ যোগ শক্তির প্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ এবং ঐরূপ অপ্রত্যক্ষ সমস্ত বিষয়েই যোগজ সন্নিবন্ধ জ্ঞাত অলৌকিক প্রত্যক্ষ করেন। যোগজ সন্নিবন্ধ অন্য যোগীর সর্বজ্ঞস্থ যোগ শাস্ত্র ও অগ্রশাস্ত্রেও কীর্তিত হইয়াছে। সমাধি বিশেষরূপ নিদ্রাধ্যাসনের ফলে যোগজ সন্নিবন্ধ লাভ করিয়া সুমুগ্ধ যোগী নিজের আত্মা ও পরমাত্মার অলৌকিক প্রত্যক্ষ করেন এবং অন্যান্য জাতব্য সমস্ত তত্ত্বের প্রত্যক্ষ করেন। মহর্ষি গৌতম ও পরে

“সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ” (৪২।৩৮) এই হৃত্রের দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া যোগীর অলৌকিক প্রত্যক্ষ জনক যোগজ সন্নিকর্ষও হুচনা করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে মহর্ষি কণাদ যোগীদিগের প্রত্যক্ষ বলিতে যুক্ত ও বিযুক্ত এই দ্বিবিধ যোগীর উল্লেখ করিয়াছেন। হুতরাং যোগজ সন্নিকর্ষ দ্বিবিধ, ইহাও উহার দ্বারা হুচিত হইয়াছে। “ভাষা পরিচ্ছেদে” বিশ্বনাথ সরলভাবে সংক্ষেপে বলিয়াছেন—“যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্ত যুজ্ঞানভেদতঃ। যুক্তশ্চ সর্বদাভানং চিন্তাসহকৃতোহপরঃ”। যিনি যুক্ত যোগী, তাহার সর্বদাই সকল বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। আর যিনি যুজ্ঞান যোগী, অর্থাৎ বিযুক্ত যোগী, তিনি চিন্তা অর্থাৎ সেই বিষয়ের ধ্যান করিলে সেই ধ্যানের সাহায্যে যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা সেই বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ করেন। কণাদোক্ত দ্বিবিধ যোগীর ক্রমে সেই সমস্ত বিষয়ের সহিত যোগজ সন্নিকর্ষ ও তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা যোগীর প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যায় প্রাচীন বৈশেষিকাচাৰ্য্য প্রশস্তপাদ বর্ণনা করিয়াছেন। ফলকথা যোগজ সন্নিকর্ষ জন্ত যে সর্ব বিষয়েরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে, ইহা মহাযোগী কণাদ স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন।

নিত্য সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিত্য, হুতরাং উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ জন্ত নহে। তাই মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ হৃত্রে ঈশ্বর প্রত্যক্ষকে লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের সর্বদা সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ প্রমা জ্ঞানের আশ্রয়—এই অর্থে তিনি শাস্ত্রে “প্রমাণ” নামে কথিত হইয়াছেন। বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত হৃত্রের শেষে “আপ্ত প্রামাণ্যাতঃ” এই বাক্যে গৌতমও আপ্ত পুরুষের প্রমাতৃস্বরূপ প্রামাণ্যই বলিয়াছেন। পরে তাহা বলি। এখন অনুমান প্রমাণের স্বরূপাদি বলিতে হইবে।

অনুমান প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিরূপণের অনন্তরই প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণের নিরূপণ সংগত। মহর্ষি গৌতম “অথ” শব্দের দ্বারা সেই সংগতি হুচনা করিয়া অনুমান প্রমাণের স্বরূপ ও প্রকার ভেদ বলিতে পঞ্চম হৃত্র বলিয়াছেন—

“অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানঃ—

পূর্ববচ্ছেদবৎ সামাশ্রিতোদৃষ্টকঃ”।১।১।৫৫

উক্ত হৃত্রে “তৎপূর্বকঃ”—এই পদে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্ব হৃত্রোক্ত প্রত্যক্ষই স্বত্কার গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্বহৃত্র হইতে “জ্ঞানঃ” এই পদের অনুবৃত্তি তাহার অভিপ্রেত। তাহা হইলে “তৎ পূর্বকং জ্ঞান মনুমানঃ”—এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ পূর্বক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষ জনিত যে যথার্থ জ্ঞান, তাহাই অনুমান প্রমাণ। “অনু” শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। সুতরাং প্রত্যক্ষ বিশেষের পশ্চাৎ তজ্জনিত যে যথার্থ জ্ঞান—অনুমিতির করণ, তাহাকে ঐ অর্থে অনুমান প্রমাণ বলা হইয়াছে (১)।

যে কোন প্রত্যক্ষ জনিত যে কোন জ্ঞানকে অনুমিতি বা অনুমান প্রমাণ বলা যায় না। সুতরাং গৌতম উক্ত হৃত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা কোন প্রত্যক্ষ বিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “তৎ পূর্বকং”—এই পদের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গের প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত এবং সেই সম্বন্ধবিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ দ্বারা সেই লিঙ্গের স্বরূপ জ্ঞান অভিপ্রেত। অনুমানের হেতু পদার্থকে লিঙ্গ বলে এবং তদ্বারা অনুমেয় পদার্থকে লিঙ্গী বলে। যে পদার্থের সমস্ত আধারে অথ যে পদার্থ অবশ্যই থাকে, সেই পদার্থকে সেই অথ পদার্থের ব্যাপ্য পদার্থ বলে এবং সেই অথ পদার্থটিকে তাহার ব্যাপক পদার্থ বলে। ব্যাপ্য পদার্থ থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক পদার্থ অবশ্যই থাকে। সুতরাং ব্যাপ্য পদার্থের দ্বারতাহার ব্যাপক পদার্থের অনুমিতি হওয়ার ব্যাপ্য পদার্থই

১। অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা কোন হেতুতে কোন ধর্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেও সেই হেতুর দ্বারা সেই ধর্মের অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং অনুমান প্রমাণ মাত্রই যে প্রত্যক্ষপূর্বক, ইহা বলা যায় না। তাই “শ্রায় বার্তিকে” উদ্যোতকর—গৌতমের উক্ত হৃত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত সমস্ত প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়া “তানি পূর্বাণি যন্ত” এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে প্রথমে “তৎপূর্বক” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষাদি যে কোন প্রমাণ পূর্বক। কিন্তু পরে তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্ত অনুমানেরই মূলে প্রত্যক্ষবিশেষ অবশ্যই থাকে। সুতরাং পরম্পরায় সমস্ত অনুমানই প্রত্যক্ষপূর্বক হওয়ার গৌতম তাহাই বলিয়াছেন। তবে ঐ “তৎ” শব্দের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ এই প্রত্যক্ষের গ্রহণ করিলে “তে বে প্রত্যক্ষ পূর্বক যন্ত” এইরূপ বিগ্রহ বাক্যানুসারে “তৎপূর্বক” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—উক্ত প্রত্যক্ষের পূর্বক। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও উহাই বুঝা যায়।

সেখানে লিঙ্গ বা হেতু হয় এবং তাহার ব্যাপক সেই পদার্থটাই সেখানে লিঙ্গী হয়।

যেমন বহিঃ শূত্র স্থানে ধূমের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেখানে তাহার কারণ বহিঃ অবশ্যই থাকে। সুতরাং ধূম বহির ব্যাপ্য পদার্থ এবং বহিঃ তাহার ব্যাপক পদার্থ। তাই ধূমের দ্বারা বহির অনুমিতি হয় এবং তাহাতে ধূম লিঙ্গ ও বহিঃ লিঙ্গী হয়। ভাষ্যকার লিঙ্গ ও ঙ্গীর সম্বন্ধ বলিয়া ঐ উভয়ের সেই ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব সম্বন্ধই বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কারণ পূর্বোক্ত স্থলে ধূমে বহির ব্যাপ্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ ব্যতীত ধূমের দ্বারা বহির অনুমিতি হইতে পারে না। প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূম ও বহির দর্শন এবং বহিঃ শূত্র স্থানে ধূমের অদর্শন জ্ঞাত ধূমে বহির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ ভ্রমে। পরে পরীক্ষা ক্রমে কোনস্থানে ধূম দেখিলে তখন তাহার সেই পূর্বজাত ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ জ্ঞাত সংস্কার উদ্ধৃত হইয়া ধূম বহিঃ ব্যাপ্য, এইরূপ স্মৃতি উৎপন্ন করে। সেই ব্যাপ্তি-স্মরণের পরেই বহির ব্যাপ্য ধূম বিশিষ্ট পরীক্ষিত,—অর্থাৎ বহির ব্যাপ্য বা বহিঃ শূত্র স্থানে থাকে না—যে ধূম, তাহা পরীক্ষিত আছে—এইরূপে পরীক্ষিত পুনরীক্ষার সেই ধূমের প্রত্যক্ষ ভ্রমে। উহাই তৃতীয় লিঙ্গ দর্শন। কারণ পাকশালাদি কোনস্থানে প্রথম ধূম দর্শনের পরে পরীক্ষিত যে প্রথম ধূম দর্শন, তাহা দ্বিতীয় ধূম দর্শন। উহার পরে ধূমে বহির ব্যাপ্তি স্মরণের অনন্তর সেখানে বহির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমের যে পুনর্দর্শন, উহা তৃতীয় লিঙ্গ দর্শন। তাই উহা “তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শ” নামে কথিত হইয়াছে এবং উহা “লিঙ্গপরামর্শ” ও কেবল “পরামর্শ” নামেও কথিত হইয়াছে।

যে পদার্থের কোন পদার্থে অনুমিতি জন্মে, সেই পদার্থ অনুমানের আশ্রয়, ধর্মী, এবং পক্ষ নামেও কথিত হইয়াছে। সাধ্যধর্ম অর্থাৎ অনুমের পদার্থের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে পদার্থ সেই অনুমানে লিঙ্গ বা হেতু হয়—সেই হেতু পদার্থ অনুমানের আশ্রয় বা পক্ষে আছে, এইরূপ নিশ্চয় জন্মিলেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত লিঙ্গপরামর্শ নামক জ্ঞান জন্মিলেই পরক্ষণে সেই আশ্রয়ে সেই সাধ্যধর্মের অনুমিতি জন্মে। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে ‘বহিঃ ব্যাপ্য ধূমবান্ পরীক্ষিতঃ’—এইরূপ জ্ঞানের পরক্ষণেই ‘পরীক্ষিতো বহিঃমান্’—এইরূপে পরীক্ষিত বহির অনুমিতি জন্মে। ভাষ্যকার পরে আবার লিঙ্গ দর্শন ও লিঙ্গ স্মরণের উল্লেখ করিয়া উক্ত

লিঙ্গপরামর্শেরও সূচনা করিয়াছেন। এবং হেতু পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিক প্রত্যক্ষ স্থল গ্রহণ করিয়াই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ-মূলক যে কোন প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থে কোন পদার্থের ব্যাপ্তি নিশ্চয় জন্মিলেও এবং পরে কোনস্থানে সেই পদার্থে সেই পূর্বানুভূত ব্যাপ্তির স্মরণ হইলেও—সেই ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সেই পদার্থ যে স্থানে আছে, ইহা যদি নিশ্চিত হয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত “লিঙ্গপরামর্শ” নামক যে কোনরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে সেইস্থানেও পরক্ষণেই তজ্জন্ত সেই লিঙ্গী বা ব্যাপ্তক পদার্থের অনুমিতি জন্মে। সুতরাং লিঙ্গ পরামর্শরূপ জ্ঞান জন্ম যে পরোক্ষ অনুভূতি, তাহাই অনুমিতি এবং সেই যথার্থ অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ, ইহাই উক্ত সূত্রের তাৎপর্যার্থ বুঝিতে হইবে।

“তত্ত্ব-চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্তরূপেই অনুমিতি ও অনুমান প্রমাণের লক্ষণ বলিয়া প্রথমে প্রাচীন মতানুসারে লিঙ্গ পরামর্শকেই ঐ অনুমিতির করণ বলিলেও পরে “পরামর্শ” গ্রন্থে নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত লিঙ্গ পরামর্শের জনক পূর্বোৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ, সুতরাং উহাই অনুমান প্রমাণ। কারণ, যাহা কোন ব্যাপার দ্বারা কার্যের জনক হয়, তাহাই করণ। সুতরাং উক্ত লিঙ্গ পরামর্শই উহার পূর্বোৎপন্ন ব্যাপ্তি জ্ঞানের বাপার হওয়ায় তদ্বারা সেই ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমিতির করণ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত লিঙ্গ পরামর্শরূপ চরম কারণ অনুমিতির করণ হইতে পারেনা।

অবশ্য প্রাচীন স্ত্রীয়াচার্য্য উদ্যোতকরও উক্ত মতান্তরের উল্লেখ করায় উহাও প্রাচীন মতবিশেষ। কিন্তু উদ্যোতকর ব্যাপ্তি জ্ঞানকেও অনুমান প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করিলেও তাঁহার মতে অনুমিতির চরম কারণ উক্ত লিঙ্গ পরামর্শই অনুমিতির মুখ্য করণ বলিয়া উহাই মুখ্য অনুমান প্রমাণ। প্রাচীন মতে যে চরম কারণই মুখ্য করণ এবং প্রমাণের চরমফল হান বুদ্ধি উপাদান বুদ্ধি এবং উপেক্ষা বুদ্ধির পক্ষে প্রমাণ জন্ম প্রমিতিও যে প্রমাণ হয়—ইহা পূর্বে বলিয়াছি। তাই উদ্যোতকর অনুমান প্রমাণ জন্ম অনুমিতিকেও অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন। অনুমিতির করণ বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে। *

* উদয়নাচার্য্যের মতে অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শের বিষয় লিঙ্গ বা হেতুই অনুমিতির করণ, ইহাই প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু ফলতঃ তিনিও লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ

গৌতম পূর্বোক্ত সূত্রে—অনুমান প্রমাণকে (১) পূর্ববৎ (২) শেষবৎ (৩) সামান্যতোদৃষ্ট—এই নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। “পূর্ব” শব্দের উত্তর তুল্যার্থে “বতি” প্রত্যয়নিপ্পন্ন “পূর্ববৎ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—পূর্বতুল্য। অর্থাৎ পূর্বে কোন স্থানে যে পদার্থকে ব্যাপ্য এবং যে পদার্থকে তাহার ব্যাপক বলিয়া প্রত্যক্ষ করা হয় অর্থাৎ যে পদার্থে যাহার ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়, তজ্জাতীয় সেই ব্যাপ্য পদার্থ অত্র প্রত্যক্ষ করিয়া সেখানে তজ্জাতীয় সেই ব্যাপক পদার্থের অনুমিতি হইলে সেখানে সেই অনুমান প্রমাণের নাম “পূর্ববৎ”। যেমন পূর্বে পাকশালায় যে ধূম ও বহ্নির দর্শন করিয়া ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়, পরে তজ্জাতীয় ধূম দর্শন করিয়াই তজ্জাতীয় বহ্নিরই অনুমিতি জন্মে। সূত্রাং এক্ষণে স্থলীয় অনুমান প্রমাণ “পূর্ববৎ”।*

যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে বলে “শেষ” পদার্থ। যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা সেই শেষ পদার্থ বিষয়ক অনুমিতি জন্মে, তাহার নাম (২) “শেষবৎ” অনুমান। ভাষ্যকার কণাদের সূত্রানুসারে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, শব্দ যখন দ্রব্য পদার্থ ও কৰ্ম পদার্থ নহে এবং অনিত্য, তখন

বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাই “তাক্কিরক্ষা” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক বরদরাজ লিখিয়াছেন—
“লিঙ্গ পরামর্শেহানুমানমিত্যাখ্যাঃ”। পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িক অন্ন ভট্ট ও “তর্ক সংগ্রহে” প্রাচীন মতানুসারে লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “পরামর্শ” গ্রন্থের দীর্ঘিতি টীকায় নিজমতে পরে মনকেই অনুমিতির করণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। এবং তাহা হইলেও অনুমিতি যে মানস প্রত্যক্ষ হইতে বিজাতীয় অনুভূতি হইতে পারে, ইহাও তিনি সেখানে সমর্থন করিয়াছেন।

* কারণ ও কার্যের মধ্যে কারণটি পূর্ব এবং কার্যটি শেষ বা উত্তর। তাই কারণ তর্থে “পূর্ব” শব্দ এবং কার্য অর্থে “শেষ” শব্দের ও প্রয়োগ হইয়াছে। তাহা হইলে যে অনুমানে “পূর্ব” অর্থাৎ কারণ হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে “পূর্ববৎ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় কারণহেতুক কার্যের অনুমান। এবং উক্তরূপ অর্থে “শেষবৎ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, কার্য হেতুক কারণের অনুমান। অর্থাৎ কারণের দ্বারা কার্যের অনুমিতি হইলে সেই অনুমিতির করণ “পূর্ববৎ” এবং কার্যের দ্বারা কারণের অনুমিতি হইলে সেই অনুমিতির করণ “শেষবৎ”। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও প্রথমে উক্তরূপ ব্যাখ্যা ও উৎসাহ প্রকাশ করায় উহা প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা না হইলেও প্রাচীন ব্যাখ্যা সন্দেহ নাই।

শব্দ গুণ পদার্থ, ইহা “শেষবৎ” অল্পমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক ষট্ পদার্থের মধ্যে শব্দ যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নহে, ইহা নিশ্চিতই আছে। কারণ,—কণাদের মতে ঐ পদার্থত্রয় নিত্য, কিন্তু শব্দ অনিত্য। সুতরাং শব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্বেরই প্রসক্তি হয়। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য দ্রব্য বিশেষ অথবা অনিত্য গুণ বিশেষ অথবা কর্ম অর্থাৎ কোন ক্রিয়াবিশেষ হইতে পারে। সুতরাং প্রথমে শব্দ কি দ্রব্য, অথবা গুণ, অথবা কর্ম? এইরূপ সংশয় জন্মে। কিন্তু পরে “শব্দো ন দ্রব্যমেক দ্রব্যসমবেতত্বাৎ”—এইরূপে অল্পমান প্রমাণ দ্বারা শব্দ যে দ্রব্য পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত হয়। কারণ, অনিত্য দ্রব্যগুলি সাবায়ব এবং তাহা একাধিক অবয়বরূপ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শব্দ একমাত্র আকাশ নামক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, ইহাই কণাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং উক্তরূপ অল্পমান প্রমাণের দ্বারা শব্দে দ্রব্যত্বের অভাব নিশ্চিত হয়।

এবং পরে “শব্দো ন কর্ম সজাতীয়োৎপাদকত্বাৎ”—এইরূপে অল্পমান প্রমাণের দ্বারা শব্দে কর্মত্বের অভাব ও নিশ্চিত হয়। কারণ, শব্দ উৎপন্ন হইলে উহা তাহার সজাতীয় অন্তর্গত উৎপন্ন করে। কিন্তু কর্ম বা কোন ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে সেই ক্রিয়া উহার সজাতীয় অপর ক্রিয়া উৎপন্ন করে না। সেখানে ক্রিয়ার অত্র কারণই অপর ক্রিয়া উৎপন্ন করে। সুতরাং শব্দে প্রসক্ত দ্রব্যত্ব গুণত্ব ও কর্মত্বের মধ্যে দ্রব্যত্ব ও কর্মত্বের প্রতিষেধ বা অভাব নিশ্চয় হইলে গুণত্বই শেষ থাকে। অতএব পরিশেষে শব্দ গুণ, ইহাই অল্পমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। সেই অল্পমান প্রমাণ “শেষবৎ”। ঐ অল্পমিতির কারণ যে অল্পমান প্রমাণ, তাহাতে সাধকত্ব সম্বন্ধে গুণত্বরূপ শেষ পদার্থ বিদ্যমান থাকায় ঐ অর্থে উহাকে “শেষবৎ” অল্পমান বলা যায়। ঐ “শেষবৎ” অল্পমানকেই বলে,— “পরিশেষাল্পমান”। কিন্তু তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারোক্ত ঐ “শেষবৎ” বা পরিশেষাল্পমানের উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই। * তিনি

* বাচস্পতিমিশ্র—“সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী”তে “শেষবৎ” অল্পমানের ব্যাখ্যা করিতে ভাট্টাকার বাচস্পতির সমর্থ ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেখানে অল্পমান প্রমাণকে প্রথমে “বীত” ও “অবীত” নামে দ্বিবিধ বলিয়া গোচরোক্ত “শেষবৎ” অল্পমানকেই বলিয়াছেন—“অবীত” এবং ব্যতিরেক মুখে প্রবর্তমান নিষেধক অল্পমান বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়া পরে উহা “ব্যতিরেকী” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। গোচরোক্ত “পূর্ববৎ” ও “সামান্যতোদৃষ্ট” অল্পমানকেই তিনি বলিয়াছেন—“বীত”।

শেষবৎ অনুমানকে “ব্যতিরেকী” অনুমানের নামান্তর বলিয়া উহার অন্ত উদাহরণ বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

তৃতীয় প্রকার অনুমানের নাম “সামান্ততো দৃষ্ট”। ইহা “পূর্ববৎ” অনুমানের বিপরীত। কারণ, “পূর্ববৎ” অনুমানস্থলে পূর্বে কোন স্থানে হেতুও সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন পাকশালাদি কোনস্থানে ধূম ও বহি—প্রত্যক্ষ করিলে সামান্ততঃ ধূম যে, বহির ব্যাপ্য, ইহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। কিন্তু “সামান্ততোদৃষ্ট” অনুমান স্থলে তাহা হয় না। কিন্তু অত্র কোন পদার্থে কোন ধর্মের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ করিয়া তত্ত্বল্য কোন পদার্থে সেই ধর্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায় সেই ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর দ্বারা সেখানে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি জন্মে। ভাষ্যকার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা আত্মার অনুমানকে ইহার উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য এই যে, যাহাতে ইচ্ছাদি গুণ আছে তাহা আত্মা, এইরূপে পূর্বে কোন স্থানে ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভবই নহে। কিন্তু যাহা যাহা গুণ পদার্থ, সেই সমস্তই কোন দ্রব্যাপ্তিত, যেমন রূপাদি গুণ, এইরূপে সামান্ততঃ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ রূপাদি গুণ পদার্থে দ্রব্যাপ্তিত্বের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হওয়ায় গুণত্বরূপে রূপাদি গুণের তুল্য ইচ্ছাদি গুণের দ্বারা তাহাতে দ্রব্যাপ্তিত্বের অনুমিতি জন্মিলে ঐ সমস্ত গুণের আশ্রয় দেহাদি ভিন্ন আত্মা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যেহেতু ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পদার্থ, অতএব তাহারা কোন দ্রব্যাপ্তিত, এইরূপে ঐ ইচ্ছাদিগুণে ঐ হেতুর দ্বারা দ্রব্যাপ্তিত্ব অনুমান সিদ্ধ হয়। পরে ইচ্ছাপ্রভৃতি গুণ দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আশ্রিত নহে অর্থাৎ দেহাদির গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে পরিণেবে উহা দেহাদি ভিন্ন কোন দ্রব্যাপ্তিত, ইহাই সিদ্ধ হয়। সেই দ্রব্যই আত্মা।

কিন্তু বাস্তবিককার উদ্যোতকর ও তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, ইচ্ছাদিগুণ পরতন্ত্র অর্থাৎ পরাশ্রিত, ইহাই “সামান্ততোদৃষ্ট” অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যাহা গুণ পদার্থ, তাহা পরাশ্রিত, যেমন রূপাদি, এইরূপে সামান্ততঃ গুণ পদার্থে পরাশ্রিতত্বের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ বশতঃ ইচ্ছাদিগুণে ও পরাশ্রিতত্ব উক্ত “সামান্ততোদৃষ্ট” অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ দেহাশ্রিত নহে, ইন্দ্রিয়াশ্রিত নহে, ইত্যাদিরূপে উহা

দেহাদির গুণ নহে, ইহা অনুমান সিদ্ধ হইলে পরিশেষে উহা দেহাদি ভিন্ন কোন দ্রব্যাপ্রিত, অর্থাৎ সেই অতিরিক্ত দ্রব্যেরই গুণ, ইহাই অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। সেই অনুমান প্রমাণের নাম “শেষবৎ” বা “পরিশেষ”। ফল কথা, উক্ত মতে পূর্বোক্ত স্থলে ইচ্ছাদি গুণের পরাপ্রিত সাধক অনুমান প্রমাণই “সাম্যাত্তোদৃষ্ট”। এবং পরিশেষে উহার আত্মাপ্রিত সাধক অনুমান প্রমাণই “শেষবৎ” বা “পরিশেষ”।

বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতমও পরে জ্ঞান যে তাঁহার মতে আত্মাপ্রিত অর্থাৎ আত্মার বাস্তব গুণ, এই সিদ্ধান্ত বহু হেতুর দ্বারা সমর্থন করিয়া আবার বলিয়াছেন—“পরিশেষাদ্ যথোক্ত হেতুপপত্তেষ্চ” (৩২:৪১)। উক্ত সূত্রে তিনি ‘পরিশেষ’ শব্দের দ্বারা তাঁহার পূর্বোক্ত “শেষবৎ” অনুমানকেই গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পরবর্তীকালে ঐ ‘শেষবৎ’ অনুমানই ‘ব্যতিরেক’ ও “কেবলব্যতিরেক” নামে কথিত হইয়াছে এবং উহার নানারূপ ব্যাখ্যা ও উদাহরণও কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন শ্রায় চার্য্য উদ্যোতকরও কল্লাস্তুরে গৌতমোক্ত ঐ ত্রিবিধ অনুমানকে যথাক্রমে “অস্বী” “ব্যতিরেক” “অস্বয়-ব্যতিরেক” এই নাম ত্রয়ে উল্লেখ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করায় উহাও প্রাচীন মত বিশেষ। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্ত প্রাচীন মতই গ্রহণ করিয়া নিজমতে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহার ব্যাখ্যায় অনেক মতভেদ হইয়াছে। পরে গৌতমোক্ত হেতু বাক্যের ব্যাখ্যায় উক্ত ত্রিবিধ হেতু বা অনুমানের ব্যাখ্যা বলিব। সংক্ষেপে অনুমান প্রমাণের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ভব। তবে পরে হেতু ও হেতুভাসের ব্যাখ্যায় অনেক কথা ব্যক্ত হইবে।

উপমান প্রমাণ

অনুমান প্রমাণের পরে যথাক্রমে তৃতীয় উপমান

প্রমাণের লক্ষণ বলিতে গৌতম বলিয়াছেন—

প্রসিদ্ধসাধার্ম্যাৎসাধ্যসাধনমুপমানং ॥১১১॥৬॥

যে পদার্থ পূর্বেই যথার্থরূপে জ্ঞাত আছে, তাহাকে বলে প্রসিদ্ধ পদার্থ। যে পদার্থ পূর্বে অজ্ঞাত, তাহা সাধ্য পদার্থ। কোন পদার্থে কোন প্রসিদ্ধ

পদার্থের সাধন্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ জন্ত কোন সাধ্য পদার্থের যে সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক অনুভূতি, তাহাকে বলে উপমিতি । সেই যথার্থ উপমিতির বাহা করণ, তাহাই উপমাননামক প্রমাণ । শ্রায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে উপমান প্রমাণের পরীক্ষায় গোতমের স্ত্রীহানুসারে বাৎস্তায়ন প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ গবয়ত্ব বিশিষ্ট পশুবিশেষে “গবয়” শব্দের বাচ্যত্ব সম্বন্ধ নির্ণয়কে উপমান প্রমাণের ফল উপমিতির প্রথম উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ।

তাৎপর্য্য এই যে, গবয় নামে এক প্রকার আরণ্য পশু আছে । উহাকে দেশ বিশেষে “নীলগাই” বলে । ঐ গবয় পশু দেখিতে গোর সদৃশ ; কিন্তু উহা গো নহে । কারণ, গোমাত্রেরই গলদেশে যে লম্বমান চৰ্ম্ম থাকে, বাহা অভিধানে “সান্না” ও “গলকষল” নামে কথিত হইয়াছে, উহাই গোমাত্রের সামান্য লক্ষণ । কিন্তু গবয় পশুতে সেই গলকষল নাই । নগরবাসী ঐ গবয় পশু দেখেন নাই । কিন্তু দৃষ্টগবয় কোন অরণ্যবাসীর নিকটে তিনি শুনিলেন— “গবয় পশু গোর সদৃশ” । পরে সেই নগরবাসী কোন সময়ে বনে যাইয়া কোন গবয় পশু দেখিয়া তাহাতে তাঁহার পূর্বদৃষ্ট (প্রসিদ্ধ) গোর সাধন্য (সাদৃশ্য) প্রত্যক্ষ করিলে পরেই তাহার পূর্বজ্ঞত সেই বাক্যার্থের স্মরণ হওয়ায় তজ্জন্ত পরক্ষণেই “অয়ং গবয় পদবাচ্যঃ” অথবা “গবযো গবয় পদবাচ্যঃ”—এইরূপ জ্ঞান জন্মে । তাঁহার উক্তরূপে গবয়ত্ব বিশিষ্ট পশুমাत्रে যে “গবয়” শব্দের বাচ্যত্ব সম্বন্ধ বা শক্তির জ্ঞান, উহাই “উপমিতি” নামক তৃতীয় প্রকার অনুভূতি । সুতরাং উক্তরূপ বার্থ অনুভূতির বাহা করণ তাহা “উপমান” নামে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে (১) ।

১। মীমাংসক ও বৈদারিক সম্প্রদায় উপমান প্রমাণ স্বীকার করিলেও তাঁহারা গবয়ত্ব বিশিষ্ট পশুতে “গবয়” শব্দের বাচ্যত্ব বোধকে উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি বলেন নাই । পূর্বমীমাংসা ভাষ্যকার শবর স্বামী ও বাস্তিককার কুমারিলভট প্রভৃতির মতে উক্ত স্থলে গবয় পশুতে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইলে পরে সেই পূর্বদৃষ্ট গো এই গবয়ের সদৃশ, এইরূপে সেই গো পদার্থে প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবয়ের যে সাদৃশ্য বোধ জন্মে, তাহাই উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি । ঐ স্থলে সেই পূর্বদৃষ্ট গোর প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তাহাতে সেই গবয়ের সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কিন্তু নৈয়ায়িক প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায় ঐরূপ সাদৃশ্য বোধকে উপমিতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই । তাঁহারা বলিয়াছেন যে গবয়ে গোর যে সাদৃশ্য আছে, তাহাই তা গোপদার্থে গবয়ের সাদৃশ্য । সুতরাং গবয়ে উহার প্রত্যক্ষ হইলে তজ্জন্ত সংস্কার বশতঃ সেই গবয়ের সদৃশ বলিয়া সেখানে পূর্বদৃষ্ট সেই গোর স্মরণই হয় । সুতরাং উহা স্মরণাত্মক জ্ঞান বলিয়া উহাকে উপমিতি ও উহার করণকে উপমান প্রমাণ বলা যায় না ।

উক্তৰূপ উপমিতিৰূপে কি ? এ বিষয়ে ও মতভেদ আছে। “ত্ৰায়মঞ্জরী”-
 কৰ জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ নৈয়ায়িকগণেৰ মতে উক্তস্থলে “যথা গোঁ
 স্থথা গবয়ঃ”—এইৰূপ পূৰ্ব্বেৰূপত বাক্যই উপমিতিৰূপে কি। উক্তৰূপ উপমিতিৰূপে
 পূৰ্বে উহা স্থিতিৰ বিষয় হওয়ায় তদ্বিষয়ক স্থিতি সম্বন্ধে উহা উপমিতিৰূপে
 কৰ্ত্তা আত্মাতে বৰ্ত্তমান হয়। কিন্তু উক্ত বাক্য শ্রবণ কৰিলেও বনে বাইয়া
 গবয় দেখিয়া তাহাতে পূৰ্ব্বেৰূপে গোঁৰ সাদৃশ্য প্ৰত্যক্ষ না কৰিলে তাহাতে
 “গবয়” শব্দেৰ বাচ্যত্ব বোধ জন্মে না। স্তত্ৰাং উক্তৰূপ বাক্য আপ্তবাক্য
 হইলেও উক্ত বিষয়ে উহা শব্দ প্ৰমাণ নহে, কিন্তু উহা উপমান নামক
 প্ৰমাণান্তৰ। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মত সমৰ্থন কৰিয়া পৰে ভাষ্যকাৰ বাৎসায়নেৰও
 যে, উহাই মত, ইহাও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকাৰেৰ কথাৰ দ্বাৰাও
 সরলভাবে তাঁহাৰ উক্তৰূপ মতই বুঝা যায়। কিন্তু বাৰ্ত্তিককাৰ উদ্যোতকৰ
 পূৰ্বোক্ত বাক্যার্থেৰ স্মৰণ সহ কৃত সাদৃশ্য প্ৰত্যক্ষকেই উপমিতিৰূপে কি বলিয়া
 উপমান প্ৰমাণ বলিয়াছেন। উদয়নাচাৰ্য্য প্ৰভৃতি নৈয়ায়িকগণ উক্তস্থলে গবয়ে
 গোঁৰ সাদৃশ্য-প্ৰত্যক্ষকেই উপমিতিৰূপে কি বলিয়া পূৰ্ব্বেৰূপে সেই বাক্যার্থেৰ
 স্মৰণকে উহাৰ ব্যাপাৰ বলিয়াছেন। এাচীন মতে এ ব্যাপাৰৰূপ চৰম
 কাৰণই মুখ্যকাৰণ হওয়ায় উহাই মুখ্য উপমান প্ৰমাণ এবং তজ্জন্তু যে
 উপমিতিৰূপ প্ৰমাণ, তাহাও উপমান প্ৰমাণ হয়। সেই প্ৰমাণেৰ ফল হান
 বুদ্ধি অথবা উপাদান বুদ্ধি অথবা উপেক্ষা বুদ্ধি। এ হানাদি বুদ্ধি কৰূপ, তাহা
 প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণেৰ ব্যাখ্যায় পূৰ্বে বলিয়াছি।

এইৰূপ যে ব্যক্তি “মুদগপৰ্ণী” ও “মাষপৰ্ণী” শব্দেৰ বাচ্য অৰ্থ জানেন না,
 তিনি দ্ৰব্যতত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকেৰ নিকটে শ্রবণ কৰিলেন—“মুদগপৰ্ণী” নামে
 ওষধি বিশেষ দেখিতে মুদগেৰ সদৃশ এবং “মাষপৰ্ণী” নামে ওষধি বিশেষ দেখিতে
 মাষেৰ সদৃশ। মুদগ ও মাষ তাঁহাৰ পূৰ্ব্বেৰূপে প্ৰসিদ্ধ পদাৰ্থ। স্তত্ৰাং পৰে কোন
 সময়ে সেই ব্যক্তি পৰ্ব্বতাদি কোন স্থানে বাইয়া মুদগপৰ্ণী দেখিয়া তাহাতে
 মুদগেৰ সাদৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এবং মাষপৰ্ণী দেখিয়া তাহাতে মাষেৰ সাদৃশ্য
 প্ৰত্যক্ষ কৰিলে পৰেই তাঁহাৰ সেই পূৰ্ব্বেৰূপে চিকিৎসক-বাকেৰ অৰ্থ স্মৰণ
 হওয়ায় সেই ওষধিবিশেষে যথাক্ৰমে “মুদগপৰ্ণী” ও “মাষপৰ্ণী” শব্দেৰ বাচ্যত্ব
 সম্বন্ধৰূপে শক্তিৰ নিৰ্ণয় হয়। উক্ত স্থলে উহাও তাঁহাৰ উপমিতি।

ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন উক্তরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, উপমান প্রমাণের আরও বিষয় আছে। তাৎপৰ্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐকথার দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, যেমন প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্য বা সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান উপমিতি জন্মে, তদ্রূপ, বৈধর্ম্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানও উপমিতি জন্মে। তাহাকে বলে “বৈধর্ম্যোপমিতি”। যেমন কোন ব্যক্তি উষ্ট্র পশু দেখিলেও এবং উহা “উষ্ট্র” শব্দের বাচ্য, ইহা জানিলেও উহা যে “করভ” শব্দের বাচ্য অর্থাৎ “করভ” শব্দের যে উষ্ট্রও একটি অর্থ, ইহা জানেন না,—সেই ব্যক্তি কখনও কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, “করভ অতি কুশী, তাহার পৃষ্ঠ কুজ ও তাহার গ্রীবদেশ অতি দীর্ঘ, এবং সে অতি কঠোর কণ্টক ভক্ষণ করে”। পরে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে উষ্ট্র দেখিলে তাহাতে তাহার প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত গবাদি পশুর বৈধর্ম্য দেখিয়া এবং উহার পরেই তাহার সেই পূর্বজ্ঞাত স্বার্থ স্মরণ করিয়া উষ্ট্র “করভ” শব্দের বাচ্য,—এইরূপে তাহাতে “করভ” শব্দের বাচ্যস্বরূপ শক্তির নিশ্চয় করেন। উক্ত স্থলে ঐ শক্তি নির্ণয় তাহার “বৈধর্ম্যোপমিতি”।

“তार्কিকরক্ষা”কার বরদরাজ গৌতমের উপমান লক্ষণ সূত্রে “সাদৃশ্য” শব্দের দ্বারা বৈধর্ম্য এবং ধর্মমাত্রকেও গ্রহণ করিয়া ত্রিবিধ উপমিতি স্বীকার পূর্বক তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলে বাচস্পতি মিশ্র “বৈধর্ম্যোপমিতিই” বলিয়াছেন। অবশ্য তুল্যভাবে উক্তরূপ বৈধর্ম্যোপমিতিও গৌতমের সম্মত বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐকথার দ্বারা অর্থ বিশেষে শব্দ বিশেষের বাচ্যস্বরূপ শক্তিভিন্ন উপমান প্রমাণের যে আরও বিষয় আছে, অর্থাৎ—উপমান প্রমাণের দ্বারা যে, অগুরূপ তত্ত্ব ও সিদ্ধ হয়,—ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও তাহাই বুঝিয়া উহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি বলেন যে, “মুদগপর্ণীর সদৃশ ওষধি বিশেষ বিষ নাশ করে”—তাহা হইলে ঐবাক্য শ্রবণের পরে কোন স্থানে কেহ সেই ওষধি বিশেষ দেখিয়া তাহাতে মুদগপর্ণীর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে পরেই সেই পূর্বজ্ঞাত বাক্যার্থের স্মরণ হওয়ায় তজ্জ্ঞাত তাহার “এই ওষধি বিশেষ বিষ নাশ করে”—এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। উক্তস্থলে তাহার সেই ওষধি বিশেষে যে বিষনাশকস্বরূপ ধর্মের নিশ্চয়, তাহাও উপমিতি।

সুতরাং উহাও উপমান প্রমাণের ফল। এইরূপ উপমান প্রমাণের দ্বারা অন্তরূপ তত্ত্ব-নিশ্চয়ের আরও অনেক উদাহরণ আছে। বস্তুতঃ ভাষ্যকার পরে যে গৌতমোক্ত চতুর্থ অবয়ব “উপনয়” বাক্যকে উপমান প্রমাণ বলিয়াছেন— তদ্বারা তাঁহার উক্তরূপ মত স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, তাঁহার কথিত “তথাচায়াং”— ইত্যাদি উপনয় বাক্যদ্বারা কোন শব্দের কোন অর্থ বিশেষে শক্তি নির্ণয় হয় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

শব্দ প্রমাণ

উপমান প্রমাণের পরে চতুর্থ শব্দ প্রমাণের লক্ষণ ও প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়া গৌতম বলিয়াছেন—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥১।১।৭।

স বিবিধো দৃষ্টী দৃষ্টার্থত্বাৎ ॥১।১।৮।

অর্থাৎ আপ্তব্যক্তির যে উপদেশ বা বাক্য, তাহা শব্দ প্রমাণ। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ এবং সেই তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যেই যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন, সেই ব্যক্তিকেই সেই বিষয়ে “আপ্ত” বলে। সেই বিষয়ে তাঁহার সেই উপদেশ অর্থাৎ তদ্বোধক বাক্যই শব্দ প্রমাণ। কারণ, যাহা যথার্থ শব্দবোধরূপ প্রমাণ করণ, তাহাই হইবে—শব্দ প্রমাণ। যাহাদিগের মতে সেই আপ্ত বাক্যই জ্ঞানমান হইয়া যথার্থ শব্দ বোধের করণ হয়, তাহাদিগের মতে উহাই শব্দ প্রমাণ। মহর্ষি গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারাও সরলভাবে উহাই বুঝা যায়। কিন্তু পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ সেই বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহের অরূপজ্ঞানকেই যথার্থ শব্দবোধের করণ বলিয়া তজ্জ্ঞ সেই সমস্ত পদার্থ বিষয়ক অরূপকেই উহার ব্যাপার বলিয়াছেন। উক্তমতে সেই পদ সমূহ বিষয়ক সমূহালম্বন অরূপজ্ঞানই শব্দ প্রমাণ। প্রাচীন মতে ব্যাপার রূপ চরম কারণই মুখ্য কারণ হওয়ায় যথার্থ শব্দ বোধের চরম কারণ—সেই সমস্তপদার্থবিষয়ক অরূপই মুখ্য প্রমাণ এবং তজ্জ্ঞ শব্দ বোধরূপ প্রমাণও শব্দ প্রমাণ হয়। তাহার ফল পূর্বোক্ত হানাদি বুদ্ধি।

অদৃষ্টার্থ বেদাদিশাস্ত্রও যে, আপ্ত বাক্য বলিয়া শব্দ প্রমাণ, এই নিজ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার জন্ত গৌতম এখানেই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পরে

বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত “আপ্তপদেশ” বা আপ্তবাক্য যখন দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ এই দুই প্রকার, তখন শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ, অর্থাৎ দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে আপ্তবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ ইহলোকেও প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা দৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ। আর যে আপ্তবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ ইহলোকে অথ কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না, তাহা অদৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ। যেমন “স্বর্গকামো অশ্বমেধেন যজ্ঞেত”—ইত্যাদি বেদবাক্য। স্বর্গার্থী অধিকারী অশ্বমেধ যাগ করিবেন। অর্থাৎ অশ্বমেধ যাগ তাঁহার স্বর্গের সাধন। কিন্তু ইহলোকে অথ কোন প্রমাণের দ্বারাই অশ্বমেধ যাগের স্বর্গ-সাধনস্থ বুঝা যায় না। স্বর্গ নামক সুখ বিশেষও ইহলোকে অনুভব করা যায় না। এইরূপ আরও বহু বহু পদার্থ আছে, যাহা বেদাদি শাস্ত্র ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারাই বুঝা যায় না। সুতরাং সেই সমস্ত বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্ররূপ আপ্তবাক্যই অদৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন—“তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তা গমাং সিদ্ধা” ১৬।

কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রে দৃষ্টার্থ বাক্যও বহু আছে এবং সত্যার্থ বহু বহু লৌকিক বাক্য ও দৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য। কারণ, যে সমস্ত লৌকিক বাক্য দ্বারা কোন বিষয় বুঝিলে—তদ্বিষয়ে প্রযুক্তি সফল হইতেছে, তাহার প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য এবং তদৃষ্টান্তে তজ্জাতীয় অত্যাশ্চর্য্য লৌকিক বাক্যেরও প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। তাই সর্বত্রই সত্যবাদী বিজ্ঞব্যক্তির লৌকিক বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে লোক-ব্যবহার চলিতেছে। কারণ, যিনি যে বিষয়ে “আপ্ত”, সে বিষয়ে তাঁহার বাক্যই আপ্ত বাক্য। তাই ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ও আপ্তের লক্ষণ বলিয়া পরে বলিয়াছেন যে, ইহা ঋষি, আৰ্য্য ও শ্রেষ্ঠগণের পক্ষে সমান। অর্থাৎ ঋষিগণের বাক্যের ত্রায় অত্যাশ্চর্য্য আৰ্য্যগণ এবং শ্রেষ্ঠগণের সত্যার্থ বহু বহু লৌকিক বাক্যের দ্বারাও যখন সেই সেই বিষয়ের যথার্থ শব্দ বোধ হইতেছে এবং তদনুসারে তাহাদিগের ব্যবহারও চলিতেছে, তখন তাহাদিগের সেই সমস্ত লৌকিক বাক্যও শব্দ প্রমাণ বলিয়া তাহারাত্তর সেই সমস্ত বিষয়ে আপ্ত, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—“আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ”।

নবম অধ্যায়

ন্যায়দর্শনে প্রমাণ-পরীক্ষা।

ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে মহর্ষি গৌতম সামান্যতঃ তাঁহার প্রথমোক্ত প্রমাণ পদার্থের পরীক্ষা করিতে প্রথমে “প্রত্যক্ষাদিনা ন প্রমাণং ত্রৈকাল্যা সিদ্ধেঃ” (২।১।৮) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই—এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার খণ্ডন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষ বাদীর পরিগৃহীত প্রমাণের যদি প্রামাণ্য থাকে, তাহা হইলে ত সর্বপ্রমাণের প্রতিষেধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হইতে পারেনা। কারণ যিনি নিজ মতের সাধক কোন প্রমাণ বলিতে পারেন না—তিনি অপরের মতেরও প্রমাণ প্রশ্ন করিতে পারেন না। সুতরাং প্রমাণ ব্যতীতও তাঁহার মত সিদ্ধ হইলে তুল্যভাবে অপরের মতও সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং সকলেরই নিজ মতের সাধক প্রমাণ বক্তব্য। কিন্তু যাহার মতে প্রমাণ বলিয়া কিছুই নাই, তিনি ত তাঁহার উক্তরূপ নিজ মতও সিদ্ধ করিতে পারেন না। আর তিনি যদি বাধ্য হইয়া তাঁহার ঐ নিজ মতের সাধক প্রমাণের বাস্তব প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে যে হেতুর দ্বারা তিনি সর্ব প্রমাণের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করিতেছেন সেই হেতু যে সর্ব প্রমাণে নাই, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তিনি ত আর সর্বপ্রমাণের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে পারেন না। গৌতম পরে পূর্বপক্ষবাদীর হেতুরও খণ্ডন করিয়াছেন।

তবে কি প্রমাণেরও প্রমাণ আছে? প্রমাণ ব্যতীত যদি কিছুই সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ত প্রমাণ পদার্থও সিদ্ধ হইতে পারে না। আর প্রমাণও যদি প্রমাণসিদ্ধ বা প্রমাণের বিষয় হয়, তাহা হইলে ত উহাও প্রমেয়পদার্থই হয়। তাহা হইলে আর উহাকে প্রমাণ বলা যায় কিরূপে? এতদ্বন্দ্বেরে গৌতম পণে বলিয়াছেন—“প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ” ২।১।১৬।

গৌতমের কথা এই যে, যাহা প্রমাণ, তাহাও কোন সময়ে প্রমেয়ও হয়। তাহাতে তাহার প্রমাণত্বভঙ্গ হয় না। যেমন যে দ্রব্যের দ্বারা সুবর্ণাদি দ্রব্যের গুরুত্ববিশেষ নির্ণয় করা হয়, সেই দ্রব্যের নাম

“তুলা”। যখন উহার দ্বারা কোন দ্রব্যের গুরুত্ববিশেষের নির্ণয় করা হয়, তখন উহা নির্ণয়ের সাধন বলিয়া উহাকে লোকে প্রমাণ বলে। কিন্তু কখনও ঐ তুলার প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ হইলে অত্ৰ-পরীক্ষিত তুলার দ্বারা উহার প্রামাণ্য পরীক্ষা করা হয়। তখন আবার সেই তুলাই প্রমেয় হয়। এইরূপ কোন প্রমাণের দ্বারা যখন কোন পদার্থের নির্ণয় হয়, তখন উহা প্রমাণই। কিন্তু সেই প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে যদি সংশয় হয়, অথবা কেহ তাহার প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহা হইলে তখন অত্ৰ প্রমাণের দ্বারা তাহার প্রামাণ্য নির্ণয় আবশ্যক হয় এবং তখন সেই প্রমাণই অত্ৰ প্রমাণের বিষয় হইয়া প্রমেয় হয়। সুতরাং প্রমাণেও প্রমেয়ত্ব থাকে। প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব কাল ভেদে ও বিষয় ভেদে বিরুদ্ধ হয় না। তাই মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষের সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ এবং অনুসিত্যাদির সাধন বুদ্ধি বা জ্ঞানকেও তাহার পরিভাষিত দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন। পরে তাহা বুঝা যাইবে।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহা পূর্বপক্ষ এই যে, যদি সমস্ত প্রমাণেরই প্রমাণ থাকে, অর্থাৎ যদি অত্ৰ প্রমাণের দ্বারাই সমস্ত প্রমাণের সিদ্ধি বা জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ত সেই সমস্ত অত্ৰ প্রমাণ এবং তাহার সাধক অত্ৰ প্রমাণ এবং তাহার সাধক অত্ৰ প্রমাণ এইরূপে অনন্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং পূর্বোক্তরূপে অনন্ত প্রমাণ পরস্পরের আপত্তিরূপ “অনবস্থা” দোষ প্রযুক্ত প্রমাণের সিদ্ধিতেও যে অত্ৰ প্রমাণ আবশ্যক, ইহা স্বীকার করা যায় না। পরন্তু তাহা স্বীকার করিলে কখনই কাহারও কোন প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, যে প্রমাণের দ্বারা কোন প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইবে, সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ের জন্ত অত্ৰ প্রমাণ গ্রহণ করিলে তাহারও প্রামাণ্য নিশ্চয়ের জন্ত আবার অপর প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে অনন্তকালেও কোন প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় সম্ভব না হওয়ায় প্রমাণ দ্বারা বস্তু সিদ্ধি সম্ভব হয় না। অতএব কোন বস্তুই নাই, অর্থাৎ জগতে বস্তুতঃ প্রমাণও নাই, প্রমেয়ও নাই, প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার কাল্পনিক, ইহাই স্বীকার্য। মহর্ষি গৌতম উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে শেষে বলিয়াছেন—

“ন প্রদীপ-প্রকাশঃ-সিদ্ধিবত্তঃসিদ্ধেঃ” ॥ ২।১।১১ ॥

গৌতমের কথা এই যে, যেমন প্রদীপালোক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ প্রমাণ সমূহ ও অল্প প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রদীপ দেখিতে অল্প প্রদীপ আবশ্যক না হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয় আবশ্যক হয়। কারণ, অন্ধ ব্যক্তি প্রদীপও দেখিতে পায় না। সুতরাং প্রদীপ যে স্বতঃ প্রকাশ, ইহাও বলা যায় না। কিন্তু সেই প্রদীপ বিষয়ে দৃষ্টার চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রমাণ এবং সেই চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়েও অনুমান প্রমাণ আছে এবং সেই অনুমান যে প্রমাণ, সে বিষয়েও অল্প অনুমান প্রমাণ আবশ্যকই আছে। কিন্তু যেমন প্রদীপ দেখিতে চক্ষুরিন্দ্রিয় আবশ্যক হইলেও তাহার জ্ঞান আবশ্যক হয় না, এইরূপ সমস্ত প্রমাণেরই সাধক প্রমাণ থাকিলেও তাহার জ্ঞান আবশ্যক হয় না। কারণ সর্ব্বত্রই প্রমাণে প্রামাণ্য সংশয় হয় না। এবং প্রমাণের দ্বারা বস্তু বোধে পূর্বে সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ও আবশ্যক হয় না। অতএব প্রমাণ দ্বারা যে কখনই বস্তু সিদ্ধি সম্ভব নহে, ইহা বলা যায় না।

কিন্তু কোন স্থলে প্রথমে প্রমাণ দ্বারা কোন যথার্থ জ্ঞান জন্মিলেও এই জ্ঞান যথার্থ কিনা? এইরূপ সংশয় কাহারও জন্মে। সুতরাং সেখানে সেই প্রমাণেও তাহার প্রামাণ্য সংশয় জন্মে, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে প্রামাণ্য যে স্বতো গ্রাহ্য, ইহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ যদি সর্ব্বত্রই যে কোন রূপে পূর্বেই প্রামাণ্যের নিশ্চয় হইয়া যায়, তাহা হইলে পরে তদ্বিষয়ে আর কখনই সংশয় জন্মিতে পারেনা। অতএব ইহাই স্বীকার্য্য যে, সেখানে পরে অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। তাই গৌতম মতের সমর্থক বাৎস্তায়ন তায়দর্শনের ভাষ্যারম্ভেই বলিয়াছেন—
“প্রমাণতোহর্থ-প্রতি পত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং”।

তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থের বোধ হইলে সেখানেই তদ্বিষয়ে ও বৃত্তির সামর্থ্য অর্থাৎ সাফল্য হয়। কিন্তু যাহা বস্তুতঃ প্রমাণ নহে, যাহাকে বলে প্রমাণাভাস, তদ্বারা কোন পদার্থের ভ্রাম্যক-নিশ্চয় হইলে সেখানে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হয় না। যেমন প্রমাণের দ্বারা জলকে জল বলিয়া বুঝিয়া তাহা পান করিলে পিপাসুর প্রবৃত্তি সফল হয়। কিন্তু প্রমাণাভাসের দ্বারা তৈলকে জল বলিয়া বুঝিয়া পান করিলে তাহার প্রবৃত্তি সফল হয় না। সুতরাং যাহা প্রমাণ নহে, তাহা সফল প্রবৃত্তির জনক

নহে, যেমন প্রমাণাভাস,—এইরূপে সকল প্রবৃত্তির জনকত্বে প্রামাণ্যের বাস্তব নিশ্চয় হওয়ার ঐ হেতুর দ্বারা পরে (ইহা প্রমাণ, সকল প্রবৃত্তি জনকত্বাৎ এইরূপে) অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। উক্তরূপে প্রথমে যে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়াছে, তজ্জাতীয় অন্যান্য প্রমাণেও তজ্জাতীয় হেতুর দ্বারা পূর্বেও প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। কিন্তু সমস্ত প্রমাণেই প্রামাণ্য সংশয় না হওয়ার সর্বত্রই উক্তরূপে প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক হয় না। এব প্রমাণের দ্বারা বস্তু বোধে ও পূর্বে সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় আবশ্যক হয় না,—ইহা পূর্বে বলিয়াছি।

পরন্তু প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ের জন্ত অনন্ত প্রমাণ স্বীকারের ও আপত্তি হয় না। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয় যে, প্রমাণ, ইহাও অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় এবং সেই অনুমান প্রমাণরূপ যে জ্ঞান, তাহার মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপ যে, মন, তাহা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ। এবং সেই অনুমান প্রমাণরূপ জ্ঞান মানস প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এবং তাহার প্রামাণ্য ও অল্প অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। এইরূপে কোন প্রমাণের সিদ্ধিই অতিরিক্ত আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় না।

পরন্তু জীবের আত্মাতে কোন বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে তাহার মনের দ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জন্মে। সেই মানস প্রত্যক্ষের নাম “অনুব্যবসায়”। সুতরাং জীবের মনের দ্বারাই তাহার জ্ঞানের প্রকাশ হওয়ায় জ্ঞান যে, স্বতঃ প্রকাশ, ইহাও বলা যায় না। আর সেই অনুব্যবসায় রূপ পরজাত জ্ঞানের প্রকাশ বা জ্ঞান আবশ্যক না হওয়ায় তাহাকেও স্বতঃ প্রকাশ বলা অনাবশ্যক এবং তাহার অনুব্যবসায় প্রভৃতি অনন্ত অনুব্যবসায় স্বীকার করাও অনাবশ্যক। কারণ প্রথমোক্ত সেই জ্ঞানের প্রকাশের জন্ত সেই সমস্ত অনুব্যবসায়ের কোন অপেক্ষা নাই। পরন্তু বিশিষ্ট জ্ঞানোৎপত্তির পরে উহার যে মানস প্রত্যক্ষ রূপ অনুব্যবসায় জন্মে, তাহাতে সেই জ্ঞানাত্মক আত্মাও বিষয় হইয়া থাকে। কারণ, ঘটাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে “ঘট মংজানামি” অর্থাৎ “আমি ঘটরূপে ঘটকে জানিতেছি,” ইত্যাদি প্রকারেই সেই “অনুব্যবসায়” জন্মে। সুতরাং সেই মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায়ের করণ মনের দ্বারাই তখন সেই আত্মারও প্রত্যক্ষরূপ প্রকাশ হওয়ায় আত্মা যে স্বতঃ প্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ,

ইহাও বলা যায় না এবং তাহা স্বীকার করাও অনাবশ্যক। কারণ, পূর্বোক্ত অমুব্যবসায়ের প্রকাশের জন্ত অত্ৰ কোন প্রকাশক অনাবশ্যক।

কিন্তু পূর্বোক্তরূপে প্রথমোৎপন্ন বিশিষ্ট জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষরূপ অমুব্যবসায় জন্মিলেও সেই জ্ঞান ভ্রম কি প্রমা, তাহা তখন বুঝা যায় না। কারণ, সেই অমুব্যবসায়ে সেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব বা প্রমাত্ব বিষয় হয় না। সুতরাং পরে অমুমান প্রমাণরূপ অত্ৰ প্রমাণের দ্বারাই সেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব বা প্রমাত্বের নিশ্চয় জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানের ভ্রমত্ব যেমন পরতোগ্রাহ্য, তদ্রূপ, প্রমাজ্ঞানের প্রমাত্বও পরতোগ্রাহ্য, উহা স্বতোগ্রাহ্য নহে। এবং ভ্রম জ্ঞানের উৎপত্তি যেমন কোন দোষ জন্ত বলিয়া তাহার ভ্রমত্বও সেই দোষজন্ত, তদ্রূপ, প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তিও তুল্যত্বায়ে কোন গুণজন্ত বলিয়া স্বীকার্য্য হওয়ার উহার প্রমাত্বও সেই গুণজন্ত, ইহা স্বীকার্য্য। এই মতের নাম “পরতঃ প্রামাণ্যবাদ”।

শ্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায় উক্ত মতকে আশ্রয় করিয়াই বেদের পৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কারণ উক্তমতে বেদবাক্যদ্বারা যে শাব্দবোধরূপ প্রমা জ্ঞান জন্মে, তাহার প্রমাত্বও সেই জ্ঞানের সাধারণ কারণ সমূহজন্তই হইতে পারেনা। তাহা হইলে ভ্রম জ্ঞান ও প্রমা কেন হয় না? অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বেদবাক্য জন্ত শাব্দবোধের যে প্রমাত্ব, তাহা সেই বেদবক্তা পুরুষের বেদার্থ বিবয়ক যথার্থ জ্ঞান অথবা তাঁহার তাৎপর্য্য জ্ঞানরূপ গুণজন্ত। সুতরাং বেদ সেই পুরুষকৃত বলিয়া পৌরুষেয়, এবং তাঁহার প্রামাণ্য প্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য। সুতরাং সেই বেদকর্তা নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরও স্বীকার্য্য। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা ব্যক্ত হইবে।

কিন্তু কৰ্ম্ম মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে বেদ নিত্য। বেদ কোন পুরুষকৃতই নহে, সুতরাং অরৌরুষেয়। তাই তাঁহার স্বতঃ প্রামাণ্যবাদই সমর্থন করিয়াছেন। বৈদান্তিক প্রভৃতি আরও অনেক সম্প্রদায় ও বিভিন্নরূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও স্বতঃ প্রামাণ্যবাদই স্বীকার করিয়াছেন। স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী দিগের মতে ভ্রম জ্ঞানের উৎপত্তিও ভ্রমত্ব, কোন দোষজন্তই হয় এবং তাহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় ও পরে অমুমানাদি প্রমাণের দ্বারাই হয়। কিন্তু প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রমাত্ব সেই জ্ঞানের সাধারণ সমস্ত কারণ হইতেই হয়, তাহাতে

অতিরিক্ত আর কোন কারণের অপেক্ষা নাই এবং সেই জ্ঞানের প্রমাণ-নিশ্চয়ে ও অন্য অনুমানাদিপ্রমাণের অপেক্ষা নাই। কারণ প্রমাজ্ঞান জন্মিলেই সেই জ্ঞানের বোধক যে সমস্ত কারণ, তদ্বারাই সেই জ্ঞানের জ্ঞানের সহিতই তাহার প্রমাণনিশ্চয় জন্মে (১)। এই মতের নাম “স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ”।

পূর্বোক্ত “স্বতঃ প্রামাণ্যবাদে”র উপরে ভারতের অনেক দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাদও উক্ত মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাই বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাদী মীমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় উক্ত মতের সমর্থন করিতে বহু প্রযত্ন ও বহু শৃঙ্খল বিচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য্যগণও উক্তমত-খণ্ডনে বহু শৃঙ্খল বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রথম কথা এই যে, কোনসময়ে কোন বিষয়ে কাহারও স্বতঃ প্রমাজ্ঞান জন্মিলেও যখন পরে এই জ্ঞান প্রমাণ কিনা? এইরূপ সংশয়ও জন্মে, তখন প্রমাণ জ্ঞানের জ্ঞানের সহিতই যে, তাহার প্রমাণ-নিশ্চয় জন্মে, ইহা কখনই বলা যায় না। কারণ, পূর্বেই প্রমাণের নিশ্চয় হইলে তদ্বিষয়ে সংশয় হইতেই পারেনা। যদি বল—সেইরূপ স্থলে জ্ঞাতা পুরুষের কোন দোষ থাকায় পূর্বে তাহার সেই জ্ঞানে প্রমাণনিশ্চয় জন্মে না। স্বতরাং সেখানে ঐরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহা বলিলে, কিরূপ দোষ সেই প্রমাণনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হয়, ইহা বলা আবশ্যক এবং দোষ থাকিলে

১। কিরূপে তাহা সম্ভব হয়। সে বিষয়ে মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুপ্রভাকর, কুমারিলভট্ট এবং মুরারি মিশ্রের বিভিন্ন মত আছে। প্রভাকরের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। স্বতরাং প্রমাজ্ঞানই তাহার প্রমাণেরও প্রকাশক হয়। কুমারিল ভট্টের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। কিন্তু জ্ঞান জন্ত জ্ঞেয় বিষয়ে যে “জাততা” নামক ধর্ম জন্মে, তাহারই প্রত্যক্ষ হয় এবং তদ্বারাই পরে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অনুমিতি জন্মে। তখন সেই জ্ঞানের গ্রাহক অনুমানের দ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রমাণ নিশ্চয় হয়। মুরারি মিশ্রের মতে প্রমাজ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায়ই জন্মে। কিন্তু তাহাতে সেই জ্ঞানের প্রমাণ ও বিষয় হওয়ায় উহার দ্বারাই তাহার প্রমাণ নিশ্চয় হয়। এই সমস্ত মত সম্যক বুঝিতে হইলে মূলগ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু মুরারি মিশ্রের গ্রন্থ এখন সহলভ। “সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী”তে নবনৈয়মিক বিখ্যাত সংক্ষেপে পূর্বোক্ত মতত্রয়ই বলিযাছেন। তন্মধ্যে মুরারি মিশ্রের মতই অভিনব তৃতীয় মত। তাই কথিত হয়—“মুরারে তৃতীয়ঃ পন্থাঃ”।

সেই দোষজন্য সেখানে তাহার সেই জ্ঞান ভ্রমই কেন হয় না? ইহাও বলা আবশ্যক। পরন্তু জ্ঞানের প্রমাত্ত্ব নিশ্চয়ে কোন দোষকে প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাতে সেই দোষের অভাবকেও অতিরিক্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, কার্য্য মাত্রেই তাহার প্রতিবন্ধক পদার্থের অভাবও কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য। তাহা হইলে প্রমা জ্ঞানের প্রমাত্ত্বনিশ্চয়ে অতিরিক্ত আর কোন কারণের অপেক্ষা নাই, অর্থাৎ প্রমাত্ত্ব “স্বতো গ্রাহ” — এই সিদ্ধান্ত-রক্ষা হয় না।

এইরূপ প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তিতে গুণ বলিয়া কোন অতিরিক্ত কারণ স্বীকার না করিলেও দোষের অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ ভ্রমের উৎপাদক কোন দোষ থাকিলে সেখানে ভ্রম জ্ঞানই জন্মে, প্রমা জ্ঞান জন্মে না, ইহা সর্ব্ব স্বীকৃত সত্য। সুতরাং প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তি ও তাহার প্রমাত্ত্ব যদি সর্ব্বত্রই দোষাভাবরূপ অতিরিক্ত কারণ জন্য হয়, তাহা হইলেও ত উৎপত্তিপক্ষেও স্বতঃ প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের রক্ষা হয় না। অভাব পদার্থরূপ কোন অতিরিক্ত কারণ জন্য হইল স্বতঃ প্রামাণ্যের হানি হয় না—এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই। আর তাহা বলিলে অভাবরূপ দোষ জন্য যে ভ্রম জ্ঞান, তাহাতেও কেন “স্বতত্ত্ব” স্বীকার করা হয়না? “ন্যায়-কুসুমাজলি”র বিতীয় স্তবকের প্রারম্ভে উক্ত মত খণ্ডন করিতে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ভ্রমের উৎপাদক দোষ মাত্রই সর্ব্বত্র ভাব পদার্থই নহে। কারণ, বিশেষ ধর্ম্ম দর্শনের অভাব প্রভৃতিও দোষ। ন৫৫৭ তৎ প্রযুক্ত সংশয়াদি ভ্রম-জ্ঞান জন্মে কেন? যাহা ভ্রমোৎপাদনে বিশেষ কারণ, তাহাকেই “দোষ” বলে। সুতরাং সেই অভাবরূপ দোষের যে অভাব, তাহা যখন বস্তুতঃ ভাব পদার্থই, তখন সেই দোষাভাব জন্য যে প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তি, তাহা বস্তুতঃ ভাব পদার্থ জন্য হইলেও তাহাকে পরতঃ উৎপত্তি কেন বলিবে না? উদয়নাচার্য্য পরে মীমাংসক সম্প্রদায়ের অন্যান্য কথারও উল্লেখপূর্ব্বক সুবিস্তৃত সূক্ষ্মবিচারের দ্বারা তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। প্রমাণের সামান্যপরীক্ষায় এখানে সংক্ষেপে গৌতমের উক্ত মতেরও কিছু আলোচনা করিলাম।

মহর্ষি গৌতম পরে তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা করিতে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়াছেন—“প্রত্যক্ষমনুমান

মেকদেশ গ্রহণাঙ্গুলক্কেঃ” (২।১.৩১) অর্থাৎ যেহেতু বৃক্ষাদি দ্রব্যের শাখাদি অবয়বরূপ কোন এক দেশ দেখিয়াই সেই বৃক্ষাদির জ্ঞান জন্মে, অতএব বৃক্ষাদি জ্ঞান অনুমিতি। এতদ্বত্তরে গৌতম বলিয়াছেন যে, বৃক্ষাদির শাখাদি কোন এক দেশের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করাই হয়। নচেৎ ঐ অনুমিতিও ত হইতে পারে না। গৌতম পরে বৃক্ষাদি অবয়বীর সমর্থন করিয়া উহার প্রত্যক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। বৃক্ষাদি দ্রব্য যে পরমাণুগুঞ্জ নহে, কিন্তু অবয়ব সমষ্টি হইতে ভিন্ন অবয়বী, ইহা সমর্থন করিতে গৌতম বলিয়াছেন যে অবয়বী না থাকিলে কিছুই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ প্রত্যেক পরমাণুই যখন অতীন্দ্রিয়, (নচেৎ তাহাকে পরমাণুই বলা যায় না) তখন পরস্পর সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

গৌতম পরে অনুমানের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে সংক্ষেপে বাহ্য বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, অনুমানের প্রকৃত হেতু বুঝা আবশ্যক। বাহ্য যে অনুমানে প্রকৃত হেতু নহে, তাহাকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাতে অনুমের ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তদ্বারা প্রকৃত অনুমানের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। অনুমানের বাহ্য প্রকৃত হেতু, তাহা কখনই অনুমের ধর্ম্মের ব্যভিচারী হয় না। কোন স্থলে কোন হেতুতে কাহারও ব্যভিচার সংশয় হইলে অনুকূল তর্কের দ্বারাই তাহার নিরাস হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ-মাত্রপ্রমাণবাদী চার্কাক ও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য। নচেৎ তিনি ধূমাদি হেতুতে বহ্যাদি পদার্থের ব্যভিচার শঙ্কাও সমর্থন করিতে পারেন না। আর তিনি যে তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাও ত তাহার প্রত্যক্ষ নহে। তাহাও তাঁহার অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ করিতে হইবে। পরন্তু চার্কাক যে অপরের অজ্ঞতা ও ভ্রম বলেন, তাহাও ত তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে পারেন না। কারণ অপরের আত্মগত অজ্ঞতা ও ভ্রম অপরে কখনই মনের দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কিন্তু তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়াই উহার অনুমান করে। পরন্তু চার্কাক যে, অনুমানের অপ্রামাণ্য সমর্থন করেন, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? তিনি ত প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণই মানেন না। কিন্তু তিনি তাঁহার মনের দ্বারা অনুমানের অপ্রামাণ্য প্রত্যক্ষ করিলেও

আর কেহই যখন তাহা প্রত্যক্ষ করেন না, তখন অস্ত্রের নিকটে তিনি সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতে পারেন না। অবশ্য স্মৃতিষ্ক বুদ্ধি চার্বাক অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন (১) কিন্তু অত্র কোন সম্প্রদায়ই চার্বাকের সেই সমস্ত কথা গ্রাহ্য করেন নাই। অত্র সকল সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষের পরে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

তবে উপমানাদি প্রমাণ বিষয়ে মতভেদ আছে। সাংখ্যসম্প্রদায়, বৈশেষিক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ, জৈনও স্মারিকদেশী সম্প্রদায় ও দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব বৈদান্তিক মধ্বাচার্য্য, “উপমান” নামক প্রমাণাত্মক স্বীকার করেন নাই (২) সূত্রসিদ্ধ বৈশেষিক সম্প্রদায় উপমান ও শব্দ প্রমাণকে অনুমান প্রমাণই বলিয়াছেন। কারণ, বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ উপমান প্রমাণের কোন উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু তিনি অনুমানের নিরূপণ করিয়া পরে বলিয়াছেন, “এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতে” (৯২।৩)। সূত্ররাং তাঁহার মতে শাব্দ বোধ যে অনুমিতি বিশেষ, ইহাই বুঝা যায়। তাই কণাদ যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়বাদী, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ আছে। (৩)

১। অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডনে চার্বাকের সমস্ত কথা ও তাহার খণ্ডনে বিবৃত আলোচনা ন্যাসস্পাদিত “স্থায় দর্শন”র দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।

২। মাধ্বমতের ব্যাখ্যাতা গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলদেব বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় “প্রমেয়রত্নাবলী” গ্রন্থে “ঐশ্বর্যমধ্বমতে হারঃপরতঃ” ইত্যাদি শ্লোকের চতুর্থ পাদে “অক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণং”—এই বাক্যের দ্বারা মধ্বাচার্য্য যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণত্রয়বাদী, ইহা বলিয়াছেন। “লঘুভাগবতাত্মক”র টীকার প্রারম্ভে তিনি নিজেও উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেখানে যে “ঐতিহ্য”রূপ বাক্য বিশেষকে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা আমরা কোনরূপেই বুঝিতে পারি না। মহর্ষি গোতম প্রভৃতি “ঐতিহ্য”কে শব্দ প্রমাণই বলিয়াছেন। পরে ইহা ব্যত্ হইবে।

৩। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র হরি ও “বড়দর্শন সন্ধ্যায়” গ্রন্থে বৈশেষিক মতের বর্ণনায় উহাই বলিয়াছেন। কিন্তু সেখানে বহুদর্শী টীকাকার গুণরত্ন হরি লিখিয়াছেন যে, ব্যোমশিবাচার্য্য কণাদের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণত্রয়ই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরাও এখন নোথিতেছি যে, প্রশস্ত পাদভাষ্যের “ব্যোমবতাবৃত্তি”তে ব্যোমশিবাচার্য্য উহাই সমর্থন করিয়াছেন এবং কোন গ্রন্থে তাহার গুরু ও যে, বিশেষরূপে উহা সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাও সেখানে তাঁহার কোন কথাই বুঝা যায়। কোন সময়ে দেশবিশেষে উক্ত মতেরও যে প্রতিষ্ঠা ছিল, ইহাও বুঝা যায়। কারণ, শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া কথিত “সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ” নামক গ্রন্থেও বৈশেষিক মতের বর্ণনায় উক্ত

আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরচাৰ্য্য ও “মানসোল্লাস” গ্রন্থে প্রমাণের সাংখ্যাবিষয়ে প্রসিদ্ধ মতভেদ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে (১) চার্কাক একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী। কণাদ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয় বাদী। সাংখ্য সম্প্রদায় এবং “জ্ঞানৈকদেশী” সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই প্রমাণত্রয়বাদী। নৈয়ায়িক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণচতুষ্টয়বাদী। গুরু প্রভাকর পূৰ্বোক্ত প্রমাণ চতুষ্টয় ও অর্থাপত্তি, এই পঞ্চ প্রমাণ বাদী। কুমারিল ভট্টের সম্প্রদায়ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় উক্ত পঞ্চ প্রমাণ এবং “অভাব” অর্থাৎ অনুপলব্ধি এই ষট্ প্রমাণ বাদী। পৌরাণিক সম্প্রদায় উক্ত ষট্ প্রমাণ এবং “সম্ভব” ও “ঐতিহ্য” এই অষ্ট প্রমাণ বাদী।

এখন বুঝা আবশ্যক যে, কণাদ উপমান প্রমাণকে পৃথক্ প্রমাণ না বলিলেও গোতম তাহা বলিয়াছেন কেন? উপমানস্থলেও যখন প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারাই অপ্ৰত্যক্ষ পদার্থের বোধ জন্মে, তখন সেই বোধও ত অনুমিতিই।

প্রমাণত্রয়ই কথিত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে উক্ত গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া আমরা বুঝি না। পরন্তু আচার্য্য শঙ্কর কণাদের উক্তরূপ মতই বলিলে তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরও তাহাই বলিতেন,— ইহাই আমরা বুঝি। কিন্তু তিনিও কণাদকে প্রমাণদ্বয়বাদীই বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্ত পাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন—“শব্দাদীনাম প্যনুमानে হস্তর্ভাবঃ”। ব্যোমশিবাচার্য্য প্রশস্তপাদের “শব্দাদীনাম”—এইপদে “অতদগুণ সম্বন্ধান” বহুব্রীহি সমাস গ্রহণ করিলেও প্রশস্ত পাদ পূর্বে তাঁহার কথিত প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ স্বার্থজ্ঞানের মধ্যে শব্দ বোধের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই কেন? ইহার সাধু উত্তর করিতে পারেন নাই। আর কণাদের “এতেন শব্দং ব্যাখ্যাতং” এই হুত্রের তাৎপৰ্য্য কি, তাহাও সেখানে কিছুই বলেন নাই। “ব্যোমবতীভূতি” কাশী চৌধাৰ্য্যসংস্কৃত সিরাজ ১৭১-৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১। প্রত্যক্ষ মেকং চার্কাকাঃ কণাদহুগতো পুনঃ।

অনুমানক—তচ্চাপি, সাংখ্যাঃ শব্দক তে অপি।

জ্ঞানৈক দেশিনোহপ্যেব মুপমানক কেচন।

অর্থাপত্ত্যা সহিতানি চত্বাৰ্থাঃ প্রভাকরঃ।

অভাববষ্ঠান্তেভানি ভট্ট। বেদান্তিন স্তথা।

সম্ভবৈতিহ্যভূতানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ।

“মানসোল্লাস”—খ্রীষ্টাব্দ ১৭১৮-১৯২০।

সুতরাং অনুমান প্রমাণের দ্বারাই তাহা জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। গৌতম নিজেই উক্ত পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—

“তথৈত্বাপসংহারাহুমানসিদ্ধেনাবিশেষঃ” (২:১।৭৮)। গৌতমের কথা এই যে, ‘যথা গৌস্তথা গবয়ঃ’—এইরূপ বাক্য শ্রবণের পরে কোন স্থানে প্রথমে গবয় পশু দেখিলে তখন “তথা” অর্থাৎ ইহা আমার পূর্ব দৃষ্ট গোর সদৃশ,— এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান অর্থাৎ সেই গবয়ে সেই গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইহা গবয় শব্দের ব্যাঙ্গ,—এইরূপ বোধ জন্মে। সুতরাং উক্তরূপ বোধকে অনুমিতি বলা যায় না। অনুমিতি হইতে উহার বিশেষ আছে। কারণ উক্ত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ কোন অনুমিতির কারণ হয় না। পরন্তু অনুমিতি মাত্রই কোন হেতুতে অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তি জ্ঞান জ্ঞান। কিন্তু কোন হেতুতে গবয় শব্দ বাচ্যরূপ অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তি জ্ঞান ব্যতীত ও যখন উক্তরূপ বোধ জন্মে, তখন উহা যে অনুমিতি নহে, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু উক্তরূপ উপমিতির পরে “আমি গবয়ে গবয় শব্দ বাচ্যত্বের অনুমিতি করিলাম”—এইরূপে কাহারই উক্ত উপমিতিরূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়) জন্মে না। কিন্তু “আমি উপমিতি করিলাম,”—“উপমানের দ্বারা বুঝিলাম,”—ইত্যাদিরূপেই ঐ বোধের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ মনের দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে, উক্তরূপ বোধ উপমিতি, উহা প্রত্যক্ষ নহে, অনুমিতি নহে এবং শব্দবোধও নহে। সুতরাং ঐ উপমিতি নামক বিজাতীয় যথার্থ অনুমিতির কারণ উপমান নামক পৃথক্ প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য।

অবশ্য বৈশেষিক সম্প্রদায় পূর্বোক্তরূপ অনুভব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা উক্তরূপ উপমিতিকে অনুমিতিই বলিয়া উহার সাধনরূপে নানাপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রথম কথা এই যে, গবয়দর্শী সেই ব্যক্তি তখন এইরূপে অনুমান করে যে,—“গবয়” শব্দ যখন সাধু শব্দ, তখন উহার কোন অর্থবিশেষে শক্তি আছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এই গবয়ত্ব বিশিষ্ট পশু মাংসই গবয় শব্দের শক্তি (১)। এইরূপ তাঁহারা আরও অনেক প্রকার

১। অনেকের মতে “গবয় পদঃ সপ্রবৃতি নিমিত্তকঃ সাধু পদত্বাৎ”—এইরূপে অনুমানের দ্বারাই গবয়ই যে “গবয়” শব্দের শব্দতাবচ্ছেদক, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, আর কোন ধর্ম গবয় শব্দের শব্দতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। যে ধর্মরূপে যে পদার্থে যে শব্দের বাচ্যত্ব সম্বন্ধ বা শক্তি আছে, সেই ধর্মকেই সেই শব্দের শব্দতাবচ্ছেদক বলে এবং “প্রবৃতি নিমিত্ত” বলে।

অনুমান প্রদর্শন করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাগণ্য প্রশস্তপাদ “যথাগোস্তথা গবয়ঃ”—ইত্যাদি আশু বাক্যকেই উপমান প্রমাণ বলায় তাঁহার মতে ঐ আশুবাক্যমূলক অনুমানই বুঝিতে হইবে। কারণ তিনি সেখ নে পূর্বেই স্পষ্ট বলিয়াছেন—“শব্দাদীনামপ্যনুমানেন্তর্ভাবঃ”।

কিন্তু নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্য্যগণ বিশেষ বিচার করিয়া বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সমস্ত অনুমানই খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রথম কথা এই যে, পূর্বোক্তস্থলে সেই গবয়দর্শীর উক্ত বিষয়ে কোন অনুমানের পূর্বেই গবয়ত্ব বিশিষ্ট পশুমাত্র “গবয়” শব্দের শক্তি জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহার কোনরূপ অনুমানের অপেক্ষা হয় না। পরন্তু কোনরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারাও তখন তাহার উক্তরূপ শক্তি জ্ঞান হইতেও পারেনা। কারণ, অনুমানের দ্বারা “গবয়” শব্দের কোন অর্থবিশেষে শক্তি আছে, এই মাত্রই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু গবয়ত্বরূপে গবয় পশুতে যে, তাহার শক্তি, অর্থাৎ গবয়ত্ব জাতিই যে, “গবয়” শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক, ইহা বুঝা যাইতে পারে না। কারণ, সাধু শব্দত্বরূপ হেতুতে উক্তরূপ শক্তির ব্যাপ্তি নাই। পরন্তু পূর্বে অত্র কোন পদার্থে কোন হেতুতেই তাহার উক্তরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভবই নহে। কারণ, উহার কোন দৃষ্টান্তই নাই। পরন্তু সেই গবয়ত্ব জাতির প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্বে কোন আশুবাক্য দ্বারাও তাহার উক্তরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারেনা। পরেও উক্তরূপ ব্যাপ্তির বোধক কোন আশু বাক্য শ্রবণ না করায় তাহার উক্তরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হয় না। আর উক্ত স্থলে তাহার পূর্বশ্রুত সেই “যথাগোস্তথা গবয়ঃ”—ইত্যাদি কোন বাক্যস্বরূপে তদ্বারাও তাহার উক্তরূপ শক্তিজ্ঞান হইতে পারে না। কারণ উক্তরূপ বাক্য গবয়ে গোর সাদৃশ্য মাত্রেরই বোধক। সুতরাং শব্দ প্রমাণের দ্বারাই যে, তাহার উক্তরূপ শক্তিজ্ঞান জন্মে, ইহাও বলা যায়না। সুতরাং উক্ত স্থলে উক্তরূপ শক্তি নির্ণয়ের করণ উপমান নামে পৃথক্ প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য।

কণাদের মতে শব্দ প্রমাণও যে অনুমান, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। মহর্ষি গোত্রম পরে পূর্বপক্ষরূপে উক্ত মতেরও সমর্থন করিয়া পরে উহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—“আপ্তোপদেশ—সামর্থ্যাচ্ছব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ” (২।১।৫২)। অর্থাৎ শব্দ হইতে যে অর্থবিশেষের সম্প্রত্যয় বা যথার্থ শব্দবোধ হয়, তাহা আশু

বাক্যের সামর্থ্য ওযুক্ত। কিন্তু অনুমানে এরূপ আপ্তবাক্যের কোন অপেক্ষা নাই। কোন বাক্যকে আপ্তবাক্য বলিয়া বুঝিয়া পরে তদ্বারা তাহার অর্থের অনুমিতি হয় না। সুতরাং আপ্তবাক্যের দ্বারা যে অর্থ বোধ হয়, তাহাকে অনুমিতি বলা যায় না। গৌতম উক্ত হস্তের দ্বারা শব্দবোধ যে অনুমিতি হইতে বিজাতীয় ভিন্ন অনুভূতি, ইহা সমর্থন করিয়া কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতও যে, বাক্যার্থবোধরূপ শব্দ বোধ জন্মে, ইহাই স্থচনা করিয়াছেন। সুতরাং তদ্বারা শব্দ বোধ যে অনুমিতি নহে, ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। কারণ কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত তদ্বারা কোন পদার্থের অনুমিতি জন্মে না, ইহা সর্বসম্মত।

গৌতম পরে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ খণ্ডন করিয়াও উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ যেমন ধূম বহির ব্যাপ্তিরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তদ্রূপ, কোন শব্দে তাহার অর্থের উক্তরূপ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং যেমন ধূমের দ্বারা বহির অনুমিতি জন্মে, তদ্রূপ,—শব্দের দ্বারা তাহার অর্থের অনুমিতি জন্মিতে পারে না। অতঃ কোন হেতুর দ্বারাও সেই বাক্যার্থের অনুমিতি সম্ভব নহে। সুতরাং বাক্যার্থবোধরূপ শব্দবোধ যে, অনুমিতি, ইহা কোনরূপেই সিদ্ধ করা যায় না। এখানেও গৌতমের চরম কথা বুঝিতে হইবে যে, শব্দবোধের পরে “আমি এইরূপে এইপদার্থকে শব্দ বোধ করিলাম”—এইরূপেই সেই শব্দবোধরূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্তু “আমি এই পদার্থের অনুমিতি করিলাম”—এইরূপে কখনই কাহারও সেই শব্দবোধ রূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না। সুতরাং ঐ শব্দবোধরূপ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মনের দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে, উহা অনুমিতি হইতে ভিন্ন জ্ঞান। *

* শব্দ বোধের অনুমিতিবাদী বৈশেষিক সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে শব্দবোধ শব্দমূলক অনুমিতি বিশেষ বলিয়াই উহার উক্তরূপেও মানস প্রত্যক্ষ জন্মে এবং সেই অনুমিতি বিশেষেই পদজ্ঞান ও পদার্থ জ্ঞানাদি অনেক বিশেষ কারণ স্বীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি কণাদও “এতেন শব্দং ব্যাখ্যাতং” এই হস্তে উক্ত অনুমিতি বিশেষকে “শব্দ” অনুমিতিই বলিয়াছেন। সুতরাং তাহার মতে কোন হেতু ও তাহাতে ব্যাপ্তি জ্ঞানাদি ব্যতীত কৃত্রাপি উহা জন্মে না। কিন্তু গোক্তরের ন্যায় কণাদও শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ খণ্ডন করার ভিত্তি যে শব্দরূপ হেতুর দ্বারা

গৌতমের প্রমাণ বিভাগে অপর পূর্বপক্ষ ও তাহার উত্তর।

পূর্বপক্ষ এই যে, “ঐতিহ্য” “অর্থাপত্তি” “সম্ভব” ও “অভাব” নামে আরও চারিটি প্রমাণ থাকায় প্রমাণ চতুর্বিধ নহে। গৌতম পরে (২২।১) “নচতুষ্টিঃ”—ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা নিজেই উক্ত পূর্বপক্ষের প্রকাশ করিয়া তদন্তের বলিয়াছেন যে, প্রমাণ চতুর্বিধই। কারণ, যাহা “ঐতিহ্য” প্রমাণ বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহা শব্দ প্রমাণে অন্তর্ভূত। এবং “অর্থাপত্তি” “সম্ভব” ও “অভাব” নামে যে প্রমাণত্রয় কথিত হইয়াছে, তাহা অনুমানপ্রমাণেই অন্তর্ভূত।

এখন ঐ “ঐতিহ্য” প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রমাণের স্বরূপও উহার উদাহরণ বুঝিলে ইহা বুঝা যাইবে। যে বাক্যের আদিবক্তা কে, তাহা জানা যায় না, এমন যে সমস্ত পরম্পরাগত প্রবাদ বাক্য, তাহার নাম “ঐতিহ্য”। যেমন কোন গ্রামে এইরূপ পরম্পরাগত প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, “এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে”। এইরূপ আরও বহুস্থানে বহু প্রবাদ বাক্য সুপ্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখনও অনেক আছে। সুপ্রাচীনকালে পৌরাণিক সম্প্রদায় উক্তরূপ প্রবাদ বাক্যকে “ঐতিহ্য” নামে পৃথক প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌতম উহাকে শব্দ প্রমাণই বলিয়াছেন। গৌতমের তাৎপর্য্য এই যে “ঐতিহ্য” মাত্রই প্রমাণ নহে। অনেক অতিরঞ্জিত বা অসত্যার্থ প্রবাদও আছে। তাহা কোন মতেই প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু যে সমস্ত প্রবাদ বাক্য সত্যার্থ বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, অর্থাৎ যাহার বক্তার নামাদি-পরিচয় না পাইলেও অন্ত প্রমাণের দ্বারা সেই বক্তার আশুত্ব নিশ্চয় করা যায়, সেই সমস্ত প্রবাদ বাক্যই প্রমাণ। সুতরাং তাহা ত শব্দ প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার্য্য। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন।

তাহার অর্থের অস্বাভাবিকতা বলিতেন না—ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কিরূপে কোন হেতুর দ্বারা শব্দ অস্বাভাবিকতা বিশেষ জন্মে, তাহা প্রশংসাপদও বলেন নাই। পরবর্ত্তী অনেক বৈশেষিকাচার্য্য কণাধের মত সমর্থন করিতে নানারূপ অনুমান প্রণালী প্রদর্শন করিয়া তাহা সমর্থন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় ও বিশেষ বিচার করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। সেই সমস্ত সুস্থ বিচার বৃদ্ধিতে ইহা সুলভ্য পাঠ করা আবশ্যিক।

মীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় “অর্থাপত্তি” নামে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন এবং বহু বিচার করিয়া উহা সমর্থন করিয়াছেন। ঐ অর্থাপত্তিও সামান্যতঃ “শ্রুতার্থাপত্তি” ও “দৃষ্টার্থাপত্তি” নামে তাঁহারা দ্বিবিধ বলিয়াছেন। বাহ্যলভয়ে বিস্তৃতভাবে উক্ত মতের ব্যাখ্যা করা এখানে সম্ভব নহে। তবে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, অর্থতঃ যে আপত্তি বা বোধ, এই অর্থে “অর্থাপত্তি” শব্দের দ্বারা সেই “অর্থাপত্তি” নামক প্রমাণ জ্ঞান বোধকে বুঝা যায় এবং যদ্বারা সেই অর্থতঃ “আপত্তি” বা বোধ জন্মে, এই অর্থে “অর্থাপত্তি” শব্দের দ্বারা সেই প্রমাণকে বুঝা যায়। যেমন কোন ব্যক্তির যথার্থ নিশ্চয় আছে যে, যজ্ঞদত্ত নামক ব্যক্তি জীবিত আছেন। কিন্তু তাহার পুত্রের নিকটে তিনি এই বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, “যজ্ঞদত্ত গৃহে নাই”। তখন তিনি ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝিলেন যে, যজ্ঞদত্ত বাহিরে আছেন। কারণ জীবিত ব্যক্তির বহিঃসত্তা ব্যতীত তাহার গৃহে অসত্তার উপপত্তি হয় না। সুতরাং উক্তরূপ অনুপপত্তি জ্ঞান জন্য তখন তাহার যে যজ্ঞদত্তের বহিঃসত্তার কল্পনারূপ বোধ হয়, উহা তাহার “অর্থাপত্তি” নামক জ্ঞান এবং পূর্বোৎপন্ন সেই অনুপপত্তি জ্ঞানই তাঁহার ঐ বোধের কারণ। কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান ঐরূপ বোধের কারণ না হওয়ায় ঐরূপ বোধকে অনুমিতি বলা যায় না। এবং পূর্বোক্ত বাক্যে যজ্ঞদত্তের বহিঃসত্তার বোধক কোন শব্দ না থাকায় ঐরূপ বোধকে শাব্দবোধও বলা যায় না। অতএব “অর্থাপত্তি” নামে পৃথক্ প্রমাণই স্বীকার্য।

কিন্তু গৌতম ঐ “অর্থাপত্তি” প্রমাণকে অনুমান প্রমাণই বলিয়াছেন। তাহার মতে পূর্বোক্ত স্থলে জীবিত যজ্ঞদত্তের যে গৃহে অসত্তা, তাহাতে বহিঃসত্তার ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্মই তাহাতে বহিঃসত্তার অনুমিতিই জন্মে। কারণ, জীবিত ব্যক্তির যখন গৃহে থাকে না, তখন তাহারা যে বাহিরেই থাকে, ইহা নিজ শরীরেই তাহারা প্রত্যক্ষ করে। তাহারা নিজ শরীরেই তখন বুঝে যে, তাহাতে বহিঃসত্তা নাই, তাহাতে জীবনের সহিত গৃহে অসত্তা নাই। ঐরূপে নিজ শরীরেই তাহাদিগের ঐ গৃহে অসত্তারূপ হেতুতে বহিঃসত্তার ব্যাপ্তি নিশ্চয় জন্মে। ঐরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে বলে “ব্যতিরেক ব্যাপ্তি” জ্ঞান।

অবশ্য মীমাংসক ও বৈদান্তিক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের

মতে “অন্বয়ব্যাপ্তির” জ্ঞানই সর্বত্র অনুমিতির কারণ হয়। কিন্তু পূর্বোক্তরূপ অর্থাপত্তি স্থলে “অন্বয় ব্যাপ্তি”র জ্ঞান ও সম্ভব হয়। কারণ, জীবিত যে সমস্ত ব্যক্তিতে গৃহে অসত্তা থাকে, তাহাতে বহিঃসত্তা থাকে, যেমন বিদেশস্থ আমি বা আমার এই শরীর, এইরূপে ও নিজ শরীরেই জীবন সহিত গৃহে অসত্তাতে বহিঃসত্তার ব্যাপ্তি নিশ্চয় জন্মে। বৈশেষিক দর্শনের উপস্থানে (৯২৭) শঙ্করমিশ্রও প্রথমে উক্তরূপ অন্বয় ব্যাপ্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্বোক্তরূপ কোন ব্যাপ্তিনিশ্চয়কৃত সংস্কার বাহার নাই, সেই ব্যক্তির পূর্বোক্ত স্থলে উক্তরূপ অনুপপত্তি জ্ঞানও জন্মিতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে “যজ্ঞদত্তো বহি রস্তি জীবিত্তে সতি গৃহেহসত্তাৎ”—এইরূপে সেই যজ্ঞদত্তে বহিঃসত্তার অনুমিতিই জন্মে, ইহা বলা যায়। তাহা হইলে “অর্থাপত্তি” নামে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা অনাবশ্যক। আর—“যজ্ঞদত্তঃ কচিদস্তি গৃহেনাস্তি” এই বাক্যদ্বয়ের বিরোধ ভঙ্গনের জন্ত বাহার “অর্থাপত্তি” নামে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদিগের যুক্তি ও বিচারসহ নহে। “সাংখ্য-তত্ত্ব-কৌমুদী”তে বাচস্পতি মিশ্র বিচারপূর্বক তাঁহাদিগের যুক্তি ও খণ্ডন করিয়াছেন।

“অর্থাপত্তি”র পৃথক্ প্রামাণ্যবাদীদিগের শেষ কথা এই যে, যে পদার্থ ব্যতীত যাহা উপপন্ন হয় না, সেই অনুপত্তমান পদার্থের দ্বারা তাহার উপপাদক পদার্থের যে কল্পনারূপ জ্ঞান, তাহাই অর্থাপত্তি নামক বথার্থ জ্ঞান। সুতরাং উক্তরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে “আমি ইহা কল্পনা করিলাম”—এইরূপেই সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায় জন্মে, ইহা অনুব্যবসায় বাদী সকলেরই স্বীকার্য। তাহা হইলে উহা যে অনুমিতি নহে, ইহাও স্বীকার্য। “বেদান্ত পরিভাষা” গ্রন্থে ধর্মরাজা ধর্মীন্দ্রও শেষে ঐ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্তরূপ স্থলে যে অনুমিতি বিশেষ জন্মে, তাহারই বিশেষ নাম “কল্পনা”। তাহাতে কল্পনাত্ব নামে বিশেষ ধর্মও স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু অনুমিতি হইতে ভিন্ন “কল্পনা” নামে কোন জ্ঞান স্বীকার অনাবশ্যক। কারণ, ঐ কল্পনাও যখন পূর্বোক্তরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না, তখন উহাতেও ঐ ব্যাপ্তি জ্ঞানকে করণ বলিয়াই স্বীকার করা যায়। তাহা হইলে পরে “ইয়ংকল্পনা, অনুমিতিঃ, ব্যাপ্তিজ্ঞান

করণকত্বাৎ—এইরূপে অনুমান প্রমাণের দ্বারা উক্ত “কল্পনা” নামক জ্ঞানের অনুমিতিত্বই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে “অর্থাপত্তি” নামক প্রমাণ যে, অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য।

এইরূপ পৌরাণিক সম্প্রদায়ের সম্মত “সম্ভব” নামক প্রমাণ ও অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত। যেমন সহস্র টাকা আছে, ইহা জানিলে শত টাকা আছে, ইহা বুঝা যায়। এক মণ চাউল আছে, ইহা জানিলে দশ সের চাউল আছে, ইহা বুঝা যায়। পৌরাণিক সম্প্রদায়ের মতে ঐ বোধ, “সম্ভব” নামক প্রমাণ জ্ঞাত। কারণ উক্তরূপ বোধ কোন হেতু ও তাহাতে ব্যাপ্তি জানাদির অপেক্ষা করেনা। কিন্তু গৌতম ঐরূপ জ্ঞানকেও অনুমিতিই বলিয়াছেন। কারণ সহস্র টাকা থাকিলে যে, তাহার মধ্যে শত টাকা অবশ্য থাকে, ইহা স্বাহারা জানে, তাহাদিগেরই সহস্র টাকার জ্ঞান হইলে শত টাকার জ্ঞান জন্মে। সুতরাং তাহাদিগের যে, সহস্র টাকায় শত টাকার ব্যাপ্তি নিশ্চয় জ্ঞাত সংস্কার থাকে, ইহা স্বীকার্য। সুতরাং তাহাদিগের উক্ত স্থলে সেই সংস্কার কৃত অতি শীঘ্রই সেই ব্যাপ্তির স্বরণ হওয়ায় তজ্জ্ঞাত শত টাকার অনুমিতিই জন্মে, ইহা বুঝা যায়। অতএব “সম্ভব” নামে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার অনাবশ্যক। **সম্ভব সম্প্রদায়ও ইহাই বলিয়াছেন।**

এইরূপ গৌতম “অভাব” নামক প্রমাণকেও অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন (১)। ভাব্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন বিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধে তাহার বিরুদ্ধ যে অবিদ্যমান পদার্থ অর্থাৎ তাহার যে অভাব, তাহা “অভাব” নামক প্রমাণ। যেমন বায়ুর সহিত মেঘের বিলক্ষণ সংযোগ হইলে তখন সেই মেঘ হইতে জল বর্ষণ হয় না। সুতরাং তখন সেই অবিদ্যমান জল বর্ষণ অর্থাৎ জল বর্ষণের অভাবের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই মেঘের সহিত বায়ুর

১। বটু প্রমাণবাদী কুমারিল ভট্ট এবং অনেক বৈদান্তিক সম্প্রদায় “অনুপলব্ধি” নামক যে, ঋত প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও “অভাব” নামেও কথিত হইয়াছে। “মানসোন্মাস” গ্রন্থে স্বদেশেরাচার্য্যও তাহাকেই “অভাব” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতম যে “অভাব” নামক প্রমাণকে অনুমানে অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন, উহা পূর্বোক্ত “অনুপলব্ধি” নামক প্রমাণ নহে। উহা কোন হুপ্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্মত পৃথক্ প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু বাচস্পতি দ্বিশ্রুতকৃষ্ণ সেই সম্প্রদায়ের নাম বলেন নাই।

বিলক্ষণ সংযোগ হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে সেই জল বর্ষণের অভাব জ্ঞান মান হইলে তখন উহার দ্বারা বায়ু ও মেঘের বিলক্ষণ সংযোগ সিদ্ধ হওয়ার সেখানে ঐ জ্ঞায়মান বর্ষণাভাবই সেবিষয়ে প্রমাণ হয়। বাস্প্যতি মিশ্র উক্ত স্থলে সেই জল বর্ষণাভাবের জ্ঞানকেই উক্তমতে “অভাব” নামক প্রমাণ বলিয়াছেন। উক্ত মতবাদীদিগের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, অভাব পদার্থ অনুমানের হেতু হয় না। কারণ অভাব পদার্থস্থ যে ব্যাপ্তি, তাহা অনুমানের অঙ্গ বলা যায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে বর্ষণের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা বায়ু ও মেঘের বিলক্ষণ সংযোগের অনুমিতি সম্ভব না হওয়ায় “অভাব” নামক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার্য।

কিন্তু গৌতম ঐ “অভাব” নামক প্রমাণকে অনুমানে অন্তর্ভূত বলিয়া অভাব পদার্থও যে অনুমানে হেতু হয়, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে অভাব পদার্থস্থ ব্যাপ্তি ও অনুমানের অঙ্গ বা প্রযোজক হইয়া থাকে। নচেৎ কার্য্যভাবের দ্বারা কারণাভাবের অনুমিতি হইতে পারেনা। তাহা হইলে তুল্য হায়ে কার্য্যভাবরূপ হেতুর দ্বারা সেই কার্য্যের প্রতিবন্ধক পদার্থের অনুমিতি ও স্বীকার্য। সুতরাং মেঘাভ্রের পরে বৃষ্টি না হইলে তখন সেই বৃষ্টির অভাব রূপ হেতুর দ্বারা সেই বৃষ্টির প্রতিবন্ধক যে বায়ু ও মেঘের বিলক্ষণ সংযোগ, তাহার অনুমিতিই জন্মে। অতএব উক্ত স্থলে “অভাব” নামে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করা অনাবশ্যক। মহর্ষি কণাদও “বিরোধ্য ভূতং ভূতশ্চ” (৩।১।১১) এই সূত্র দ্বারা উক্তরূপ স্থলে চতুর্থ প্রকার অনুমানই বলিয়াছেন।

গৌতম পরে (২।২।৮) ভাব পদার্থ হইতে ভিন্ন অভাব পদার্থও যে আছে, উহাও প্রমাণ সিদ্ধ, ইহাও বিচার পূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে (৯।১) কণাদ ও তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অভাব পদার্থের বোধের জন্ত “অনুপলব্ধি” নামক পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। (১) কারণ, তাঁহাদিগের মতে ভূতলাদি স্থানে চক্ষুঃ

(১) প্রমাণত্ব বাদী সাংখ্য সম্প্রদায় এবং পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুষ্টয় ও অর্থাপাত্ত এই পক্ষ প্রমাণ বাদী মীমাংসাগণ্য গুরু প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত অভাব পদার্থ স্বীকারই না করায় “অনুপলব্ধি” নামে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে ভূতলাদি স্থানে যে ঘটাবাদিক

সংযোগ হইলে তখন সেই স্থানস্থ অনেক অভাব বিশেষের সহিতও সেই চক্ষুরিঞ্জিরের সন্নিবর্ধ বিশেষ সম্ভব হয় এবং অত্যাচ্ছ ইঞ্জির গ্রাহ্য অত্যান্য অভাব বিশেষের সহিতও সেই সেই ইঞ্জিরের সন্নিবর্ধ বিশেষ সম্ভব হওয়ায় সেই সমস্ত অভাবেরও প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানই জন্মে। অভাব পদার্থের সহিত ইঞ্জিরের সন্নিবর্ধ হয় না, সুতরাং উহা ইঞ্জির গ্রাহ্য পদার্থ নহে, ইহা বলা যায় না। কারণ ঘট শূন্য ভূতলাদি স্থানে চক্ষুঃ সংযোগের পরে ঘটাভাবের যে বোধ জন্মে, তাহা চক্ষুঃ প্রত্যক্ষ বলিয়াই অনুভবসিদ্ধ। কারণ সেই স্থলে “ঘটাভাব মহং পশ্যামি” অর্থাৎ আমি ঘটাভাব দেখিতেছি—এইরূপেই সেই ঘটাভাবের বোধের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুভবসায় জন্মে। এবং কোন স্থানে কেহ কোন ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইলে তিনি আসিয়া বলেন যে, আমি চোখে দেখিয়া আসিলাম, তিনি সেখানে নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই যে সমস্ত অভাবের বোধ জন্মে, তাহার বোধের জন্য “অনুপলব্ধি” নামক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করা অনাবশ্যক। “বেদান্ত পরিভাষা” গ্রন্থে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র শেষে অভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করিয়াও অনুপলব্ধিকেই তাহার করণ বলিয়া অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে কোন প্রমাণ জন্য বোধে অন্য প্রমাণ সহকারী হইলেও সেই বোধে উহা করণ না হওয়ায় যেমন প্রমাণ হয় না, এইরূপ ঘটের যে অনুপলব্ধি, (অপ্রত্যক্ষ) তাহা ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সহকারী কারণ হইলেও করণ নাহওয়ায় প্রমাণ হইতে পারেনা।

কোন প্রাচীন সম্প্রদায় যে হস্তাদি অঙ্গের ক্রিয়া বিশেষরূপ চেষ্টাকেও লক্ষ্য প্রমাণ বলিতেন, ইহাও জানা যায়। তাঁহাদিগের মতে কাহারও হস্তাদি কোন অঙ্গের ক্রিয়া বিশেষরূপ চেষ্টার দ্বারা অর্থাৎ হস্তাদি অঙ্গের কোন ভঙ্গীর দ্বারা অপরের যে কোন বিষয়ে যথার্থ বোধ জন্মে, তাহা ঐ “চেষ্টা” নামক প্রমাণ জন্ত। কিন্তু প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, উহাও অনুমান প্রমাণের

যেহ হয়, সেই সমস্ত অভাব বস্তুতঃ সেই ভূতলাদি দেশ হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। তদনু ভূতলাদি স্থানই তখন ঐরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং অভাব নামে কোন অতিরিক্ত পদার্থই নাই।

অন্তর্গত। বস্তুতঃ হস্তাদি অস্ত্রের ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা কোন স্থলে যেমন পদার্থ বিশেষের অনুমিতি জন্মে, তদ্রূপ কোন চেষ্টা বিশেষের দ্বারা কোন বাক্য স্মরণ হওয়ায় তদ্বারা শব্দবোধও জন্মে, সুতরাং চেষ্টা নামে অভিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করা অনাবশ্যক। মূল কথা গোঁতমের মতে প্রমাণ চতুষ্টয়ই। তাই তিনি বলিয়াছেন—“প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি”। *

* গোঁতম পরে “নচতুষ্টয়ং”— ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া উহার খণ্ডন দ্বারা ও তাঁহার পূর্বোক্ত মত সমর্থন করিলেও প্রমাণত্রয় বাদী ভা সর্বজ্ঞ “স্মারসার” গ্রন্থে গোঁতমকেও প্রমাণত্রয় বাদী বলিয়া সমর্থন করিতে অনেক কল্লনা করিয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে, গোঁতমের মতেও উপমান শব্দ প্রমাণ বিশেষ। তাই তিনি উহা যে শব্দ প্রমাণ নহে, ইহা পরে বলেন নাই। কিন্তু উহা যে অনুমান প্রমাণ নহে, ইহাই বৃত্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। যাহারা শব্দ প্রমাণকে অনুমানই বলিতেন, তাহাদিগের মত যে, কোনরূপেই গ্রাহ্য নহে, ইহা বুঝাইতেই তিনি প্রথমে উপমান প্রমাণরূপ শব্দ প্রমাণ বিশেষকে গ্রহণ করিয়া অনুমান প্রমাণ হইতেই উহার স্পষ্ট ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভাসবর্কজের ঐ কল্লনা গ্রহণ করা যায় না। তাই অস্ত্র কোন সম্প্রদায়ই উহা গ্রহণ করেন নাই। অস্ত্র সকল সম্প্রদায়ের মতেই গোঁতম প্রমাণচতুষ্টয়বাদী এবং ভাসবর্কজের সম্প্রদায় “স্মারৈক দেশী” নামেই কথিত হইয়াছেন। “মানসোল্লাস” গ্রন্থে সুরেশ্বরচাৰ্য্যও বলিয়াছেন—“স্মারৈকদেশীনোহপ্যেবং”।

দশম অধ্যায়

ন্যাসদর্শনে বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষা।

বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষা করিতে মহর্ষি গৌতম প্রথমে নাস্তিকমতানুসারে
পূর্বপক্ষ স্বত্ব বলিয়াছেন—

“তদপ্রামাণ্যম্নত-ব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ” ॥ ২।১।৫৭ ॥

উক্ত সূত্রের প্রথমে “তৎ” শব্দের দ্বারা বেদই গৃহীত হইয়াছে। ‘তত্ত্ব
বেদস্ত অপ্রামাণ্যং’ ‘তদপ্রামাণ্যং’। অর্থাৎ বেদবিরোধী নাস্তিকের মত এই
যে, বেদের প্রামাণ্য নাই, বেদ প্রমাণ হইতে পারেনা,—যে হেতু বেদে
“অনৃত” অর্থাৎ মিথ্যা এবং “ব্যাঘাত” ও “পুনরুক্ত” দোষ আছে।
ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন নাস্তিকের কথানুসারে প্রথমে অনৃত দোষের উদাহরণ
বলিয়াছেন যে, বেদে আছে—“পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ঠা যজেত”। অর্থাৎ পুত্রার্থী
পুত্রেষ্ঠি যাগ করিবেন। পুত্রেষ্ঠি যাগ করিলে পুত্র জন্মে। কিন্তু কত স্থানে
কত ব্যক্তি পুত্রেষ্ঠি যাগ করিয়াও পুত্র লাভ করেন না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।
এইরূপ বেদে আছে—“কারীরী” যাগ করিলে বৃষ্টি হয়। কিন্তু বহু স্থানে
“কারীরী” যাগ করিলেও বৃষ্টি হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ আরও বহু
বহু বেদোক্ত কর্মের কোন ফলই হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সমস্ত
বৈদিক বিধিবাক্য মিথ্যা। তাৎপর্য্য এই যে, বেদোক্ত “পুত্রেষ্ঠি” ও “কারীরী”
প্রভৃতি যাগের ফল হইলে ইহকালেই তাহা প্রত্যক্ষ হইবে,—এজন্য ঐ সমস্ত
বেদবাক্য দৃষ্টার্থ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যও
যখন মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তদদৃষ্টান্তে অত্যাশ্রয় সমস্ত বেদবাক্যই
মিথ্যা, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ যাহার বহু বহু দৃষ্টার্থ বাক্যও মিথ্যা
বলিয়া বুঝা বাইতেছে, তিনি যে সাধারণ মনুষ্যের আশ্রয় ভ্রান্ত বা প্রতারক,
সুতরাং অনাপ্ত, এবিষয়ে সংশয় নাই। অতএব ঐরূপ ব্যক্তির কোন বাক্যই
প্রমাণ হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষবাদী নাস্তিকের দ্বিতীয় হেতু “ব্যাঘাতদোষ”। “ব্যাঘাত” বলিতে পরস্পর বিরোধ। ভাষ্যকার নাস্তিকের কথানুসারে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, বেদে আছে—অগ্নিহোত্রী “উদিত”কালে হোম করিবেন, “অনুদিত”কালে হোম করিবেন, “সময়াধ্যুষিত”কালে হোম করিবেন। স্বর্ঘ্যোদয়ের পরবর্তী কালের নাম “উদিত”কাল। স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে অরুণ-কিরণ ও অন্ন নক্ষত্রবিশিষ্ট কালের নাম “অনুদিত”কাল। স্বর্ঘ্য ও নক্ষত্রশূন্য-কালের নাম “সময়াধ্যুষিত” কাল। কিন্তু বেদে উক্ত কালত্রয়ে হোমের বিধান করিয়া পরেই আবার অগ্নি বাক্যের দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই ঐ হোমের নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং সেই নিন্দার দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই হোম যে অকর্তব্য, ইহাই বুঝা যায়। অতএব উক্ত স্থলে প্রথমোক্ত বিধিবাক্য এবং শেষোক্ত নিন্দার্থবাদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং উক্তরূপ ব্যাঘাত বা বিরোধ-বশতঃ পূর্বোক্ত সমস্ত বেদবাক্যই অপ্রমাণ এবং ঐ দৃষ্টান্তে অন্যান্য সমস্ত বেদবাক্যও অপ্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

পূর্বপক্ষবাদী নাস্তিকের তৃতীয় হেতু “পুনরুক্ত” দোষ। ভাষ্যকার নাস্তিকের কথানুসারে ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেদে আছে “ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং” (শতপথব্রাহ্মণ ১।৩.৫)। উক্ত বাক্যের দ্বারা একাদশ “সামিধেনী”র মধ্যে প্রথমা ঋক্ এবং উত্তমা ঋক্কে তিনবার পাঠ করিবে, ইহা কথিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যে মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিতে হইবে, তাহার নাম “সামিধেনী” ঋক্। বেদে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে— ৩।৫) একাদশটি “সামিধেনী” কথিত হইয়াছে এবং উহার পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাও আছে। তন্মধ্যে “প্রবোবাজা” ইত্যাদি ঋক্টি প্রথম, এবং উহার নাম “প্রবতী”, এবং সর্বশেষোক্ত “আজুহোতাশ্ববন্ত” —ইত্যাদি ঋক্টির নাম “উত্তমা”। বেদের “শতপথ ব্রাহ্মণ” প্রভৃতিতে উক্ত একাদশটি ঋকের মধ্যে প্রথমকে তিনবার এবং শেষোক্ত “উত্তমা”কে তিনবার পাঠ করিবে, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ প্রকাশ করিতে যে বাক্য বক্তব্য, তাহা একবার বলিলেই তাহার ফলসিদ্ধি হওয়ায় পুনরুক্ত তাহা বলিলে পুনরুক্তদোষ হয়। অতএব পূর্বোক্ত একই মন্ত্রের তিনবার পাঠ করিলে পুনরুক্তদোষ অবশ্যই হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে উক্তরূপ পুনরুক্তদোষপ্রযুক্ত বেদ অপ্রমাণ।

যদিও বেদের সর্বত্রই ঐরূপ পুনরুক্তদোষ নাই, কিন্তু যে অংশে ঐ দোষ আছে, তদৃষ্টান্তে বেদের অত্যাশ্রয় সমস্ত অংশও অগ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যে বক্তা ঐরূপ পুনরুক্তদোষও বুঝেন না, তিনি অজ্ঞ বা ভ্রান্ত। সুতরাং তাঁহার কোন বাক্যই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে পরে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন—

ন কশ্ম-কর্তৃ-সাধন-বৈগুণ্যং ॥ ২।১।৫৮ ॥

অভ্যাপেত্য কালভেদে দোষবচনাং ॥ ২।১।৫৯ ॥

অনুবাদোপপত্তেচ্চ ॥ ২।১।৬০ ॥

প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পুত্রোক্তি প্রভৃতি যাগের বিধায়ক বেদবাক্যে অন্তদোষ নাই। কারণ, কশ্ম, কর্তা ও ঐ কশ্মের সাধন বা উপকরণের বৈগুণ্যবশতঃ ও ফলাভাব হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, বেদবিহিত পুত্রোক্তি প্রভৃতি যাগ যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে উহা দেহী অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করে না। পুত্রোক্তি যাগে অবশ্যকর্তব্য অঙ্গযাগাদির অনুষ্ঠান না করিলে তাহা সেখানে কশ্মবৈগুণ্য, এবং ঐ যাগকর্তা পুরোহিত প্রভৃতি আবিধান অথবা পাতিত্যাदि কোন দোষে ঐ কশ্মে অনধিকারী হইলে তাহা সেখানে কর্তৃ-বৈগুণ্য; এবং ঐ যাগের সাধন দ্রব্যাদি অথবা মন্ত্র ও দক্ষিণার কোন দোষ হইলে উহা সেখানে সাধন-বৈগুণ্য। পূর্বোক্ত কশ্ম-বৈগুণ্য, কর্তৃ-বৈগুণ্য এবং সাধনবৈগুণ্য অথবা উহার মধ্যে যে কোন প্রকার বৈগুণ্যবশতঃ পুত্রোক্তি যাগ নিষ্ফল হইয়া থাকে। সুতরাং কোন স্থলে পুত্রোক্তি যাগের ফল না হওয়ায় তদ্বারা পূর্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যা স্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে যে রোগনিবৃত্তির জন্ত যে সকল উপকরণের দ্বারা যেরূপে যে ঔষধ প্রস্তুত করার বিধি আছে এবং রোগীর পক্ষে যেরূপ নিয়মে সেই ঔষধ সেবনের বিধি আছে, চিকিৎসক যদি সেই বিধি অনুসারে সেই ঔষধ প্রস্তুত না করেন, এবং রোগী যদি যথাবিধি তাহার ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে সেখানে সেই ঔষধসেবন তাহার পক্ষে নিষ্ফল হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই চিকিৎসাশাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ করা যায়?—তাহা কখনই করা যায় না। কারণ, অনেক স্থলে সেই চিকিৎসাশাস্ত্রের সত্যার্থতা

এখনও বুঝা যাইতেছে। এখনও বহু রোগী সেই চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ঔষধসেবন করিয়া নিরাময় হইতেছেন। এইরূপ পুত্রোষ্টিযাগের অমূল্যতা করিয়াও বহু ব্যক্তি পুত্রলাভ করিয়াছেন এবং কারীকী যাগের পরেই অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা মিথ্যা বলিবার কোন প্রমাণ নাই।*

বেদে পূর্বোক্ত “ব্যাঘাত” দোষও নাই, ইহা বুঝাইতে গৌতম দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন,—“অভ্যাপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ”। অর্থাৎ বেদে “উদিত” “অনুদিত” ও “সময়াধ্যুষিত” নামক কালত্রয়ে হোমের বিধান করিয়া পরেই যে, আবার উক্ত কালত্রয়েই হোমের নিন্দা করা হইয়াছে, ঐ সমস্ত নিন্দার্থবাদের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি উদিতকালেই হোম করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন, সেই অগ্নিহোত্রী সেই পূর্ববীকৃত কাণ্ডকে ত্যাগ করিয়া “অনুদত” অথবা “সময়াধ্যুষিত” নামক কাণ্ডে হোম করিলে উহা নিন্দিত। এইরূপ “অনুদিত” অথবা “সময়াধ্যুষিত” নামক কাণ্ডে হোমের সংকল্প করিয়া কালান্তরে হোম করিলে সেই হোমও নিন্দিত। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী প্রথমে তাঁহার গৃহীত কালবিশেষেই যাবজ্জীবন হোম করিবেন। কখনও কালান্তরে হোম করিলে উহা সিদ্ধ হইবে না। বস্তুতঃ বেদে “উদিতে হোতব্যং” “অনুদিতে হোতব্যং” এবং “সময়াধ্যুষিতে হোতব্যং”—এই তিনটি বিধিবাক্যের দ্বারা কল্পত্রয়ে অগ্নিহোত্র হোমে উক্ত কালত্রয়ের বিধান হইয়াছে। সমস্ত অগ্নিহোত্রীই উক্ত কালত্রয়েই

* বেদবিরোধী বৌদ্ধসম্প্রদায় পরে গৌতমের উক্ত উক্তরের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, পুত্রোষ্টি যাগের নিফলত্ব যে, কর্ম্মাদির বৈশুণ্যপ্রযুক্তই, এ বিষয়ে ত কোন প্রমাণ নাই। উক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রযুক্তই উহা নিফল হয়, ইহাও ত বলিতে পারি। বদাচিং কাহারও পুত্রোষ্টি যাগের পরে পুত্র জন্মিলেও তাহা যে ঐ পুত্রোষ্টি যাগের ফল, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করা যায়? এতদূতরে তৎকালে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উদ্ভাস্তকর—“স্বায় বার্হিক” গ্রন্থে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি শেষকথা বলিয়াছেন যে, কর্ম্মাদির বৈশুণ্য—প্রযুক্তও যখন পুত্রোষ্টি যাগের নিফলত্ব সম্ভব হয়, তখন উহার দ্বারা উক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, - ইহাই আমাদেরিগ্গঃ এখানে বক্তব্য। সুতরাং তোমরা পূর্বে উক্ত মিথ্যাত্বকে সিদ্ধ বলিয়াও পরে আবার বাধ্য হইয়া যদি বল, উহা সন্দিদ্ধ, তাহা হইলেও ত উহার দ্বারা উক্ত বেদ বাক্যের অপ্ৰামাণ্য সিদ্ধ করিতে পার না। কারণ, যাহা সন্দিদ্ধ, তাহাও প্রকৃত হেতুই নহে—কিন্তু হেতুভাস, ইহা তোমাদিগেরও স্বীকৃত।

হোম করিবেন,—ইহা ঐ সমস্ত বিধিবাক্যের অর্থ নহে। কিন্তু উহার দ্বারা “বিকল্প”ই অভিপ্রেত। অর্থাৎ উক্ত কালত্রয়ের মধ্যে আত্ম-তুষ্টি অনুসারে যাহার যে কালে হোম করিতে ইচ্ছা, তিনি সেই কালেই হোম করিবেন। ব্যক্তিভেদে উক্ত কালত্রয়ে হোমই উক্ত স্থলে কর্তব্য বলিয়া ব্যবস্থিত। যে স্থলে দ্বিবিধ শ্রুতি আছে, অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা দ্বিবিধ ধর্মই বিহিত হইয়াছে, সেখানে সেই উভয়ই ধর্ম, ইহা বলিয়া ভগবান্ মনুও পূর্বোক্ত উদ্ভিতাদি কালত্রয়ে হোমকে ইহার উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন (১)। সংহিতাকার মহর্ষি গৌতম স্পষ্ট বলিয়াছেন—“তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ”। অর্থাৎ তুল্যবল অনেক বিধিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে সেখানে বিকল্পই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বিরোধ না থাকায় সেই সমস্ত বিধিবাক্যের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। যেমন বেদে বিধিবাক্য আছে—“ব্রীহিভির্ষা যজ্ঞেত, যবৈর্ষা যজ্ঞেত”। অর্থাৎ যাগ বিশেষে ব্রীহির দ্বারা যাগ করিবে, অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে। অর্থাৎ ব্রীহির দ্বারা যাগ ও যবের দ্বারা যাগ উভয়ই তুল্যফল। সুতরাং আত্মতুষ্টি অনুসারে যাহার যে কালে ইচ্ছা, তিনি সেই কালেই গ্রহণ করিবেন। ভগবান্ মনুও পূর্বোক্তরূপ বিকল্পস্থলেই আত্মতুষ্টিকে ধর্মের নির্ণায়ক বলিয়াছেন। তিনি সর্বত্রই আত্মতুষ্টি অনুসারে ধর্মনির্ণয় কর্তব্য বলেন নাই। কিন্তু যে স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি অথবা সদাচারের দ্বারা দ্বিবিধ বা বহুবিধ ধর্ম বুঝা যায়, সেখানে ধর্মের নির্ণায়ক কি? তাই মনু পরে বলিয়াছেন—“আত্মন-স্তৃষ্টিরেব চ” (২।৬)।

বেদে পূর্বোক্ত পুনরুক্ত দোষও নাই, ইহা বুঝাইতে গৌতম পরে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—“অনুবাদোপপত্তেচ্চ”। অর্থাৎ বেদে “ত্রিঃ প্রথমা মবাহ ত্রিকৃতমাং”—এইরূপ উক্তি থাকিলেও তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, উহা “অনুবাদ”। অনর্থক পুনরুক্তিই পুনরুক্ত দোষ। কিন্তু সার্থক

(১) শ্রুতিবৈধিক্ত যজ্ঞ শ্রাৎ তত্র ধর্মাবুভৌ স্মৃতৌ।

উভাবপি হি তৌ ধর্মৌ সম্যগুভৌ মনাবিভিঃ ॥

উদ্ভিতংহুদিতং চৈব সম্যগুদ্ভিতে তথা।

সর্বথা বর্তন্তে যজ্ঞ ইত্যায়ং বেদিকী শ্রুতিঃ ॥ মনুসংহিতা ১২।১৪।১৫।

পুনরুক্তির নাম অনুবাদ। লৌকিক বাক্যেও ঐরূপ অনুবাদ আছে, উহা দোষ নহে। কারণ উহার প্রয়োজন আছে। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইতে বেদের “ইদমহং ব্রাহ্মব্যং পঞ্চদশাবরেণবাগ্‌বজ্জ্ঞেণ” ইত্যাদি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্ত মন্ত্রে পূর্বোক্ত একাদশ “সামিধেনী”র পঞ্চদশত্ব শ্রুত হয়। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? তাই বেদে কথিত হইয়াছে, “ত্রিঃ প্রথমা মবাহ ত্রিৰুত্তমাং।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত একাদশটি সামিধেনীর মধ্যে প্রথমাকে তিনবার এবং “উত্তমা” অর্থাৎ শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে। তাহা হইলে প্রথমটির দুইবার ও শেষটির দুইবার অধিক পাঠ হওয়ায় ঐ একাদশ সামিধেনীর উক্তরূপে পাঠ দ্বারা পঞ্চদশ মন্ত্র সম্ভব হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত একাদশ মন্ত্রের মধ্যে প্রথমটির তিনবার ও শেষটির তিনবার পাঠ হইলে সেই পাঠভেদে মন্ত্রভেদ বশতঃ ছয় মন্ত্র এবং মধ্যবর্তী নয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পঞ্চদশ মন্ত্র হইবে (১)। উক্তরূপে পূর্বোক্ত একাদশ মন্ত্রের পঞ্চদশত্ব-সম্পাদনের জন্তই বেদে পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি বিহিত হইয়াছে। সুতরাং উহা পুনরুক্ত দোষ নহে। ফলকথা, পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ঐরূপ পুনরাবৃত্তি ব্যতীত শেষোক্ত পঞ্চদশত্ব-বোধক মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি হয় না। সুতরাং সেই মন্ত্র পাঠ করা যায় না। কিন্তু সেই যাগবিশেষে উহা অবশ্য পাঠ্য, নচেৎ তাহার ফলসিদ্ধি হয় না। অতএব বাগের ফল-সিদ্ধির জন্ত উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি অবশ্য কর্তব্য। তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, উহা সপ্রয়োজন বলিয়া উহাকে বলে “অনুবাদ”।

মহর্ষি গৌতম পরে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যে, (১) বিধি, (২) অর্থবাদ ও (৩) অনুবাদ নামে ত্রিবিধ বাক্যবিভাগ আছে—ইহা বলিয়া উক্ত বিধি প্রভৃতির লক্ষণ এবং “অর্থবাদ” ও “অনুবাদে”র প্রকারভেদও বলিয়াছেন এবং পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া অনুবাদ ও পুনরুক্তের যে বিশেষ আছে, ইহাও

১। এখানে ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যিক যে, উচ্চারণভেদে উক্ত মন্ত্রের ভেদ ব্যতীত যখন একাদশ মন্ত্রের পঞ্চদশত্ব সম্ভব হয় না, তখন ঐ ভেদও উক্ত শ্রুতি সিদ্ধ হওয়ায়, ঐ মন্ত্রের স্থিরত্ব বা অভিন্নত্ব স্বীকার করা যায় না। সুতরাং উহার নিত্যত্ব ও সমর্থন করা যায় না। কণাদ ও গৌতমের মতে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্তু তজ্জাতীয় অপর শব্দের উচ্চারণই শব্দের পুনরাবৃত্তি। সেই সমস্ত শব্দই উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন ও অনিত্য। উক্ত সিদ্ধান্তে পূর্বোক্ত শ্রুতি ও মূল বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

পরে সমর্থন করিয়াছেন। লৌকিক বাক্যের শ্রায় বেদেও পূর্বোক্ত বিধিবাক্য-
অর্থবাদবাক্য ও অনুবাদবাক্যরূপ বাক্যবিভাগ থাকায় লৌকিক বাক্যের শ্রায়
বেদের প্রামাণ্য যে সম্ভাবিত এবং উহার বাধক কিছুই নাই, ইহা প্রতিপন্ন
করিয়া গৌতম পরে উহার সাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন—

মন্ত্রায়ুর্বেদ-প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্ত-প্রামাণ্যং ॥২।১।৬৮॥

তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবর্তক অনেক মন্ত্র আছে,
যাহার যথাবিধি প্রয়োগ করিলে তদ্বারা বিষাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা
পরীক্ষিত সত্য। এইরূপ স্মপ্রাচীন কাল হইতেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রের
সত্যার্থতা পরীক্ষিত। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের যথোক্ত সত্যার্থতাই উহার
প্রামাণ্য। কিন্তু ঐ প্রামাণ্যের হেতু কি? ইহা বিচার করিতে গেলে
ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বক্তা সেই
সমস্ত তত্ত্বদর্শী আপ্তপুরুষ। অর্থাৎ সেই আপ্তপুরুষের প্রামাণ্যই মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ
শাস্ত্রের প্রামাণ্যের হেতু। এইরূপ স্বথেন্দ প্রভৃতি চতুর্বেদেও যে সমস্ত অলৌকিক
তত্ত্বের বর্ণন হইয়াছে, তাহাও সেই সমস্ত তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিত্ব আর কাহারও জ্ঞানের
গোচরই হইতে পারে না। সূতরাং ঐ সমস্ত অলৌকিক তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যে
সর্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার্য্য এবং তিনি যে জীবের মঙ্গলবিধান ও হুঃখবিমোচনে ইচ্ছুক
হইয়া তাঁহার যথাদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, ইহাও স্বীকার্য্য। পূর্বোক্ত
তত্ত্বদর্শিতা এবং জীবে দয়া প্রভৃতিই তাঁহার আপ্তত্ব, তাই তিনি প্রমাণ পুরুষ।
সূতরাং তাঁহার প্রামাণ্যপ্রযুক্ত বেদ প্রমাণ। যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ।

অবশ্য বেদেও বহুরোগ নিবারক অনেক অব্যর্থ মন্ত্রও ঔষধের উল্লেখ আছে।
কিন্তু উক্ত সূত্রে গৌতম যে, মন্ত্রও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ
করিয়াছেন, তাহা মূল বেদ হইতে ভিন্ন। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের ব্যাখ্যার
দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। “শ্রায় মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতিও বিচার পূর্বক
সমর্থন করিয়াছেন যে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মূল বেদ নহে। বস্তুতঃ বিষ্ণু পুরাণেও
অষ্টাদশবিধার উল্লেখ করিতে পরে আয়ুর্বেদের পৃথক উল্লেখই হইয়াছে (১)।

(১) অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা শ্রায়বিস্তরঃ।

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দশ ॥

সুশ্রুতও আয়ুর্বেদকে অধর্ষবেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন (২) এবং পরে “আয়ুর্বেদ” শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বারা উহার অন্তর্গত বেদ শব্দের অর্থ যে শ্রুতি নহে, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ম্ভুই যে প্রথমে অধর্ষবেদের উপাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ইহাও তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন। গরুড় পুরাণেও (পূর্বখণ্ড ১৪৯ অঃ) কথিত হইয়াছে যে স্বঃ পরমেশ্বরই ধনন্তরিক্সে অবতীর্ণ হইয়া সুশ্রুতকে আয়ুর্বেদ বলিয়াছিলেন। গৌতমের উক্ত হস্ত্রের দ্বারাও বুঝা যায় যে, আয়ুর্বেদ সর্বজ্ঞ আপ্ত পুরুষের বাক্য।

কিন্তু বাৎস্তায়ন পরে মূল বেদের অন্তর্গত “গ্রামকামো যজ্ঞেত”—ইত্যাদি দৃষ্টার্থক বিধিবাচ্যকেও দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ গ্রামার্থী অধিকারীর পক্ষে বেদে “সাংগ্রহী” নামক যাগ বিহিত হইয়াছে এবং উহার ইতিকর্তব্যতাও কথিত হইয়াছে। যথাবিধি ঐ যাগের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকেই গ্রাম লাভ হয় অর্থাৎ কোন গ্রামের অধিপতি হওয়া যায়। অনেক ব্যক্তিই ঐ যাগ করিয়া গ্রাম লাভ করায় উক্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের প্রামাণ্য পরীক্ষিত। “শ্রায় মঞ্জরী”কার জয়ন্তভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, আমার পিতামহই (কল্যাণ স্বামী) “সাংগ্রহী” যাগ করিয়া—“গৌরমূলক” নামক গ্রামলাভ করিয়াছিলেন। ফলকথা বাৎস্তায়ন পরে মূলবেদের অন্তর্গত ঐ সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যকেও দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া সমস্ত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গৌতমও পূর্বোক্ত হস্ত্রে “চ” শব্দের দ্বারা সেই সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্য এবং অশ্রুত লৌকিক সত্যার্থ বাক্যকেও দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন,—ইহা বুঝা যায়। কারণ, গৌতমের মতে আপ্ত পুরুষের প্রামাণ্য প্রযুক্তই তাঁহার বাক্যের প্রামাণ্য। তাই তিনি বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতেও সামান্ত্রতঃ হেতু বলিয়াছেন— “আপ্ত প্রামাণ্যাতঃ”।

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্থস্ত বিদ্যা হৃষ্টাদশৈব তু ॥—বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ৬।

(২) ইহ খল্লায়ুর্বেদো নাম যহপাঙ্গমধর্ষবেদশ্রাব্যংপাণ্ডেব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রক কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ। ততোহল্লায়ুষ্টিমল্লমেধস্বকাবলোক্য নরাণাং ভূয়োহষ্টধা প্রণীতবান। সুশ্রুত-সংহিতা—১ম অঃ ॥

অবশ্য গৌতমের মতে বেদ কৰ্ত্তা সেই আশু পুরুষ কে, তাহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু সেই নিত্য সৰ্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষই যে, বেদের আদি বক্তা বা কৰ্ত্তা, ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ ও যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া গৌতমের ও উক্তরূপ মত অবশ্যই বুঝা যায়। “তাৎপর্য টীকা”কার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও পরে গৌতমের তাৎপর্য সূত্রাক্রমে বলিয়াছেন যে, জগৎকৰ্ত্তা পরমেশ্বর নিত্য সৰ্ব্বজ্ঞ ও পরম কাৰুণিক। সুতরাং তিনি সৃষ্টির পরে মানবগণের হিতার্থ নানা উপদেশ অবশ্যই করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত প্রথম উপদেশ বা বাক্যই বেদ। বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যবস্থাপক সেই বেদই সকল শাস্ত্রের আদি ও মূল। এবং উহাই ঋষি মহর্ষি মহাজনদিগের পরিগৃহীত। এই রূপ বিষাদি নাশক অগ্নি অনেক মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও সেই নিত্যসৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর কর্তৃক উক্ত এবং তাহার প্রামাণ্য ইহলোকেই পরীক্ষিত। সুতরাং ঐ মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ন্যায় বেদও নিত্যসৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর কর্তৃক উক্ত বলিয়া উহার প্রামাণ্য স্বীকার্য। পরন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও বেদোক্ত “শান্তিক” ও “দৌষ্টিক” বস্তুগুলির অনুষ্ঠান এবং রাসায়নাদিক্রিয়াক্রমে বেদবিহিত চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের কর্তব্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং যাহার প্রামাণ্য পরীক্ষিত সর্বসম্মত, সেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হওয়ায় তদ্বারাও উহার প্রামাণ্য ও মহাজনপরিগ্রহ নিশ্চয় করা যায়। বাচস্পতি মিশ্র যোগদর্শন-ভাষ্যের টীকাতেও (১২৪) গৌতমের উক্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ নিত্যসৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর প্রণীত। তিনি ভিন্ন আর কেহই প্রথমে ঐ সমস্ত অব্যর্থফল মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলিতেই পারেন না। এইরূপ আর কেহই প্রথমে অভ্যাদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপদেশক অসংখ্য অলৌকিক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের প্রতিপাদক বেদবাক্য সমূহ বলিতেই পারেন না। তাঁহার নিত্য সৰ্ব্বজ্ঞতাই শাস্ত্রের মূল। সুতরাং তাঁহার নিত্য সৰ্ব্বজ্ঞতারূপ প্রামাণ্যবশতঃ যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রমাণ, তদ্রূপ বেদও অবশ্যই প্রমাণ, ইহা স্বীকার্য (১)। বাচস্পতি মিশ্রের পরে উদয়নাচার্য্য জয়ন্ত ভট্ট এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি মহা নৈয়ায়িকগণও বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

১। পরমেশ্বর কোন প্রমাণের করণরূপ প্রমাণ না হওয়ায় গৌতম প্রথমোক্ত প্রমাণ পদার্থের মধ্যে পঞ্চম প্রমাণরূপে তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রমাতা অর্থে পরমেশ্বরও

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন—“তত্ত্বচিনাদান্নায়—প্রামাণ্যং” (১।১।৩)। “কিরণাবলী” টীকায় “উদয়নাচার্য্য” কণাদের উক্ত হৃত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“তত্ত্বচিনাৎ তেনেশ্বরেণ প্রণয়নাৎ” (১)। কিন্তু ঐ “তৎ” শব্দের দ্বারা অব্যবহিতপূর্ষ হৃত্রোক্ত ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া “তত্ত্বচিনাৎ,” ধর্ম্মবচনাৎ ধর্ম্ম প্রতিপাদকত্বাৎ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও কণাদের মতেও বেদ যে, সেই নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর প্রণীত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, কণাদ পরে বলিয়াছেন—“বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্বেদে” (৬।১।১)। অর্থাৎ লৌকিক বাক্যরচনার স্থায় বেদ বাক্যের যে রচনা, তাহা কাহারও বুদ্ধি পূর্ব্বক অর্থাৎ সেই বেদার্থ বিষয়ক জ্ঞানজন্য। কিন্তু সেই সমস্ত অলৌকিক বেদার্থ জ্ঞান ত আর কাহারও নিত্যসিদ্ধি হইতে পারে না। আর কেহই ত প্রথমে সেই সমস্ত অলৌকিক ধর্ম্ম প্রতিপাদক বেদ-বাক্য বলিতে পারেন না। সুতরাং কণাদ অভূদয়ও নিঃশ্রেয়সের সাধক ধর্ম্মের

প্রমাণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাহার সহস্র নামের মধ্যেও উক্ত অর্থে—“প্রমাণ”ও তাহার একটি নাম বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত হৃত্রে গৌতম যে, “আপ্ত প্রামাণ্য” বলিয়াছেন, তাহার অর্থ আপ্তপুরুষের প্রমাতৃত্ব। পরমেশ্বরই সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয়ক প্রমাণ আছে, কোন কালেই তাহার অস্তাব নাই। গৌতমের মতে উক্তরূপ প্রমাতৃত্ব অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক প্রমাণতাই পরমেশ্বরের প্রামাণ্য। মহা নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও বিচারপূর্ব্বক ইহাই বলিয়াছেন—“মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তি শুদ্ধতা চ প্রমাতৃত্বা। তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে”। কুহ্মাঞ্জলি ১৪।৫।

১। উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া উদয়নাচার্য্য পরে নিরাকার পরমেশ্বর কিরূপে বেদের উচ্চারণ করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, তিনি দেহ ধারণ করিয়াই প্রথমে বেদের উচ্চারণ করেন। তাহার সেই প্রথম বেদোচ্চারণই বেদের রচনা। কিন্তু “কুহ্মাঞ্জলি”র পঞ্চম স্তবকে উদয়নাচার্য্য ইহাও বলিয়াছেন যে, বেদের “কাঠক” ও “কালাপক” প্রভৃতি শাখা বিশেষের ঐ সমস্ত নামের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে “কঠ” ও “কলাপ” প্রভৃতি নামক ঋষি সেই সমস্ত শাখাবিশেষের আদি বক্তা। নচেৎ ঐ সমস্ত শাখার ঐ সমস্ত নাম হইতে পারে না। সেখানে উদয়নাচার্য্যের মত ইহাই বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরই “কঠ” প্রভৃতি নামক শরীর ধারণ করিয়া অথবা সেই সমস্ত ঋষি শরীরে আবিষ্ট হইয়া প্রথমে বেদের ঐ সমস্ত শাখা বলিয়াছেন। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও “ঈশ্বরাত্মমানচিত্তামণি” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর সময়ে ভূতাবশের স্থায় বহু ব্যক্তির শরীরে আবিষ্ট হইয়াও তাহাদিগের দ্বারা নানা বিষয়ে বোঝা-শিক্ষার প্রবর্তন করেন।

প্রতিপাদকত্ব হেতুর দ্বারা বেদকে প্রমাণ বলিলেও তাঁহার মতে ও সেই “স্বাশ্রিত ধর্মগোষ্ঠা” পরমেশ্বরই যে বেদের আদি কর্তা, সূত্ররাং তাহার প্রামাণ্য-প্রযুক্তই বেদ প্রমাণ, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। *

অবশ্য বেদ নিত্য,— ইহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। পূর্ব মীমাংসা দর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও বেদের নিত্যত্ব সমর্থনোদ্দেশ্যে প্রথমে বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্ব সমর্থন করিতে চরম সূত্র বলিয়াছেন—“লিঙ্গদর্শনাচ্চ” (১।১।২৩)। ভাষ্যকার শবরস্বামী সেখানে “বাচা বিরূপ নিত্যয়া”—এই শ্রুতিবাক্যকে জৈমিনির উক্ত মতের সাধক চরম লিঙ্গ বা হেতু বলিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যে “নিত্যয়া বাচা” এই উক্তির দ্বারা শব্দের নিত্যত্বই শ্রুতিসম্মত বুঝা যায়। সূত্ররাং শ্রুতি-বিরুদ্ধ কোন অনুমানের দ্বারাই শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না—ইহাই জৈমিনির চরম কথা। কিন্তু কণাদ ও গৌতম উভয়েই বিচার পূর্ষক শব্দের নিত্যত্ববাদের খণ্ডন করিয়া অনিত্যত্ব পক্ষেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে কোন শব্দই উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্য বা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। পরন্তু বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্ব মতেও পদ ও বাক্যের নিত্যত্ব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ অনেক বর্ণের যোজনার দ্বারাই একটি পদের নিষ্পত্তি হয় এবং অনেক পদের যোজনার দ্বারাই বাক্যের নিষ্পত্তি হয়। ভামতী টীকায় (১।১।৩) শ্রীমদ্ বাচস্পতি গির্শিও ইহা বিশদরূপে সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু বর্ণের নিত্যত্ব প্রযুক্ত বর্ণময় বেদবাক্য নিত্য হইলে সমস্ত লৌকিক বাক্যও নিত্য কেন হইবে না? তাহা হইলে কোন বাক্যই ত অপ্রমাণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন উক্ত বিষয়ে মীমাংসকের যুক্তি খণ্ডন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ যুগান্তর ও মনুষ্যের সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্যই বেদের নিত্যত্ব। অর্থাৎ এক দিব্য যুগের পরে অপর দিব্য যুগের প্রারম্ভে এবং এক মনুষ্যন্তরের পরে অপর মনুষ্যন্তরের

* স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কণাদের মতে অনুমানরূপেই শব্দের প্রামাণ্য—এই প্রসিদ্ধ মতেও বেদের প্রামাণ্য আছে। কণাদও প্রথমে উক্ত সূত্রের দ্বারা তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। কিন্তু বশে হইতে প্রকাশিত কোন বেদান্তদর্শন পুস্তকের ভূমিকায় দক্ষিণাত্য কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও অনেকে লিখিয়াছেন যে, ‘বৈশেষিক সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করায় তাঁহার নাস্তিকই’। এ বিষয়ে আর কি বলিব। তবে ঐক্য অপসিদ্ধান্তের বহুল প্রচার যে বড় আশঙ্কা ও দুঃখের কারণ, ইহা অবশ্য বক্তব্য।

প্রারম্ভেও বেদের অধ্যাপক অধ্যোতা ও বেদাধ্যয়নাদি অব্যাহত থাকে এবং চিরদিনই ঐরূপ সময়েও উহা অব্যাহত থাকিবে—এই তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে বেদ নিত্য, ইহা বলা হইয়াছে। *

কিন্তু মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ যে সময়ে সত্যলোকেরও বিনাশ হওয়ায় সত্য-লোকস্থ ব্রাহ্মণও দেহ নাশ হয়, তখন বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ অবশ্যজ্ঞাবো। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার কিরূপে বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়, ইহা অবশ্য বক্তব্য। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উক্তস্থলে শেষে ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—“মহাপ্রলয়েতু ঈশ্বরেণ বেদান্ প্রণীয় সৃষ্টাদৌ স্বয়মেব সম্প্রদায়ঃ প্রবর্ত্যত এবোতি ভাবঃ”। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সমস্ত বেদ প্রণয়ন করিয়া সৃষ্টির প্রথমে স্বয়ংই সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। তিনি বদ্ধ জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই আবার জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ করেন। যোগদর্শন-ভাষ্যে (১।২৫) বাসদেবও বলিয়াছেন—“তত্ত্ব আত্মানু গ্রহাভাবেহপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনং, জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্প-প্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষানুদ্বিরম্যামীতি”। কন্ম মীমাংসক সম্প্রদায়

* এখানে বলা আবশ্যক যে, নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সকল বেদার্থ বিষয়ে যে প্রজ্ঞা বা নিত্য জ্ঞান, তাহা “বেদ” শব্দের বাচ্য নহে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক বর্ণাঙ্কক শব্দরাশিই “বেদ” শব্দের বাচ্য। মহর্ষি আপস্তম্বও স্পষ্ট বলিয়াছেন—“মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ং”। মুণ্ডক উপনিষদের প্রথমে যে ঋগ্বেদ প্রভৃতিঃক অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে, তাহা সেই সমস্ত শব্দরাশি। ভাষ্যকার শঙ্করও সেখানে উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—“বেদ শব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিক্ষিতঃ”। সুতরাং বেদান্ততর উপনিষদে “যো বৈ বেদাংশু গ্রহিণোতি তস্মৈ” (৬।৮) এই শ্রুতিবাক্যেও বহুবচনান্ত “বেদ” শব্দ দ্বারা সেই সমস্ত শব্দ রাশিই বুঝিতে হইবে। সুতরাং উহা নিত্য কি অনিত্য, ইহাই বিচার্য্য এবং তদ্ বিবর্ত্তই মত ভেদ। অতঃ মহর্ষি পতঞ্জলি বর্ণাঙ্কক শব্দ হইতে ভিন্ন “ফোট” নামক নিত্য শব্দ ও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বা আর কোন ঋষিই পরমেশ্বরের বেদার্থ বিষয়ক প্রজ্ঞা অথবা চিরসত্য বৈদিক তত্ত্বকে “ফোট” বলেন। পতঞ্জলির সমস্ত “ফোট” নামক অতিরিক্ত শব্দ ও আর কেহই স্বীকার করেন নাই। শাস্ত্রীয় ভাষ্যে (১।৩।২৮) আচার্য্য শঙ্করও ফোট-বাদে দোষ প্রদর্শন করিয়া উপবর্ধমূনির মতই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন—“বর্ণাএবতু শব্দ ইতি ভগবান্নপবর্ধঃ”। পানিনির কোন সূত্রেও “ফোট” নামক নিত্য শব্দের উল্লেখ নাই। শুনা যায়—পানিনিও উপবর্ধমূনির শিষ্য ছিলেন।

উক্তরূপ প্রলয় অস্বীকার করিয়াই বেদের সম্প্রদায়ের অনুচ্ছেদ ও নিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রলয় এবং পরে পুনঃ সৃষ্টি—শাস্ত্র সিদ্ধ ও যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া অত্র সম্প্রদায় উক্ত মীমাংসক মত গ্রহণ করেন নাই।

ত্ৰায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরবর্তী কোন কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত শাস্ত্র বাক্যে বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে—তাহা বেদের স্ততি মাত্র। উহার দ্বারা বেদ যে বস্তুতঃই উৎপত্তিবিনাশশূন্য নিত্য, ইহা বুঝা যাইতে পারে না। কারণ, যাহা অসম্ভব, তাহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহা স্বীকার্য যে, কর্তৃমীমাংসক সম্প্রদায়ও বেদাদি শাস্ত্রের অনেক বাক্যকে স্ততিরূপ অর্থবাদ বলিয়া নিজমতের উপপাদন করিয়াছেন। যেমন বেদবাক্য আছে—“বনস্পত্যঃ সএমাসত”। কিন্তু বৃক্ষগণের যজ্ঞ কর্তৃত্ব অসম্ভব বলিয়া উহা যে, যজ্ঞের স্ততিরূপ অর্থবাদ, ইহা পূর্বমীমাংসা ভাষ্যে শবরস্বামীও স্পষ্ট বলিয়াছেন। এইরূপ বেদ সম্বন্ধেও তাঁহারা অনেক শাস্ত্র বাক্যকে অর্থবাদই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদ সেই পরমেশ্বরের পরম বিভূতি। তাই বেদও তাঁহাকে অভিন্নরূপে ধ্যানের জগ্ন বেদকে সনাতন পরব্রহ্মও বলা হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মরূপা সরস্বতীকে “বাক্” বলিয়া নিত্য বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে বেদমূর্তিও বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—“ঋক্‌সাম যজুরেব চ” (গীতা—৯।৭) পরে আবার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—“বেদানাং সাম বেদোহস্মি” (গীতা—১০।২২)। আবার মহিষাসুরবধের পরে শক্রাদি সুরগণ সেই বেদমাতা বেদাধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননীর স্ততি করিতেও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“শক্‌দ্বিত্বিকা স্তুবিমলর্গযজুর্বাং নিধান মুদগীত রম্যপদপাঠবতাক্ষ সাম্নাঃ” (চণ্ডী)।

পরন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষ সূক্ত মন্ত্রের মধ্যে “তস্মাং যজ্ঞাং সর্কহত ঋচঃ সামানি জজিরে। ছন্দাংসি জজিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ্ জায়ত” (৯০ হু—৯) এই মন্ত্রে বেদের উৎপত্তি স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। আর ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র যে, সেই পরমেশ্বরেরই নিঃসৃত, স্মরণ্য তিনিই উহার আদি কর্তা, ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে “অস্ত্র মহতো ভূতস্ত নিঃসৃত মেতদ্ যদৃগ্ বেদঃ সামবেদোহধর্ষাঙ্গিরসঃ” ইত্যাদি (২।৪।২০) প্রতিবাক্যের দ্বারাও প্রকটিত হইয়াছে। বেদাস্তদর্শনের “শাস্ত্রমোনিষ্ঠাং” (১।৩) এই সূত্রের

ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও উক্ত ঋতি বাক্যানুসারে ঐ কথাই বলিয়াছেন। সেখানে “ভামতী” টীকায় বাচস্পতি মিশ্রও শঙ্করের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে লিখিয়াছেন—“অপ্রযত্নেনাশ্চ বেদকর্তৃত্বে ঋতিকৃত্তা অশ্চ মহতো ভূতস্ত ইতি”। স্মতরাং শঙ্করের মতেও যে বেদের কেহ কর্তা নাই, ইহা ত বলা যায় না। তবে তাঁহার মতে বেদ পুরুষকৃত হইলেও স্বতন্ত্র পুরুষকৃত না হওয়ার অপৌরুষেয়। কারণ তাঁহার মতে যাহা স্বতন্ত্র পুরুষকৃত, তাহাকেই বলে পৌরুষেয়। কিন্তু পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইলেও বেদ রচনায় তিনি স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহেন। কারণ, তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির প্রারম্ভে পূর্বে সৃষ্টির প্রারম্ভে কথিত—সেই সমস্ত স্বরবর্ণ বিশিষ্ট তজ্জাতীয় বেদবাক্য সমূহই বলেন। কখনও কোন অংশে তাহার পরিবর্তন করেন না। তাই চিরকালই বেদবিহিত স্বর্গজনক যাগাদি জ্ঞাত্ব স্বর্গই হইতেছে ও হইবে এবং চিরকালই বেদনিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যা দি জ্ঞাত্ব নরকই হইয়াছে ও হইবে। কখনই ইহার বৈপরীত্য হয় নাই ও হইবে না। “ভামতী” টীকায় শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ইহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বুঝাইয়াছেন।

কিন্তু ত্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায় বৈদিক সিদ্ধান্তের ঐরূপ নিত্যতা স্বীকার করিলেও বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা “পৌরুষেয়” শব্দের উক্তরূপ বিশেষ অর্থও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে উচ্চারণের পূর্বে কোন শব্দ বা বাক্যের সত্তাই থাকে না এবং যে কোন পুরুষের উচ্চারিত বাক্যমাত্রই পৌরুষেয়। তাই তাঁহারা “বেদঃ পৌরুষেয়ো বাক্যাত্মাং, ভারতাদিবৎ”—এইরূপ অনুমান দ্বারাও বেদের পৌরুষেয়ত্বই সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক মূলকথা, বেদান্ত মতে পূর্বোক্ত অর্থে বেদ অপৌরুষেয় হইলেও পরমেশ্বরই যে, বেদের আদিকর্তা, তাঁহা হইতেই যে নিঃবাসের ত্রায় বেদের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা, পূর্বোক্ত ঋতি ও যুক্তির দ্বারা বৈদান্তিক সম্প্রদায়ও সমর্থন করিয়াছেন। আর অদ্বৈত মতে যখন পরব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই অনিত্য, তখন বেদান্ত দর্শনে পরে “অতএবচ নিত্যত্বং” (১।৩।২৯) এই সূত্রের দ্বারা বাদরায়ণও যে, বেদকে উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্য নিত্য বলেন নাই, ইহা অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়েরও স্বীকার্য্য। *

* “বেদান্ত পরিভাষা” গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী ধর্ম্মরা জাধরীন্দ্রও কর্তৃমৌমাংসক সম্প্রদায়ের মতে বেদকে নিত্য বলিয়া পরেই বলিয়াছেন—“অস্মাকন্ত মতে বেদো ন নিত্য উৎপত্তি মত্বাৎ। উৎপত্তিমত্বক্

কিন্তু কিরূপে পরমেশ্বর হইতে বেদের উৎপত্তি হয়? বেদের উচ্চারণই বেদের রচনা হইলে পরমেশ্বরে প্রথমে কিরূপে তাহা সম্ভব হয়? এবিষয়ে বহু বক্তব্য ও মতভেদ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে—
 “যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূৰ্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ” (৬:১৮)।
 তদনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে কথিত হইয়াছে,—“তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদ্য কবয়ে”। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই মহেশ্বর প্রথমে কোন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে মনের দ্বারাই অর্থাৎ সংকল্পমাত্রেই সমস্ত বেদের উপদেশ করেন, অধ্যাপনাদির দ্বারা সেই ব্রহ্মাকেই তিনি সমস্ত বেদ প্রচারে নিযুক্ত করেন। কুর্শ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে—“বেদপ্রচারণার্থায় ব্রহ্মাজাতশ্চতুর্মুখঃ”। মুণ্ডক উপনিষদের প্রারম্ভেও প্রথমে ব্রহ্মা হইতেই ব্রহ্মবিত্তার প্রবর্তক সম্প্রদায়ের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। আর চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁহার মানস পুত্রগণকে চতুর্মুখে সমস্ত বেদের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের পুত্রগণকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি পরমেশ্বর-প্রেরিত হইয়া পূর্বে একবার বেদের বিভাগও করিয়াছিলেন এবং পরে ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণ দৈবায়ন (বেদব্যাস) রূপে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও স্রমন্ত এই চারি শিষ্যকে যথাক্রমে ঋগ্বেদ সংহিতা প্রভৃতি চারি সংহিতা দান করেন এবং সেই শিষ্য চতুষ্টয় অত্যাশ্রয় শিষ্যগণকে ঐ সমস্ত সংহিতার অধ্যাপনা করেন, এইরূপে তাঁহাদিগের শিষ্য

“অশ্রমংতো ভূতশ্চ নিঃখসিত মেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃখর্ববেদ” ইত্যাদি শ্রুতঃ”।
 পরে তিনি বেদবাক্যের এক্ষণা বহায়ায়িত্তরূপ অনিত্যত্বের প্রতিবাদ করিয়া বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—“সর্গাচ্চকালে পরমেশ্বরঃ পূর্বসিদ্ধ বেদাত্মপূর্বো সমানাত্ম পূর্ব্যাকং বেদং বিরচিতবান্, ন তু তদ্বিজাতীয় মিত্তি, তস্ত সজাতীয়োচ্চারণা পেষ্টোচ্চারণ বিষয়ত্বাদপৌরুষেয়ত্বং”।
 হুতরাং অষ্টম মতেও পরমেশ্বর যে সৃষ্টির প্রথমে পূর্ব সৃষ্টির শ্রায় সজাতীয় সেই সমস্ত বেদবাক্যের উচ্চারণই করেন, সেই উচ্চারণই তাঁহার বেদ-রচনা, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। ভামতী টীকা (১:১:৩) শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বুঝাইতে লিখিয়াছেন—“সর্বকোজোহপি সর্বদশিত্তিরপি পূর্ব সর্গাত্মসারণ বেদান্ বিরচয়ন্ ন স্বতন্ত্র” ইত্যাদি। হুতরাং বেদান্ত মতে বেদ যে সর্বজ্ঞ রচিত ও নহে, ইহা কেহ লিখিতঃও আমরা তাহা লিখিতে পারি না।

প্রশিষাদিপরাং বেদের ও সম্প্রদায়-রক্ষা করিয়াছেন—ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও ঐ সমস্ত বার্তার বিশদ বর্ণন আছে।

পরন্তু পরমেশ্বর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অধিপতি ব্রহ্মাও অসংখ্য, ইহাও দেবী ভাগবতাদি পুরাণে বর্ণিত আছে। কিন্তু আদি সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরই নিখিল ব্রহ্মাও পতিও সকল ভুবনপতি এবং তিনি প্রত্যেকব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সেই সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরন্তাৎ। বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং (ষ্ঠেত্যতর উপ-৬।৭)। পরন্তু বেদান্ত দর্শনে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—“যাবদধিকারমবস্থিতিরাদিকারিকাণাং” (৩।৩.৩২) ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর সেখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বকল্পসিদ্ধ মহর্ষিগণের মধ্যে যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত না হওয়ায় বিদেহকৈবল্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা পরকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর কর্ত্ত্বক বেদপ্রবর্তনাদি সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত হইয়া সেই অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকেন। তাই তাঁহারা “আধিকারিক” পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শঙ্করের মতে কৃষ্ণ ঐশ্যায়ন বেদব্যাসও সেই আধিকারিক পুরুষ। পূর্ব্বকল্পসিদ্ধ অপান্তরতমা নামে বেদাচাৰ্য্য পুরাণ ঋষিই কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে মণ্ডাবিষ্ণুর আদেশে কৃষ্ণঐশ্যায়ন হইয়াছিলেন। শঙ্কর সেখানে ইহার কোন প্রমাণ বলেন নাই।

কিন্তু কৃষ্ণঐশ্যায়ন যে নারায়ণের অবতার বিশেষ, ইহাও পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। আর পরমেশ্বরই যে, বেদব্যাসাদিরূপে বেদান্তার্থ-সম্প্রদায় প্রবর্তক, ইহা ভগবদ্ গীতার টীকায় অদ্বৈতবাণী মধুসূদন সরস্বতীও বলিয়াছেন। পরন্তু অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মার পদলাভ করিতে পারেন—এমন অসংখ্য “আধিকারিক” পুরুষ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে—ইহাও চিন্তনীয়। আর সৃষ্টির পরে স্বয়ং পরমেশ্বরই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব এই ত্রিমূর্ত্তি হন, ইহাও শাস্ত্র সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ আছে। সেই ব্রহ্মার স্তব রচনায় কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে কালিদাসও বলিয়াছেন—“নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং

প্ৰাক্‌সৃষ্টে: কেবলায়নে”। “লঘু ভাগবতামৃত” গ্ৰন্থে শ্ৰীৰূপ গোস্বামী পদ্ম-
পুৰাণের বচন (১) উদ্ধৃত কৰিয়া সমাধান কৰিয়াছেন যে, কোন মহাকল্পে
উপাসনাসিদ্ধ জীবও অৰ্থাৎ পূৰ্ব্বকল্পসিদ্ধ জীবমুক্ত পুৰুষও ব্ৰহ্মার পদ লাভ
করেন এবং কোন মহাকল্পে স্বয়ং মহাবিশ্বই ব্ৰহ্মা হন। শ্ৰীৰূপ গোস্বামী ইহাও
বলিয়াছেন যে, “হিরণ্যগৰ্ভ” ও “বৈৰাজ” নামে ব্ৰহ্মা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে হিরণ্যগৰ্ভ
ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মলোকের স্থিতিপৰ্য্যন্ত সেখানে থাকিয়াই ঐশ্বৰ্য্য ভোগ করেন। “বৈৰাজ”
ব্ৰহ্মাই প্ৰায়শ: পৰমেশ্বরের আদেশে প্ৰজা সৃষ্টি ও বেদ প্ৰচাৰ করেন। কিন্তু
শাৰীৰক ভাষ্যে (১৩:৩০) আচাৰ্য্য শঙ্কর সৃষ্টিাদি কাৰ্য্যে পৰমেশ্বরের
অনুগ্ৰহে পূৰ্ব্বকল্পসিদ্ধ হিরণ্যগৰ্ভাদি ঈশ্বৰগণের পূৰ্ব্বকল্পীয় ব্যবহার স্বৰ্গণ সমর্থন
কৰিয়াছেন। হিরণ্যগৰ্ভ ব্ৰহ্মার সৃষ্টিাদি কৰ্ত্তৃত্ব বিষয়ে শাস্ত্ৰ প্ৰমাণও আছে।

সে বাহা হউক, এখন প্ৰকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পৰমেশ্বরের প্ৰথমে
হিরণ্যগৰ্ভ ব্ৰহ্মার দেহাদি সৃষ্টি কৰিয়া তাঁহার দ্বাৰা অত্যা অनेক সৃষ্টি ও
বেদ প্ৰবৰ্ত্তনাদি কৰাইবার জন্ত তাঁহাকে প্ৰথমে সংকল্প মাত্ৰে সমস্ত বেদের
উপদেশ কৰিলেও তিনি নিজে যে ত্ৰিমূৰ্ত্তি পরিগ্ৰহ কৰিতে চতুৰ্মুখ মহা ব্ৰহ্মার
দেহ সৃষ্টি করেন, সেই দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি নিজেই প্ৰথমে ক্ৰমশ:
চতুৰ্মুখে তাঁহার পূৰ্ব্বকল্পে উচ্চাৰিত সেই সমস্ত বেদবাক্যের সজাতীয় বেদবাক্য
সমূহের উচ্চাৰণ করেন—ইহা বলিলে তাঁহার পক্ষে উহা অসম্ভব হয় না।
আর মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় “ঈশ্বৰানুমান চিন্তামণি” গ্ৰন্থে ইহাও
সম্ভব বলিয়া সমর্থন কৰিয়াছেন যে, পৰমেশ্বরের মীনৰূপে অবতীৰ্ণ হইয়া প্ৰলয়-
কালে আবার সমস্ত বেদের উদ্ধাৰ করেন। তিনি সেই মীন দেহেই
প্ৰথমে পূৰ্ব্বকল্প বিনষ্ট সমস্ত বেদবাক্যের সজাতীয় বেদবাক্য যথাযথ উচ্চাৰণ
করেন। উহাই তাঁহার বেদ রচনা। গঙ্গেশের উক্ত মতই পরে নৈয়ায়িক
মত বলিয়া প্ৰসিদ্ধ হয়। আর পৰমেশ্বরের যে, সময় বিশেষে ভূতাবেশের
ত্ৰায় অপৰ শরীৰ-বিশেষে আবেশ হয়, ইহাও গঙ্গেশ সমর্থন কৰিয়াছেন।
এবিষয়ে উদয়নাচাৰ্য্যের কথাও সংক্ষেপে পূৰ্বে বলিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে
এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

কণকথা, যে ভাবেই ইউক. পরমেশ্বরই যে সমস্ত বেদের আদি বক্তা বা কর্তা, ইহাই স্বীকার্য। তবে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি পর্যন্ত তপোবলে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বেদলাভ করিয়াছেন এবং সময়ে তাহা স্মরণ করিয়া যথাযথ উচ্চারণ করিয়াছেন। তাই বাৎস্তায়ন প্রভৃতি কোন কোন পূর্বাচার্য বেদকে ঋষি বাক্যও বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ঋষিগণকে বেদের আদিকর্তা বলেন নাই। কারণ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই বেদের আদিকর্তা হইতেই পারেন না। তাঁহার উপদেশ ব্যতীত আর কাহারই প্রথমে বেদও বেদার্থ বিষয়ে কোন জ্ঞানই সম্ভব হইতে পারে না। বেদরচনার পূর্বে কাহারও বেদার্থজ্ঞান বা ঋষিত্ব লাভের আর কোন উপায়ই ছিল না। সেই পরমেশ্বরই সকলের আদিগুরু। যোগ দর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও স্পষ্ট বলিয়াছেন—“পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ” (১।২৬) অর্থাৎ সেই নিত্য সর্বজ্ঞ মহেশ্বরই ব্রহ্মাদিরও গুরু। কারণ, তিনি কোন কালবিশেষাবচ্ছিন্ন পুরুষ নহেন। তিনি ব্রহ্মাদিরও পূর্বকাল হইতে চির বিদ্যমান। তিনি অনাদি, অনন্ত। সুতরাং তিনিই যে প্রথমে সকল বেদের উপদেষ্টা ও তিনিই যে প্রথমে সকল বেদার্থের ব্যাখ্যাতা, এ বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? মনে রাখিতে হইবে, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—“বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং”। গীতা—(১৫।১৫)।*

* “বেদান্তকৃৎ” বেদান্তার্থ-সম্প্রদায় প্রবর্তকো বেদব্যাসাদি রূপেণ। ন কেবল মেতাব দেব, “বেদবিদেবচাহং”,—কর্মকাণ্ডোপাসনাকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডায়ক মন্ত্রব্রাহ্মণায়ক মর্ক বেদার্থবিচ্ছাহ মেব। অন্তঃ সাধুকং,—“ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ” মিত্যাदि। মধুহৃদন সরস্বতী কৃত টীকা।

একাদশ অধ্যায়

ন্যায়-দর্শনে প্রমেষ পদার্থ।

মহর্ষি গৌতম সর্ব প্রথম হৃত্রে তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ (নামোল্লেখ) করিতে প্রমাণের পরেই প্রমেষপদার্থের উদ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, প্রমাণদ্বারা সেই প্রমেষপদার্থই মুখুর প্রধান জ্ঞাতব্য। উহাই প্রকৃষ্টমেষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়। সেই “প্রমেষ” পদার্থগুলির বিশেষ নামনির্দেশরূপ বিভাগ করিতে গৌতম পরে বলিয়াছেন—

“আত্ম-শরীরৈজ্জিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ — প্রেত্যভাব-ফল-হুঃখাপবর্গান্ত-প্রমেষঃ” ॥১।১৯।

অর্থাৎ (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইজ্জি, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) হুঃখ এবং (১২) অপবর্গই প্রমেষ। অর্থাৎ উক্ত আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্যন্ত দ্বাদশ পদার্থই প্রথম হৃত্রোক্ত প্রমেষ পদার্থ।

এখানে বলা আবশ্যক যে, বস্তুমাত্রকেই প্রমেষ বলে। যাহা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রমেষ। সাংখ্যাচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন— “প্রমেষ-সিদ্ধিঃ প্রমাণাঙ্কি”। সূত্রাং গৌতমের মতেও যাহা প্রমাণ সিদ্ধ,—সে সমস্তই প্রমেষ। আর তিনি যে “প্রমেষো চ তুলা প্রামাণ্যবৎ”—এই হৃত্রের দ্বারা প্রমাণকেও প্রমেষ বলিয়াছেন—ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। গৌতমের মতের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, (১) “দ্রব্য”, “গুণ”, “কর্ম্ম”, “সামান্ত”, “বিশেষ” ও “সমবায়”,—

১। “অন্ত্যত্মদপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্ত-বিশেষ-সমবায়ঃ প্রমেষঃ তদভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ঃ। অন্ত তু তৎ-জ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যা জ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং বিশেষেণেতি”। বাৎস্তায়ন ভাস্ক (১।১।৯) বস্তুতঃ স্ত্রায় দর্শনে গৌতমের অনেক হৃত্রের দ্বারা এবং পরমাদ্যুর নিত্যত্বও অববীক্স সমর্থন প্রভৃতির দ্বারা কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থ যে গৌতমেরও সম্মত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। এক তিনিও কণাদের স্ত্রায় পরে অভাবরূপ প্রমেষও সমর্থন করিয়াছেন। সূত্রাং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিতেও দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থকে গ্রহণ করিয়া

এই সমস্ত প্রমেয়ও আছে এবং সেই দ্রব্যাদিপ্রমেয়ের অসংখ্য ভেদ-
ধাকায় প্রমেয় অসংখ্য। কিন্তু তন্মধ্যে আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্যন্ত
পূর্বোক্ত দ্বাদশ পদার্থ বিষয়ে নানা প্রকার মিথ্যাজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান
বলিয়া ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই সেই সমস্ত মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ
করিয়া মুক্তির সাফাং কারণ হয়। সুতরাং মহর্ষি গৌতম বিশেষ করিয়া ঐ
আত্মাদি পদার্থকেই “প্রমেয়” বলিয়াছেন। অর্থাৎ গৌতমোক্ত ঐ “প্রমেয়”
শব্দটা তাঁহার কথিত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের বোধক পারিভাষিক শব্দ।
ঐ সমস্ত পদার্থই মুমুকুর পক্ষে প্রকৃষ্টমেয় বা জ্ঞেয়, এই তাৎপর্য্যেই গৌতম
বিশেষ করিয়া ঐ সমস্ত পদার্থকে “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন।
কিন্তু তাঁহার মতে অত্যা ত যে সমস্ত পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ তাহাও সামান্য প্রমেয়।

আত্মা।

পদার্থের উদ্দেশের পরে তাহার লক্ষণ বক্তব্য। তাই মহর্ষি গৌতম পক্ষে
তাঁহার নিজ মতানুসারে যথাক্রমে পূর্বোদ্দিষ্ট আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়পদার্থের
লক্ষণও স্থানা করিয়াছেন। সূত্রের দ্বারা বহু অর্থ স্থচিত হওয়ায় উহার নাম
“সূত্র”। সুতরাং গৌতমের সূত্রের দ্বারা যে সমস্ত অর্থ স্থচিত হইয়াছে, তাহা
বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। গৌতম তাঁহার প্রথমোক্ত প্রমেয় আত্মার
সম্বন্ধে প্রমাণ ও লক্ষণ স্থানা করিতে বলিয়াছেন—

“ইচ্ছা-দেব-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ জ্ঞানাত্মানো লিঙ্গঃ” ॥ ১।১।২ ॥

অর্থাৎ ইচ্ছা, দেব, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক।
তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয়,
ঐ সমস্ত গুণের আশ্রয় কোন দ্রব্য আছে। এবং জীবের দেহ ইন্দ্রিয় ও মন,
সেই দ্রব্য নহে—ইহাও অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় সেই ইচ্ছাদি গুণের
আশ্রয় দ্রব্য যে দেহাদি ভিন্ন আত্মা, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিরূপে তাহা সিদ্ধ হয়,
তাহা গৌতম পরে আত্মপরীক্ষায় বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পূর্বে
(দ্বিতীয় অধ্যায়ে) গৌতমের—সেই সমস্ত যুক্তি যথা সম্ভব বলিয়াছি।

উহা সমর্থনও করিয়াছেন। “সিদ্ধান্তমূল্যবলী” গ্রন্থে বিবনাথও ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের উক্ত-
কথানুসারেই লিখিয়াছেন—“এতে চ পদার্থা বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গা নৈরায়িকানামপ্যবিরুদ্ধাঃ, প্রতি-
পাদিতকৈব মেব ভাষ্যে”।

অবশ্য আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি প্রকারে মনোগ্রাহ সুখদুঃখাদি
 ক্ষণের মনস প্রত্যক্ষ কালে সমস্ত জীবই নিজ নিজ আত্মারও মানস প্রত্যক্ষ
 করে,—ইহাও পূর্বে বলিয়াছি কিন্তু তখন জীব নিজের আত্মাকে দেহাদি
 ভিন্ন বলিয়া প্রত্যক্ষ করে না। এই তাৎপর্য্যেই কণাদ জীবাত্মাকেও অপ্রত্যক্ষ
 পদার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যোগীর মতেও যোগজসম্মিকর্ষ বিশেষের দ্বারা
 দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মার অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহাও পূর্বে
 বলিয়াছি। সুতরাং প্রথমে মুমুক্শু মানব বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা আত্মার প্রকৃত
 স্বরূপ শ্রবণ করিয়া উহার মননের জন্ত অনুমান প্রমাণরূপ যুক্তিকে আশ্রয়
 করিবেন। তাই গৌতম পূর্বোক্ত সূত্রের দ্বারা সেই যুক্তির সূচনা করিয়া পরে
 তৃতীয় অধ্যায়ে উহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু গৌতম উক্ত সূত্রে
 ইচ্ছাদি গুণকে আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অস্তিত্বের সাধক বলিয়া ঐ ইচ্ছাদি গুণ যে,
 দেহাদিভিন্ন আত্মার বাস্তবধর্ম্ম, সুতরাং উহা আত্মার লক্ষণ, ইহাও সূচনা
 করিয়াছেন। কারণ, ঐ ইচ্ছাদিগুণ আত্মার বাস্তব ধর্ম্ম না হইলে আত্মা
 উহার আশ্রয় বা আধার হইতে পারে না। তাহা না হইলে উহার আশ্রয়রূপে
 আত্মার অনুমিতি সম্ভব না হওয়ায় ইচ্ছাদি গুণ আত্মার লিঙ্গ, এইরূপ উক্তির
 উপপত্তি হয় না। •

বস্তুত: পূর্বোক্ত সূত্রের দ্বারা গৌতম যে, ইচ্ছাদি গুণকে আত্মার অনুমাপক
 লিঙ্গই বলিয় ছেন, উহাকে আত্মার অসাধারণ ধর্ম্মরূপ লক্ষণ বলেন নাই
 এইকথা বলা যায় না। কারণ, তাঁহার প্রথমোদ্দিষ্ট প্রমেয় আত্মার লক্ষণ
 অবশ্য বক্তব্য। সুতরাং তিনি উক্ত সূত্রের দ্বারা ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণকেই যে

* বৈশেষিক দর্শনে (৩২।৪) মহর্ষি কণাদও প্রাণাদির নায় স্বঃ, দুঃখ ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নকে
 এবং তৎপূর্বে (৩১।১৮) জ্ঞানকে জীবাত্মার সাধক লিঙ্গ বলিয়াছেন। কণাদের হত্রানুসারে প্রশস্তপাদ
 বলিয়াছেন—“স্বঃ-দুঃখেচ্ছা—দ্বেষ প্রযত্নৈশ্চ গুণৈ গুণানুসারিতঃ”। কারণে ইচ্ছাদি গুণের দ্বারা
 স্তম্ভী আত্মার অনুমিতি হয়, এ বিষয়ে মতভেদ পূর্বে “সামান্তোক্তোদৃষ্ট” অনুমানের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি।
 প্রশস্তপাদ ভাস্কর “হুতি” টীকায় নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার সেই অনুমানপ্রণালী প্রদর্শন
 করিতে লিখিয়াছেন—“হুতাদিকং ব্যবাসমবেতঃ গুণত্বাৎ”। “জ্ঞানং কচিদাপ্রিতং কার্যত্বাৎ গন্ধবৎ”।
 এবং কণাদের মতে জ্ঞানাদি যে আত্মার গুণ, ইহা বুঝাইতে তিনিও পরে লিখিয়াছেন—“বুদ্ধাদীনাম্
 ভক্ষ্য গুণত্বাভাবে তল্লিঙ্গ বচনানুপপত্তে রিতি ভাবঃ”।

আত্মার লক্ষণ রূপেও সূচনা করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তাঁহার মতে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ যে, আত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহা তাঁহার উক্ত সূত্রে দ্বারাও বুঝা যায়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ ইচ্ছা, প্রভৃতি গুণ, আত্মার লক্ষণ হইতে পারে না। আর গৌতম যখন পরে বিচার করিয়া জানিলেন আত্মারই বাস্তবগুণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, তখন তাঁহার উক্তরূপ বক্তব্য বিষয়ে কোন সংশয়ই হইতে পারেনা। উক্ত বিষয়ে অত্রাণ বক্তব্য পূর্বেই (চতুর্থ অধ্যায়ে) বলিয়াছি।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গৌতমের পূর্বোক্ত সূত্রে “লিঙ্গ” শব্দের দ্বারা লক্ষণ অর্থই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইচ্ছা প্রভৃতি ঐ সমস্ত গুণ, আত্মার লক্ষণ। তন্মধ্যে ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়েরই লক্ষণ এবং সূত্র ও দ্ব্যর্থ—কেবল জীবাত্মার লক্ষণ। বস্তুতঃ উক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্ত গুণকেই আত্মার একটি লক্ষণ বলিলে বৈয়র্থ্যদোষ হয়। উহার মধ্যে কোন একটি গুণকে আত্মার লক্ষণ বলিলে তুল্যত্বায়ে অন্য গুণকেও আত্মার লক্ষণ বলা যায় ও বলিতে হয়। সুতরাং গৌতম যে, ঐ ইচ্ছাদিগুণকে আত্মার পৃথক্ পৃথক্ এক একটী লক্ষণই বলিয়াছেন—ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ইচ্ছাবৎ প্রযত্নবৎ ও জ্ঞানবৎ এই লক্ষণত্রয় কেবল জীবাত্মার লক্ষণ বলা যায় না। কারণ, পরমাত্মাতেও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন ও নিত্য জ্ঞান আছে। (অনেকে মতে নিত্য সূত্রও আছে) সুতরাং গৌতম জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মার সম্বন্ধেই যে, উক্ত লক্ষণত্রয় বলিয়াছেন—ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে গৌতম পূর্বোক্ত প্রেমের বিভাগসূত্রেও প্রথমে “আত্মান্” শব্দের দ্বারা আত্মরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন—ইহাও স্বীকার্য্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ঐ ব্যাখ্যার দ্বারা তৎকালীন নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও উক্তরূপ মতই বুঝা যায়। এবিষয়ে অত্রাণ পূর্বে (সপ্তম অধ্যায়ে) বলিয়াছি।

শাস্ত্রীর।

আত্মার পরে দ্বিতীয় প্রেমের শরীর। গৌতম উহার লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

“চেষ্টেজ্জিয়াখ্যাশ্রয়ঃ শরীরং” ।১।১।১১ ॥

আত্মার প্রযত্ন জন্ত তাহার শারীরিক ক্রিয়ার নাম চেষ্টা। শরীরই উহার আশ্রয় বা আধার। সুতরাং চেষ্টাশ্রয়ত্ব শরীরের একটি লক্ষণ। এইরূপ ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গুলিও শরীরাপ্রাপ্ত। শরীরাবচ্ছেদেই ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় থাকায় অবচ্ছেদকতা সঙ্কে শরীরই উহার আশ্রয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বও শরীরের একটি লক্ষণ। উক্ত সূত্রে গৌতম পরে শরীরের অপর লক্ষণ বলিয়াছেন—অর্থাশ্রয়ত্ব। ভাণ্ড্যকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ ঐ “অর্থ” শব্দের দ্বারা সুখ ও দুঃখরূপ অর্থকে গ্রহণ করিয়া সুখাশ্রয়ত্ব ও দুঃখাশ্রয়ত্বকে শরীরের চরম লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদিও গৌতমের মতে জীবাশ্মাই সাক্ষাৎ সঙ্কে সুখ ও দুঃখের আশ্রয়, কিন্তু বিখ্যাপী প্রত্যেক জীবাশ্মার নিজ নিজ শরীরাবচ্ছেদেই সুখ ও দুঃখ জন্মে। শরীরের বাহিরে জীবাশ্মাতে সুখ দুঃখাদি জন্মে না। সমস্ত জীবাশ্মার নিজ নিজ শরীরই তাহার সমস্ত সুখ দুঃখভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই গৌতম শরীরকে সুখাশ্রয় ও দুঃখাশ্রয় বলিয়া শরীরের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন।

মুমুক্শু মানব তাহার নিজ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার শ্রায় শরীরের ও তৎ-স্রবণ করিয়া তাহারও মনন করিবেন। তাই মহর্ষি গৌতম পরে শরীরের পরীক্ষা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন—“পার্শ্বিৎ গুণান্তরোপলব্ধেঃ” (৩।১।২৮) তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সর্বদাই তাহাতে গন্ধ নামক গুণের বা গুণবিশেষের উপলব্ধি হওয়ায় সিদ্ধ হয় যে, মনুষ্য শরীরমাত্রই পার্শ্বিৎ, অর্থাৎ পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীই উহার উপাদান কারণ। এখানে বলা আবশ্যক যে, কণাদ ও গৌতমের মতে গন্ধ কেবল পৃথিবীরই বিশেষগুণ। জলাদি দ্রব্যে গন্ধ থাকে না। কিন্তু তাহার অন্তর্গত পার্শ্বিৎ অংশের গন্ধই অনেকস্থলে জলাদির গন্ধ বলিয়া অনুভূত ও কথিত হয়। সুতরাং মনুষ্য শরীরে যখন উহার বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখন উহাতে পার্শ্বিৎ অংশই অধিক, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং পৃথিবী নামক প্রথমভূতই যে, উহার উপাদান কারণ, ইহাই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে মনুষ্য শরীরে জলাদিভূতের সে সমস্ত গুণের উপলব্ধি হয়, তদ্বারা সেই শরীরের জলীয়ত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ সেই সমস্ত ঐ

শরীরের অন্তর্গত জলীয়াদি অংশেরই গুণ। পরন্তু সেই একই শরীর পার্থিব জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়,—ইহা বলা যায় না। কারণ একই পদার্থে পৃথিবীত্বাদি নানা বিরুদ্ধ জাতি থাকিতে পারে না। সুতরাং কেবল মনুষ্য শরীরেই নহে, মনুষ্যালোকস্থ সমস্ত শরীর এবং সমস্ত পার্থিব দ্রব্যেরই পৃথিবীই উপাদান কারণ। কারণ, নানা বিরুদ্ধ জাতীয় দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না। কিন্তু সজাতীয় দ্রব্যই সজাতীয় দ্রব্যান্তরের উপাদান কারণ হইতে পারে।

পরন্তু মনুষ্য শরীরাদি সমস্ত পার্থিব দ্রব্যে পার্থিব অংশই যে অধিক, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। নচেৎ অশ্রমতেও তাহার “পার্থিব” এই সংজ্ঞার উপপত্তি হয় না। কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে কেবল পৃথিবীই যাহার উপাদান কারণ, এই অর্থেই উহাকে পার্থিব বলা হয়। তবে জলাদিত্ত চতুষ্টয় ও উহার নিমিত্ত কারণ বলিয়া পঞ্চভূতের দ্বারা নিম্পন্ন এই অর্থে উহাকে “পাঞ্চভৌতিক” ও বলা হইয়াছে। এবং পঞ্চভূতের দ্বারা যাহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ নিম্পন্ন হয়, এই অর্থে শাস্ত্রে পার্থিব দ্রব্যকে “পঞ্চাত্মক”ও বলা হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম ও পরে কোন স্ত্রে (৩।১২০) পদ্মাদি পার্থিব দ্রব্যকে উক্তরূপ অর্থেই “পঞ্চাত্মক” বলিয়াছেন,— ইহা স্বীকার্য। কারণ, তাঁহার মতে পঞ্চভূতই কোন দ্রব্যের উপাদান কারণ নহে এবং উপাদান কারণ ও তাহার কার্যদ্রব্য তত্ত্বতঃ অভিন্নও নহে। সুতরাং গর্ভোপনিষদের প্রারম্ভে শরীরকে যে “পঞ্চাত্মক” বলা হইয়াছে, গৌতমের মতে তাহারও উক্তরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

গৌতম পরে তাঁহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে আবার বলিয়াছেন— “শ্রুতি-প্রামাণ্যাক্ষ” (৩।১৩১)। ভাষ্যকার বাৎসায়ন গৌতমের কথা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে “স্বধ্যস্তে চক্ষুর্গচ্ছতাং” ইত্যাদি মন্ত্রের শেষে কথিত হইয়াছে—“পৃথিবীং তে শরীরং”। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রীর দাহকালে পাঠ্য উক্ত মন্ত্রের শেষে উক্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তোমার শরীর পৃথিবীতে গমন করুক, অর্থাৎ পৃথিবীতে লয় প্রাপ্ত হউক। উপাদান কারণেই তাহার কার্যদ্রব্যের লয় বা বিনাশ হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত শ্রুতি-বাক্যে বিশেষ করিয়া কেবল পৃথিবীতেই শরীরের লয়প্রাপ্তি কথিত হওয়ায়

উহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, কেবল পৃথিবীই সেই শরীরের উপাদান কারণ।
সুতরাং অত্ৰ কোন শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা
যায় না (১)। এবং কোন অনুমান দ্বারাও উহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে
পারে না। কারণ শ্রুতি বিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য নাই। মহর্ষি গৌতম উক্ত
সূত্রের দ্বারা ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে মহর্ষি কণাদ পূর্বোক্ত
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন—“প্রত্যক্ষা প্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্তা-
প্রত্যক্ষত্বাং পঞ্চায়কং ন বিত্ততে” (৪।২।২)। উক্ত সূত্রে অন্য সম্প্রদায়ের
মতানুসারে পঞ্চভূতই যাহার উপাদান কারণ, এই অর্থেই “পঞ্চায়ক” শব্দের
প্রয়োগ করিয়া কণাদ বলিয়াছেন যে, পঞ্চায়ক কোন বস্তু নাই। কারণ, প্রত্যক্ষও
অপ্রত্যক্ষ পদার্থের যে সংযোগ, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে
পঞ্চভূতই শরীরের উপাদান কারণ হইলে উহা পৃথিব্যাদি প্রত্যক্ষভূতত্রয় এবং
বায়ু ও আকাশ এই অপ্রত্যক্ষ ভূতদ্বয়ে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান হওয়ায় শরীরের
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পদার্থে যাহা সমবায়
সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। পৃথিবীও বায়ু প্রভৃতির সংযোগ
ইহার দৃষ্টান্ত। (২) পৃথিব্যাদি প্রত্যক্ষভূতত্রয় ও যে, শরীরের উপাদান

১। ছানোগ্য উপনিষদের “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” (৬।৩।৪) এই শ্রুতি
বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত তেজ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়ের “ত্রিবৃতকরণ” কথিত হওয়ায় তদ্বারা
অনেক সম্প্রদায় উক্ত ভূতত্রয়েরই উপাদানত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং অনেক বৈদান্তিক উহার দ্বারা
পঙ্কীকরণ ও ব্যাখ্যা করিয়া পঞ্চভূতেরই উপাদানত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কণাদ ও গৌতমের
মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও উক্তরূপ কোন সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যায় না। কারণ অস্তিত্ব
ভূত নিমিত্ত কারণ হইলেও উক্ত শ্রুতিবাক্যের উপপত্তি হইতে পারে। পূর্বোক্ত ভূতত্রয়ের পরস্পর
বিলক্ষণ সংযোগ বিশেষের উপাদানই উক্ত শ্রুতি বাক্যে “ত্রিবৃতকরণ” বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাতে
উপাদান কারণ ভূত বিশেষের আধিক্য প্রকাশ ও ঐরূপ উক্তির উদ্দেশ্য।

২। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাত
“পঙ্কীকরণ” বাদ যে, কণাদেরও সম্মত, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে “ফেলোসিপের লেক্চরে” (পঞ্চমবর্ষ
৪৫ পৃষ্ঠায়) কণাদের “ত্রিবোহু পঞ্চায়কত্বং”—এইরূপসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কণাদ পূর্বে
“প্রত্যক্ষা প্রত্যক্ষাণাং” ইত্যাদি পূর্বোক্তসূত্রের দ্বারা পঞ্চায়কত্বের খণ্ডন করিয়া পরে অষ্টম অধ্যায়ের
দ্বিতীয় আঙ্কিকে উহাই স্বরণ করাইবার উদ্দেশ্যে সূত্র বলিয়াছেন—“ত্রিবোহু পঞ্চায়কত্বং প্রতিবিন্ধ্য”।

কারণ নহে, ইহাও কণাদ পরে অন্য যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। ফল কথা কণাদের মতেও পার্থিব শরীরে পৃথিবীই উপাদান কারণ এবং জলাদি ভূতচতুষ্টয় নিমিত্ত কারণ। এইরূপ বরুণলোক, সূর্যলোক ও বায়ুলোকে দেবগণের যে অযোনিজ জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীর আছে, তাহাতে যথাক্রমে জল, তৈজ ও বায়ুই উপাদান কারণ। অতীভূত চতুষ্টয় নিমিত্ত কারণ। কণাদ পরে প্রমাণ দ্বারা সেই সমস্ত অযোনিজ শরীরের অস্তিত্ব ও সমর্থন করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়।

শরীরের পরে তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়। ষষ্ঠ প্রমেয় মনও ইন্দ্রিয়। কিন্তু মনের বিশেষ ধর্মরূপে তত্ত্ব জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া গৌতম প্রমেয়বর্গের মধ্যে মনের পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। তাই ঘ্রাণাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়কেই গ্রহণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

“ঘ্রাণ-রসন-চক্ষুশ্রু-শোত্রাগীন্দ্রিয়াণিভূতেভ্যঃ” ১।১।১২

সাংখ্যাদি শাস্ত্রে বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচটি কর্মেঞ্জিয়ও কথিত হইয়াছে এবং “অহঙ্কার” নামক এক পদার্থ হইতেই সর্বেঞ্জিয়ার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কিন্তু কণাদও গৌতম বাক্য ও হস্তাদি অঙ্গ বিশেষকে ইন্দ্রিয় বলেন নাই। তাঁহাদিগের মতে এত্যাঙ্করূপ জ্ঞানের সাধন বলিয়া ঘ্রাণাদিই ইন্দ্রিয় পদবাচ্য। পূর্বোক্ত বাক্যাদি ইন্দ্রিয় নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ার সদৃশ বলিয়া তাহাতে “ইন্দ্রিয়” শব্দের গোণ প্রয়োগ হইতে পারে। তাৎপর্য টীকাকার বাস্পতি মিশ্রও গৌতমের উক্তমত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি অসাধারণ কার্য বিশেষের সাধন বলিয়া বাক্য ও হস্তাদি অঙ্গবিশেষকে কর্মেঞ্জিয় বলা যায়, তাহা হইলে জীবের কণ্ঠ, হৃদয়, আশাশয় ও পকাশয় প্রভৃতিকেও কর্মেঞ্জিয় বলিতে হয়। কিন্তু তাহা কেহই বলেন নাই। এবং কণাদের শ্রায় গৌতমের মতেও সর্বেঞ্জিয়ার উপাদান কারণ অহঙ্কার নামক কোন দ্রব্য পদার্থ নাই। কিন্তু পৃথিব্যাди পঞ্চ ভূতই যথাক্রমে

শারীরক ভায়ে—(২।২।১১) আচার্য্য শঙ্কর ও কণাদের পূর্বোক্ত “প্রত্যক্ষপ্রত্যক্ষাণাং” ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ করিয়া কণাদের উক্তরূপ মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের মূল। সুতরাং ব্রাণাদি পূর্বোক্ত পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ভৌতিক পদার্থ। তাই গৌতম তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্তই পূর্বোক্ত হস্তের শেষে বলিয়াছেন—“ভূতেভ্যঃ”।*

গৌতম পরে (তৃতীয় অধ্যায়ে) তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার মূল যুক্তি এই যে, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে ব্রাণেন্দ্রিয় যখন কেবল গন্ধেরই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে এবং রসেন্দ্রিয় কেবল রসের এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় কেবল রূপের এবং শ্রুতিরিন্দ্রিয় কেবল স্পর্শেরই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, তখন ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা যথাক্রমে ব্রাণাদি ঐ চারিটি ইন্দ্রিয়ের পার্থিবত্ব, জলীয়ত্ব, তৈজসত্ব ও বায়বীয়ত্ব অসুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয়। গৌতম পরে উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—“তদ্ব্যবস্থানন্ত ভূয়ত্বাৎ” (৩।১।৬৯) অর্থাৎ যে সমস্ত পৃথিব্যাди ভূত ব্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক, তন্মধ্যে ব্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপাদক পৃথিবীরই ভূয়ত্ব বা প্রকর্ষ বশতঃ পৃথিবীই উহার উপাদান কারণ। এইরূপ রসনাদি ইন্দ্রিয়ত্রয়ের নিব্‌পাদক পৃথিব্যাদি ভূতের মধ্যে যথাক্রমে জল, তৈজ ও বায়ুরই ভূয়ত্ব বা প্রকর্ষ বশতঃ যথাক্রমে জলাদি

* কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত হস্তে গৌতম “ভূতেভ্যঃ” এই পঞ্চমাস্তপদের প্রয়োগ করায় তাঁহার মতে অবগেন্দ্রিয় রূপ আকাশ ও হৃদয় ভূতবিশেষজ্ঞ। সুতরাং তাঁহার মতে আকাশেরও উৎপত্তি হয়। কিন্তু কণাদও গৌতমের মতে আকাশের উৎপাদক কোন হৃদয়ভূত যে, নাই, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। পরন্তু তাঁহাদিগের মতে আকাশ বিতু অর্থাৎ সর্বব্যাপী। কণাদ স্পষ্ট বলিয়াছেন—“বিভবান্নান্না কাশন্তথাচান্না” (৭।১।২২) গৌতমও স্পষ্ট বলিয়াছেন—“অবুহাবিষ্টন্ত-বিতুজানিচাকাশধর্মাঃ” (৪।২।২২) সুতরাং বিতু দ্রব্যের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ার কণাদও গৌতমের মতে আকাশ যে নিত্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহাদিগের অস্ব হস্তের দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। সুতরাং অবগেন্দ্রিয় যখন আকাশ স্বরূপ বলিয়া নিত্য, তখন তৎপক্ষে গৌতমের উক্তহস্তে “ভূতেভ্যঃ”—এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির জন্তরূপ অর্থ, তাঁহার বিবক্ষিত নহে, ইহা স্বীকার্য। পরন্তু আকাশ এক হইলেও জীবের কর্ণগোলকাবহির্ন আকাশই তাহার অবগেন্দ্রিয়। সুতরাং সেই সমস্ত কর্ণগোলক রূপ উপাধির ভেদপ্রযুক্ত অবগেন্দ্রিয়রূপ আকাশের কল্পিত ভেদ গ্রহণ করিয়া তাহাকে আকাশ-প্রযোজ্য বলা যায়। অর্থাৎ অবগেন্দ্রিয়ের পক্ষে উক্ত হস্তে “ভূতেভ্যঃ”—এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ, জন্তরূপ নহে—প্রযোজ্য। যাহার সত্তা ব্যতীত বাহার সত্তা সিদ্ধ হয়না, তাহাকে তৎ প্রযোজ্য বলে। আকাশের সত্তা ব্যতীত অবগেন্দ্রিয় সমূহের সত্তা সিদ্ধ না হওয়ায়—উহা আকাশ-প্রযোজ্য।

ভূতত্ত্বই ঐ ইন্দ্রিয়ত্রয়ের উপাদান কারণ হইয়াছে। জীবগণের ইন্দ্রিয় নিষ্পাদক অদৃষ্ট বিশেষের ফলেই তাদৃশ প্রকৃষ্ট পৃথিব্যাদি ভূতজন্তু ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়না। কারণ জীবগণের কর্ণ গোলকাবচ্ছিন্ন নিত্য আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। কিন্তু সেই কর্ণ গোলকের উৎপত্তি গ্রহণ করিয়াই শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এবং সেই সমস্ত কর্ণ গোলকরূপ উপাধির ভেদ গ্রহণ করিয়াই শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ আকাশের ভেদ কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই নিত্য অখণ্ড আকাশের সত্তা ব্যত ত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সত্তা সম্ভব হয় না। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই গোঁতম পরে আকাশকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের যোনি বা মূল বলিয়াছেন। শ্রবণেন্দ্রিয়ও যে অভৌতিক পদার্থ নহে, কিন্তু আকাশ নামক পঞ্চম ভূতাত্মক, ইহা প্রকাশ করাও তাঁহার ঐরূপ উক্তির উদ্দেশ্য।

গোঁতম পরে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজসত্ব সমর্থন করিয়াও উহার ভৌতিকত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং তজ্জন্তু প্রথমে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই “প্রাপ্যাকারিত্ব” সমর্থন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়বর্গ তাহার বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সন্নিবৃত্ত হইয়াই তাহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে—এজন্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে বলা হইয়াছে “প্রাপ্যাকারী”। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন দূরস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন তাহার সেই সমস্ত বিষয়ের সহিত সন্নিবৃত্ত কিরূপে সম্ভব হইবে? চক্ষুরিন্দ্রিয় অভৌতিক পদার্থ হইলে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আর তাহা হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃষ্ঠবর্তী ব্যবহিত এবং অতি দূরস্থ বিষয়েরও প্রত্যক্ষ কেন হয় না? সূত্ররাং ইহাই স্বীকার্য্য যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রদীপের ন্যায় তৈজস পদার্থ। প্রদীপের রশ্মির ন্যায় চক্ষুরিন্দ্রিয়েরও রশ্মি আছে। এবং প্রদীপের রশ্মি যেমন কোন বাবধায়ক দ্রব্যবিশেষের দ্বারা প্রতিহত হয়, তজ্জপ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মিও প্রতিহত হয়। সূত্ররাং ব্যবহিত বিষয়ের সহিত তাহার সন্নিবৃত্ত সম্ভব না হওয়ায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে না। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ—অভৌতিক পদার্থ হইলে ভিত্তি প্রভৃতি বাবধায়ক দ্রব্যবিশেষের দ্বারা তাহার প্রতিহত হইতে পারে না। কারণ, প্রতিঘাত ভৌতিক দ্রব্যেরই ধর্ম্ম। কাচাদি কোন কোন স্বচ্ছ দ্রব্যের দ্বারা তৈজস পদার্থ প্রতিহত না হইলেও ভিত্তি প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা তাহা

প্রতিহত হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়-
তৈজস পদার্থ।

গৌতম ইহা সমর্থন করিতে সর্বশেষে আবার বলিয়াছেন—“নক্তঞ্চর-
নয়ন-রশ্মি দর্শনাচ্চ” (৩.১।৪৪) অর্থাৎ রাত্রিকালে [বিড়াল ও ব্যাঘ্রাদি
কোন কোন নক্তঞ্চর জীবের চক্ষুর রশ্মি দেখাও যায়। সুতরাং তদ্ব্যবস্থায়
অন্তান্ত সমস্ত চক্ষুস্থান জীবেরও চক্ষুর রশ্মি অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয়।
সেই সমস্ত বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মিও ভিত্তি প্রভৃতি ব্যবধায়ক দ্রব্যের
দ্বারা প্রতিহত হওয়ায় তাহারাও ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে
পারে না। সুতরাং তাহাদিগের চক্ষুরিন্দ্রিয় যে অল্প জাতীয় বিলক্ষণ,
ইহাও বলা যায় না। কিন্তু মনুষ্যাদির চক্ষুর রশ্মি, যাহা অনুমান প্রমাণ
সিদ্ধ, তাহাতে রূপ থাকিলেও তাহা উদ্ভূত রূপ নহে। সুতরাং সেই
রশ্মি নির্গত হইয়া দূরে গমন করিলেও তখন তাহা দেখা যায় না। কারণ,
উদ্ভূত রূপ এবং সেই রূপ বিশিষ্ট মহৎ দ্রব্যেরই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।
রূপ মাত্রেরই এবং রূপ বিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রেরই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন
অগ্নিতপ্ত জলের মধ্যে অগ্নিরূপ তেজঃ পদার্থ থাকিলেও সেই অগ্নিতে উদ্ভূত রূপ
না থাকায় তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ মনুষ্যাদি জীবের চক্ষুর
রশ্মিরও প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্ভূত ও অমুদ্ভূত নামে যে দ্বিবিধ রূপ আছে, তন্মধ্যে
উদ্ভূত রূপই প্রত্যক্ষ যোগ্য। কিন্তু যেখানে তাহাও অভিব্যক্ত থাকে, সেখানে
তাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন উদ্ধায় উদ্ভূত রূপ থাকিলেও মধ্যাহ্নকালে
সূর্য্য কিরণ দ্বারা তাহা অভিব্যক্ত হওয়ায় তখন উহার প্রত্যক্ষ হয় না।

ফলকথা চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ, সুতরাং প্রদীপাদির ন্যায় উহারও রশ্মি
আছে, ইহা অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। আর সাংখ্যাদিসম্প্রদায়ও ত শরীর হইতে
বহিরিন্দ্রিয়পথে অস্থঃকরণের বহির্গমন ও দূরস্থ বিষয়াকারে পরিণতি প্রত্যক্ষ
করেন না। তাহাদিগের মতেও ত উহা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ। কিন্তু
কণাদও গৌতমের মতে নির্বিকার অন্তঃকরণ বা মনের কোন প্রকার
বিকার সম্ভবই নহে। আর জীবের জীবন কাল পর্যন্ত তাহার মন যে
নিজ শরীর মধ্যেই থাকে, লৌকিক প্রত্যক্ষের জন্য সাধারণ জীবের মন যে,
তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইতে পারে না, ইহাও গৌতম সমর্থন

করিয়াছেন। প্রাচীন কোন সাংখ্য সম্প্রদায়ের মতে একমাত্র ত্রিগুণই বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়। অর্থাৎ ভ্রাণ, রসনা, চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থানে যে ত্রিগুণই আছে তাহাই যথাক্রমে গন্ধ রস স্পর্শও শব্দের প্রত্যক্ষ জন্মায়। শারীরিক ভাষ্যে (২।২।১০) আচার্য্য শঙ্করও উক্ত সাংখ্য মতের উল্লেখ করিয়াছেন। গৌতম ইন্দ্রিয় পরীক্ষায় পরে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। বহুল্য ভয়ে এখানে তাঁহার সমস্ত কথা বলা সম্ভব নহে। বিশেষ জিজ্ঞাসু ছাত্র-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় পরীক্ষায় অনেক জ্ঞাতব্য জানিতে পারিবেন।

অর্থ।

ইন্দ্রিয়ের পরে চতুর্থ প্রমেয় “অর্থ”। “অর্থ” শব্দের অনেক অর্থ বিশেষে প্রয়োগ হইয়াছে। মহর্ষি কণাদ তাঁহার কথিত দ্রব্য গুণ ও কর্ম এই পদার্থ ত্রয়ের নাম বলিয়াছেন—“অর্থ”। কিন্তু গৌতমোক্ত চতুর্থ প্রমেয় যে, “অর্থ,” তাহা ইন্দ্রিয়ার্থ। যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত ভ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পঞ্চ বিশেষ গুণই “ইন্দ্রিয়ার্থ” বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাই কণাদও বলিয়াছেন—“প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থা।” (৩।১।১)। গৌতম উহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

“গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থ্যঃ”। (১।১।১৪)

উক্ত সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্ব্ব সূত্রোক্ত ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিয়া “তদর্থ্যঃ”—এই উক্তির দ্বারা তাঁহার পূর্ব্ব কথিত চতুর্থ প্রমেয় “অর্থ” যে ইন্দ্রিয়ার্থ, ইহাও গৌতম ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঐ গন্ধাদি পঞ্চগুণকে পৃথিব্যাদির গুণ বলায় উহা পৃথিব্যাদি প্রত্যেক ভূতেরই গুণ কি না? এইরূপ সংশয় হইতে পারে এবং ঐ সমস্ত গুণের মধ্যে কোন ভূতের কি কি গুণ, এ বিষয়ে বহু মতভেদও আছে। তাই গৌতম পরে (৩।১।১২।১৩) তাঁহার পূর্ব্বোক্ত “অর্থ” নামক প্রমেয়ের পরীক্ষা করিতে প্রথমে উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ, পৃথিবীর গুণ। রস রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ। রূপ ও স্পর্শ তেজের গুণ। স্পর্শমাত্র বায়ুর গুণ এবং শব্দমাত্র আকাশের গুণ। বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে যথাক্রমে পাঁচ সূত্রের দ্বারা মহর্ষি কণাদও তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন।

গৌতম পরে পূৰ্ণপক্ষ রূপে মতান্তর সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যখন ভ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং রসেন্দ্রিয়ের দ্বারা জলেও রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং চক্ষুরিन्द्रিয়ের দ্বারা তেজে স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না, তখন পৃথিবীাদি ভূতে পূৰ্ণোক্ত ঐ সমস্ত গুণ নাই। কিন্তু গন্ধই কেবল পৃথিবীর স্বাভাবিক গুণ। এবং রসই জলের স্বাভাবিক গুণ এবং রূপই তেজের স্বাভাবিক গুণ এবং স্পর্শই বায়ুর স্বাভাবিক গুণ। তাহা হইলে পৃথিবীতে রস রূপ এবং স্পর্শেরও নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং জলেও রূপও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং তেজে ও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় কেন? এতদ্বস্তরে পূৰ্ণোক্ত মতানুসারে গৌতম পরে বলিয়াছেন—“বিষ্টং হপরাং পরেণ” (৩।১৬৬) তাৎপর্য্য এই যে স্থূল ভূতের সৃষ্টিতে পৃথিব্যাদি ভূত অপরভূত জলাদি কর্তৃক ব্যাপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ পূৰ্ণভূতে পরভূতের বিলক্ষণ সংযোগ রূপ সংসর্গ হওয়ায় তাহাতে সেই পরভূতের গুণ বিশেষেরও নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু জলাদিতে পৃথিবীর ঐক্য পসংসর্গ না হওয়ায় তাহাতে পৃথিবীর গুণ গন্ধের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় না এবং তেজে জলের ঐক্য সংসর্গ না হওয়ায় তাহাতে জলের গুণ রসের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় না। এবং বায়ুতে তেজের ঐক্য সংসর্গ না হওয়ায় তাহাতে তেজের গুণ রূপের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় না। ফলকথা, উক্তমতে পূৰ্ণভূতেই পরভূতের অল্প প্রবেশ স্বীকৃত হইয়াছে। পরভূতে তাহার পূৰ্ণভূতের অল্প প্রবেশ স্বীকৃত হয় নাই।

গৌতম পরে পূৰ্ণোক্তমতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—“ন পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ” (৩।১৬৭) তাৎপর্য্য এই যে, পার্থিব দ্রব্য এবং জলীয় দ্রব্যেরও যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন তাহাতেও রূপ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ যে দ্রব্যে উদ্ভূতরূপ নাই, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। পার্থিব ও জলীয়দ্রব্যে উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট তেজের বিলক্ষণ সংযোগরূপ সংসর্গ প্রযুক্তই তাহাতে সেই তেজের রূপেরই প্রত্যক্ষ হয়—ইহা বলিলে বায়ুতেও তেজের রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বায়ুতে তেজের ঐক্য সংসর্গ নাই, কিন্তু তেজেই বায়ুর ঐক্য সংসর্গ আছে,—ইহা স্বীকার করা যায় না। ভাব্যকার উক্তমতের আরও অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নানা যুক্তির দ্বারা

উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,—পাৰ্থিব দ্রব্যবিশেষে যে তিস্তাদি রসেরও প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা উহার অন্তর্গত জলেরই রস, ইহা বলা যায় না। কারণ জলে যে, তিস্তাদি সমস্ত রসই আছে, এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। এবং তেজেও যে, গুরুপীতাদি সমস্তরূপই আছে, এবিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। ভাষ্যকার পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যখন কোন পাৰ্থিব দ্রব্যে পূর্বতন সেই জলাদিভূতত্রয়ের সংসর্গ বিধ্বস্ত হয়, তখনও তাহাতে রস রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় পৃথিবীতে পূর্বোক্ত গন্ধাদি চতুর্গুণই স্বীকার্য্য। এইরূপ কোন জলীয়দ্রব্যে যখন তেজও বায়ুর পূর্বতন সংসর্গ বিধ্বস্ত হয়, তখনও তাহাতে রস ও রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় জলে পূর্বোক্ত রসাদিগুণত্রয়ই স্বীকার্য্য। এবং কোন তৈজস পদার্থে বায়ুর পূর্বতন সংসর্গ বিধ্বস্ত হইলে তখনও তাহাতে স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তেজে রূপের স্থায় স্পর্শও স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত কথার দ্বারা ইহাও তাহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, যে সমস্ত জলাদিভূতে পাৰ্থিব অংশের সংসর্গ নাই তাহাতে গন্ধের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় জলাদিভূতে স্বাভাবিক গন্ধ থাকে না। কিন্তু পাৰ্থিব অংশের সংসর্গ প্রযুক্তই তাহাতে সেই পৃথিবীর গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ জলাদিভূতে যে গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, উহা তাহার অন্তর্গত পৃথিবীরই স্বাভাবিক গুণ। আর কোন ভূতে স্বাভাবিক গন্ধ নাই। তাই মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন—“ব্যবস্থিঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ” (২।২।২)

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, পৃথিবীতে গন্ধাদি চতুর্গুণই বিद्यমান থাকিলে স্বাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাতে ঐ সমস্ত গুণেরই প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এতদ্বত্তরে গৌতম পরে (৩।১।৬৮) বলিয়াছেন যে, যে ইন্দ্রিয়ে যে গুণের উৎকর্ষ আছে, তদ্বারা সেই গুণবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। স্বাণেন্দ্রিয় পাৰ্থিব দ্রব্য বলিয়া তাহাতেও গন্ধাদি চারিটি গুণ থাকিলেও তন্মধ্যে গন্ধেরই উৎকর্ষ থাকায় তদ্বারা গন্ধেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ রসেন্দ্রিয় জলীয় দ্রব্য বলিয়া তাহাতে রস রূপ ও স্পর্শ থাকিলেও তন্মধ্যে রসেরই উৎকর্ষ থাকায় তদ্বারা রসেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ বলিয়া তাহাতে রূপ ও স্পর্শ থাকিলেও তন্মধ্যে রূপেরই উৎকর্ষ বশতঃ তদ্বারা রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। শ্রুতিগিদ্ৰিয়ে কেবল স্পর্শই থাকায় উহার দ্বারা স্পর্শেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু

প্রাণেন্দ্রিয়ে যে গন্ধ আছে, তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ রসেন্দ্রিয়স্থ রস এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়স্থ রূপ এবং স্বগেন্দ্রিয়স্থ স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না। কেন জন্মে না? এতদ্বত্তরে গৌতম পরে বলিয়াছেন—“সংগণানামিন্দ্রিয়ভাবাৎ” (৩।১।৭০) তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণেন্দ্রিয়ে যে গন্ধ আছে, সেই গন্ধ সহিত সেই ইন্দ্রিয়ই প্রাণেন্দ্রিয়। সুতরাং সেই গন্ধ ও প্রাণেন্দ্রিয়স্বরূপই হওয়ায় তদ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ রসেন্দ্রিয়স্থ রস এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়স্থ রূপ এবং স্বগেন্দ্রিয়স্থ স্পর্শ ও সেই ইন্দ্রিয় স্বরূপ বলিয়া তদ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ আকাশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, শ্রবণেন্দ্রিয়স্থ সেই শব্দেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই শব্দ পূর্বে শ্রবণেন্দ্রিয়ে না থাকায় তাহাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্বরূপ বলা যায় না। সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে।

বস্তুতঃ প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের শ্রায় তদগত শব্দভিন্ন গন্ধাদি বিশেষ গুণও অতীন্দ্রিয়। দ্রব্য ও গুণ মাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু যে সমস্ত দ্রব্য ও গুণে প্রত্যক্ষ প্রযোজক ধর্ম্ম আছে, তাহারই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মিও তাঁহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয় না—এতদ্বত্তরে গৌতমও পূর্বে বলিয়াছেন—“দ্রব্যগুণ-ধর্ম্ম-ভেদাচ্চোপলব্ধি-নিয়মঃ”। (৩।১।৩৭) সুতরাং তাঁহার মতে যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মির রূপে প্রত্যক্ষ প্রযোজক উদ্ভূতত্ব ধর্ম্ম না থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, তজ্রূপ, প্রাণাদি ইন্দ্রিয়স্থ গন্ধাদি গুণেও প্রত্যক্ষ প্রযোজক ধর্ম্ম-বিশেষ না থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না,—ইহাই তাঁহার প্রকৃত উত্তর বুঝা যায়। ফলকথা যেমন পাষণাদি অনেক পার্থিব দ্রব্যে গন্ধ থাকিলেও অন্তর্গত বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, তজ্রূপ প্রাণেন্দ্রিয়স্থ গন্ধেরও প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ রসাদি গুণের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

বুদ্ধি।

অর্থের পরে পঞ্চম প্রমের “বুদ্ধি”। যদ্বারা বুঝা যায়, এই অর্থে নিম্পন্ন “বুদ্ধি” শব্দের দ্বারা জীবের অন্তঃকরণ বা মন ও বুঝা যায়। মহাবি গৌতমও পরে ঐ অর্থেও “বুদ্ধি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রমের পদার্থের মধ্যে যে “বুদ্ধি” বলিয়াছেন, তাহা জীবের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান। জ্ঞানার্থক “বু” ধাতুর উত্তর ভাবার্থে ক্তিন্ প্রত্যয় নিম্পন্ন বুদ্ধি শব্দের দ্বারা

জ্ঞানই বুঝা যায়। গৌতমের মতে সেই জ্ঞানকেই উপলব্ধি বলে। তাই তিনি তাঁহার কথিত “বুদ্ধি” নামক পঞ্চম প্রমেয়ের স্বরূপ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

বুদ্ধিরূপলব্ধি জ্ঞানমিত্যনর্থাস্তরং । ১।১।১৫ ।

অর্থাৎ বুদ্ধি উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্থাস্তর (ভিন্ন পদার্থ) নহে, একই পদার্থ। যাহাকে জ্ঞান এবং উপলব্ধি বলে, তাহাই বুদ্ধি। সাংখ্য মতে মূল প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি, উহারই নাম অন্তঃকরণ। জ্ঞান সেই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণেরই বৃত্তি বা পরিণাম বিশেষ। উহা অন্তঃকরণেরই বাস্তব ধর্ম। গৌতম পরে বিচারপূর্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবাশ্মাতেই প্রত্যক্ষাঙ্গি জ্ঞানরূপ বিশেষ গুণ জন্মে এবং উহাই জীবাশ্মার চৈতন্য, ইহা পূর্বেও বলিয়াছি। সুতরাং জ্ঞান কখনই জড় পদার্থ অন্তঃকরণের ধর্ম হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে অন্তঃকরণই চেতন, জ্ঞাতা, ইহা বলিতে হয়। পরন্তু অন্তঃকরণই জ্ঞানে, কিন্তু চেতন আত্মা উপলব্ধি করে, ইহাও অনুভব বিরুদ্ধ। কারণ কোন বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে আমি ইহা জানিতেছি আমি ইহা উপলব্ধি করিতেছি—এইরূপে সেই জীবাশ্মাই সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং জ্ঞান ও উপলব্ধি যে অভিন্ন পদার্থ, এবং জীবাশ্মাই তাহার আধার, ইহাই অনুভব সিদ্ধ। পরন্তু অন্তঃকরণের বৃত্তি জ্ঞানের সহিত আত্মার যে অবাস্তব সম্বন্ধ, তাহাকেই উপলব্ধি বলিলে উহা ত বাস্তব পদার্থ হয় না। কিন্তু উপলব্ধি যে অবাস্তব, ইহাও অনুভববিরুদ্ধ। পরন্তু চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যমণ্ডলের ছায়, অন্তঃকরণে পুরুষ বা আত্মার প্রতিবিম্বপাতও হইতে পারে না। কারণ রূপ শূন্য নির্বিকার পদার্থের প্রতিবিম্ব অসম্ভব। সাংখ্যাদি সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিলেও কণাদ ও গৌতম তাহা স্বীকার করেন নাই।

পরন্তু কণাদ ও গৌতম জীবের অন্তঃকরণেরই অবস্থাভেদে বা পরিণামভেদে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই নামত্রয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে মন অন্তরিস্থিয় বলিয়া মনের নামই অন্তঃকরণ। এবং জীবের ব্রহ্মজ্ঞান বিশেষই অহঙ্কার ও অভিমান নামে কথিত হইয়াছে। এবং জীবের জ্ঞান যাত্রাই তাহার বুদ্ধি হইলেও কর্তব্য নিশ্চয়রূপ যে বিশেষ বুদ্ধি, তাহাও শাস্ত্রে অনেক স্থলে “বুদ্ধি” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। “বুদ্ধি” শব্দের উক্তরূপ

বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়া উপনিষদে সেই বুদ্ধিকেই সারথি বলা হইয়াছে। এইরূপ শাস্ত্রে আরও অনেক বিশেষ অর্থে অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মূলকথা, কণাদ ও গৌতমের মতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি একই পদার্থ এবং উহা জীবাত্মাতেই উৎপন্ন হয়। আর সাংখ্য সম্প্রদায়ের মতে পুরুষ বা আত্মা যে, অন্তঃকরণস্থ কর্তৃত্ব ও সূক্ষ্মহুঃখাদির অভিমান করেন, সেই অভিমানও ত ভ্রমাত্মক জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং উহা আত্মাতে উৎপন্ন হইলে আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি কিরূপে অস্বীকার করা যায়? কর্তৃত্ব ও সূক্ষ্ম হুঃখাদি অন্তঃকরণেরই স্বকীয় বাস্তববর্ণনা হইলে অন্তঃকরণেরই তদ্বিষয়ে ভ্রম জ্ঞান জন্মে, ইহা ত বলা যাইবে না। সুতরাং অন্তঃকরণস্থ সেই জ্ঞানের সহিত আত্মার অবাস্তব সম্বন্ধই তাহার অভিমান, ইহাও বলা যাইবে না। ভ্রমাত্মক জ্ঞান বিশেষ ভিন্ন “অভিমান” শব্দের অর্থ কোন অর্থেও প্রমাণ নাই।

মন

বুদ্ধির পরে ষষ্ঠ প্রেমের মন। জীবের সূক্ষ্মহুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষের করণরূপে মন নামে অন্তরীন্দ্রিয় অবশ্য স্বীকার্য্য,—ইহা পূর্বে বলিয়াছি। এইরূপ মনের অস্তিত্ব সাধক আরও অনেক হেতু থাকিলেও গৌতম তাহার নিজ সম্মত একটি প্রধান হেতুর প্রকাশের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন—

“যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসোলিঙ্গং” ॥ ১।১।১৬ ॥

অর্থাৎ একইক্ষণে অনেক প্রত্যক্ষের যে অনুৎপত্তি, তাহা মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। তাৎপর্য্য এই যে, যেক্ষণে কোন এক বিষয়ের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হইয়াছে, তখন অল্প বিষয়ের সহিত অল্প ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হইলেও যুগপৎ অর্থাৎ একইক্ষণে সেই বিষয়দ্বয়ের দুইটি প্রত্যক্ষ জন্মে না, কিন্তু ক্ষণবিলম্বেই অপর বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, জীবদেহে এমন কোন একটি দ্রব্য আছে, যাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত না হইলে সেই ইন্দ্রিয় জ্ঞাত প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং সেই দ্রব্য পরমাণুর স্থায় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব হয় না, সুতরাং যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয় জ্ঞাত অনেক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। তাহা হইলে মনের এইরূপ লক্ষণ বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার সংযোগ জ্ঞাত, সেই

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্তু বাহার সংযোগ না হইলে অত্যান্ত কারণ সত্ত্বেও সেই প্রত্যক্ষ জন্মে না—এমন অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যই মন। গৌতম উক্ত সূত্রের দ্বারা মনের উক্তরূপ লক্ষণও সূচনা করিয়াছেন। পরন্তু গৌতম তাঁহার সমস্ত উক্ত হেতুর দ্বারা জীবদেহে মন যে একটি এবং উহা অণু অর্থাৎ পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। কারণ, জীবদেহে একাধিক মন থাকিলে যুগপৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিভিন্ন মনের সংযোগ সম্ভব হওয়ায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় জ্ঞাত অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং সেই এক মনও সর্ব শরীরস্থ হইলে যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ জন্য অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু গৌতম জ্ঞানের যোগপন্থ অস্বীকার বরায় প্রতিদেহে মনের একত্ব ও অণুত্বই স্বীকার করিয়াছেন। তাই তিনি পরে মনের পরীক্ষায় স্পষ্ট বলিয়াছেন—“জ্ঞানা যোগপন্থাদেকং মনঃ।” “বধোক্ত হেতুত্বাচ্চাণু” ॥ ৩২।৫৬।৫৯ ॥

অবশ্য অত্যান্ত অনেক সম্প্রদায়ই অনেক স্থলে জ্ঞানের যোগপন্থ অস্বীকার সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করায় গৌতমের উক্তমত গ্রহণ করেন নাই। কোন-সম্প্রদায় আবার জীবদেহে পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের সহকারী পাঁচটি মনও স্বীকার করিয়াছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের উপস্থারে (৩।২।৩) শঙ্কর মিশ্রও ঐ প্রাচীন মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতমের নায় কণাদও জ্ঞানের যোগপন্থ স্বীকার করেন নাই। তাই মনের একত্ব ও অণুত্ব সমর্থন করিতে বৈশেষিক দর্শনে তিনিও বলিয়াছেন—“প্রযত্না যোগপন্থাজ্জ্ঞানা যোগপন্থাচ্চৈকং” ॥ ৩।২।৩ ॥ “তদভাবাদণুমনঃ” ॥ ৭।১।২৩ ॥ চরক সংহিতার শারীরস্থানের প্রথম অধ্যায়ে চরকও বলিয়াছেন—“অণুত্বমথচৈকত্বং বৌদ্ধগৌ মনসঃ স্মৃতৌ”।

বস্তুতঃ প্রতিও বলিয়াছেন—“অন্যত্র মনা অভূবৎনাদর্শ মত্ত্বত্র মনা অভূবৎ নাশ্রোষমিতি, মনসা হোষ পশ্চতি, মনসা শৃণোতি” (বৃহদারণ্যক ১।৫।৩)। অর্থাৎ আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, দেখি নাই, অন্যমনস্ক ছিলাম, শ্রবণ করি নাই। লোকেও অনেক সময়ে অনেকের মুখে ঐরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু কিরূপে ঐ অন্যমনস্কতা সম্ভব হয়? ইহা বিচার করা আবশ্যিক। কণাদ ও গৌতমের মতে প্রত্যক্ষ কার্যে, যে সময়ে কাহারও একই ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার মনের সংযোগ স্থির আছে, তখন তাহাকে বলে অন্যমনস্ক। যে ব্যক্তি কখনও

হির মনে কাহারও কথা শ্রবণ করে, সে তখন তাহার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকেও দেখিতে পায় না। তাই পরে তাহাকে দেখিলে ঐরূপ কথা বলে। এইরূপ বধন চকুরিস্থিরের সহিত তাহার মন সংযুক্ত থাকে, তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার মনের সংযোগ না থাকায় সে ব্যক্তি অন্যের কথা শ্রবণ করিতে পারে না। তাই পরে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, আমি অন্যমনস্ক থাকায় শুনিতে পাই নাই। কিন্তু তাহার মন সর্ব শরীরস্থ হইলে অথবা বহু হইলে তাহার উক্তরূপ অন্যমনস্কতা সম্ভব হইতে পারে না।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, কোনস্থলে ঐরূপ হইলেও অনেক স্থলেই ত আমাদিগের একই সময়ে দর্শন ও শ্রবণাদি নানা প্রত্যক্ষ জন্মিতেছে, কিন্তু কিরূপে ইহার উপপত্তি হইবে? এতদুত্তরে গৌতম বলিয়াছেন—“অশ্রুত চক্রদর্শনবত্ত্বপলঙ্কিরান্ত সঞ্চারান্” (৩২।৫৮)। তাৎপর্য্য এই যে, একই ক্ষণে একই ব্যক্তির দর্শনাদি নানা প্রত্যক্ষ জন্মে না। মনের অতি শীঘ্রগতিপ্রযুক্ত ক্ষণবিলম্বেই অত্যাশ্রিত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু অবিচ্ছেদে ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হওয়ায় উহাতে যোগপত্ত ভ্রম জন্মে। গৌতম ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন—“অশ্রুতচক্র দর্শন”। বর্তমানকালে আত্মস্বাক্ষীর শ্রায় প্রাচীনকালে “অশ্রুতচক্র” নামক যন্ত্রবিশেষ নির্মিত হইয়া আকাশে নিক্ষিপ্ত হইলে তখন উহার ঘূর্ণন ক্রিয়া গুলি একইক্ষণে হইল এবং একইক্ষণে ঐ সমস্ত ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রত্যক্ষ হইল— এইরূপ বোধ হইত। কিন্তু ঐ সমস্ত ক্রিয়া কখনই একই ক্ষণে জন্মিতে পারে না। সুতরাং একইক্ষণে ঐ সমস্ত ক্রিয়ার প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। কারণ যে ক্রিয়া পরে জন্মিবে, তাহার প্রত্যক্ষ তৎপূর্ব্বে কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং উক্ত স্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঐ সমস্ত ক্রমিক বিভিন্ন ক্রিয়াও উহার ক্রমিক বিভিন্ন প্রত্যক্ষ গুলিতে যে যোগপত্ত বোধ, তাহা ভ্রম। অশ্রুত চক্রের অতি দ্রুত গতিই ঐ ভ্রমের কারণ দোষ। এইরূপ শরীর মধ্যে মনের অতি দ্রুত গতি প্রযুক্ত পক্ষক্ষেপেই অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় তৎ পরক্ষণেই সেই ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু ক্ষণবিলম্বেই অবিচ্ছেদে ঐরূপ নানা প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হওয়ায় তাহাতে যোগপত্ত ভ্রম জন্মে। মনের অতি দ্রুত গতিই ঐ ভ্রমের কারণ দোষ। ভাষ্যকার বাংশায়ন গৌতমের উক্ত মত

সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, কোনস্থলে গন্ধাদি নানাবিষয়ের যে যুগপৎ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা নিঃসংশয় নহে, অর্থাৎ উহার সর্বসম্মত দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু অনেক স্থলে ক্রমিক উৎপন্ন নানা ক্রিয়ায় যে যৌগপত্ত্ব ভ্রম জন্মে, এ বিষয়ে গৌতমোক্ত দৃষ্টান্ত এবং আরও অনেক দৃষ্টান্ত সর্বসম্মত আছে। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে অবিলম্বে বিভিন্নক্ষেণে উৎপন্ন গন্ধাদি নানাবিষয়ের নানা প্রত্যক্ষে ও যৌগপত্ত্ব বুদ্ধিকে ভ্রম বলা যায়। বাৎস্তায়ন আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

সে যাহা হউক, কণাদ ও গৌতমের পূর্বোক্ত মত বহু বিবাদগ্রস্ত হইলেও জীবের শরীরস্থ মন যে, বায়ুর জ্বায়ু দ্রুতগতিশীল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ভগবদ্গীতায় “চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ং” (৬:৪) ইত্যাদি শ্লোকেও তাহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। সুতরাং মন যে বিভূ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, এই মতও অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। মনের বিভূত্ববাদ খণ্ডন করিতে গৌতমও পরে বলিয়াছেন—“ন গতভাবাৎ” (৩:৮)। অর্থাৎ বিভূ পদার্থের গতিক্রিয়া না থাকায় গতিশীল মনকে বিভূ বলা যায় না। এইরূপ মন জীবের সর্বশরীর ব্যাপী হইলেও শরীর মধ্যে তাহার ঐরূপ দ্রুত গমনাগমন সম্ভব হয় না। সুতরাং মন যে স্থূল দ্রব্য, ইহাই স্বীকার্য্য। সাংখ্য সূত্রকারও বলিয়াছেন—অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ”। ৩:১৪। *

কিন্তু পরিণামবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে মনের পরিণাম আছে। তাঁহাদিগের মতে জড়পদার্থ মাত্রই—প্রতিক্ষণ-পরিণামী। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বিদ্যারণ্যমুনিও “জীবনুক্রিবিবেক” গ্রন্থে বলিয়াছেন—“সাবয়ব মনিত্যং সর্বদা জতু স্ববর্ণাদিবদ্ বহুবিধ পরিণামাইং দ্রব্যং মনঃ”। কিন্তু আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের মতে মন সাবয়ব হইতে পারে না। কারণ

* সাংখ্যসূত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্ট উক্ত হত্রাত্মনামের মনের অণুত্বই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু যোগদর্শন ভাষ্যে (৪:১০) ব্যাসদেবের উক্তির ব্যাখ্যায় যোগবার্ত্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যমতে মন দেহ সম পরিমাণ, ইহা বলিয়া পতঞ্জলির মতে মন বিভূ, ইহা বলিয়াছেন। উক্তমতে বিভূ মনের সঙ্কোচ ও বিকাশ হয় না, কিন্তু উহার বৃত্তিরই সংকোচ ও বিকাশ হয়। মীমাংসাকাব্য গুরু প্রভাকরও মনের বিভূত্ব সমর্থন করিয়াছিলেন। “স্বায় কুহ্মমঞ্জলি” গ্রন্থে (৩:১) মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বহু বিচার করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

তীহাদিগের মতে নিত্য পরমাণুই জন্তদ্রব্যের চরম অবয়ব বা অংশ এবং জন্ত-
 ভূতেরই মূল অবয়ব পরমাণু আছে। কিন্তু মন ভৌতিক দ্রব্য নহে। শাস্ত্রেও
 পঞ্চভূত হইতে মনের পৃথক উল্লেখই হইয়াছে। সুতরাং মনের মূল কোন
 সূক্ষ্ণভূত (পরমাণু) না থাকায় মন নিরবয়ব এবং নিরবয়বত্ব বশতঃ পরমাণুর জ্ঞান
 অতি সূক্ষ্ম নিত্য, ইহাই স্বীকার্য। সুতরাং উক্ত মতে মনের সংকোচ, বিকাশ
 এবং কোন পরিণাম নাই। কারণ, সাবয়ব দ্রব্যেরই সংকোচ বিকাশাদি
 হইতে পারে। উক্তমতে প্রত্যেক জীবাশ্মাই এক একটি নিত্য সদ্ধ মন আছে
 এবং সেই সেই জীবাশ্মার প্রাক্তন অদৃষ্ট বিশেষ জন্তই তাহার সেই মনই
 তাহার অভিনব স্থল শরীরে প্রবেশ করে। তাহার অভিনব মনের সৃষ্টি
 হয় না (১)। স্থল শরীরে তাহার সেই মনের প্রবেশ এবং জীবাশ্মার সহিত
 উহার বলিষ্ঠ সংযোগের উৎপত্তিই মনের সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। মনের
 সহিত সেই আত্মার সেই বিংক্ষণ সংযোগ ব্যতীত তাহাতে কোন জ্ঞানাদিই
 জন্ম না। মনঃসংযুক্ত আত্মাই “জীব” শব্দের বাচ্য। তাই আত্মার উপাধি
 মনের অণুত্ব বা অতি সূক্ষ্মত্ব গ্রহণ করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন—“বালাগ্রশত
 ভাগস্থ শতধা কলিতস্ত চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ” (স্বৈতান্বতর)।
 উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীব কেশাগ্রের শতাংশের শতাংশের অংশ পরিমিত
 অর্থাৎ পরমাণুর জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম ইহা কথিত হওয়ায় “জীব” শব্দ বাচ্য যে
 মনোরূপ উপাধি বিশিষ্ট আত্মা, তাহার উপাধিভূত মন যে, পরমাণুর জ্ঞান
 অতি সূক্ষ্ম ইহাই বুঝা যায়। নচেৎ বিশ্বব্যাপী জীবাশ্মার উক্ত রূপ অণুই
 উপপন্ন হয় না। *

১। যোগার্সনে (৪।৪) কায়বাহকারী যোগীর সম্বন্ধে যে বহু মনের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে,
 সেই সমস্ত মনের সাবয়ব স্বীকার করায় কোন দোষ নাই। যোগিগণ যোগ শক্তিশক্তাবে বহু
 শরীরের জ্ঞান বহু মনেরও সৃষ্টি করিতে পারেন এবং তাহারাই যুগপৎ নানা শরীরে নানা মনের দ্বারা
 বহু স্থান হুঃখ ভোগও করেন। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কায়বাহকারী
 যোগী তাহার সৃষ্ট অসংখ্য শরীরে মুক্ত পুরুষগণের সেই সমস্ত নিত্য মনই আকর্ষণ করিয়া প্রবিষ্ট
 করেন। কিন্তু এবিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ বলেন নাই।

* অবশ্য বৈষ্ণব দার্শনিকগণ স্বৈতান্বতর উপনিষদের উক্ত “বালাগ্রশতভাগস্থ” ইত্যাদি শ্রুতি
 বা কায়সূত্রে জীবাশ্মাই স্বভাবতঃ অণু, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বেদান্ত দর্শনে বাদরায়ণের

কলকথা জীবাশ্মার বিভূত্বই স্বাভাবিক, অগুহ ওপাধিক। এইরূপ অন্তর্যায়ী-
 পরমাশ্মার উপাধি বিশেষের অগুহ গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকেও যেমন শাস্ত্রে কোন
 স্থলে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ, জীবাশ্মার উপাধি তাহার মনের
 অগুহ গ্রহণ করিয়াই তাহাকেও কোন স্থলে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বলা হইয়াছে।
 ঐ “অঙ্গুষ্ঠ মাত্র” শব্দের অর্থও অতি হৃদয়। মহাভারতের বনপর্বে কথিত
 হইয়াছে—“অঙ্গুষ্ঠ” মাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ” (১৯৬ অঃ ১৭)।
 অর্থাৎ সাবিত্রীর পতি সত্যবানের শরীর হইতে যম অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে
 আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। সাংখ্যাদি অনেক সম্প্রদায়ের মতে স্থূল শরীর
 মধ্যস্থ লিঙ্গ শরীর বা হৃদয় শরীরই উক্ত শ্লোকে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ। কিন্তু
 শ্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায় লিঙ্গ শরীর স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে
 জীবের মৃত্যু হইলে তখন তাহার প্রাণ সংযুক্ত সেই মনই শরীর হইতে উদ্ধৃত
 হয়। সেই মনের অতি হৃদয় বশতঃই আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বলা
 হইয়াছে এবং সেই প্রাণ সংযুক্ত মনের আকর্ষণই উক্ত শ্লোকে সেই পুরুষের
 আকর্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাভারতে উক্ত শ্লোকের পরে “ততঃ সমুদ্ধৃত
 প্রাণঃ গতস্থানং হতপ্রভং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও ঐ তাৎপর্য বুঝা যায়।
 মূল কথা, শ্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে জীবের নিত্যসিদ্ধ মন পরমাণুর
 শ্রায় অতি হৃদয়। ঐ মনেরই নামান্তর অন্তঃকরণ, চিত্ত, হৃদয় প্রভৃতি। কোষ-
 কার অমরসিংহও বলিয়াছেন—“চিত্তস্ত চেতো হৃদয়ং স্বাস্তং হৃদয়ানসংমনঃ” ॥

হৃদয় দ্বারাও সিদ্ধান্তরূপেই উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের মতে
 জীবাশ্মার স্বভাবতঃ বিভূত্বই শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তি সিদ্ধ। তাঁহাদিগের মতে “মহাস্তং বিভূত্বান্নান্যং মহা
 বীরো ন শোচতি” (কঠ) ইত্যাদি অনেক শ্রুতি ও অশ্রু শাস্ত্র বাক্যানুসারে পরমাশ্মার শ্রায় জীবাশ্মাও
 বিভূ। পরন্তু উক্ত বেদান্তের উপনিষদেই “বুদ্ধেত্ত্বং গণেশ্বত্ত্বং গুণেশ্বত্ত্বং”—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা
 ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, জীবাশ্মা তাহার স্বকীয় গুণ পরমহংস প্রযুক্ত “অবর” অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা
 মহান হইলেও তাহার “বুদ্ধি” অর্থাৎ মনের গুণ অগুহ প্রযুক্ত “আরাগ্রমাত্র”। অতি ভীক্সাগ্র হুচী
 বিশেষের নাম “আরা”। তাহার অগ্র পরিমিত অর্থাৎ অতি হৃদয়। উক্ত শ্রুতি বাক্যানুসারে
 “বেদান্ত পরিভাষা” গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী ধর্ম্মরাজাধারীন্দ্রও বলিয়াছেন—“এতেন জীবত্যাগুহং প্রত্যুভয়ং
 “বুদ্ধেত্ত্বং গণেশ্বত্ত্বং গুণেশ্বত্ত্বং চৈব আরাগ্রমাত্রোহবদোহপি দৃষ্ট” ইত্যাদী জীবত্যাগুহ শব্দব্যাচ্যন্তঃ-
 করণ পরিমাণোপাধিকত্ব পরমাণুত্ব প্রবণাৎ”। বিষয়-পরিচ্ছেদ ॥”

প্রবৃত্তি

মনের পরে সপ্তম প্রমেয় “প্রবৃত্তি”। এই প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ মানবের শুভাশুভকর্ম। উহা ত্রিবিধ, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। তাই গৌতম বলিয়াছেন।

প্রবৃত্তির্বাগ্ বুদ্ধি-শরীরারম্ভঃ ॥ ১।১।১৭।

যাহা আরম্ভ অর্থাৎ অমুষ্ঠিত হয় এই অর্থে উক্ত হৃত্রে “আরম্ভ” শব্দের অর্থ শুভাশুভ কর্ম। এবং যদ্বারা বুঝা যায় এই অর্থে “বুদ্ধি” শব্দের অর্থ মন। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও বলিয়াছেন—“মনোহত্র বুদ্ধিরিত্যাভি প্রেত্যং, বুধ্যতেহেনেনেতি বুদ্ধিঃ”। তাহা হইলে উক্ত হৃত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, বাগারম্ভ অর্থাৎ বাচিক শুভাশুভকর্ম এবং বুদ্ধ্যারম্ভ অর্থাৎ মানসিক শুভাশুভকর্ম এবং শরীরারম্ভ অর্থাৎ শারীরিক শুভাশুভকর্ম—এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি। মহর্ষি গৌতম জায়দর্শনের দ্বিতীয় হৃত্রে উক্ত ত্রিবিধ শুভাশুভকর্ম জন্ত ধর্ম ও অধর্মকেই “প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উহা প্রবৃত্তি শব্দের মুখ্য অর্থ নহে। উদ্যোতকর গৌতমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, কারণরূপ ও কার্যরূপ। মানবের ধর্মাদর্শের জনক শুভাশুভ কর্মরূপ প্রবৃত্তিই কারণরূপ প্রবৃত্তি এবং তাহার কার্য বা ফল যে ধর্ম ও অধর্ম, তাহাই কার্যরূপ প্রবৃত্তি।

দোষ

প্রবৃত্তির পরে অষ্টমপ্রমেয় দোষ। জীবাশ্মার রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটির নাম “দোষ”, উহা পূর্বহৃত্রোক্ত প্রবৃত্তির জনক। তাই গৌতম পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির পরেই উহার কারণ দোষ নামক প্রমেয়ের উল্লেখ করিয়া উহার লক্ষণ বলিয়াছেন।

প্রবর্তনা লক্ষণা দোষাঃ ॥ ১।১।১৮ ॥

“প্রবর্তনা” শব্দের অর্থ এখানে প্রবৃত্তি জনকত্ব। ঐ “প্রবর্তনা” যাহার লক্ষণ, তাহা দোষ। বিষয়ে আসক্তিরূপ রাগ, এবং দ্বেষ ও মোহই জীবাশ্মাকে শুভাশুভকর্মে প্রবৃত্ত করে। অবশ্য কাম, মৎসর, ও অহম্মা প্রভৃতি নামেও বহু দোষ আছে। কিন্তু সেইসমস্তই উক্ত ত্রিবিধদোষেরই অন্তর্গত। তাই গৌতম।

পরে বলিয়াছেন “তৎ ত্রৈরাশ্রং রাগ-দ্বৈষ-মোহার্বাস্তর ভাবাৎ” (১।১।৩) অর্থাৎ পূর্বোক্ত দোষত্রয়ের তিনটি রাশি বা পক্ষ আছে। কারণ সে সমস্তই রাগ, দ্বৈষ ও মোহের অন্তর্গত। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কাম, মৎসর, স্পৃহা, তুষা ও লোভ রাগপক্ষ অর্থাৎ রাগেরই অন্তর্গত প্রকার বিশেষ। ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অমৃতা দ্রোহ ও অমর্ষ, দ্বৈষপক্ষ অর্থাৎ দ্বৈষেরই অন্তর্গত প্রকার বিশেষ। মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা (সংশয়) মান ও প্রমাদ, মোহপক্ষ অর্থাৎ মোহেরই অন্তর্গত প্রকার বিশেষ। বুদ্ধিকার বিশ্বনাথ আরও অনেক দোষের উল্লেখ করিয়া নিজমতানুসারে উক্ত সমস্ত দোষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত ত্রিবিধদোষের মধ্যে মোহই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। এবিষয়ে গৌতমের কথা পূর্বেই (তৃতীয় অধ্যায়ে) বলিয়াছি।

প্রত্যভাব

দোষের পরে নবম প্রমেয় প্রত্যভাব। প্র পূর্বক “ইণ্” ধাতুর উত্তর ত্বা প্রত্যয়সিদ্ধ “প্রেতা” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—মরণের পরে। “ভাব” শব্দের অর্থ পুনরুৎপত্তি বা পুনর্জন্ম। তাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“প্রত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জন্ম”। অর্থাৎ জীবের মরণের পরে যে পুনর্জন্ম হয়, উহাই “প্রত্যভাব” শব্দের অর্থ। পূর্বসূত্রোক্ত দোষ জন্ত জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির ফলেই জীবের পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং জীবের পুনর্জন্ম, তাহার দোষ মূলক। তাই মহর্ষি গৌতম প্রমেয় মধ্যে দোষের পরে প্রত্যভাবের উল্লেখ করিয়া পরে উহার লক্ষণ বলিয়াছেন।

পুনরুৎপত্তিঃ প্রেতাভাবঃ। ১।১।১২ ॥

জীবাশ্মার নিত্যত্ববশতঃ তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। কিন্তু অনাদি-কাল হইতে তাহার পুনঃ পুনঃ যে অভিনব স্থূল শরীর বিশেষের পরিগ্রহ অর্থাৎ তাহার সহিত বিলক্ষণ সংযোগ, উহাই উক্ত সূত্রে “পুনরুৎপত্তি” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। গৌতম পরে উক্ত বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন—“আত্ম-নিত্যত্বে প্রেতাভাবাসিদ্ধিঃ” (১।১।১০)। অর্থাৎ জীবাশ্মার নিত্যত্ব প্রযুক্ত তাহার “প্রেতাভাব” বা পুনর্জন্মসিদ্ধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাশ্মার নিত্যত্বসাধক যে সমস্ত যুক্তি কথিত হইয়াছে,

সুদদ্বারাই তাহার পুনর্জন্মও সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে গৌতমের যুক্তি ও অন্তান্ত বক্তব্য পূর্বেই বলিয়াছি।

ফল

প্রত্যভাবের পরে দশম প্রমেয় ফল। উহা দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ। জীবের সুখ ও দুঃখের উপভোগই তাহার মুখ্য ফল এবং তাহার সাধন দেহ ইঞ্জিয় প্রভৃতি সমস্তই গৌণ ফল। জীবের ফলমাত্রই তাহার পূর্বকৃত কৰ্ম জন্ত ধৰ্ম বা অধৰ্মের ফল এবং সেই ধৰ্ম ও অধৰ্ম তাহার দোষ জনিত।

তাই গৌতম উহার লক্ষণ বলিয়াছেন—

প্রবৃত্তিদোষ জনিতোহর্থঃ ফলং ॥ ১।১।২০ ॥

অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধে যে পদার্থ, তাহার ধৰ্ম বা অধৰ্মরূপ প্রবৃত্তি এবং রাগ ঘেবাদি দোষ জনিত, তাহাই তাহার ফল। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ধৰ্মাধৰ্মরূপ প্রবৃত্তির শ্রায় জীবের সুখ দুঃখাদি ফলের প্রতিও তাহার রাগঘেবাদিদোষ কারণ,—ইহা ব্যক্ত করিতেই গৌতম উক্ত সূত্রে “প্রবৃত্তি” শব্দের পরে “দোষ” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। দোষ-রূপ জলের দ্বারা সিস্ত আত্মারূপ ভূমিতেই ধৰ্ম ও অধৰ্মরূপ বীজ সুখ দুঃখাদি ফল উৎপন্ন করে। গৌতম পরে উক্ত “ফলের” পরীক্ষা করিতে যাগাদি শুভকৰ্ম জনিত স্বর্গাদি ফল যে কালান্তরেই জন্মে, উহা ঐহিক ফল নহে—এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া তদ্বারা পরলোকও সমর্থন করিয়াছেন এবং শুভাশুভ কৰ্ম জন্ত ধৰ্ম ও অধৰ্মরূপ গুণ যে সেই কৰ্ম কৰ্তা নিত্য জীবাত্মাতেই জন্মে এবং তদ্বারাই পূর্বকৃত সেই সমস্ত শুভাশুভ কৰ্ম কালান্তরে ও স্বর্গনরকাদি ফলের কারণ হয়—এই সিদ্ধান্ত ও ব্যক্ত করিয়াছেন। সেখানে গৌতমের “প্রীতেরাশ্বাশ্রয়াদি প্রতিষেধঃ” (১।১।৫১) এই সূত্রের দ্বারা তাহার মতে সুখ এবং তাহার কারণ ধৰ্ম নামক অদৃষ্ট যে জীবাত্মারই বাস্তব গুণ, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে।

দুঃখ

ফলের পরে একাদশ প্রমেয় দুঃখ। দুঃখ না বুঝিলে অপবর্গ লাভের অধিকারই জন্মিতে পারে না এবং দুঃখের হেতু শরীরাদি ফল পর্যন্ত প্রমেয় না

বুঝিলে ঐ সমস্ত বিষয়ে দুঃখ-বুদ্ধি সম্ভব হয় না। তাই গৌতম হুঃখের হেতু শরীরাদি ফল পর্যা্যন্ত প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ পূর্বক লক্ষণ বলিয়া অপবর্গের পূর্বে উদ্দিষ্ট দুঃখ নামক প্রমেয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন—

বাধনা লক্ষণং দুঃখং । ১।১।২১ ॥

ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন—“বাধনা পীড়া তাপ ইতি”। অর্থাৎ যাহাকে পীড়া ও তাপ বলে, তাহাই বাধনা। “বাধনা” “পীড়া” ও “তাপ” শব্দ একার্থ বাচক পর্যায় শব্দ। ফল কথা, সর্বজীবের মনোগ্রাহ যে দুঃখ নামক গুণ বিশেষ, তাহারই নাম বাধনা এবং উহারই অপর নাম পীড়া ও তাপ। পূর্বাচাৰ্য্যগণ ঐ দুঃখকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই নামত্রেয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। তাই উক্ত ত্রিবিধ দুঃখই “ত্রিতাপ” নামে কথিত হইয়াছে। দুঃখ স্বভাবতঃই অপ্রিয় পদার্থ। সূত্রার্য্য প্রতিকূল ভাবেই উহার অনুভব বা মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় পূর্বাচাৰ্য্যগণ উহার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—“প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখং”। গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায় যে, বাধনা যাহার লক্ষণ বা স্বরূপ, অর্থাৎ সর্বজীবের মনোগ্রাহ দুঃখই বিশিষ্ট যে গুণ, তাহাই দুঃখ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহা “বাধনা-লক্ষণ,” অর্থাৎ দুঃখানুভূত, তাহাই দুঃখ। যেখানে সূখ আছে, সেখানে অবশ্যই দুঃখ আছে। সূখ মাত্রে দুঃখের উক্ত অবিভাবরূপ সৎকই তাহাতে দুঃখানুভূত এবং ঐ দুঃখানুভূত প্রযুক্তই সূখমাত্রই দুঃখানুভূত ও দুঃখানুভূত বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূত্রার্য্য উক্ত লক্ষণানুসারে জীবের সূখ ও দুঃখ। এবং দুঃখের কারণ শরীরাদিও দুঃখ। কারণ জীবের সমস্ত দুঃখের আয়তন বা অধিষ্ঠান বলিয়া শরীরে সমস্ত দুঃখের নিমিত্ততা রূপ দুঃখানুভূত আছে। এবং জীবের দুঃখের সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ ও তাহার গ্রাহ বিষয় সমূহ এবং তদ্বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞান সমূহে দুঃখের সাধনই সৎকরূপ দুঃখানুভূত থাকায় ঐ সমস্তও দুঃখ। আর সর্বজীবের মনোগ্রাহ দুঃখ নামক গুণপদার্থে ঐ দুঃখের অভেদ সৎকরূপ দুঃখানুভূত থাকায় উহা মুখ্য দুঃখ। ফল কথা, ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা শরীরাদি পদার্থ এবং সূখকেও গৌণ

হুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বার্তিককার উদ্যোতকরও উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া এক বিংশতি প্রকার হুঃখ বলিয়াছেন (১) এবং সেই একবিংশতি প্রকার হুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পূর্বোক্ত শরীরাদি সুখ পর্যান্ত পদার্থগুলি হুঃখ পদবাচ্য না হইলেও মুমুক্শু ঐ সমস্তকেও হুঃখ বলিয়া ভাবনা করিবেন। তাই গৌতমও ঐ অভিপ্রায়েই তাহার কথিত প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই। তিনি পরে হুঃখের পরীক্ষায় নিজেই বলিয়াছেন—“বাধনা হনিবৃত্তে র্বৈদয়তঃ পর্যেষণ দোষাদ প্রতিষেধঃ”। “হুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ” (৪।১।৫৬.৫৭) তাৎপর্য্য এই যে, জীব কোন সুখানুভব করিলে আবার তজ্জাতীয় সুখ জনক বিষয়ে “পর্যেষণ” বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সেই আকাঙ্ক্ষার বহু দোষ বশতঃ উহা নানা হুঃখেরই কারণ হওয়ায় সুখলিপ্সু জীবের বাধনার (হুঃখের) নিবৃত্তি হয় না। পরন্তু “হুঃখ বিকল্পে” অর্থাৎ নানাপ্রকার হুঃখে সুখের অভিমান বশতঃ সুখও তাহার সাধন বিষয় সমূহে আসক্ত হইয়া রাগ দ্বেষাদি দোষ বশতঃ নানাবিধকর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা ও নানাব্যাধি প্রভৃতি নিমিত্তক নানাবিধ অসংখ্য হুঃখভোগ করে। অতএব যিনি মুমুক্শু তিনি শরীরাদির শ্রায় সুখকেও হুঃখ বলিয়াই ভাবনা করিবেন। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার সুখকেই হুঃখ বলিয়া দীর্ঘকাল ভাবনা করিলে তাহাতে আসক্তি ক্ষয় বা বৈরাগ্য জন্মে। সুতরাং সুখের জগ্গ নানা কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া যায়। কিন্তু প্রমেয় বর্গের মধ্যে সুখের উল্লেখ করিলে সুখত্বরূপে তাহারও তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতার উপদেশ করা হয়। এবং তাহা হইলে সুখকেও সুখ বলিয়া ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু ঐরূপ ধ্যান মুমুক্শুর বৈরাগ্যের পরিপন্থী। মুমুক্শু সুখকে হুঃখ বলিয়াই ধ্যান করিবেন। তাই গৌতম প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি অনেক স্থলে সুখের উল্লেখও করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে সুখ পদার্থ মানিতেন না, ইহা কখনই বলা যাইবে না।

১। জীবের হুঃখের আশ্রয়ন শরীর এবং সেই হুঃখের সাধন ভ্রাপাদি ষড়্ভিল্লিয় এবং সেই ষড়্ভিল্লিয়ার গ্রাহ্য ষড়্ভিষয় এবং সেই ষড়্ভিষয়ে ষড়্ভুক্তি এবং হুঃখ, এই বিংশতি প্রকার গোপ্য হুঃখ এবং মুখ্য হুঃখ গ্রহণ করিয়া একবিংশতি প্রকার হুঃখ কথিত হইয়াছে।

অপবর্গ

হুঃখের পরে অপবর্গই গৌতমোক্ত চরম প্রমেয়। পরম পুরুষার্থ নির্বাণ মুক্তির নামই অপবর্গ। গৌতম পূর্ব হুঃখের লক্ষণ বলিয়া উক্ত অপবর্গের লক্ষণ বলিয়াছেন—“তদতান্ত্রবিমোক্ষোহপবর্গঃ” (১।১।২২) অর্থাৎ পূর্বহুঃখোক্ত হুঃখের যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহাই অপবর্গ। সুষুপ্তিকালে এবং প্রলয়াদি কালে জীবের যে সাময়িক হুঃখ নিবৃত্তি, তাহা আত্যন্তিক হুঃখ নিবৃত্তি নহে। যে হুঃখ নিবৃত্তির পরে আর কখনও পুনর্জন্ম হইবে না—সুতরাং কোনপ্রকার হুঃখোৎপত্তির কোন কারণই থাকিবেনা, উহাই আত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তি। উহারই নাম অপবর্গ। গৌতম পরে ঐ অপবর্গের পরীক্ষা করিতে প্রথমে উহা অসম্ভব এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার খণ্ডনদ্বারা অপবর্গ যে অবশ্যই সম্ভব, ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য প্রথমেই বলিয়াছি।

এখন এখানে বুঝা আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম হেয় ও উপাদেয় ভেদে পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রমেয় বলিয়াছেন। তন্মধ্যে শরীর হইতে হুঃখ পর্য্যন্ত দশ প্রমেয় হেয় অর্থাৎ ত্যাজ্য এবং প্রথম প্রমেয় আত্মা ও চরম প্রমেয় অপবর্গ উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ্য। আত্মার উচ্ছেদ কাহারই কাম্য হইতে পারে না এবং চিরস্থায়ী আত্মার অপবর্গই চরমলভ্য। সুতরাং আত্মা ও অপবর্গ হেয় পদার্থ নহে। কিন্তু হুঃখ স্বভাবতঃই অপ্রিয় পদার্থ বলিয়া হেয়। অনাগত (ভাবী) হুঃখের ভয়ে ভীত হইয়া বুদ্ধিমান সমর্থ জীবমাত্রই উহার অমুৎপত্তির উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে। যোগ দর্শনে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—“হেয়ং হুঃখ-মনাগতং”। কিন্তু সেই হুঃখের যে সমস্ত হেতু, তাহার পরিত্যাগ ব্যতীত কখনই হুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং শরীরাদি ফল পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত নয়টি প্রমেয় ও হেয় হুঃখের হেতু বলিয়া হেয়। যে সমস্ত পদার্থ মুমুকুর হেয়, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা জ্ঞান ও তাহার সংসারের নিদান হওয়ায় সেই সমস্ত মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ত সেই সমস্ত পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞান মুক্তিলাভে আবশ্যক। তাই মহর্ষি গৌতমও পরে বলিয়াছেন—“দোষ নিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তিঃ” (৪।২।১)। এবং তিনি প্রথমে দ্বিতীয় হুঃখের

দ্বারা হেয় ও উপাদেয় সমস্ত প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ রূপে স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সেখানে আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয় বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়া সেই সমস্ত মিথ্যা জ্ঞানকেই—সংসারের নিদান বলিয়াছেন এবং উহার বিপরীত সমস্ত জ্ঞানকেই স্বাক্রমে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের তত্ত্ব-জ্ঞান বলিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকারের মতে গৌতমের সিদ্ধান্ত বুঝা যায় যে, উপনিষদে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই স্তুতিবাক্যে যে আত্মদর্শন মুক্তির সাক্ষাৎ কারণরূপে কথিত হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় বিষয়ক হইয়াই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ মুমুক্শু যোগী আত্মদর্শনকালে শরীরাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত একাদশ প্রমেয় পদার্থের ও স্বার্থ দর্শন করেন। সুতরাং তখন তাঁহার সংসারের নিদান আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় বিষয়েই সর্বপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় আর কখনও সংসার বা পুনর্জন্ম হইতে পারে না। তাই মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ পদার্থকেই “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। যাহা প্রকৃষ্ট প্রমেয় অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, তাহাই উক্ত “প্রমেয়” শব্দের অর্থ। এবিষয়ে অগ্র বক্তব্য পূর্বেই বলিয়াছি।

দ্বাদশ অধ্যায়

ন্যায়দর্শনে সংশয়াদিচতুর্দশ পদার্থ।

গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থের পরিচয় লিখিত হইয়াছে। এখন এই অধ্যায়ে যথাক্রমে সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেতুভাস, ছল, জাতি, ও নিগ্রহস্থান, এই চতুর্দশ পদার্থের পরিচয় লিখিত হইবে। উক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ ই “আরীক্ষিকী” বিজ্ঞা বা ত্রায়শাস্ত্রের পৃথক্ প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাত। আর কোন বিজ্ঞা বা শাস্ত্রে উক্ত চতুর্দশ পদার্থের প্রতিপাদন হয় নাই। প্রস্থানের ভেদেই বিজ্ঞা বা শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে। তাই আরীক্ষিকী বিজ্ঞা, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ড নীতি, এই বিজ্ঞাত্রয় হইতে ভিন্ন চতুর্থী বিজ্ঞা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে (১)। উক্ত আরীক্ষিকী বিজ্ঞায় উহার পৃথক্ প্রস্থান সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা আবশ্যক। নচেৎ প্রস্থান ভেদ না হওয়ায় বিজ্ঞা বা শাস্ত্রের ভেদ হয় না। ভাব্যকার বাৎস্তায়ন ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের পৃথক্ উল্লেখপূর্বক বিশেষরূপে প্রতিপাদন না করিলে এই বিজ্ঞা উপনিষদের ত্রায় অধ্যাত্মবিজ্ঞামাত্র হয়। অর্থাৎ পৃথক্ বিজ্ঞা হয় না। সুতরাং যদিও সামান্যতঃ প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ বলিলেই সকল পদার্থ বলা হয়, কিন্তু তদ্বারা উক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের বিশেষজ্ঞান জন্মে না। তাই ত্রায়শাস্ত্রের বক্তা মহর্ষি গৌতম ত্রায়শাস্ত্রের পৃথক্ প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাত পূর্বোক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ পূর্বক উহার লক্ষণাদি বলিয়াছেন।

(১) সংশয়

পূর্বোক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের মধ্যে “সংশয়” নামক পদার্থ গৌতমের প্রথম সূত্রোক্ত ষোড়শপদার্থের অন্তর্গত তৃতীয় পদার্থ। উহা “ত্রায়ে”র

পূর্বোক্ত। কারণ, অজ্ঞাত পদার্থে শ্রায় প্রযুক্তি হয় না, নিশ্চিত পদার্থেও শ্রায়-প্রযুক্তি হয় না। কিন্তু যে পদার্থে কাহারও সংশয় জন্মিয়াছে, সেই সন্দিগ্ধ পদার্থেই শ্রায়-প্রযুক্তি হয়। যথাক্রমে উচ্চারিত গৌতমোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব রূপবাক্য সমষ্টিই ঐ “শ্রায়” শব্দের অর্থ। বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ নিজ সিদ্ধান্তে তাঁহাদিগের সংশয় না থাকিলেও মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় নিরাসের উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিজপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই শ্রায়-প্রয়োগই ন্যায়-প্রযুক্তি। মধ্যস্থগণের সংশয়ই উহার মূল। তাই মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে ন্যায় শাস্ত্রের পৃথক্ প্রস্থানগুলির উল্লেখ করিতে সর্বাগ্রে ন্যায়ের পূর্বোক্ত “সংশয়” নামক পদার্থেরই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। পদার্থের নাম কখনকে “উদ্দেশ্য” বলে। কিন্তু কেবল উদ্দেশ্য দ্বারাই উহার তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে না, লক্ষণাদি ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। সূত্রোক্ত সংশয় কাহাকে বলে এবং কি কি কারণে কতপ্রকার সংশয় জন্মে, তাহা বলা আবশ্যিক। তাই যথাস্থানে গৌতম পরে বলিয়াছেন—

সমানানেক ধর্মোপপত্তে র্বিপ্ৰতিপত্তে রূপলক্ষ্যমূলক্যাব্যবহাত্ত

বিশেষাপেক্ষা বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥ ১।১।২৩ ॥

উক্তসূত্রে “বিমর্শ” শব্দের দ্বারা সংশয়ের সামান্ত্রলক্ষণ সূচিত হইয়াছে। “বি” শব্দের অর্থ বিরোধ। “ম্শ” ধাতুর অর্থ জ্ঞান। তাহা হইলে “বিমর্শ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। ফলিতার্থ এই যে, কোন একই পদার্থে নানাবিরুদ্ধ পদার্থের যে জ্ঞান, তাহাকে বলে সংশয়। ভাষ্যকার বাণেশায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণ “অনবধারণ” জ্ঞান বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “অবধারণ” শব্দের অর্থ নিশ্চয়। কিন্তু নিশ্চয়ের অভাবই সংশয় নহে। কারণ, যে পদার্থ বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানই জন্মে নাই, সেবিষয়েও নিশ্চয়ের অভাব আছে। কিন্তু সেবিষয়ে তখন সংশয় বলা যায় না। যে পদার্থ বিষয়ে কাহারও সংশয় জন্মে, তদ্বিষয়ে তাহার সামান্য জ্ঞান অবশ্যই থাকে। কিন্তু সেই পদার্থের বিশেষ ধর্মকে অবধারণ করিতে না পারায় তদ্বিষয়ে তাহার সংশয়রূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই “অনবধারণ” জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিশেষ ধর্মের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উক্ত সংশয়জ্ঞানের

প্রতিবন্ধক। কারণ, সেই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মিলে তখন আর যে বিষয়ে সেই সংশয় জন্মে না। সুতরাং কার্যমাত্রেই যখন তাহার প্রতিবন্ধকের অভাব সামান্য কারণ, তখন সংশয়মাত্রেই বিশেষ ধর্মনিশ্চয়ের অভাব সামান্য কারণ, ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে কোন বিষয়ে কোনরূপ সংশয় জন্মিলে তাহার যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ সেই সেই কারণ জন্ম পরেও পুনঃ পুনঃ আবার সেইরূপ সংশয় জন্মিবেই, ইহা বলা যায় না। কারণ, বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় জন্মিলে তখন সেই নিশ্চয়ের, অভাবরূপ (প্রতিবন্ধকতাব) কারণ না থাকায় সেইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। মহর্ষি গৌতমও পরে উক্ত সংশয় পদার্থের পরীক্ষা করিতে উক্ত যুক্তির দ্বারা ই পূর্বোক্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত সূত্রে ‘বিশেষাপেক্ষঃ’—এই পদের দ্বারাও উক্ত যুক্তি স্থচনা করিয়াছেন এবং ইহাও স্থচনা করিয়াছেন যে, যে সমস্ত বিশেষ ধর্মের নিশ্চয়তাব জন্ম তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ কারণ জন্ম সংশয় বিশেষ জন্মে, সেই সমস্ত বিশেষধর্মের স্মরণাত্মক জ্ঞানও সংশয়মাত্রেই কারণ। সুতরাং সেই সমস্ত বিশেষ ধর্মও পূর্বে কোন সময়ে অনুভূত হওয়া আবশ্যক। কারণ, তাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, তদ্বিষয়ে সংস্কারের অভাবে স্মরণ জন্মিতে পারে না।

মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রে প্রথমে “সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ”—ইত্যাদি পঞ্চমীবিভক্ত্যন্তপদের দ্বারা পূর্বোক্ত সংশয় নামক জ্ঞানের বিশেষ কারণ-গুলি নির্দেশ করিয়া সেই সমস্ত কারণ ভেদে উহার প্রকার ভেদও স্থচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্ম প্রথম প্রকার সংশয় জন্মে। যেমন সন্ধ্যাকালে অন্ন অন্নকারে পথে একটি স্থাপু অর্থাৎ শাখাপল্লব শূন্য বৃক্ষে চক্ষুঃ সংযোগের পরে তাহাতে স্থাপুত্বরূপ বিশেষ ধর্মের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তখন স্থাপু ও দণ্ডায়মান মনুষ্যের সমান ধর্ম যে দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি, তাহা সেই দৃষ্ট পদার্থে প্রত্যক্ষ করিয়া কাহারও সংশয় জন্মে যে, ইহা কি স্থাপু হুথবা মনুষ্য? উক্তস্থলে স্থাপু ও মনুষ্যের বিশেষধর্ম যে স্থাপুত্ব ও মনুষ্যত্ব, তাহাই উক্ত সংশয়ের কোটি (১)। পূর্বে অথ কোন স্থাপু ও মনুষ্যে উক্ত

(১) সংশয়বিষয়ীভূত ধর্মকে সংশয়ের কোটি বলে। ন্যায়নৈয়ায়িকগণের মধ্যে অনেকের মতেই বিরুদ্ধ ভাব ও অভাব পদার্থই সংশয়ের কোটি হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত স্থলে “স্থাপুনবা”

বিশেষ ধর্মের জ্ঞান জন্ত সংস্কার থাকায় উক্ত সংশয়ের পূর্বে ঐ কোটিদ্বয়ের স্বরণ জন্মে। কিন্তু তখন সেখানে উক্ত কোটিদ্বয়ের কোন কোটিরই নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ না হওয়ায় পূর্বোক্ত সাধারণ ধর্মের প্রত্যক্ষ জন্ত তাহাতে উক্তরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ জন্মে। *

এইরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্ত দ্বিতীয় প্রকার সংশয় জন্মে। যেমন যে ব্যক্তির শব্দে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপ কোন বিশেষধর্মের নিশ্চয় জন্মে নাই, তাহার কোন সময়ে শব্দে শব্দত্বরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্ত শব্দ নিত্য কি অনিত্য? এইরূপ সংশয় জন্মে। সেই ব্যক্তির নিশ্চিত অন্ত নিত্য পদার্থে নিত্যত্ব এবং অন্ত অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বরূপ ধর্ম তাহার পূর্বজ্ঞাত পদার্থ বলিয়া ঐ ধর্মদ্বয় বিবয়ে তাহার সংস্কার থাকায় সেই

অথবা “পূর্বঘোষনবা”—এইরূপ আকারেই সংশয় জন্মে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ কেবল ভাবপদার্থ কোটিক এবং বহুভাব পদার্থ কোটিক সংশয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন। এবিষয়ে বেবলাহ্মি দীধিতির টীকায় গদ্যধর ভট্টাচার্য্য উক্ত উভয় মতের যুক্তি বিচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাবর-কোটিক ও বহুভাব কোটিক সংশয়ের কারণ উপস্থিত হইলে প্রাচীন মতে উহাও অবশ্যই জন্মে। “অভিজ্ঞান শকুন্তল” নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে কালিদাসের “ধমোহু মায়াহু মতিভ্রমেহু”—ইত্যাদি শ্লোকে এবং তাহার রচিত বহিষা প্রসিদ্ধ “কিমনুঃ কিং পদ্মঃ কিমু মুকুরবিধং কিমু মুখং”—ইত্যাদি শ্লোকে বহুভাব কোটিক সংশয়ই বর্ণিত হইয়াছে। আর “ভাষাপরিচ্ছেদে” নব্যনৈয়ায়িক বিঘ্ননাথও “নরোবা স্থাপূর্বা” ইত্যাকার জ্ঞানকেও সংশয়ের উদাহরণ বলিয়াছেন।

* মহর্ষি কণাদও বহিয়াছেন—“সামান্য প্রত্যক্ষাদিশেষা প্রত্যক্ষা বিশেষ স্মৃতেষ্ঠ সংশয়ঃ” (২।২।১৭) অর্থাৎ সমান ধর্মের প্রত্যক্ষ এবং বিশেষ ধর্মের অপ্রত্যক্ষ ও বিশেষ ধর্মের স্মরণজন্ত সংশয় জন্মে। কণাদ গৌতমোক্ত অসাধারণ ধর্মজ্ঞান প্রভৃতিকে কোন প্রকার সংশয়ের কারণ বলেন নাই। তদনুসারে “উপস্কার” টীকাকার শঙ্করমিশ্র বিচার পূর্বক কণাদের মত বলিয়াছেন যে, সংশয় পঞ্চ-বিধও নহে, ত্রিবিধও নহে, কিন্তু সর্বত্রই সাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্ত একবিধই। প্রশস্তপাদ সংশয় ভিন্ন “অনধ্যবসায়” নামক একপ্রকার ভ্রমজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ পদার্থে বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হইলে, ইহা কি? এইরূপে যে আলোচনাত্মক জ্ঞান জন্মে, তাহা উক্তমতে “অনধ্যবসায়” নামক জ্ঞান। উক্তরূপ জ্ঞানস্থলে কোন বিশেষ ধর্মের স্মরণ সম্ভব না হওয়ায় উহাকে সংশয় বলা যায় না। উক্ত মতে অসাধারণ ধর্মজ্ঞান কোনস্থলে উক্ত “অনধ্যবসায়” নামক জ্ঞানেরই কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু গৌতমের মতে উহাও সংশয় বিশেষ। তাই তিনি অসাধারণ ধর্মজ্ঞান জন্ত দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ই বলিয়াছেন। কণাদের কোন হুত্রে কিন্তু অসমস্ত অনধ্যবসায় নামক জ্ঞানের উল্লেখ পাই না।

সংস্কার জ্ঞাত তখন ঐ ধর্মদ্বয় বিষয়ে তাহার স্মৃতি জন্মে। স্মৃতরাং তখন শব্দমাত্রের অসাধারণ ধর্ম যে শব্দত্ব, শব্দরূপ ধর্মোতে তাহার জ্ঞান জ্ঞাত উক্তরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু শব্দে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপ কোন ধর্মের নিশ্চয় হইলে তখন আর উক্তরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না।

গৌতম পরে “বিপ্রতিপত্তিঃ” এই পদের দ্বারা “বিপ্রতিপত্তি” প্রযুক্ত তৃতীয় প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয়-পরীক্ষা প্রকরণে (১৬) ভাষ্যকার এই “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন— “সমানেধিকরণে—ব্যাহতার্থো প্রবাদো বিপ্রতিপত্তি শব্দস্যর্থঃ”। অর্থাৎ একই আধারে বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের বোধক যে প্রবাদদ্বয় বা বাক্যদ্বয়, তাহাই উক্ত “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ। যেমন মীমাংসক বলেন—শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন—শব্দ অনিত্য। একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয় কখনই থাকিতে পারে না। স্মৃতরাং উক্ত বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের বোধক বাক্যদ্বয় শ্রবণ করিলে তখন সেই বাক্যার্থজ্ঞান জ্ঞাত যাহাদিগের শব্দে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপ কোন পক্ষের নিশ্চয় জন্মে নাই, সেই মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের সংশয় জন্মে যে, শব্দ কি নিত্য? অথবা অনিত্য? বাদী ও প্রতিবাদী, মীমাংসক ও নৈয়ায়িক সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের ঐ সংশয় নিরাসের উদ্দেশ্যে ত্রায় প্রয়োগের দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন করেন।

গৌতম পরে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয়ের হেতু বলিয়াছেন। উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির নিয়মভাব। যেমন তড়াগাদিতে বিद्यমান জলেরই উপলব্ধি হয় এবং মরীচিকায় অবিद्यমান জলেরও ভ্রমাত্মক উপলব্ধি হয়। স্মৃতরাং সর্বত্রই যে, বিद्यমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, অথবা অবিद्यমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। এইরূপ ভূগর্ভে বা অন্তরস্থ বিद्यমান জলাদি পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না এবং অবিद्यমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। স্মৃতরাং উপলব্ধির ত্রায় অনুপলব্ধিরও উক্তরূপ কোন নিয়ম নাই। স্মৃতরাং কাহারও কোন পদার্থের উপলব্ধি হইলে সেখানে যদি সেই পদার্থের বিद्यমানত্ব বা অবিद्यমানত্বের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে তাহার বিद्यমান-পদার্থেরই কি উপলব্ধি হইতেছে? অথবা অবিद्यমান পদার্থেরই উপলব্ধি

হইতেছে? এই রূপ সংশয় জন্মে। উহা উপলব্ধির অব্যবস্থা জ্ঞাত চতুর্থ প্রকার সংশয়। এবং কোনস্থানে কোন পদার্থের উপলব্ধি না হইলে বিদ্যমান পদার্থেরই কি উপলব্ধি হইতেছে না? অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হইতেছে না? এই রূপ সংশয় জন্মে। উহা অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জ্ঞাত পঞ্চম প্রকার সংশয়। *

(২) প্রয়োজন

সংশয়ের দ্বারা প্রয়োজনও “শ্রায়ে”র পূর্বসঙ্গ। কারণ, প্রয়োজন ব্যতীতও পূর্বোক্ত ন্যায়-প্রবৃত্তি হয় না। প্রয়োজনের ব্যাখ্যার ভাষ্যকারও পূর্বে বলিয়াছেন—“তদাশ্রয়শ্চ শ্রায়ঃ প্রবর্ততে”। তাই মহর্ষি গৌতম সংশয়ের পরেই প্রয়োজন পদার্থের উদ্দেশ্য করিয়া তাহার লক্ষণস্বরূপ বলিয়াছেন,—

যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎপ্রয়োজনং ॥১।১।২৪ ॥

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া জীব তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগের উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই পদার্থকে প্রয়োজন বলে। ভাষ্যকারের মতে প্রাপ্য পদার্থের ন্যায় ত্যাজ্য পদার্থও প্রয়োজন। কারণ, ত্যাজ্য পদার্থের পরিত্যাগের জ্ঞাতও জীবের প্রবৃত্তি হওয়ায় ত্যাজ্য পদার্থ গুলিও জীবের প্রবৃত্তির প্রয়োজক হইয়া থাকে। “প্রযুক্ত্যতে হনেন”—এইরূপ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ “প্রয়োজন” শব্দের দ্বারা উক্ত রূপ অর্থ বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিখ্যাত

* বার্তিককার উদ্যোতকর ভাষ্যকারের এইরূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে একতর পক্ষের সাধক প্রমাণের অভাব এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে বাধক প্রমাণের অভাব। ঐ উভয় সংশয় মাত্রের কারণ, কিন্তু কোন সংশয় বিশেষের কারণ নহে। সুতরাং মহর্ষি গৌতমও ঐ উভয়কে সংশয় মাত্রের কারণ রূপেই উক্ত হুত্রে বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং তাহার প্রথমোক্ত সাধারণ ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি ত্রিবিধ কারণ জ্ঞাত সংশয় ত্রিবিধ, ইহাই সিদ্ধান্ত। পরবর্তী প্রায় সমস্ত নৈয়ায়িকও উক্ত বিষয়ে উদ্যোতকরের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতমের হুত্রে দ্বারা ভাষ্যকারের মতই সরল ভাবে বুঝা যায়। কোন নব্য-নৈয়ায়িক সম্প্রদায় গৌতমের উক্ত হুত্রে “চ” শব্দের দ্বারা ব্যাপ্যপদার্থের সংশয় জ্ঞাত ব্যাপক পদার্থের সংশয়কেও গৌতমের অভিमत বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “অনুমান চিন্তামণি”র উপাধি বিভাগের টীকায় রঘুনাথ শিবোমণিও উক্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন।

প্রভৃতি নবাগণ সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া জীব তাহার উপায়ে ওত্তর হয়, তাহা প্রয়োজন। ঐ প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি বিষয়ে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে, এজন্য ঐ উভয়কেই বলা হইয়াছে, স্বতঃ প্রয়োজন বা মুখ্য প্রয়োজন। আর ঐ সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির যে সমস্ত উপায়, তাহাকে বলা হইয়াছে—গৌণ প্রয়োজন।

(৩) দৃষ্টান্ত

প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব রূপ ন্যায় বাক্যের মধ্যে তৃতীয় অবয়ব যে উদাহরণ বাক্য বক্তব্য, তাহা দৃষ্টান্ত পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত বলা যায় না। কারণ দৃষ্টান্ত পদার্থ বিশেষের বোধক বাক্যই উদাহরণ বাক্য। তাই মহর্ষি গৌতম প্রয়োজন পদার্থের পরেই দৃষ্টান্ত পদার্থের উদ্দেশ্য করিয়া পরে উহার লক্ষণ হ্রস্ব বলিয়াছেন,—

লৌকিক-পরীক্ষকাণাং যন্মিন্নর্থো বুদ্ধি সাম্যং স দৃষ্টান্তঃ ॥ ১।১ ২৫

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহারা স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রানুশীলনাদি জন্ম বুদ্ধিপ্রকর্ষ লাভ করেন নাই, অর্থাৎ যাহাদিগকে “সাধারণ লোক” বলে, তাহারা “লৌকিক”। আর যাহারা উক্তরূপ বুদ্ধিপ্রকর্ষ লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যাহারা ত্রায় প্রয়োগ দ্বারা তত্ত্ব পরীক্ষা করিতে সমর্থ, তাহারা “পরীক্ষক”। যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক এই উভয়ের বুদ্ধির সাম্য হয়, অর্থাৎ যাহাতে উভয়ের বুদ্ধির বৈষম্য বা বিরোধ থাকে না—সেই পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলে। যেমন কোন পরীক্ষক ব্যক্তি কোন লৌকিক ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন যে, যেহেতু ঐস্থানে ধূম আছে, অতএব অবশ্যই বহ্নি আছে। কিন্তু ধূম থাকিলেই যে, সেখানে বহ্নি থাকে, ইহাও তাহাকে বুঝ ন আবশ্যক। তাই তিনি পরে উহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন—যথা রন্ধনশালা। রন্ধনশালায় যে ধূম থাকিলে তখন বহ্নিও থাকে, ইহা সেই লৌকিক ব্যক্তিও দেখিয়াছেন। সুতরাং তাহা স্মরণ করিয়া সেই পরীক্ষকের ত্রায় তিনিও তখন বুঝিলেন যে, যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নি থাকে। সুতরাং তখন সেই রন্ধনশালা নামক পদার্থে উক্ত বিষয়ে উভয়েরই বুদ্ধির সাম্য হওয়ায় উক্ত লক্ষণানুসারে উহা দৃষ্টান্ত হয়।

বস্তুতঃ সর্বত্রই যে, উত্তরূপ লৌকিক ব্যক্তির বুদ্ধিগম্য বা লোকসিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত হয়, ইহা গৌতমের তাৎপর্য্য নহে। কারণ তিনি বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষায় শেষস্থত্রে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যকে এবং অহত্র আরও কোন কোন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন,—যাহা লোকসিদ্ধ নহে, কেবল পরীক্ষক পণ্ডিতজনবোধ্য। সুতরাং উক্ত স্থত্রে “লৌকিক” শব্দের দ্বারা যাহাকে তত্ত্ব বুঝান হয়, সেই বোদ্ধা পুরুষ এবং “পরীক্ষক” শব্দের দ্বারা যিনি তাহাকে প্রমাণাদির দ্বারা কোন তত্ত্ব বুঝান, সেই বোধয়িতা পুরুষট গৌতমের বিবক্ষিত। বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় ব্যক্তিই বোদ্ধা ও বোধয়িতা। সুতরাং যে পদার্থ তাহাদিগের উভয়ের মতেই প্রমাণসিদ্ধ, অর্থাৎ যাহা উভয়েরই স্বীকৃত, তাহা লোক সিদ্ধ পদার্থ না হইলেও দৃষ্টান্ত হয়। ‘ভামতী’ টীকায় (১।১।১৪) বাচস্পতি মিশ্রও গৌতমের উক্ত স্থত্রের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই সমর্থন করিয়াছেন। যে পদার্থে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মত-বৈষম্য আছে, তাহা যে সেখানে দৃষ্টান্ত হয় না, ইহা উক্ত স্থত্রে “যস্মিন্নর্থং বুদ্ধিমাযং” এই কথার দ্বারা গৌতমও ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ দ্বিবিধ, সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত এবং, বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত। পরে তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহা পরিষ্কৃত হইবে।

(৪) সিদ্ধান্ত

কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়াই তাহার সংস্থাপনের জন্ত দৃষ্টান্ত মূলক তায়ের প্রয়োগ হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত কাহাকে বলে এবং উহা কত প্রকার, ইহা বলা আবশ্যক। তাই মহর্ষি গৌতম প্রথম স্থত্রে “দৃষ্টান্ত” পদার্থের পরে “সিদ্ধান্ত” পদার্থের উদ্দেশ্য করিয়া পরে যথাক্রমে উহার লক্ষণাদি প্রকাশ করিতে নিম্নলিখিত ছয়টি স্থত্র বলিয়াছেন—

তত্ত্বাধিকরণভূপগম সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥১।১।২৬॥

স চতুর্বিধঃ সর্বত্রহু প্রতিতত্ত্বাধিকরণভূপগম সংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ ॥ ১।১।২৭ ॥

সর্বতত্ত্বাধিকরণস্থেহধিকৃতোহর্থঃ সর্বত্রসিদ্ধান্তঃ ॥ ১।১।২৮ ॥

সমানতত্ত্বসিদ্ধঃ পরতত্ত্বাসিদ্ধঃ প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তঃ ॥ ১।১।২৯ ॥

যৎসিদ্ধান্তপ্রকরণসিদ্ধিঃ সোহধিকরণসিদ্ধান্তঃ ॥ ১।১।৩০ ॥

অপরাধিতত্ত্বভূপগমাত্তদ্বিশেষ পরীক্ষণমভূপগম সিদ্ধান্তঃ ॥ ১।১।৩১ ॥

“তত্ত্ব” শব্দের অর্থ শাস্ত্র। “তত্ত্ব” বা শাস্ত্র বাহার অধিকরণ বা আগ্রহ অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ কোন শাস্ত্র বোধিত, সেই সমস্ত পদার্থই উক্ত প্রথম হুত্রে “তত্ত্বাধিকরণ” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। সেই সমস্ত পদার্থের “অভ্যুপগম” অর্থাৎ স্বীকার রূপ যে “সংস্থিতি” বা নিশ্চয়, অর্থাৎ নিশ্চিত যে শাস্ত্রার্থ, তাহাই সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার “সিদ্ধান্ত” পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে পূর্বে (প্রথম হুত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন যে, “ইহা” এবং “এই প্রকার”—এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ যে সমস্ত পদার্থ, তাহাকে বলে “সিদ্ধ”। সেই পদার্থের যে পূর্বোক্তরূপে সংস্থিতি বা নিশ্চয় অর্থাৎ নিশ্চিত যে সমস্ত সিদ্ধ পদার্থ, তাহাই সিদ্ধান্ত। প্রাচীনকালে নিশ্চয় অর্থেও “অন্ত” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় “সিদ্ধান্ত” শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। বিভিন্ন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি সকলের নিশ্চিত বা সম্মত না হইলেও সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে নিশ্চিত শাস্ত্রার্থ বন্নিয়া সেই সমস্তও সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে সিদ্ধান্তের বহু ভেদ থাকাতেই “বাদ”, “জল্প” ও “বিতণ্ডা”—এই ত্রিবিধ “কথা”র প্রবৃত্তি হইতেছে। নচেৎ তাহা হইতে পারে না। তাই মহর্ষি গৌতম উক্ত সিদ্ধান্ত পদার্থের প্রকার ভেদ বলিয়া যথাক্রমে তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত চতুর্বিধ। যথা (১) “সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” (২) “প্রতিতত্ত্ব সিদ্ধান্ত” (৩) “অধিকরণ সিদ্ধান্ত” ও (৪) “অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত”।

তন্মধ্যে গৌতম প্রথম প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহা সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, সেই পদার্থকে বলে “সর্বতত্ত্ব সিদ্ধান্ত”। যেমন ঘ্রাণাদির ইন্দ্রিয়ত্ব, পৃথিব্যাতির ভূতত্ত্ব এবং আত্মার নিত্যত্ব প্রভৃতি। ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত সমস্ত আন্তিক শাস্ত্রের সম্মত এবং শাস্ত্রে কথিত। যাহা সর্ব শাস্ত্রে কথিত, তাহাই “সর্বতত্ত্ব সিদ্ধান্ত”—ইহা বলা যায় না। কারণ, গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত অনেক পদার্থ অত্রাশ্র শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। কিন্তু সেই সমস্ত পদার্থও সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং ত্রায়শাস্ত্রে কথিত হওয়ায় উক্ত সর্বতত্ত্ব সিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক পদার্থ আছে, যাহা সর্বশাস্ত্রে কথিত না হইলেও সর্বসম্মত পদার্থ বলিয়া “সর্বতত্ত্ব সিদ্ধান্ত”। কিন্তু যাহা কোন শাস্ত্রেই কথিত হয় নাই,

তাহা সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেও “সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত” হইবে না। কারণ তাহাতে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণই নাই। গৌতম ইহাই প্রকাশ করিতে উক্ত “সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত”ের লক্ষণস্থলে পরে বলিয়াছেন—“তন্ত্ৰেধিকৃতঃ”।

গৌতম পরে দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহা সমান তন্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ কোন এক শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু পরতন্ত্রে অসিদ্ধ, তাহাকে বলে (২) “প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত”। যেমন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের পক্ষে শ্রায়শাস্ত্র সমানতন্ত্র, সাংখ্যাদি শাস্ত্র পরতন্ত্র। ফলকথা,—যে সম্প্রদায়ের যাহা নিজমত প্রতিপাদক শাস্ত্র, তাহাই উক্ত স্থলে “সমানতন্ত্র” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। সুতরাং যে পদার্থ যাহার নিজ তন্ত্রসিদ্ধ, কিন্তু পরতন্ত্রে অসিদ্ধ, তাহাই তাঁহার পক্ষে “প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত”। যেমন পূর্ব যীমাংসা শাস্ত্রে মহিষ জৈমিনি শব্দের নিত্য সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈশেষিক শাস্ত্রে কণাদ এবং শ্রায় শাস্ত্রে গৌতম শব্দের অনিত্য সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং যীমাংসক সম্প্রদায়ের পক্ষে শব্দের নিত্য এবং শ্রায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পক্ষে শব্দের অনিত্য “প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত”। এইরূপ আরও বহু বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে।

গৌতম পরে তৃতীয় প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের সিদ্ধি হইলেই তন্নির প্রকৃতসাধ্য সিদ্ধ হয়, সেই পদার্থকে বলে (৩) “অধিকরণ সিদ্ধান্ত”। ইহার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ বিষয়ে মতভেদ আছে। বাস্তবিক-কার উদ্যোতকর ও রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যামুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গৌতমের উক্তস্থলের তাৎপর্যার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থের সিদ্ধি ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয় না, সেই প্রথমোক্ত পদার্থই “অধিকরণ সিদ্ধান্ত”। যেমন “তদ্ব্যগুক সর্কর্তৃকং কার্যাত্মাদৃষ্টবৎ”—ইত্যাদি শ্রায় প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণ দ্বারা সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন “ব্যগুক” নামক দ্রব্যে কর্তৃজগত্ব সিদ্ধ করিলে অর্থাৎ সেই ব্যগুকের কোন কর্তা আছেন, ইহা সিদ্ধ করিলে সেই কর্তার সর্কর্তৃত্ব ও সিদ্ধ হয়। কারণ, সেই ব্যগুকের উপাদান কারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণুর প্রত্যক্ষ ব্যতীত সেই ব্যগুকে কর্তৃজগত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং সেই ব্যগুক-কর্তা প্রকৃষ যে অতীন্দ্রিয়দর্শী সর্কর্ত্ব, ইহা স্বীকার্য। উক্তস্থলে জগৎকর্তা সেই পরমেশ্বরের নিত্য সর্কর্ত্বই উক্ত

লক্ষণানুসারে “অধিকরণ সিদ্ধান্ত”। কারণ পূর্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন “দ্যগুক” নামক দ্রব্যে সৰ্বভূত্ব বা কৰ্তৃজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইলে আনুষঙ্গিক রূপে সেই দ্যগুককর্তার নিত্য সৰ্বভূত্ব অবশ্যই ‘সদ্ধ হইবে। নচেৎ কোন প্রমাণ দ্বারাই সেই দ্যগুকে কৰ্তৃজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতরাং পরমেশ্বরের নিত্যসৰ্বভূত্বরূপ সিদ্ধান্ত উক্ত কৰ্তৃজ্ঞত্ব-রূপ সিদ্ধান্তের অধিকরণ বা আশ্রয় বলিয়া উহা “অধিকরণ সিদ্ধান্ত” নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ করিতে গৌতম প্রথমে যে অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন, তদ্বারা আত্মাতে ইন্দ্রিয়ভিন্নত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে আনুষঙ্গিকরূপে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব প্রভৃতিও অবশ্য স্বীকার্য্য হয়। ভাষ্যকার সেই সমস্ত সিদ্ধান্তকেই ইহার উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌতম পরে শেষ সূত্রের দ্বারা চতুর্থ প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ বর্ণিয়াছেন যে, যেস্থলে অপরীক্ষিত পদার্থের “অভ্যুপগম” অর্থাৎ স্বীকার করিয়া-তাহার বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা করা হয়, সেই স্থলে অশ্ব সম্প্রদায়ের সম্মত সেই পদার্থকে বলে (৫) “অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত”। উক্তরূপ ব্যাখ্যানুসারে ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, মীমাংসক সম্প্রদায়বিশেষের মতে বর্ণাত্মক শব্দ দ্রব্যপদার্থ ও নিত্য। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে উহা গুণপদার্থ ও অনিত্য। কোন নৈয়ায়িকের নিকটে উক্ত মতবাদী কোন মীমাংসক, শব্দের দ্রব্যত্ব সংস্থাপন করিলে তখন নৈয়ায়িক উহা খণ্ডন না করিয়াই বলিলেন যে,—আচ্ছা—শব্দ দ্রব্য পদার্থ হউক, কিন্তু উহার নিত্যত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করুন। নৈয়ায়িকের অভিক্ষি এই যে, শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াও যদি উহার নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে পারি, তাহা হইলে মীমাংসকের ঐ প্রধান সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হওয়ায় তিনি আর শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিবেন না। উক্তস্থলে নৈয়ায়িক, মীমাংসক-সম্মত শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্তকে পরীক্ষা না করিয়া অর্থাৎ উহা মানিয়া লইয়াই উহার অনিত্যত্ব-রূপ বিশেষ ধর্ম সংস্থাপন করায় শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্ত তাহার পক্ষে “অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত”। ফলকথা বিচারস্থলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিবাদী বাদীর অভিমত কোন সিদ্ধান্ত বিশেষ মানিয়া লইয়াই তাহার প্রধান মতের খণ্ডন করিলে সেখানে

সেই সিদ্ধান্ত তাঁহার পক্ষে “অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত” হয়, কিন্তু বাদীর পক্ষে তাহা “প্রতি তত্ত্ব সিদ্ধান্ত”। “চরক সংহিতার” বিমান স্থানেও চতুর্থ “অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত” উক্তরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু বার্তিককার উদ্যোতকর প্রভৃতি গৌতমের উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহা সূত্রের দ্বারা ‘অপরীক্ষিত’ অর্থাৎ স্পষ্ট কথিত হয় নাই, তাহা স্বীকার করিয়াই সূত্রকার সেই পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষা করিলে সেই অপরীক্ষিত পদার্থকে বলে “অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত”। যেমন গৌতম ইন্দ্রিয় বিভাগ সূত্রে মনের উল্লেখ না করিলেও এবং অগ্র কোন সূত্রেও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ব্যক্ত না করিলেও তিনি মনের যে সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার মতে মনও যে ইন্দ্রিয়বিশেষ, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং মনের ইন্দ্রিয়ত্ব—“অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত”। কিন্তু গৌতমের পূর্ব্বোক্ত “অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ”—ইত্যাদি সূত্র পাঠের দ্বারা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সরলভাবে বুঝা যায়। ভাষ্যকার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ লক্ষণ সূত্রের ভাষ্যে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সমর্থন করিতে গৌতম কেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই, তাহার হেতুও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব—“সর্ব্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত”।

(৫) অবয়ব

“ন্যায়”দ্বারা সিদ্ধান্তনির্ণয়াদি কার্য্যে “অবয়ব” পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। তাই মহর্ষি গৌতম “সিদ্ধান্ত” পদার্থের পরেই “অবয়ব” পদার্থের উল্লেখ করিয়া পরে যথাক্রমে উহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—
“প্রতিজ্ঞা হেতুদাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ” (১১।৩২)। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামক পঞ্চ বাক্য বিশেষ “অবয়ব”। গৌতম পরে যথাক্রমে উহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে নিম্নলিখিত সাংখ্যিক সূত্র বলিয়াছেন—

(১) সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥ (২) উদাহরণ—সাধ্যশ্রীঃ সাধ্যসাধনং হেতুঃ ॥ (৩) তথা বৈধর্ম্মাৎ ॥ (৪) সাধ্যসাধ্যাত্তদ্ব্যবভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ ॥ (৫) তদ্বিপৰ্য্যাসাৎ বিপরীতঃ ॥ (৬) উদাহরণ—পেক্ষন্তুথ্যেতুপসংহারো ন তথেষ্টিবা সাধ্য স্তোপনয়ঃ ॥ (৭) হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনং ॥ ১১।৩৩।৩৩

অবয়ব কি এবং তাহার প্রয়োজন কি ? ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমে বুঝা আবশ্যক যে, পূর্বোক্ত অনুমান প্রমাণ স্বার্থ ও পরার্থ নামে দ্বিবিধ। নিজের তত্ত্ব নিশ্চয়ার্থে যে অনুমান প্রমাণকে আশ্রয় করা হয়, তাহাকে বলে স্বার্থানুমান। আর পরের তত্ত্ব নিশ্চয়োদ্দেশ্যে অর্থাৎ অপরকে নিজমত বুঝাইবার জন্ত যে অনুমান প্রমাণ আশ্রয় করা হয়, তাহাকে বলে পরার্থানুমান। বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে নিজমত প্রতিপাদন করিতে যে, অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করেন, উহা তাঁহাদিগের পরার্থানুমান। এবং তাহা প্রদর্শন করিতে যথাক্রমে তাঁহাদিগের যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই বাক্য সমষ্টির নাম—“গ্রন্থ”। পূর্বোক্ত “পরার্থানুমান” ও “ন্যায়” নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু যথাক্রমে উচ্চারিত পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি নামক পঞ্চ বাক্যের সমষ্টিই বাক্যরূপ “ন্যায়”। ভাষাকার উহাকে “পরম ন্যায়” বলিয়াছেন। উক্ত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নামক পঞ্চবাক্য; সেই “ন্যায়ের” পাঁচটি অবয়ব। সাবয়ব দ্রব্যের অংশগুলি যেমন তাহার অবয়ব নামে কথিত হয়, তদ্রূপ, ন্যায় বাক্যের অংশ বলিয়া উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি খণ্ডবাক্য উহার “অবয়ব” নামে কথিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, যেমন সাবয়ব দ্রব্যের উপাদান কারণ অবয়বগুলি মিলিত হইয়া সেই দ্রব্যের উৎপাদন ও ধারণ করে, তদ্রূপ, প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য মিলিত হইয়া “ন্যায়” নামক মহাবাক্যের নিষ্পাদন করিয়া তাহার প্রতিপাত্ত বা বস্তুর বিবক্ষিত অর্থের প্রতিপাদন করে। তাই ঐ প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য দ্রব্যের উপাদান কারণ অবয়বের সদৃশ বলিয়া উক্তরূপ গৌণ অর্থে “অবয়ব” নামে কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে ইহাও বুঝা যায় যে, উক্ত ন্যায় বাক্যের অন্তর্গত যে প্রতিজ্ঞাদি বাক্য, তাহাই অবয়ব। কেহ গ্রন্থ প্রয়োগ না করিয়া ঐরূপ কোন বাক্য বলিলে তাহা অবয়ব হইবে না। সুতরাং গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারা গ্রন্থ বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যের অষ্টতমত্বই অবয়বের সামান্য লক্ষণ হুঁত হইয়াছে, বুঝা যায়।

(১) প্রতিজ্ঞা

প্রথম অবয়ব “প্রতিজ্ঞা”। গৌতম উহার লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—“সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা”। অনুমেয় দর্শকে যেমন সাধ্য বলে, তদ্রূপ

যে ধর্ম্মীতে সেই ধর্ম্মের অনুমান করা হয়, সেই ধর্ম্মীকেও সেই ধর্ম্মরূপে সাধ্য বলে। উহার নাম সাধ্যধর্ম্মী। যেমন শব্দে অনিত্যত্ব ধর্ম্মের অনুমান করিতে গেলে অনিত্যত্বই শব্দে সাধ্য ধর্ম্ম এবং সেই শব্দ অনিত্যত্বরূপে সাধ্যধর্ম্মী। (গৌতমের উক্ত হৃত্রে সাধ্যধর্ম্মী অর্থে ই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, যে বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মীর নির্দেশ হয়, অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী প্রথমে যে বাক্যের দ্বারা তাঁহাদিগের সাধ্যধর্ম্মীর প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের সেই সাধ্যধর্ম্মীর বোধক বাক্যট “প্রতিজ্ঞা”। যেমন শব্দের অনিত্যবাদী নৈয়ায়িক প্রথমে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মীর নির্দেশ করিতে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলেন—“নদো হনিত্যঃ”। ভাষ্যকার “অনিত্যঃ শব্দঃ”,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিয়াছেন। কিন্তু পরে অনেকে ঐরূপ বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

(২) হেতু

যে পদার্থ অনুমেয় ধর্ম্মের সাধন হয়, তাহাকে অনুমানস্থলে হেতু পদার্থও ক্রি়া বলে। কিন্তু গৌতমোক্ত দ্বিতীয় অবয়ব যে হেতু, তাহা সেই হেতু পদার্থের বোধক বাক্য বিশেষ। যেমন ‘ধূমঃ’ ইত্যাদি পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত বাক্য। পূর্কোক্ত হেতু পদার্থ দ্বিবিধ (১) সাধর্ম্ম্য হেতু ও (২) বৈধর্ম্ম্য হেতু। সুতরাং সেই হেতু পদার্থের বোধক বাক্যরূপ দ্বিতীয় অবয়ব যে হেতু, তাহাও সাধর্ম্ম্য হেতু ও বৈধর্ম্ম্য হেতু নামে দ্বিবিধ। গৌতম পরে দুই হৃত্রের দ্বারা যথাক্রমে উক্ত দ্বিবিধ হেতু বাক্যের লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, উদাহরণ পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত যে বাক্য সাধ্যধর্ম্মের সাধন হয়, তাহা হেতু, তদ্রূপ, উদাহরণ পদার্থের বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত যে বাক্য সাধ্যধর্ম্মের সাধন হয়, তাহাও হেতু। “উদাহরণ” শব্দটি দৃষ্টান্ত পদার্থ এবং তাহার বোধক বাক্য (তৃতীয়, অব্যব) এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। গৌতমের উক্ত হেতু লক্ষণ হৃত্রে “উদাহরণ” শব্দের অর্থ দৃষ্টান্ত পদার্থ। অনুমানস্থলে যে পদার্থে হেতু পদার্থ অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়, সেই পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলে। সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত ও বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত নামে সেই দৃষ্টান্ত পদার্থও দ্বিবিধ (১)। সেই দৃষ্টান্ত

পদার্থের সাধর্ম্য বা সমান ধর্ম প্রযুক্ত সাধাধর্মের সাধনত্ব বোধক যে বাক্য বিশেষ, তাহাই সাধর্ম্য হেতু বাক্য। এবং সেই দৃষ্টান্ত পদার্থের বৈধর্ম্য প্রযুক্ত সাধ ধর্মের সাধনত্ব বোধক যে বাক্যবিশেষ তাহা বৈধর্ম্য হেতুবাক্য। যেমন পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগের পরেই শব্দে অনিত্যত্বরূপ সাধাধর্মের সাধন প্রকাশের জন্ত নৈয়ায়িক বলেন—“উৎপত্তি ধর্মকত্বাৎ”।

নৈয়ায়িকের মতে বিद्यমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয় না, কিন্তু ঘটাদি পদার্থের জ্ঞায় পূর্বে অবিद्यমান শব্দেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তস্থলে ঘটাদি পদার্থই নৈয়ায়িকের বিবক্ষিত দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ ঘটাদি অনিত্য পদার্থে যেমন উৎপত্তিমত্ব ধর্ম আছে, তদ্রূপ শব্দেও ঐ ধর্ম থাকায় ঘটাদি পদার্থের জ্ঞায় শব্দ অনিত্য, ইহাই নৈয়ায়িকের বক্তব্য। সুতরাং উক্ত স্থলে শব্দে ঘটাদি দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধর্ম্য বা সমান ধর্ম যে, উৎপত্তিমত্ব, তৎপ্রযুক্তই নৈয়ায়িক “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এই বাক্যের প্রয়োগ করায়—উহা সাধর্ম্যহেতু বাক্য এবং উহাই “হেতু” নামক দ্বিতীয় অবয়ব। কিন্তু উক্ত স্থলে নৈয়ায়িক যদি নিত্য আত্মাকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া বলেন যে, যে সমস্ত পদার্থ অনিত্য নহে, তাহা উৎপত্তিমান নহে, যেমন আত্মা, তাহা হইলে নৈয়ায়িকের গৃহীত ঐ দৃষ্টান্ত পদার্থ হইবে বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত। কারণ নৈয়ায়িকের কথিত উৎপত্তিমত্বরূপ হেতু আত্মাতে না থাকায় উহা আত্মার বৈধর্ম্য। সুতরাং সেই বৈধর্ম্য প্রযুক্ত নৈয়ায়িকের কথিত উক্ত হেতু বাক্যই ঐ স্থলে বৈধর্ম্য হেতু বাক্য হইবে।

ভাষ্যকার বাৎস্তান্নন বৈধর্ম্য হেতু বাক্যের উক্তরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেও উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ উহা গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছেন যে, যে স্থলে সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত না থাকায় বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তেই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়,—সেই স্থলীয় হেতু বাক্যকে বলে বৈধর্ম্য হেতু বাক্য। যেমন নৈরায়াবাদী নাস্তিকের নিকটে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে আস্তিক বলিলেন—“জীবচ্ছরীরং সাত্মকং প্রাণাদিমত্বাৎ”। অর্থাৎ যে হেতু জীবিত প্রাণীর শরীরে প্রাণাদি আছে, অতএব উহা সাত্মক, অর্থাৎ উহাতে আত্মা বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ আছে। কিন্তু প্রতিবাদী আত্মা বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ স্বীকার না করায় তাঁহার মতে কাহারও কোন শরীরই

সাম্বন্ধক নহে। সুতরাং উক্ত স্থলে উভয়বাদি-সম্মত কোন সাধ্যম্ব্য দৃষ্টান্ত সম্ভব হয় না। সাধ্যম্ব্য দৃষ্টান্তকেই “অবয় দৃষ্টান্ত” বলে, এবং সেই দৃষ্টান্তে হেতু পদার্থে অনুমের ধর্মের যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাহাকে বলে “অবয় ব্যাপ্তি”। কিন্তু উক্ত স্থলে অবয় দৃষ্টান্তের অভাবে বাদীর কথিত প্রাণাদিম্ব্য হেতুতে সাম্বন্ধকরূপ সাধ্য ধর্মের অবয় ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভব না হওয়ায় বাদী নৈয়ায়িক বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া পরে উদাহরণ বাক্য বলিলেন—“যন্নৈবং তন্নৈবং যথা বটঃ”। উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, যাহা সাম্বন্ধক নহে, তাহা প্রাণাদি বিশিষ্ট নহে, যেমন বট। উক্ত রূপ উদাহরণ বাক্যকে বলে বৈধর্ম্যোদাহরণ বাক্য। উহার দ্বারা যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহাকে বলে বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত ও “ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত”। উক্তরূপ দৃষ্টান্তে যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, তাহাকে বলে “ব্যতিরেক ব্যাপ্তি”। (১)

পূর্বোক্ত রূপ বৈধর্ম্যোদাহরণ বাক্যদ্বারা উক্ত স্থলে বাদী ইহাই প্রতিপাদন করেন যে, প্রাণাদির অভাব সাম্বন্ধকের অভাবের ব্যাপক পদার্থ, ইহা নিশ্চিত। অর্থাৎ প্রাণাদি শূন্য কোন পদার্থই সাম্বন্ধক নহে—ইহা উভয় বাদিঙ্গিক। সুতরাং বাদীর কথিত প্রাণাদি ম্বরূপ যে হেতু, তাহাতে সাম্বন্ধকরূপ সাধ্য ধর্মের ব্যতিরেক ব্যাপ্তি থাকায় ঐ হেতুর দ্বারা জীবিত প্রাণীর শরীর মাত্রের সাম্বন্ধকের অনুমিতি হইতে পারে। কারণ ব্যাপক পদার্থের অভাব রূপ হেতু।

১। “ব্যতিরেক” শব্দের অর্থ অভাব। যে যে পদার্থে সাধ্য ধর্ম নাই, তাহাতে হেতু পদার্থ নাই, ইহা কোন ব্যতিরেক দৃষ্টান্তে বুঝিলে হেতু পদার্থের অভাব যে সাধ্য ধর্মের অভাবের ব্যাপক পদার্থ,—ইহাই বুঝা হয়। তাহা হইলে তখন সাধ্য ধর্মের অভাবের ব্যাপক যে অভাব, (হেতুভাব) তাহার প্রতিযোগী সেই হেতু পদার্থ, এইরূপ নিশ্চয় ও জন্মে। উক্তরূপ নিশ্চয়ই দেখানে হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নিশ্চয়। সুতরাং সাধ্য ধর্মের অভাবের ব্যাপক অভাবের যে প্রতিযোগিত্ব ধর্ম হেতু পদার্থে থাকে, তাহাই ব্যতিরেক ব্যাপ্তির স্বরূপ। গবেষণ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ ইহাই বলিয়াছেন। আর হেতু পদার্থের ব্যাপক যে সাধ্যধর্ম, তাহার সহিত একাধারে অবস্থিতি রূপ যে সামান্যাদিকরণ, (হেতু ব্যাপক সাধ্য সামান্যাদিকরণ) তাহাকেই বলিয়াছেন—“অবয় ব্যাপ্তি”। কারণ, যে যে পদার্থে হেতু পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পদার্থেই সাধ্য ধর্ম আছে, ইহা কোন অবয় দৃষ্টান্তে বুঝিলে সেই সাধ্য ধর্মটি যে সেই হেতু পদার্থের ব্যাপক পদার্থ, ইহাই বুঝা হয়। সুতরাং উক্ত রূপ অবয় দৃষ্টান্তে পূর্বোক্ত রূপ অবয় ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় হইয়া থাকে।

দ্বারা ব্যাপ্য পদার্থের অভাবের যে অনুমিতি হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। উক্ত স্থলে প্রাণাদিম্বের অভাবের অভাব যে প্রাণাদিম্ব, তাহা ব্যাপক পদার্থের অভাব, এবং নিরায়কব্ধের অভাব যে সাত্ত্বিকত্ব, তাহা ব্যাপ্য পদার্থের অভাব। সুতরাং জীবিত প্রাণীর শরীরে প্রাণাদিম্ব হেতুর দ্বারা সাত্ত্বিকত্বরূপ সাধ্য ধর্ম অবশ্যই অনুমান প্রমাণ দিষ্ট হয়।

বস্তুতঃ গৌতমোক্ত দ্বিবিধ হেতু বাক্য ও দ্বিবিধ উদাহরণ বাক্যের লক্ষণসূত্র দ্বারা পূর্বোক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত ও দ্বিবিধ ব্যাপ্তিই যে স্থচিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় এবং তিনি “অর্থাপত্তি” প্রমাণকে অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত বলায় তদ্বারাও তাঁহার মতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নিশ্চয় যে অনুমিতির কারণ, ইহা বুঝা যায়। তাই গৌতমোক্ত দ্বিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যায় “অবয়ী”, “ব্যতিরেকী” ও “অব. ব্যতিরেকী” নামে অনুমান প্রমাণ দ্বিবিধ, এইরূপও ব্যাখ্যা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাঃার্থ্য উদ্যোতকরও প্রথমে ঐ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উক্ত দ্বিবিধ অনুমানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ক্রমে অনেক মতভেদ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা এই যে, যে স্থলে কেবল অবয় দৃষ্টান্তে হেতু পদার্থে কেবল অবয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মই অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণের নাম ‘অবয়ী’ ও ‘কেবলাবয়ী’। আর যে স্থলে অবয় দৃষ্টান্তের অভাবে কোন ব্যতিরেক দৃষ্টান্তে হেতু পদার্থে ব্যতিরেক ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মই অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণের নাম “ব্যতিরেকী” ও “কেবল ব্যতিরেকী”। পূর্বে ইহার উদাহরণ বলিয়াছি। আর যেস্থলে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তে হেতু পদার্থে দ্বিবিধ ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় জন্ম অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণের নাম “অবয়ব্যতিরেকী”। যেমন ধূমহেতুর দ্বারা বহ্নির অনুমানস্থলে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তই থাকায় কাহারও দ্বিবিধ ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় হইলে সেখানে সেই অনুমান প্রমাণ “অবয়ব্যতিরেকী” হইবে। আর কেবল অবয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্ম অনুমিতি হইলে উহা সেখানে “অবয়ী” হইবে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে যে স্থলে সাধ্য-ধর্মের অভাবই অলীক, সেইরূপস্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত সম্ভব না হওয়ায় কেবল অবয়ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মই অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণের নামই “কেবলাবয়ী”। এ সকল বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে। অনেকে “অবয়ব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার অনুমান প্রমাণ স্বীকার করেন নাই।

মীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় “কেবল ব্যতিরেকী” অনুমানও স্বীকার করেন নাই। কারণ তাঁহারা ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলিয়া অস্বীকার করিয়া “অর্থাপত্তি” নামে পৃথক্ প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে সর্বত্রই অবয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় জ্ঞতই অনুমিতি জন্মে, স্তত্রাং সমস্ত অনুমান প্রমাণই “অবয়ী”। ন্যায়নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও পরে স্বাধীন মতানুসারে সর্বত্র অবয় ব্যাপ্তি নিশ্চয়কেই অনুমিতির কারণ বলিয়াছেন এবং তিনি “পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ” গ্রন্থে মীমাংসক মতানুসারে “অর্থাপত্তি”র পৃথক্ প্রামাণ্যও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ মত গোতম মত বিরুদ্ধ। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় “কেবল ব্যতিরেকী” অনুমান সমর্থন করিতে বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ কথ এই যে, যদিও অনুমানস্থলে সর্বত্রই হেতুতে অবয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে, ইহা স্বীকারই করা যায়, তাহা হইলেও যে স্থলে কোন ব্যক্তির সেই নিশ্চয় জন্মে নাই, কিন্তু কেবল ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই বুদ্ধিস্থ হওয়ায় তাহাতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় জন্মিয়াছে, অন্ততঃ সেইরূপ স্থলেও ত সেই অনুমান প্রমাণকে “কেবল ব্যতিরেকী” বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বাহ্যিক ভায়ে এবিষয়ে এখানে আর অধিক আলোচনা সম্ভব নহে।

(৩) উদাহরণ

হেতু বাক্যের পরে প্রযোজ্য উদাহরণ বাক্য ও দ্বিবিধ,—সাধর্ম্যোদাহরণ বাক্য এবং বৈধর্ম্যোদাহরণ বাক্য। মহর্ষি গোতম উহার লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, সাধ্য ধর্ম্মীর সমান ধর্ম্ম প্রযুক্ত যে পদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের ভাব অর্থাৎ সত্তা থাকে, সেই “তদ্ধর্ম্মভাবী” পদার্থ দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। সেই দৃষ্টান্তের অর্থাৎ উক্তরূপ অবয় দৃষ্টান্তের বোধক যে বাক্য, তাহা সাধর্ম্মোদাহরণ বাক্য। আর সাধ্যধর্ম্মীর বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত যে পদার্থে হেতু পদার্থ নাই, সেই পদার্থকে বলে, বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত, সেই দৃষ্টান্তের বোধক যে বাক্য, তাহা বৈধর্ম্মোদাহরণ বাক্য। পূর্বে হেতু বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহার উদাহরণ এবং সে বিষয়ে ভাষ্যকারের বিশেষ মতও বলিয়াছি।

(৪) উপনয়

উদাহরণ বাক্যানুসারে উপনয় বাক্যও বিবিধ। তাই মহর্ষি গৌতম উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্ম্মীতে পূর্বোক্ত উদাহরণ বাক্যানুসারী “তথা” এইরূপ অথবা “ন তথা” এইরূপ যে উপসংহার, অর্থাৎ হেতু পদার্থের বোধক উক্তরূপ বাক্য বিশেষ, তাহা “উপনয়”। যেমন পূর্বোক্ত “শব্দোৎপত্তিঃ, উৎপত্তি ধর্ম্মকত্বাৎ” ইত্যাদি ন্যায় প্রয়োগ স্থলে নৈয়ায়িক যদি “যথাযটঃ” এইরূপ সাধর্ম্মোদাহরণ বাক্য বলেন, তাহা হইলে উহার পরে উপনয় বাক্য বলিবেন—“তথাচোৎপত্তি ধর্ম্মকঃ শব্দঃ”। উক্ত বাক্য হইবে—“সাধর্ম্মোপনয়”। উহার দ্বারা বুঝা যায়, শব্দও ঘটের স্থায় উৎপত্তি বিশিষ্ট। এইরূপ উক্তস্থলে নৈয়ায়িক যদি “যথা আস্মা” এইরূপ বৈধর্ম্মোদাহরণ বাক্য বলেন, তাহা হইলে পরে বৈধর্ম্মোপনয় বাক্য বলিবেন,—“নচ তথানুৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ”। উক্ত বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দও আস্মার স্থায় অনুৎপত্তি ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে। কোন মতে পূর্বোক্ত স্থলে “তথাচায়াং” এইরূপ বাক্যও উপনয় বাক্য হইতে পারে। উপনয় বাক্যের আকার বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে। *

(৫) নিগমন

“উপনয়” বাক্যের পরে পঞ্চম অবয়ব “নিগমন” বাক্য। গৌতম পরে ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন—“হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনং”। অর্থাৎ

* নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই উপনয়বাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। ব্রুত্তিকার বিষনাথ বলিয়াছেন যে, উপনয়বাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ যে অবশ্য কর্তব্য, ইহা সূত্রকারের তাৎপর্য্য নহে। তবে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াও উপনয়বাক্য হইতে পারে। যেমন “পূর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ যথামহানসং” ইত্যাদি স্থায়প্রয়োগস্থলে “বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংচায়াং” অথবা “তথাচায়াং” এইরূপ বাক্য “উপনয়” হইবে। ভাস্কর্য্যার কিন্তু গৌতমের উক্ত সূত্রানুসারে উপনয় বাক্যে সর্ব্বত্রই “তথা” শব্দের প্রয়োগ কারিয়াছেন। পরন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, উপনয় বাক্যের দ্বারা যে বোধ জন্মে, তাহা উপমান প্রমাণ জন্ম। সূত্রগাং তাঁহার মতে উপনয় বাক্যে যে সাদৃশ্যবোধক “তথা” শব্দের প্রয়োগ অবশ্য কর্তব্য, ইহা বুঝা যায় এবং তাঁহার মতে উপমান প্রমাণের দ্বারা যে শব্দ শক্তির স্থায় অন্ত পদার্থেরও বোধ জন্মে, ইহাও বুঝা যায়। পূর্ব্ব উপমান প্রমাণের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে ভাস্কর্য্যার কথা বলিয়াছি।

প্রতিজ্ঞা বাক্যের পরে যে হেতুবাক্য কথিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্বক সেই প্রতিজ্ঞা বাক্যের যে পুনর্কচন, তাহা নিগমন বাক্য। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে সর্বশেষে বলিতে হইবে,—“তস্মাদুৎপত্তি ধর্মকত্বাৎশব্দোহনিত্যঃ”। উক্তরূপ বাক্যই নিগমনবাক্য। উক্তস্থলে ভাষ্যকার পূর্বে “অনিত্যঃশব্দঃ”—এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োগ করায় তিনি পরে “তস্মাদুৎপত্তি ধর্মকত্বাদনিত্যঃশব্দঃ” এইরূপ নিগমন বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি গৌতমের উক্ত সূত্রে—“হেতুপদেশাৎ” এই বাক্যানুসারে নিগমন বাক্যে “তস্মাৎ” এই পদের পরে পূর্বোক্ত “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এই হেতু বাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ কেবল “তস্মাৎ” এই পদের দ্বারা পূর্বোক্ত হেতু পদার্থেরই উল্লেখ পূর্বক নিগমন বাক্য বলিয়াছেন। হেতু বাক্য, উদাহরণ বাক্য ও উপনয় বাক্য দ্বিবিধ হইলেও শেষোক্ত নিগমনবাক্য সর্বত্রই একরূপ। কারণ, সাধর্ম্যাহেতুই হউক, অথবা বৈধর্ম্যাহেতুই হউক, তাহার উল্লেখ পূর্বক পুনর্বার প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিলে সেই নিগমন বাক্যের প্রকারভেদ হইতে পারে না। কিন্তু শৈবাচার্য্য ভাস্করজ (“শ্রায়সার” গ্রন্থে) নিগমন বাক্যকেও দ্বিবিধ বলিয়াছেন।

“অবয়বের”র সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ ও

গৌতমমতের সূত্র।

মীমাংসক ও কোন কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি তিনটি অথবা উদাহরণ প্রভৃতি তিনটি অবয়বের দ্বারাই যখন বাদীর শ্রায়-প্রয়োগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন স্বেচ্ছানুসারে উহার মধ্যে উক্ত কোন অবয়বত্রয়ই প্রযোজ্য। পঞ্চাবয়ব স্বীকার অনাবশ্যক। কোন জৈন সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা ও হেতু এই দুই অবয়বই স্বীকার করিয়াছেন (১)। পরবর্তী অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায় উদাহরণ এবং উপনয় এই অবয়ব দুইই স্বীকার করিয়াছেন। (২)

১। “দাবয়বৌ প্রতিজ্ঞা হেতুশ্চ।” জৈন “শ্রায়দীপিকা”।

২। “ভার্কিক রক্ষা”কার বরদরাজ বলিয়াছেন—“দৌগতান্ত সোপানীতিমুদাহতিং”। এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থকার বৌদ্ধমতে উদাহরণ ও উপনয় এই অবয়বদ্বয়ই বলিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ

ভাষ্যকার ব্যাংস্ত্রায়ন গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়ববাদ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্য না বলিলে তাঁহার গ্রাহ-প্রয়োগই হইতে পারে না। কারণ, বাদীর সাধনীয় কি? তিনি কি সিদ্ধ করিতে চাহেন, ইহা প্রথমে না বলিলে তিনি কিণের জন্ত হেতু বাক্যাদির প্রয়োগ করিবেন? অর্থাৎ বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা তাঁহার সাধ্য নির্দেশ না করিলে আকাজ্জকতার অভাবে তাহার হেতু বাক্যাদির প্রয়োগ সংগতই হয় না। কারণ, বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলেই তাঁহার কথিত সাধ্য ধর্মের সাধন কি? এইরূপ আকাজ্জকবশতঃই হেতু বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। হেতু বাক্যের প্রয়োগ না করিলে তাহার সাধ্য ধর্মের সাধন বলা হয় না, সুতরাং তাঁহার গ্রাহ-প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। কিন্তু হেতু বাক্য বলিলেও তাঁহার কথিত সেই হেতু পদার্থে যে, তাঁহার সেই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ আছে, ইহা বুঝা যায় না। সুতরাং উহা বুঝাইতে বাদী পরে উদাহরণ বাক্যের অবশ্য প্রয়োগ করিবেন। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে শব্দের অনিত্যত্ব সংস্থাপন করিতে বাদী নৈয়ায়িক “উৎপত্তি ধর্মকত্বাৎ”—এই হেতু বাক্যের প্রয়োগ করিয়া পরে “যো য উৎপত্তি ধর্মকঃ সোহনিত্যঃ, যথা ৫টঃ” এইরূপ উদাহরণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বুঝাইবেন যে, উৎপত্তি ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রই যখন অনিত্য, তখন উৎপত্তি ধর্মকত্বরূপ হেতু পদার্থে অনিত্যত্ব রূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। কিন্তু উক্ত উদাহরণ বাক্যের দ্বারা উক্ত হেতু ত অনিত্যত্ব-

সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত বিষয়ে ক্রমে মতভেদ হইয়াছিল। অনেকে “অন্তর্ব্যাপ্তি” স্বীকার করিয়া সর্বত্র উদাহরণ বাক্যের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে ব্যাপ্তিবোধের অল্প বাহ্য উদাহরণ ব্যর্থ। অনেকস্থলে বাহ্য উদাহরণ ব্যতীতও ব্যাপ্তির বোধ হওয়ায় উহার নাম “অন্তর্ব্যাপ্তি”। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক রত্নাকর শাস্ত্রি “অন্তর্ব্যাপ্তি সমর্থন” গ্রন্থে ইহা বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাংস্ত্রায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ উহা স্বীকার করেন নাই। তবে যে স্থলে হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি সর্বসিদ্ধ অর্থাৎ তদ্বিষয়ে কোন বিবাদের আশঙ্কাই নাই, সেইরূপ স্থলেই উদাহরণ বাক্য প্রয়োগ অনাবশ্যক, ইহা পরে অনেক স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মতে সেইরূপ স্থলেও বাদীর নিজ কর্তব্য নির্বাহের জন্ত উদাহরণ বাক্য প্রয়োগ কর্তব্য।

রূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রতিপাদন করিলেও সেই অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট উৎপত্তি ধর্মকল্পরূপ হেতু যে, শব্দে আছে, ইহা উক্ত উদাহরণ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় না। তাহা না বুঝিলেও উক্ত অনুমান প্রমাণ দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব বুঝা যায় না। কারণ যে ধর্মীতে কোন ধর্মের অনুমিত হইবে, সেই ধর্মীতে সেই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সেই হেতু পদার্থ আছে, এইরূপ যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, (যাহা “লিঙ্গ পরামর্শ” নামে কথিত হইয়াছে) তাহা অনুমিতির অব্যবহিত পূর্বে আবশ্যক। নচেৎ সেই অনুমিতি জন্মিতে পারে না। সুতরাং বাদী তাঁহার প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের উক্তরূপ অনুমিতির চরমকারণ উক্ত রূপ জ্ঞান (লিঙ্গ পরামর্শ) জন্মাইবার জন্ত পরে পূর্বোক্ত রূপ উপনয় বাক্য অবশ্যই বলিবেন। সর্বশেষে বাদী তাহার পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের পরস্পর সাকাজ্জতা বুঝাইবার জন্ত পূর্বোক্ত রূপ নিগমন বাক্য ও অবশ্যই বলিবেন। কারণ ঐ চারিটি বাক্য যে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট বা সাকাজ্জ, ইহা না বুঝিলে উহার দ্বারা বাদীর প্রতিপাত্ত অর্থ বুঝা যায় না। ভাষ্যকার “নিগমন” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিতেও বলিয়াছেন— “নিগম্যন্তেহেনেন প্রতিজ্ঞা হেতুদাহরণোপনয় একত্রেতি নিগমনং”। অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও উপনয় এই চারিটি বাক্য একই প্রতিপাদ্য অর্থে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়, তাহা নিগমন। *

রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণববৈদান্তিক শ্রীনিবাস দাস “যতীন্দ্রমত দীপিকা” গ্রন্থে পূর্বোক্ত মত ভেদ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন যে (১) আমাদের মতে

* ভাষ্যকার পরে নিগমন বাক্যের আবশ্যকতা সমর্থন করিতে তাঁহার শেষকথা বলিয়াছেন যে, সর্বশেষে নিগমন বাক্য না বলিলে বাদীর সেই অনুমানের আশ্রয় বা ধর্মীতে তাঁহার অনুমেয় ধর্ম আছে কি না এইরূপ বিপরীত শঙ্কা নিবৃত্তি হয় না এবং সেখানেও বাদীর কথিত হেতুর তুল্য বল বিরোধী অপর কোন হেতু যে নাই, ইহাও ব্যক্ত করা হয় না। অর্থাৎ বাদীর সেই হেতু যে বাধিত নহে এবং সংপ্রতিপক্ষও নহে, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্তও পরে তাঁহার নিগমন বাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। “স্তায় সার” গ্রন্থে ভাস্করীজ্ঞও এরূপ কথাই বলিয়াছেন। পরে গোতমোক্ত তৃতীয় ও পঞ্চম হেতুভাস বুঝিলে ইহা বুঝা যাইবে।

(১) “অশ্মাকল্পনিয়মঃ, কচিং পকাবয়বাঃ.....মুহুমধ্যম কঠোরধিগ্নাং বিস্তর সংগ্রহণ দ্বাভ্য-
বহার উপপাদ্যত ইত্যনিয়মএব”। “যতীন্দ্র মত দীপিকা”।

কিন্তু অবয়ব প্রয়োগ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। কোন স্থলে পঞ্চাবয়ব, কোন স্থলে অবয়বত্রয় এবং কোন স্থলে অবয়বদ্বয়ই প্রযোজ্য। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যক্তিগণ উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটি মাত্র অবয়ব প্রয়োগ করিলেই বাদীর বক্তব্য বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে উক্ত অবয়বদ্বয়ই প্রযোজ্য। মধ্যম বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে পরে নিগমন বাক্যও প্রযোজ্য। কিন্তু কোমল বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বই প্রযোজ্য। কোন জৈন দার্শনিক সম্প্রদায়ও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন (১)।

কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, জিগীষা মূলক “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক কথায় বাদী কখনই পূর্বে প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণের বুদ্ধির তারতম্য নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। পরন্তু অনেক সময়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মধ্যস্থও বাদীর বক্তব্য নিঃসন্দেহে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে বলেন,—ইহাও দেখা যায়। সুতরাং উক্তরূপ জিগীষামূলক বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্য সংক্ষেপ কখনই উচিত নহে। কারণ, তাহাতে তাঁহাদিগের অনেক “নিগ্রহ স্থান” সম্ভব হওয়ায় পরাজয়ের আশঙ্কা আছে। পরন্তু উদাহরণ বাক্য ও উপনয় বাক্যে বাদী বা প্রতিবাদীর অভিমত সেই ধর্ম্মীতে তাহাদিগের সাধ্যধর্ম্মের বোধক কোন শব্দ প্রয়োগ না হওয়ায় কেবল ঐ দুইটি বাক্যের দ্বারা তাঁহাদিগের সাধ্য ধর্ম্ম বুঝাও যায় না। তাই মীমাংসক সম্প্রদায়ও পক্ষান্তরে উদাহরণ ও উপনয় বাক্যের পরে নিগমন বাক্যকে তৃতীয় অবয়ব রূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে ও দ্বিতীয় পক্ষে হেতু বাক্যের প্রয়োগ না করিয়া সর্বাগ্রে উদাহরণ বাক্য প্রয়োগে কোন সংগতি নাই। কারণ প্রথমে হেতুবাক্য দ্বারা হেতু পদার্থ কথিত হইলে পরে মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারেই সেই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্তই উদাহরণ বাক্য বক্তব্য। আর সর্বাগ্রে প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিলে যে, হেতু বাক্যের প্রয়োগও সংগত হয় না—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

পরন্তু যাহারা স্থল বিশেষেও পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ কর্তব্য বলিয়াছেন, তাঁহারাও ত “পঞ্চাবয়ববাদ” স্বীকারই করিয়াছেন। সাংখ্য সূত্রকারও “পঞ্চাবয়ব যোগাৎ সুখ সংবিত্তিঃ” (৫।২৭) এই সূত্রের দ্বারা সর্বত্র পঞ্চাবয়বই সাংখ্য সম্প্রদায়ের সম্মত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌতমের মতানুসারে “শ্রায় সারে” ভাস্কর্যজ্ঞও তাহাই বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্ত পাদ ও পঞ্চাবয়বেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি হেতুবাচ্যকে “অপদেশ” নামে এবং উদাহরণ বাক্যকে “নিদর্শন” নামে এবং উপনয় বাক্যকে “অনুসন্ধান” নামে এবং নিগমন বাক্যকে “প্রত্যাম্নায়” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। “চরক সংহিতার” বিমান স্থানে ও গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়বই উদাহরণের সহিত কথিত হইয়াছে। “বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর” স্মৃতিতেও উক্ত পঞ্চাবয়বই স্বীকৃত হইয়াছে (১)। মহাভারতের সভাপর্কেও নারদের গুণ বর্ণনায় কথিত হইয়াছে—“পঞ্চাবয়ব যুক্তস্ত বাক্যস্ত গুণদোষবিৎ”। (৫।৫) সূত্রাং উক্ত পঞ্চাবয়ববাদই যে; বহু সম্মত সূত্রপ্রাচীন মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের পূর্বে কোন প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের সহিত জিজ্ঞাসা ও সংশয় প্রভৃতি আরও পাঁচটি অবয়ব স্বীকার করিয়া “দশাবয়ববাদ” সমর্থন করিয়াছিলেন। বাৎস্তায়ন উক্ত মতের উল্লেখ পূর্বক খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, জিজ্ঞাসা ও সংশয় প্রভৃতি জ্ঞানের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলেও ঐ সমস্ত যখন পর প্রতিপাদক বাক্য নহে, তখন উহাদিগকে ন্যায়ের অবয়ব বলা যাইতে পারে না। পর প্রতিপাদক বাক্যবিশেষই “শ্রায়” নামক মহাবাক্যের অংশরূপ অবয়ব হইতে পারে। সূত্রাং গৌতমোক্ত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নামক পঞ্চ বাক্যই পঞ্চাবয়ব।

(৬) তর্ক

সুচিরকাল হইতেই “তর্ক” শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে (১)। তন্মধ্যে গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত যে তর্ক পদার্থ, তাহা প্রমাণের

১। প্রতিজ্ঞা-হেতু-দৃষ্টান্ত বৃপসংহার এবং।

তথা নিগমনকৈব পঞ্চাবয়বমিষ্যতে ॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর। ৩।৫।৫।

১। অনুমান প্রমাণ অর্থেও “তর্ক” শব্দের বহু প্রয়োগ আছে এবং অনুমান প্রমাণ অস্ত্র যে মনন, তাহাকেও তর্ক বলা হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্য ইয়র কৃষ্ণের “উহঃ

সহকারী জ্ঞান বিশেষ। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ জ্ঞায়প্রয়োগের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়াদি করিতে ঐ তর্ক আবশ্যক হওয়ায় মহর্ষি গৌতম “অবয়ব” পদার্থের পরেই ঐ তর্ক পদার্থের উল্লেখ করিয়া পরে উহার লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

অবিজ্ঞাততত্ত্বার্থে করণোপপত্তিঃ

তত্ত্ব জ্ঞানার্থ মুহুস্তর্কঃ ॥ ১।১।৪০ ॥

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থের তত্ত্ব-নিশ্চয় জন্মে নাই, তাহার তত্ত্ব নিশ্চয়ার্থ সেই তত্ত্ব-নিশ্চয়ের কারণ যে প্রমাণ, তাহার উপপত্তি প্রযুক্ত সেই পদার্থে যে উহ, তাহা তর্ক। অর্থাৎ সন্দেহমান স্বত্বের মধ্যে এই বিষয়েই প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে, এই বিষয়েই প্রমাণ সম্ভব হয়, এইরূপ যে উহ অর্থাৎ মানসজ্ঞান বিশেষ, তাহার নাম তর্ক। উহা কোন প্রমাণ নহে, এবং প্রমাণের ফল তত্ত্ব-নিশ্চয়ও নহে, কিন্তু প্রমাণের অনুরোধক বা সহকারী জ্ঞান বিশেষ। গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারাও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

ভাষ্যকার ঐ তর্কের একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আত্মা আছে, ইহা জানিলেও আত্মার নিত্যত্বরূপ তত্ত্ব-নিশ্চয় যাহার জন্মে নাই, তাহার আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসা জন্মে। কিন্তু কোন কারণে তাহার আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তখন আত্মার নিত্যত্ব সাধক যে প্রমাণ, তাহা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। পরে তত্ত্বজিজ্ঞাসা বশতঃ সেই ব্যক্তি মনের দ্বারা এইরূপ তর্ক করেন যে, আত্মা যদি উপপত্তি

শব্দোপাধায়নং ইত্যাদি (৫১) কারিকার “উহ” শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র মননরূপ তর্কই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে গোড় পাদের ব্যাখ্যাত অর্থও বলিয়াছেন। যোগীদিগের যোগাস্ত্রের মধ্যেও “তর্ক” আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় অমৃতনাদোপনিষদে কথিত হইয়াছে—“প্রত্যাহার স্তব্ধাধ্যানং প্রাণায়ামোদ্ব ধারণা। তর্কশ্চৈব সমাধিচ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে”। ৬। তর্ক শাস্ত্র অর্থেও “তর্ক” শব্দের বহু প্রয়োগ আছে। রাজশেখর হরি তাঁহার “কাব্য মীমাংসা” পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৌদ্ধ জৈন ও চার্বাক দর্শন এবং সুসংখ্য জ্ঞায় ও বৈশেষিক দর্শনকে তর্ক শাস্ত্র বলিয়া “যটু তর্ক” বলিয়াছেন। তাই যটু সংখ্যা অর্থেও “তর্ক” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মতান্তরে উহার অন্তরূপ কারণও আছে।

ধর্মক হয়, অর্থাৎ যদি জীবের দেহোৎপত্তিকালে অভিনব আত্মারই উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাহার সংসারও মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ আত্মার পূর্বকৃত কর্মফল ব্যতীত তাহার বিচিত্র জন্ম বা সংসার সম্ভব হইতে পারে না এবং আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করিলে কোনকালে তাহার বিনাশও স্বীকার্য হওয়ায় তাহার মুক্তি বলা যায় না। অতএব আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যত্ব রূপ নিত্যত্ব বিষয়েই প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে। উক্তরূপ তর্কের ফলে তখন সেই ব্যক্তির আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় নিবৃত্ত হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব সাধক সেই প্রমাণই নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মার নিত্যত্ব রূপ তত্ত্ব-নিশ্চয় জন্মায়। পূর্বোক্তরূপ তর্ক ঐ প্রমাণকে অনুগ্রহ করায় তত্ত্ব-নিশ্চয় কার্যে উহার সহকারী হইয়া থাকে। তর্ক প্রমাণকে অনুগ্রহ করে—ইহার অর্থ এই যে, তর্ক প্রমাণের বিষয়ে সংশয় নিবৃত্ত করিয়া প্রমাণকে সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত করে। ভাষ্যকারের অত্বকথার দ্বারাও তাঁহার মত বুঝা যায় যে, এই বিষয়েই এইরূপে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে, এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জানই তর্ক (১)। কিন্তু ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেও বাচস্পতি মিশ্র অনিষ্টাপত্তিকে তর্ক বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণ স্থলেও ‘আত্মা যদি উৎপত্তি ধর্মক হয়, তাহা হইলে উহার সংসারও মোক্ষ না হউক’? এইরূপ আপত্তিকে তর্ক বলা যায়। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

প্রাচীনকাল হইতেই উক্ত তর্ক পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে নানা মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ উহাকে সংশয় বিশেষ এবং কেহ কেহ নির্ণয় বিশেষ বলিতেন এবং অনেকে উহাকে অনুমান প্রমাণই বলিতেন। প্রাচীন

(১) ভগবদ্গীতার “মতঃ স্মৃতিস্ত্রাণি মপোহনক” (১৫।১৫) এই ভগবদ্ বাক্যে “অপোহন” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার রামানুজ গৌতমোক্ত তর্কই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং “উহন” ও “উহ” যে উহারই নামান্তর, ইহা বলিয়া তিনি সেখানে বাৎস্তায়নের মতানুসারেই উহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“উহোনাম ইহা প্রমাণমিখং প্রবর্ত্তি তুমহঁতীতি প্রমাণপ্রবৃত্তাহঁত। প্রযোজক সামগ্র্যাদিনিরূপণ জ্ঞান প্রমাণানুগ্রাহকং জ্ঞান।” “শ্রায় পরিচুক্তি” গ্রন্থে বেকট নাথও গৌতমোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাখ্যা করিতে রামানুজের ঐ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ তর্করূপ জ্ঞানের পৃথক্ উল্লেখ না করায় “ত্ৰায়-কন্দলী” কার ত্রীধর ভট্ট বহু বিচার করিয়া উহা যে পৃথক্ কোন জ্ঞান নহে, অনেক স্থলে, উহা অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত, এইরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বে “ত্ৰায়বার্ত্তিক”কার উদ্যোতকর ঐ সমস্ত মতেরই খণ্ডন করিয়া তাহায় সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ‘এই পদার্থ এইরূপই হইতে পারে’ এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান বিশেষই তর্ক। উহা সংশয়ও নহে, নির্ণয়ও নহে। তাই মহর্ষি গৌতমও সংশয় ও নির্ণয় পদার্থের উল্লেখ করিয়াও তর্কের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তাহাদিগের মতে বাহ্য সম্ভাবনা নামক জ্ঞান, তাহাও সংশয় বিশেষ। যে সংশয়ে কোন এক কোটিই অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহাকে বলে উৎকট কোটিক সংশয় এবং উহারই নাম সম্ভাবনা। কিন্তু পূর্বোক্ত তর্ক পদার্থ সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে। কারণ তর্ককারী মনের দ্বারা তাহার ঐ জ্ঞানকে সংশয়রূপে বুঝে না।

তবে উহা কিরূপ জ্ঞান? তর্কের স্বরূপ কি? “তাৎপর্য্যপরিভূক্তি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—“তস্য চ স্বরূপ মনিষ্টপ্রসঙ্গ ইতি”। অর্থাৎ অনিষ্ট পদার্থের যে প্রসঙ্গ বা আপত্তি তাহাকে বলে তর্ক। “তार्কিক-রক্ষা”কার বরদরাজ ইহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—

তর্কোহনিষ্ট-প্রসঙ্গঃস্তা দনিষ্টংদ্বিবিধং স্মৃতং ।

প্রামাণিক পরিত্যাগ স্তুত্বতর-পরিগ্রহঃ ॥

অর্থাৎ অনিষ্টের আপত্তিকে তর্ক বলে। সেই অনিষ্ট দ্বিবিধ। প্রামাণ-সিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগ এবং অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকার। যেমন কেহ বলিলেন—জলপান পিপাসা নিবর্ত্তক নহে। তখন অপর ব্যক্তির আপত্তি হইল যে, তাহা হইলে পিপাসু ব্যক্তিরা কেহই জলপান না করুক? উক্ত স্থলে জলপানের পিপাসা নিবর্ত্তকত্ব বাহ্য সর্বসম্মত প্রামাণসিদ্ধ পদার্থ, তাহার পরিত্যাগ বা অপলাপ প্রথম প্রকার অনিষ্ট, উক্ত অনিষ্টের যে আপত্তি, তাহা তর্ক। এবং কেহ বলিলেন—জলপান অন্তর্দাহ জন্মায়। তখন অপর ব্যক্তির আপত্তি হইল যে, তাহা হইলে জলপান আমারও

‘অন্তর্দাহ উৎপন্ন করুক ?’ উক্তস্থলে পীতজলের অন্তর্দাহ জনকত্ব অপ্রামাণিক পদার্থ, স্তত্রাং উহা পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট। ঐ অনিষ্টের যে আপত্তি, তাহাও তর্ক। এইরূপ অস্ত্রাশ্রয় স্থলেও পূর্বোক্ত যে কোন অনিষ্ট-পদার্থের আপত্তিই তর্ক।

পরবর্তী নব্যনৈয়ায়িকগণ উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে আরও হৃদয়বিচার করিয়া বিশদভাবে তর্কের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্যপদার্থের আরোপ-প্রযুক্ত ব্যাপকপদার্থের আরোপরূপ আপত্তিই তর্ক। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্য ব্যাখ্যাকারগণ গৌতমের উক্তসূত্রে “কারণ” শব্দের দ্বারা ব্যাপ্য-পদার্থ এবং “উপপত্তি” শব্দের দ্বারা আরোপ অর্থ গ্রহণ করিয়া গৌতমোক্ত তর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেখানে ব্যাপক পদার্থ নাই, ইহা নির্ণীত বা সর্বসম্মত, সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত সেই ব্যাপক পদার্থের আরোপ রূপ যে উহা বা আপত্তি, তাহাকে বলে তর্ক। যেমন ধূম বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ, বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ। ব্যাপ্য পদার্থ যেখানে থাকে, সেখানে তাহার ব্যাপক পদার্থ অবশ্যই থাকিবে, নচেৎ তাহাকে ব্যাপক পদার্থ বলা যায় না। স্তত্রাং কোনস্থানে ব্যাপ্য পদার্থটি আছে বলিলে তাহার আরোপপ্রযুক্ত তাহার ব্যাপক পদার্থটির আরোপরূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই ব্যাপক পদার্থটি বিद्यমানই আছে, সেখানে তাহার আপত্তি তর্ক নহে। উহাকে বলে “ইষ্টাপত্তি”। যেমন পাকশালায় যখন ধূমও ও বহ্নি উভয়ই আছে, তখন কেহ সেখানে ধূম আছে বলিলে অপরে যদি আপত্তি করেন যে, তাহা হইলে বহ্নিও থাকুক ? উক্ত আপত্তি ইষ্টাপত্তি, উহা তর্ক নহে। কিন্তু যেখানে ধূমও নাই বহ্নিও নাই, সেইস্থলে কেহ ধূম আছে বলিলে অপরের উক্তরূপ আপত্তি, তর্ক হইবে। কিন্তু যে কোন পদার্থের আরোপ-প্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপরূপ আপত্তি তর্ক নহে। যেমন কেহ এখানে হস্তী আছে ইহা বলিলে অপরে যদি আপত্তি করেন যে, তাহা হইলে গর্দভও থাকুক, উক্তরূপ আপত্তি তর্ক হইতে পারে না। কারণ, হস্তী গর্দভের ব্যাপ্য পদার্থ নহে। অর্থাৎ হস্তী থাকিলেই যে সেখানে গর্দভ থাকিবে, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই। স্তত্রাং উক্ত

রূপ আপত্তি ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক পদার্থের আরোপ না হওয়ায় তর্ক হইবে না।

পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত আপত্তিরূপ তর্ক মনের দ্বারাই জন্মে, উহা মানস প্রত্যক্ষ রূপ জ্ঞান। আমরা কত সময়ে নীরবে কত বিষয়ে মনের দ্বারাই ঐরূপ তর্ক করি এবং প্রয়োজন হইলে বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করি। কিন্তু সেই বাক্য তর্ক নহে, পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত মানস প্রত্যক্ষ রূপ আপত্তিই তর্ক। উহা সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে, কিন্তু নিশ্চয়াত্মক ভ্রম জ্ঞান (১)। ভ্রম জ্ঞান হইলেও উহার সাহায্যে পরে প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় জন্মে ও জন্মিতে পারে। কিরূপে তাহা জন্মে, তাহাও এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি। কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে বুঝা আবশ্যক যে, সর্বত্রই তর্ক হলে যে ব্যাপ্য পদার্থটির আরোপ করিয়া তাহার ব্যাপক পদার্থের আপত্তি করা হয়, সেই ব্যাপ্য পদার্থটি হয় আপাদক। এবং তাহার ব্যাপক সেই পদার্থটি হয়, আপাদ্য। কারণ যে পদার্থের আপত্তি করা হয়, তাহাকে বলে আপাদ্য এবং যে পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত সেই আপত্তি হয়, তাহাকে বলে আপাদক। যেমন যদি ধূম থাকে, তবে বহ্নি থাকুক? এইরূপে কোনস্থানে ধূমের আরোপ প্রযুক্ত বহ্নির আপত্তি করিলে সেখানে বহ্নি হইবে আপাদ্য এবং ধূম হইবে আপাদক। আপাদক পদার্থটি হইবে আপাদ্য পদার্থের ব্যাপ্য পদার্থ, সুতরাং আপাদ্য পদার্থটি হইবে তাহার ব্যাপক পদার্থ।

তাহা হইলে এখন বুঝা আবশ্যক যে, ব্যাপ্য পদার্থ থাকিলে সেখানে যখন তাহার ব্যাপক পদার্থ অবশ্যই থাকিবে, তখন সেই ব্যাপক

(১) বাহ্য আরোপাত্মক জ্ঞান, তাহা ভ্রমজ্ঞানই হয়। ভ্রমেরই অপর নাম আরোপ। ঐ ভ্রমজ্ঞান আহাৰ্য্য ও অনাহাৰ্য্য নামে দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। “আহাৰ্য্য” শব্দের অর্থ কৃত্রিম। ভ্রমের বাধক নিশ্চয় সম্বন্ধে ইচ্ছাপূর্বক যে আরোপ করা হয়, তাহাকে বলে “আহাৰ্য্য” ভ্রম। যেমন জলে ধূম ও বহ্নি উভয়ই নাই, ইহা নিশ্চয় থাকিলেও যদি জলে ধূম থাকে তবে বহ্নি থাকুক? এইরূপে জলে ধূম ও বহ্নির যে স্বেচ্ছাকৃত আরোপ, তাহা আহাৰ্য্য ভ্রম। সুতরাং উক্ত রূপ তর্ক ভ্রমাত্মক নিশ্চয়রূপ জ্ঞান এবং উহা মানস প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান। বৃত্তিকার বিদ্যনাথও লিখিয়াছেন—“উহ দ্বক মানসক ব্যাপ্যো জ্ঞাতি বিশেষঃ”।

পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইলে তদ্বারা সেই ব্যাপ্য পদার্থের অভাবনিশ্চয়ও জন্মিবে। কারণ ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে সেখানে ব্যাপ্য পদার্থেরও অভাব থাকায় ব্যাপক পদার্থের অভাবে ব্যাপ্য পদার্থের অভাবের ব্যাপ্তি আছে। উক্তস্থলে উক্তরূপ তর্ক সেই ব্যাপ্তির স্মরণ জন্মাইয়া সেখানে (জলং ধূমাতাবব্দ বহুভাবাৎ" এইরূপে) জলে ধূমাতাবের সাধক অনুমান প্রমাণ উপস্থিত করে। সুতরাং উক্তরূপে ঐ তর্ক সেখানে সংশয় নিবৃত্ত করিয়া জলে ধূমাতাবরূপ তত্ত্ব নির্ণয়ে সহায় হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে আপাদক ধূম পদার্থে আপাদক বহ্নি পদার্থের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাই ঐ তর্কের মূল ব্যাপ্তি। উহা না থাকিলে উক্তরূপ আপত্তি কখনই তর্ক হইতে পারে না। তাই আপাদক পদার্থে আপাত্ত পদার্থের যে ব্যাপ্তি, তাহাই তর্কের প্রথম অঙ্গ। তর্কের আরও চারিটি অঙ্গ আছে। সেই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন তর্কই প্রকৃত তর্ক। সুতরাং উহাই প্রমাণ দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয়ে প্রমাণের সহায় হইতে পারে। তাই বরদরাজ বলিয়াছেন—“অঙ্গপঞ্চকসম্পন্ন তত্ত্ব-জ্ঞানায়কল্পতে”। পঞ্চাঙ্গের মধ্যে কোনও অঙ্গহীন হইলেও তাহা তর্ক হইবে না—তাহাকে বলে “তর্কভাস” (১)। সুতরাং কোন তর্ক উপস্থিত হইলে উহা তর্ক বা তর্কভাস, তাহাও বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। তর্কের যে সমস্ত দোষ কথিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে হইবে। সুতরাং কাহারও কোনও তর্ককে কুতর্ক বলিতে হইলেও কেন তাহা কুতর্ক, তাহাতে তর্কের কোন অঙ্গ নাই, এবং কি দোষ আছে, তাহা বিচার করিয়া বলিতে হইবে।

(১) “তর্কিক রক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন—“ব্যাপ্তিস্তর্কী প্রতিহতি রবদানং বিপর্যয়ে। অনিষ্টাননুকূলত্ব ইতি তর্কপঞ্চকং”। অঙ্গাঙ্গতমবৈকল্যে তর্কভাসভাসতা ভবেৎ”। অর্থাৎ (১) আপাদক পদার্থে আপাদ্য পদার্থের ব্যাপ্তি, (২) সেই তর্কের ব্যাবাহতক অপর প্রতিকূল তর্কের দ্বারা অপ্রতিঘাত, (৩) বিপর্যয়ে অর্থাৎ আপাদ্য পদার্থের অভাবে পর্যাবধান, (৪) আপাত্ত পদার্থের অনিষ্টত্ব এবং (৫) সেই আগন্তির অননুকূলত্ব অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অসাধকত্ব, এই পাঁচটি তর্কের অঙ্গ। উহার কোন একটি অঙ্গ শূন্য হইলেও তাহা তর্ক হইবে না, তাহা হইবে—“তর্কভাস”।

তর্কের প্রকার ভেদ

নানাহানে নানারূপে পূর্বোক্ত আপত্তিরূপ তর্ক উপস্থিত হয়। তাই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “আত্ম-তত্ত্ববিশেষক” গ্রন্থে উক্ত তর্কপদার্থকে (১) “আত্মাশ্রয়” (২) “ইতরেতরাশ্রয়” (৩ “চক্রক” (৪) “অনবস্থা” ও (৫) “অনিষ্ট প্রসঙ্গ” নামে পঞ্চবিধ বলিয়াছেন। তদনুসারে “তार्কিক রক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ ও বলিয়াছেন—“আত্মাশ্রয়াদিভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ”। শেযোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্ক “বাধিতার্থ প্রসঙ্গ” নামেও কথিত হইয়াছে। “প্রসঙ্গ” শব্দের অর্থ আপত্তি। যে পদার্থ প্রমাণ বাধিত হওয়ায় অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত, এমন পদার্থের আপত্তিই “বাধিতার্থ-প্রসঙ্গ”। যদিও পূর্বোক্ত আত্মাশ্রয়াদি চতুর্বিধ তর্কও বাধিতার্থ-প্রসঙ্গ, তথাপি ঐ সমস্ত তর্কে যে বিশেষ আছে, তাহা গ্রহণ করিয়াই পৃথক সংজ্ঞার দ্বারা উহার পৃথক উল্লেখ হইয়াছে। ঐ চতুর্বিধ তর্ক ভিন্ন আর যে সমস্ত বাধিতার্থ প্রসঙ্গ বা অনিষ্টাপত্তি, তাহাই শেযোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্ক। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহাকে “তদন্ত্রবাধিতার্থ-প্রসঙ্গ” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। *

* “সর্ব দর্শন সংগ্রহে” (অক্ষপাদদর্শনে) মাধবাচার্য্য পূর্বোক্ত আত্মাশ্রয়াদি চতুর্বিধ তর্ক এবং “ব্যাঘাত” প্রভৃতি নামে আরও সপ্ত প্রকার তর্কের উল্লেখ করিয়া গোতমোক্ত তর্কেই একাদশ প্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। কোন অপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উহার ব্যাখ্যা পাইলেও তাহার মূল পাওয়া যায় না। “হ্যার-পরিশুদ্ধি” গ্রন্থে বেকটনাথ তর্কের প্রকার ভেদ বিষয়ে “প্রজ্ঞা-পরিব্রাণ” নামক গ্রন্থের মত প্রকাশ করিতে আত্মা শ্রয়াদি চতুর্বিধ তর্ক এবং “বিরোধ” ও “অসম্ভব” নামে ষট্ প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। “মান মেয়োদয়” গ্রন্থে অনুমান পরীক্ষায় নারায়ণ ভট্ট উক্ত আত্মাশ্রয়াদি চতুর্বিধ তর্ক এবং গৌরব ও লাঘব নামে ষট্ প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে উদয়নোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্কের কোন উল্লেখ করেন নাই তাহা চিস্তনীয়। মতান্তরে “প্রথমোপস্থিতত্ব” ও “বিনিগমনাবিরহ” ও তর্ক বলিয়া কথিত হইত, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায় বুঝা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত আত্মাশ্রয়াদি পঞ্চবিধ তর্কই যে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের সম্মত, ইহা সমর্থন করিতে বৃত্তিকার শেষে বলিয়াছেন যে, “প্রথমো-পস্থিতত্ব” ও লাঘব গৌরব প্রভৃতি আপত্তি স্বরূপ না হওয়ায় উহা বস্তুতঃ তর্ক পদার্থ নহে। কিন্তু ঐ সমস্তও তর্কের দ্বারা প্রমাণের সহকারী হওয়ায় প্রমাণ সহকারিত্ব রূপ সাধার্ম্য বশতঃ তর্কবৎ ব্যবহৃত হয়।

কোন পদার্থ নিজের উৎপত্তি অথবা হিতি অথবা জ্ঞানে নিজেকেই অব্যবধানে অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহার নাম (১) “আত্মাশ্রয়”। এইরূপ অপর একটা পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ এক পদার্থ-ব্যবধানে আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহার নাম (২) “ইতরেতরাশ্রয়” ও “অন্তোন্তাশ্রয়”। এইরূপ অপর দুইটি পদার্থ বা ততোহধিক পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া শেষে আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহার নাম (৩) “চক্রকাস্রয়” ও “চক্রক”। যেকোন আপত্তির কুত্ৰাপি বিশ্রাম বা শেষ নাই, এমন যে সমস্ত ধারা বাহিক অনন্ত আপত্তি, তাহার নাম (৪) “অনবস্থা”। কিন্তু যে স্থলে ঐরূপ আপত্তি প্রমাণসিদ্ধ, সেখানে উহা অনবস্থা হইবে না। কারণ সেখানে তাহা সকল মতেই ইষ্টাপত্তি। পূর্বোক্ত রূপ অনন্ত আপত্তি মূলক যে অনিষ্টাপত্তি, তাহাকেও অনেকে “অনবস্থা”ই বলিয়াছেন। যেমন পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে তাহার অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বের ধারাবাহিক অনন্ত আপত্তি হয়, এবং সেই অনন্ত অবয়ব স্বীকার করিলে পরমত ও সর্বপেক্ষ তুল্য পরিমাণাপত্তিরূপ অনিষ্টাপত্তি হয়। পূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহা বলিয়াছি। পূর্বোক্ত আত্মাশ্রয় প্রভৃতি ত্রিবিধ তর্কের প্রকার ভেদে বহু উদাহরণ আছে। কিন্তু সংক্ষেপে তাহার কোন কথাই ব্যক্ত করা যায় না। বহু লিখিলেও তাহা বুঝা যায় না। গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াই তাহা বুঝিতে হইবে।

পূর্বোক্ত চতুর্বিধ তর্ক ভিন্ন সমস্ত তর্কই পঞ্চম প্রকার তর্ক। উহাও আবার ব্যাপ্তিগ্রাহক ও বিষয়পরিশোধক এবং অনুকূল তর্ক ও প্রতিকূল তর্ক প্রভৃতি নামে নানাপ্রকার কথিত হইয়াছে। পূর্বে যে তর্কের উদাহরণ বলিয়াছি, তাহা বিষয় পরিশোধক অনুকূল তর্ক। আর অনুমান স্থলে যে তর্ক হেতু পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত করে, তাহাকে বলে, ব্যাপ্তিগ্রাহক অনুকূল তর্ক। যেমন ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান স্থলে ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কি না? অর্থাৎ বহ্নি শূন্যস্থানেও থাকে কিনা? এইরূপ সংশয় হইলে তখন ‘ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী পদার্থ হয়, তাহা হইলে বহ্নি জগ্ন না হউক?’ অর্থাৎ বহ্নি ব্যতীতও ধূম

উৎপন্ন হউক? এই প্রকার আপত্তি রূপ তর্ক। কারণ উক্তরূপ তর্কের ফলে (“ধূমো ন বহ্নি-ব্যভিচারী বহ্নি জ্ঞত্বাৎ” এইরূপে) উক্তস্থলে ধূমে আপাত্ত পদার্থের অভাব রূপ (বহ্নিজ্ঞত্ব) হেতুর দ্বারা অপাদক পদার্থের অভাব (বহ্নি ব্যভিচারিত্বাভাব) সিদ্ধ হওয়ায় ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত হইলে তখন তাহাতে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তস্থলে পূর্বোক্ত রূপ তর্ককে বলে ব্যাপ্তিগ্রাহক অমূল্য তর্ক। কিন্তু অত্যান্ত প্রমাণ দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়েও অনেক স্থলে বিষয় পরিশোধক তর্ক আবশ্যক হয়। তাই উক্ত তর্ক পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও উহা যে সর্ব প্রমাণেরই অনুগ্রাহক, ইহা অস্ত্র সম্প্রদায়ও বলিয়াছেন (১)। বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্যা বিষয়ে সংশয় হইলে তাহার নিবৃত্তিও জ্ঞাত ও বিচার বা মীমাংসারূপ তর্ক আবশ্যক হয়। তাই মীমাংসক সম্প্রদায় তর্ককে বিচার ও মীমাংসা নামেও উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাকে প্রমাণের “ইতিকর্তব্যতা” (সহকারিবিশেষ) বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃত তর্কের সাহায্য ব্যতীত বেদাদি শাস্ত্রার্থ—নির্ণয়ও সম্ভব হয় না। তাই ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

১

“আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।*

যন্তর্কেণানু সন্ধন্তে সধর্মং বেদ নেতরঃ” ॥১২/১০৬॥

নির্ণয়

তর্কের পরে নির্ণয়। যে কোন প্রমাণের দ্বারা পদার্থের অবধারণই নির্ণয়, কিন্তু গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত যে নির্ণয় পদার্থ, তাহা

১। “মান মেবাদয়” গ্রন্থে মীমাংসক নারায়ণ ভট্টও বলিয়াছেন—

যতঃ প্রত্যক্ষ শব্দাদি প্রমাণান্যথিলাস্তপি।

তর্কং বিনা ন জীবন্তি প্রত্যক্ষে তাবদীক্ষ্যতাং ॥

এক সর্বত্র তর্কোদৈ রথাতাস-নিরাসতঃ।

যাক্যার্থ স্থাপনী সর্ব্বা মীমাংসা তর্করূপিণী ॥

তস্মাৎ সর্ব প্রমাণানাং তর্কোন্মূল গ্রাহকঃ স্থিতঃ।

সাধ্যোবিপর্যাসা শঙ্ক্যবিচ্ছেদস্বত্বগ্রহঃ ॥ প্রমাণপঃ ১২/২০ ॥

অবয়ব ও তর্কসাধ্য নির্ণয়বিশেষ। তাই গৌতম অবয়ব ও তর্ক পদার্থের পরেই “নির্ণয়” পদার্থের উল্লেখ করিয়া পরে উহার লক্ষণ বলিয়াছেন—

“বিমৃশ্ত পক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ” ॥১।১।৪১॥

অর্থাৎ সংশয় করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপন ও প্রতিপক্ষ খণ্ডনের দ্বারা যে পদার্থাবধারণ, তাহা নির্ণয়। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষে তাঁহাদিগের নিজের নিশ্চয় থাকিলেও মধ্যস্থগণ সেই বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপ্রতি বাক্য শ্রবণ করিয়া তজ্জন্য যেখানে তদবিষয়ে সংশয় করেন, সেখানে তাঁহাদিগের সেই সংশয় নিবৃত্তির জন্ত বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। কারণ মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই পক্ষের অনুমোদন করিতে পারেন না। উক্তরূপ স্থলে মধ্যস্থগণের সেই সংশয়ের পরে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বপক্ষ স্থাপন ও প্রতিপক্ষ খণ্ডন দ্বারা মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের যে অবধারণ, তাহাই পূর্বোক্ত নির্ণয় পদার্থ। ফলকথা জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর “জল্প” বা বিতণ্ডা”র দ্বারা মধ্যস্থগণের যে নির্ণয় জন্মে, তাহাকেই গৌতম “নির্ণয়” বলিয়াছেন। তাই উক্ত লক্ষণ সূত্রে প্রথমে “বিমৃশ্ত” এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। “বিমৃশ্ত”—এই পদের অর্থ বিমর্শ করিয়া অর্থাৎ মধ্যস্থগণ কর্তৃক সংশয়ের অনস্তর।

কিন্তু জিগীষা শূন্য গুরু শিষ্য প্রভৃতি বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া কোন বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়োদ্দেশ্যে যে “বাদ” কথায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে মধ্যস্থ আবশ্যক না হওয়ায় সেই “বাদ” কথার দ্বারা যে তত্ত্ব নির্ণয় হয়, তাহা মধ্যস্থ কর্তৃক সংশয় পূর্বক নহে। সুতরাং উক্ত সূত্রের প্রথমোক্ত “বিমৃশ্ত”—এই পদ পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত অংশের দ্বারাই “বাদ” কথা স্থলীয় নির্ণয়ের লক্ষণ ও বৃত্তিতে হইবে এবং কেবল “অর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ”—এই অংশের দ্বারা নির্ণয় মাত্রেরই সামান্য লক্ষণ বৃত্তিতে হইবে। অর্থাৎ যে কোন প্রমাণ দ্বারা যে অর্থাবধারণ বা পদার্থ নিশ্চয়, তাহাই সামান্যতঃ যথার্থ নির্ণয় পদার্থ। আর প্রমাণভাসের দ্বারা যেখানে কোন পদার্থের নিশ্চয় জন্মে, তাহা ব্রহ্মস্বক নির্ণয়।

(৮) বাদ (৯) জল্প ও (১০) বিতণ্ডা

মহর্ষি গৌতম যে, “বাদ”, “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক পদার্থত্রয় বলিয়াছেন, উহার নাম “কথা”। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন—“তিস্রঃ কথা ভবন্তি, বাদোজলো বিতণ্ডাচেতি”। ঐ “কথা” শব্দটি গৌতমোক্ত বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার বোধক পারিভাষিক। গৌতম নিজেও পরে (৫২।১৯২৩) উক্ত পারিভাষিক “কথা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাম্বীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও (২।৪২) ঐ পারিভাষিক “কথা” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এখন ঐ “কথা”র সামান্য লক্ষণ কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। “তार्কিকরক্ষা” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক বরদরাজ বলিয়াছেন—

“বিচারবিষয়ো নানা বক্তৃকো বাক্য-বিস্তরঃ।

কথা, তসাঃ ষড়ঙ্গানি গ্রাহ্যচছারি কেচন” ॥ ৭৬ ॥

অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ে নানাবক্তৃক যে বাক্যবিস্তর, তাহাকে বলে “কথা”। একজন বক্তা অথবা গ্রন্থকর্তার পূর্বপক্ষ, উত্তর পক্ষ, এবং দুষণ ও সমাধানের প্রতিপাদক বাক্য সমূহ “কথা” নহে। কিন্তু বিচার্য বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর যথোক্ত নিয়মানুসারে উক্তি প্রত্যুক্তি রূপ যে বচন সমূহ, তাহাই “কথা”। বৃত্তিকার বিখ্যাত ইহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন যে, তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভ, ইহার একতরের সম্পাদন যোগ্য যে শ্রায়াহুগত বাক্যসন্দর্ভ, তাহাকে বলে “কথা”। লৌকিক বিবাদহলে বাদী ও প্রতিবাদীর যে সমস্ত উক্তি প্রত্যুক্তি, তাহা শ্রায়াহুগত না হওয়ায় অর্থাৎ সেই স্থলে যথাশাস্ত্র শ্রায়-প্রয়োগাদি না হওয়ায় তাহা “কথা” নহে। আর যেখানে কোন বাদী নিঃপক্ষ স্থাপনের জন্ত যথানিয়মে “শ্রায়” গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, প্রতিবাদী তাহার প্রতিবাদ করেন নাই, সেখানে বাদীর সেই সমস্ত বাক্যও “কথা” হইবে না। কারণ, সেখানে তদ্বারা কোন তত্ত্ব-নির্ণয়ও সম্ভব নহে, জয়লাভও সম্ভব নহে। সেখানে বাদীর সেই সমস্ত বাক্য তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা জয়লাভ, ইহার মধ্যে কোনটিরই স্বরূপ যোগ্য নহে।

বস্তুতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর স্বপক্ষ সংস্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনার্থ উক্তি প্রত্যুক্তিরূপ বিচার তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা জয়লাভ, এই দুই উদ্দেশ্যে হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেবল তত্ত্ব নির্ণয়োদ্দেশ্যে গুরু শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার হয়, তাহার নাম “বাদ”। উহাতে কাহারও জিগীষা থাকে না। কারণ, তত্ত্ব-নির্ণয়ই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তত্ত্ব-নির্ণয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই ঐ “বাদ” কর্তব্য। কিন্তু যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী জিগীষু হইয়া বিচার করেন, সেখানে তাহা-দিগের যে শ্রায়ানুগত উক্তি প্রত্যুক্তি রূপ বাক্যসমূহ, তাহাই “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যেখানে প্রতিবাদীও বাদীর শ্রায় নিজ পক্ষ স্থাপন করেন, সেখানে তাহাদিগের সেই কথাকে বলে, “জল্প” এবং যেখানে প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল পরপক্ষ খণ্ডনই করেন, সেখানে সেই কথাকে বলে “বিতণ্ডা”। মহর্ষি গৌতম উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে শ্রায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্হিকের প্রারম্ভে যথাক্রমে পূর্বোক্ত “বাদ”, “জল্প” ও “বিতণ্ডা”র লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—

“প্রমাণতর্ক সাধনোপালম্বঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ

পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহোবাদঃ” ॥

“স্বথোক্তোপপঞ্জহল-জ্ঞাতি-নিগ্রহ

স্থান সাধনো পালম্বো জল্পঃ” ॥

“স প্রতিপক্ষস্থাপনানীনো বিতণ্ডা” ॥

প্রথম সূত্রের দ্বারা গৌতম “বাদের” লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহাতে প্রমাণও তর্কের দ্বারা সাধন (স্বপক্ষ স্থাপন) এবং উপালম্ব (পরপক্ষ খণ্ডন) হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ যাহাতে কোন অপসিদ্ধান্ত বলা হয় না এবং যাহা পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত, এমন যে “পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ”, অর্থাৎ যাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী নিয়মতঃ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে গ্রহণ করিয়া সংস্থাপন করেন— এমন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্য সমূহ, তাহাকে বলে “বাদ”।

যেমন তত্ত্বনির্ণয়ার্থী শিষ্য গুরুর নিকটে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ “শ্রায়” বাক্য প্রয়োগ করিয়া অশ্রায় অনিত্যত্বরূপ পক্ষ স্থাপন করিলে

তখন গুরু ষড়ানিয়মে জ্ঞায় প্রয়োগ করিয়া আত্মার নিত্যরূপ প্রতিপক্ষের সংস্থাপন ও অনিত্যত্ব পক্ষের খণ্ডন করিলেন। তখন সেই শিষ্যের আত্মার নিত্যরূপ তত্ত্বের নির্ণয় হইল। উক্ত স্থলে তাঁহাদিগের উভয়ের সেই সমস্ত উক্তি প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যই “বাদ”। অবশ্য সেখানে আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষে শিষ্যের কথিত সেই প্রমাণ ও তর্ক প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ক নহে। উহাকে বলে “প্রমাণাভাস” ও “তর্কাভাস”। কারণ আত্মার অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মই কখনই প্রমাণ তর্ক সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু শিষ্য তাঁহার অভিমত সেই প্রমাণ ও তর্ককে প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ক বলিয়া বুঝিয়াই উহা প্রদর্শন করায় ঐ তাৎপর্য্যে গৌতম তাঁহার পক্ষেও সেই সমস্ত বাক্যকে “প্রমাণ তর্ক সাধনোপালব্ধ” বলিয়াছেন। কিন্তু “জল্প” ও “বিতণ্ডা” স্থলে প্রতিবাদীর জ্ঞানভেদ উদ্দেশ্য থাকায় তিনি কোন স্থলে প্রমাণাভাস ও তর্কাভাস বলিয়া বুঝিয়াও তাহাকে প্রমাণ ও তর্ক বলিয়া তদ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করিতে পারেন। “বাদ” কথায় প্রতিবাদী তাহা পারেন না। কারণ, প্রতারণক ব্যক্তি “বাদ” কথায় অধিকারীই নহে। সূত্ররাং প্রমাণাভাস ও তর্কাভাস বলিয়া বুঝিলে তদ্বারা যাহাতে স্বপক্ষস্থাপনাদি করা যায় না, তাহা “বাদ,” ইহাই উক্ত সূত্রে গৌতমের প্রথমোক্ত ঐ পদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। পরন্তু গৌতম উক্ত সূত্রে পরে “পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ”—এই পদের প্রয়োগ করিলেও প্রথমে “প্রমাণ তর্ক সাধনোপালব্ধঃ”—এই পদের দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন যে,—কোন স্থলে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও “বাদ” কথ্য হইতে পারে। কিন্তু সেখানেও প্রমাণ ও তর্কদ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করিতে হইবে। নচেৎ “বাদ” কথ্য ও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন “বাদ” কথায় সর্বত্র পঞ্চাবয়ব প্রয়োগের আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়া গৌতমের উক্তরূপ অভিপ্রায়ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু “জল্প” ও “বিতণ্ডা” স্থলে সর্বত্রই বাদী প্রথমে মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে তাঁহার সাধনীয় কি? ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া ক্রমে হেতুবাক্য, উদাহরণ বাক্য, উপনয় বাক্য ও নিগমন বাক্যের প্রয়োগ

করিবেন। কারণ, তাহাতে জয়-পরাজয়ের ব্যবস্থা থাকায় “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন কর্তব্য বলিয়া পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ কর্তব্য। “বাদ” কথায় সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য নহে। কিন্তু “অপসিদ্ধান্ত” ও “হেতুভাস” রূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ গুরুও যদি কদাচিৎ ভ্রমবশতঃ কোন অপসিদ্ধান্ত বলেন, অথবা দৃষ্ট হেতুর দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করেন, তাহা হইলে সেখানে শিষ্যও তাহার উল্লেখপূর্বক প্রতিবাদ করিবেন। নচেৎ সেখানে তত্ত্ব-নির্ণয়রূপ উদ্দেশ্যই সিক্ত হইতে পারে না। পূর্বোক্ত “বাদ” লক্ষণ সূত্রে গৌতম “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ”—এই পদের দ্বারা “বাদ” কথায় যে, “অপসিদ্ধান্ত” ও “হেতুভাস” নামক নিগ্রহস্থানের উল্লেখ কর্তব্য, ইহা স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি অনেক প্রাচীন আচার্য্যের মতে “বাদ” কথায় পঞ্চাবয়ব প্রয়োগস্থলে “ন্যূন” ও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানেরও উদ্ভাবন কর্তব্য। পরে নিগ্রহস্থানের পরিচয় বুঝিলে ইহা বুঝা যাইবে।

গৌতম পরে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত “জল্প”র লক্ষণ বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত বাদ লক্ষণ সূত্রে বাদের যে প্রকার ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া যাহাতে “ছল” “জ্ঞাতি” ও সর্ব প্রকার “নিগ্রহস্থানে”র দ্বারা সাধন ও উপালম্ব (স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন) হয় অর্থাৎ হইতে পারে, এমন বিচার বাক্যই “জল্প”। উক্ত সূত্রে গৌতমের শেষোক্ত ঐ অতিরিক্ত বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, “বাদ” কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষা থাকে না। কিন্তু “জল্প” কথায় তাঁহাদিগের জিগীষা থাকে। কারণ, জয়লাভের উদ্দেশ্যেই জিগীষু বাদী বা প্রতিবাদী “ছল” প্রভৃতির প্রয়োগ করেন। “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক কথায় জয়লাভার্থ অসঙ্গতর বিশেষ্যই “ছল” ও “জ্ঞাতি নামে কথিত হইয়াছে। সে কিরূপ, তাহা পরে বুঝা যাইবে। ফলকথা, কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ যে বিচার, যাহাতে কাহারও জিগীষার গন্ধ নাই, তাহা “বাদ”, এবং বিজিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষ স্থাপন পূর্বক যে বিচার, তাহা “জল্প”, ইহাই গৌতমের উক্ত দুই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। তদনুসারেই পূর্বাচর্য্যগণ বলিয়াছেন—“তত্ত্ব-বুৎসুকথা বাদঃ। উভয় পক্ষ স্থাপনাবতী বিজিগীষু কথা জল্পঃ”।

গৌতম পরে তৃতীয় সূত্রের দ্বারা শেযোক্ত “বিতণ্ডা”র লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সেই “জল্প”ই প্রতিপক্ষ স্থাপনাতীন হইলে তাহাকে বলে “বিতণ্ডা”। অর্থাৎ “জল্প” স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যথাক্রমে নিজপক্ষ স্থাপন করেন। কিন্তু “বিতণ্ডা” স্থলে প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল পরপক্ষ খণ্ডনই করেন,—ইহাই “জল্প” হইতে “বিতণ্ডা”র বিশেষ। “জল্প”র অস্তিত্ব লক্ষণ “বিতণ্ডা”তেও থাকিবে। কিন্তু উক্ত বিশেষ গ্রহণ করিয়াই “জল্প” হইতে উহার পৃথক নির্দেশ হইয়াছে। উক্ত বিশেষ গ্রহণ করিয়া “রেক সংহিতা”র বিমান স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে চরকও বলিয়াছেন—“জল্প বিপর্যায়ো বিতণ্ডা, বিতণ্ডা নাম পরপক্ষ দোষ বচন মাত্রমেব”।

যিনি “বিতণ্ডা”, করেন, তাহাকে বলে বৈতণ্ডিক। বাদীর যাহা প্রতিপক্ষ, তাহাই বৈতণ্ডিকের নিজ পক্ষ। প্রথমে বাদীর বিতণ্ডা সম্ভবই নহে। কিন্তু বাদী প্রথমে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষ অর্থাৎ বাদীর পক্ষের বিপরীত পক্ষরূপ প্রতিপক্ষের স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষের খণ্ডনই করেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত বিচার বাক্য হইবে—“বিতণ্ডা”। শূণ্যবাদী কোন সম্প্রদায়বিশেষ প্রমাণাদি পদার্থ অস্বীকার করায় নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে না পারিয়া কোন সময়ে বলিতেন যে, আমরা বৈতণ্ডিক, আমাদের নিজের কোনও পক্ষই নাই, স্ততরাং স্বপক্ষ সিদ্ধি আমাদের বিতণ্ডার উদ্দেশ্যই নহে। মনে হয়, এই মতানুসারেই আধুনিক কোন কোন অধৈতবাদী বৈদ্যান্তিকও বলেন যে, বৈতণ্ডিকের কোন পক্ষই নাই। কিন্তু বাৎস্তায়ন উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিকের ও নিজপক্ষ আছে, ইহা স্বীকার্য। বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতমও পূর্বোক্ত বিতণ্ডার লক্ষণ সূত্রে “প্রতিপক্ষ” শব্দের পরে “স্থাপনা” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিকের ও নিজপক্ষ আছে। কিন্তু কেবল বাদীর পক্ষ খণ্ডন করিতে পারিলেই তাহার সেই নিজ পক্ষ আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে—এই অভিসন্ধি বশতঃই তিনি নিজ পক্ষ স্থাপন করেন না। তাহার নিজের যে কোন পক্ষই নাই, ইহা নহে। তাই গৌতম “সপ্রতিপক্ষ হীনা বিতণ্ডা” এইরূপ সূত্র বলেন নাই। বার্তিক-কার উদ্যোতকর ও গৌতমের ঐ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে স্পষ্ট বলিয়াছেন—

“অভ্যাপেত্য পক্ষং যো ন স্থাপয়তি স বৈতণ্ডিক উচ্যতে” ।

পূর্বোক্ত “বিতণ্ডা” পদার্থের স্বরূপ না জানিয়া এখন অনেকেই “বিতণ্ডা” বলিতে বাক্য কলহ অথবা সত্যের অপলাপ করিয়া কুতর্ক করা প্রভৃতি বুঝেন এবং অনেকেই ঐরূপ কোন অর্থে “বাগ্বিতণ্ডা” ও “বাদবিতণ্ডা” প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগও করেন। বঙ্গভাষায় এখন প্রায়ই “বিতণ্ডা” শব্দের প্রকৃতার্থে প্রয়োগ হয় না। প্রাচীনকালে বাঙ্গালা গ্রন্থেও শ্রায়দর্শনোক্ত “বিতণ্ডা” প্রভৃতি শব্দের প্রকৃতার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে। “চৈতন্য চরিতামৃত” গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখিয়াছেন—“বিতণ্ডা হল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল” (মধ্যষষ্ঠঃ) । বস্তুতঃ “বিতণ্ডাতে ব্যাহত্বতে পর পক্ষোহনয়া”—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে “কথা”র দ্বারা প্রতিবাদী কেবল পরপক্ষ খণ্ডনই করেন, তাহাই “বিতণ্ডা” শব্দের যোগিক অর্থ। উহাতে জিগীষা থাকিলেও ক্রোধ বা কলহের কোন কথাই নাই। জিগীষা ও ক্রোধ এক পদার্থ নহে।

বস্তুতঃ বিচারস্থলে যাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া কলহ করেন, অথবা সর্বজন সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করিয়া অনুচিত কুতর্ক করেন, তাঁহারা “বিতণ্ডা” কথারও অধিকারী নহেন। তর্কশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক পূর্বাচার্য্যগণ বিচারস্থলে জয়লাভের জ্ঞও কাহাকেও ঐরূপ অনুচিত কর্তব্যের উপদেশ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কথার অধিকারী নিরূপণ করিতে স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভের অভিলাষী এবং সর্বজন সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন না, এবং যাহারা বাক্য শ্রবণাদি পটু অর্থাৎ বধির ও প্রমত্ত নহেন এবং কথার সম্পাদক সমস্ত ব্যাপারে সমর্থ এবং যাহারা কলহ করেন না, তাঁহারা “কথা”র অধিকারী। আর তন্মধ্যে যাহারা কেবল তত্ত্ব নির্ণয়েচ্ছ, এবং নিজের পরিজ্ঞাত সত্যের গোপন করেন না এবং প্রকৃত বিষয়েই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করেন এবং যথাকালেই যাহাদিগের উত্তর ক্ষুণ্ণিত হয় এবং যাহারা যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ব বোদ্ধা, তাঁহারা “বাদ” কথার অধিকারী।

পরন্তু (১) বাদি নিয়ম (২) প্রতিবাদি নিয়ম (৩) সভাপতি নিয়ম ও (৪) মধ্যস্থ ও সদস্ত নিয়ম, এই চারিটি পূর্বোক্ত জল্প ও বিতণ্ডার অঙ্গ বলিয়া পূর্বাচার্য্যগণ ঐকমত্যে বলিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদি নিয়ম ও

প্রতিবাদি নিয়ম অর্থাৎ কে বাদী হইবেন এবং কে প্রতিবাদী হইবেন, ইহা নির্ধারণ করিতেও প্রথমে তাঁহাদিগের অধিকার-নির্ণয় আবশ্যক। সভাপতি, তাহা নির্ণয় করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর নিয়োগ করিবেন। সেই সভায় কোন রাজা বা তত্ত্বাল্য প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি সভাপতি হইবেন। অথবা তিনি অত্র উপযুক্ত সভাপতি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন। সভাপতিই তখন উপযুক্ত মধ্যস্থ নিয়োগ করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারের প্রবর্তন করিবেন। তখন সেই বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যস্থ পণ্ডিতগণের নিকটে যথানিয়মে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সমস্ত বক্তব্য বলিবেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নচাৰ্য্য পরে অতি হৃদয় বিচার করিয়া “প্রবেধ সিদ্ধি” নামক গ্রন্থে জল্প ও বিতণ্ডার সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে শঙ্কর মিশ্রও “বাদিবিবাদ” গ্রন্থে ঐ সমস্ত বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য লিপিবদ্ধ করেন। “বাদিবিবাদ” মুদ্রিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু উহা পরিশ্রম করিয়া পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিবেন। এখন কিরূপে কি প্রণালীতে “জল্প” বিচার কর্তব্য, তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমে বাদী মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব রূপে স্তায় প্রয়োগ দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া পরে তাঁহার কথিত হেতু যে, নির্দোষ, ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। অর্থাৎ তাঁহার হেতুতে সম্ভাব্যমান সমস্ত দোষের নিরাকরণের জন্ত প্রথমে সামান্ততঃ উহা হেত্বাভাস নহে, কারণ উহাতে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ নাই এবং পরে বিশেষতঃ উহা বিরুদ্ধ নহে, ব্যভিচারী নহে, ইত্যাদি প্রকারে উহা যে কোন প্রকার হেত্বাভাসই হইতে পারে না, সুতরাং উহা তাঁহার সাধ্যধর্মের সাধক প্রকৃত হেতু, ইহা বুঝাইবেন। উক্তরূপে বাদীর সমস্ত বক্তব্য সমাপ্ত হইলে তখন প্রতিবাদী মধ্যস্থগণের নিকটে বাদীর পূর্বোক্ত সমস্ত কথার অনুবাদ করিবেন। কারণ বাদীর সেই সমস্ত কথা তিনি ঠিক বুঝিয়াছেন কিনা, তাহা প্রথমে বুঝান তাঁহার আবশ্যক। নচেৎ তাঁহার প্রতিবাদ ব্যর্থ হইবে এবং বাদীর কথা না বুঝিয়া প্রতিবাদ করিলে পরে তাঁহার অনেক “নিগ্রহস্থান” উপস্থিত হইবে। সুতরাং তিনি প্রথমে মধ্যস্থগণের নিকটে বাদী যাহা

বাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিবেন। পরে তিনি উহার প্রতিবাদ করিতে বাদীর পক্ষে প্রথমে হেত্বাভাসভিন্ন নিগ্রহস্থান বিশেষের উদ্ভাবন করিবেন। তাহা সম্ভব না হইলে পরে যথাসম্ভব হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন দ্বারা বাদীর কথিত হেতুর দৃষ্টত্ব প্রতিপাদন করিয়া শেষে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ শ্রায় প্রয়োগ দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিবেন। উক্তরূপে প্রতিবাদীর সমস্ত বক্তব্য সমাপ্ত হইলে তখন বাদী তৃতীয় পক্ষস্থ হইয়া প্রতিবাদীর কথিত সমস্ত প্রতিবাদের অনুবাদ করিয়া তিনি যে প্রতিবাদীর সমস্ত কথাই ঠিক বুঝিয়াছেন, ইহা মধ্যস্থগণকে বুঝাইবেন। পরে তাহার নিজ পক্ষের সাধক হেতুতে প্রতিবাদীর প্রদর্শিত দোষগুলির উদ্ধার করিয়া প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপনার খণ্ডনের জন্ত উহাতে প্রথমে হেত্বাভাস ভিন্ন নিগ্রহস্থান বিশেষের উদ্ভাবন করিবেন। তাহা সম্ভব না হইলে তখন যথাসম্ভব হেত্বাভাসের উদ্ভাবন অর্থাৎ উল্লেখ করিবেন। পরে প্রতিবাদী তখন চতুর্থপক্ষস্থ হইয়া পূর্ববৎ ঐ সমস্ত করিবেন। উক্তরূপ প্রণালীতে সেই জিগীষু বাদীও প্রতিবাদীর বিচার চলিবে। পরিশেষে যিনি নিজমতে দোষের উদ্ধার ও পরমতে দোষ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনিই পরাজিত হইবেন। মধ্যস্থগণ সেই জয়-পরাজয় নির্ণয় করিবেন এবং তাহাদিগের নির্ণয় অবগত হইয়া নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ সভাপতি সেই জয়-পরাজয় ঘোষণা করিবেন। উক্তরূপ বিচারকালে বাদী বা প্রতিবাদী তথাকথিত কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তিনি যথার্থরূপে নিজপক্ষ স্থাপন করিলেও সেই নিয়ম লঙ্ঘন ভুল তৎকালে নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়া নিগৃহীত বা পরাজিত বলিয়া কথিত হইবেন।

ফলকথা গৌতমোক্ত “জল্প” ও “বিতণ্ডা”য় যেরূপ নিয়মবন্ধন অবশ্য স্বীকার্য, তদনুসারেই জল্প ও বিতণ্ডা কর্তব্য। স্মৃতরাঃ উহাতে বাদী বা প্রতিবাদীর ক্রোধ বা কলহের কোন অবকাশই নাই। কিন্তু এখন নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ সর্বমান্ত কোন সভাপতি এবং সর্বমান্ত পক্ষপাতশূন্য প্রকৃত বোদ্ধা মধ্যস্থও অতি দুর্লভ। আর কালপ্রভাবে এখন কেহই যেন কোন নিয়মের অধীনও হইতে চাহেন না। তাই এখন বিচার সভায় অনেকস্থলে যেন সকলেই বাদী ও সকলেই প্রতিবাদী ও সকলেই সভাপতি। কিন্তু উপায় কি? এখন ত আর কোন বাদী ও

প্রতিবাদীরই গ্রায় দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত নিগ্রহ স্থানের কোন ভয় নাই। অনেকদিন হইতে নৈয়ায়িক পণ্ডিত সমাজেও গ্রায় দর্শনের পঞ্চম অধ্যায় যেন “পঞ্চম অত্রথা সিদ্ধ” (নিতান্ত অনাবশ্যক) বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে। তাই কালপ্রভাবে এখন গ্রায়-দর্শনোক্ত বিচার-ব্যবস্থা একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। এবিষয়ে আর অধিক বলা অনাবশ্যক।

কিন্তু এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, পূর্বোক্ত “বাদ” কথায় সভা বা মধ্যস্থ প্রভৃতির অপেক্ষা নাই। পর্ণকুটীরে বা বৃক্ষ মূলে বসিয়াও গুরু শিষ্য প্রভৃতি তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ “বাদ” করিয়াছেন। মুমুক্শু ব্যক্তি তত্ত্ব নির্ণয় ও তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্ত প্রথমে “অধীক্ষিকী” বিচার অধ্যয়ন, ধারণাও সতত চিন্তনাদিরূপ অভ্যাস এবং সেই বিচাভিহ্ন অস্থায়ী শূন্য শিষ্য, গুরু, সতীর্থ ও শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ অগ্রাণ্ড শ্রোয়র্থাদিগের সমীপস্থ হইয়া পূর্বোক্ত “বাদ” বিচার করিবেন। ইহারই প্রাচীন নাম “তদ্বিহ্ন—সংবাদ” ও “তদ্বিহ্ন—সম্ভাষা”। মহর্ষি গৌতমও পরে দুই সূত্রের দ্বারা উহা বলিয়াছেন (১)। পূর্বোক্তরূপ বাদ বিচারে কাহারও কিছুমাত্র জিগীষা না থাকায় উহা “বীতরাগ কথা” নামেও কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও—উহাতেও যথা নিয়মে পর পক্ষ খণ্ডন ও কর্তব্য। নচেৎ সেই বাদ কথার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। স্ততরাং কেবল তত্ত্ব নির্ণয়োদ্দেশ্যে বাদ কথাতেও প্রতিবাদী যথাসম্ভব হেত্বাভাস প্রভৃতির উদ্ভাবন করিয়া বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিবেন। তাহা করিলেও তাঁহাদিগের কাহারই জিগীষা বা পরপরভাবে ইচ্ছা না থাকায়—দেই কথার বীতরাগকথাত্ব বা বাদত্বের ব্যাঘাত হইবে না। শারীরিক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ইহা বলিয়াছেন এবং সেখানে “ভামতী” টীকায় শ্রীমদবাচস্পতি মিশ্র শঙ্করের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই সুব্যক্ত করিয়াছেন (২)। পূর্বোক্ত বাদ জল্প ও

(১) “জ্ঞান গ্রহণাভ্যাসপুর্বিদ্যেঃ সহ সংবাদঃ”। “তং শিষ্য গুরু-সব্রহ্মচারি বিশিষ্ট শ্রোয়র্থাভিন্নন-হৃষিত্তিরভূতপেয়াৎ”। “ছায়াদর্শন” ৪।২।৪৭ ৪৮ ॥

(২) নহু মুমুক্শুণাং মোক্ষ সাধনত্বেন সমাগদর্শননিরূপণায় স্বপক্ষ স্থাপনমেব কেবলং কর্তৃত্বং, কিং পরপক্ষ-নিরাকরণেন পরদেষ্য করেণ, বাচমেব, তথাপি মহাজ্ঞান পরিগৃহীতানি মহাস্থি সাংখ্যাদি তত্ত্বানি” ইত্যাদি শারীরক ভাষ্য (২।২।১)। “তত্ত্বনির্ণয়বাসানা বীতরাগ কথা, নচ পর-পক্ষ দূষণ মন্তরেণ তত্ত্ব-নির্ণয়ঃ শক্যঃ কর্তৃমিতি তত্ত্ব-নির্ণয়য় বীতরাগেণাপি পরপক্ষো দুষ্টতে, নতু-পরপক্ষ ভয়েতি ন বীতরাগ কথা-ব্যাহতি রিত্যর্থঃ”। “ভামতী”।

বিতণ্ডার মধ্যে বাদই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ উহাতে কাহারও জিগীষার গন্ধও নাই এবং উহা তত্ত্বনির্ণয়ের পরম পবিত্র কারণ। তাই উহা শ্রীভগবানের অশ্রুতম বিভূতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—“বাদঃ প্রবদতামহং” (গীতা—১০।৩২) অর্থাৎ বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি “বাদ”। ভাষ্যকার শঙ্কর ও টীকাকার শ্রীধর স্বামি প্রভৃতিও ভগবদ্ভক্ত ঐ “বাদ” শব্দের দ্বারা গৌতমোক্ত “বাদ” নামক কথাকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু স্থলবিশেষে মুমুক্শুর ও জল্প ও বিতণ্ডা কর্তব্য হওয়ায় উহার তত্ত্ব-জ্ঞানও তাঁহার আবশ্যিক। তাই মহর্ষি গৌতম তাঁহার কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে “বাদে”র পরে “জল্প এবং “বিতণ্ডা” নামক পদার্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কি কারণে মুমুক্শু ব্যক্তিরও জিগীষু হইয়া জল্প ও বিতণ্ডা কর্তব্য? তাই গৌতম পরে বলিয়াছেন—

* * “তত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে

বীজ-প্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টক-শাখাবরণবৎ” ১৪.২.৫০। *

তাৎপর্য্য এই যে, কেহ কোন ক্ষেত্রে কোন বীজ রোপণ করিলে যখন উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তখন গো মহিষাদি পশুগণ উহা বিনষ্ট করিতে উত্তত হইলে সেই ব্যক্তি সেই অঙ্কুরের রক্ষার জন্ত যেমন কণ্টক শাখার দ্বারা উহার আবরণ করে, তদ্রূপ, মুমুক্শু ব্যক্তিও তাঁহার প্রথমোৎপন্ন তত্ত্ব-নিশ্চয় রক্ষার জন্ত আবশ্যিক হইলে জল্প ও বিতণ্ডা করিবেন। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন গৌতমের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, শাস্ত্র হইতে প্রথমে তত্ত্ব শ্রবণ করিলেও যাহাদিগের সেই তত্ত্ব-নিশ্চয় দৃঢ় বা পরিপক্ব হয় নাই এবং সেই তত্ত্ব-নিশ্চয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্ত যাহারা গুরুপদেশানুসারে মননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের নিকটে নাস্তিকগণ বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিলে তাহাদিগের সেই তত্ত্ব-নিশ্চয়ের হানি হইয়া থাকে। সুতরাং তখন তাহারা নিজের সেই তত্ত্ব-

* মনে হয়, গৌতমের উক্ত হত্রানুসারেই কোন সময়ে কোন বৈদান্তিক “ইদন্ত কণ্টকা-বরণং” “তত্ত্বস্ত বাদরায়ণাৎ” এইরূপ বাক্য রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত হত্রের দ্বারা গৌতম কিন্তু শ্রায় শাস্ত্রকে কটাকাবরণ বলেন নাই। তিনি “তত্ত্বস্ত বাদরায়ণাৎ” এইরূপ কোন হত্রও বলেন নাই, তাহা বলিতেই পারেন না।

নিশ্চয়-রক্ষার জন্তই অগত্যা জল বা বিতণ্ডাকে আশ্রয় করিয়া সেই সমস্ত নাস্তিককে নিরস্ত করিবেন। কিন্তু ধন লাভ বা লোক সমাজে পূজা ও খ্যাতিলাভের জন্ত কখনই তাঁহারা উহা করিবেন না। তাই ভাষ্যকার পরে স্পষ্ট বলিয়াছেন—

“তদেতদবিজ্ঞাপরি পালনার্থং, ন লাভ-পূজা খ্যাতির্থমিতি”।

কিন্তু “তাৎপর্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র অতি সুন্দর ভাষায় ইহাও বলিয়াছেন যে, দাস্তিক নাস্তিকগণ সন্ধিত্যয় বিরক্তিবশতঃ অথবা লাভ, পূজা বা খ্যাতির কামনায় আস্তিকদিগকে আক্রমণ করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণাদির খণ্ডন করিলে তদ্বারা সমাজ ও ধর্ম রক্ষক রাজারও মতি বিভ্রম হওয়ায় প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহার নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে আস্তিক পণ্ডিতগণ তৎকালে জল বা বিতণ্ডার দ্বারাও সেই সমস্ত নাস্তিককে নিরস্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহারাও বেদবিজ্ঞা ও বৈদিকধর্মের রক্ষার জন্তই—উহা করিবেন। ধনলাভ বা লোক সমাজে পূজা বা খ্যাতি লাভের জন্ত উহা করিবেন না। বাচস্পতি মিশ্রের ঐ সমস্ত কথার দ্বারা গৌতমোক্ত জল ও বিতণ্ডার উদ্দেশ্য বিষয়ে তাঁহার অভিमत এবং তাঁহার সময়েও ভারতে কোন কোন স্থানে বেদ বিরোধী অনেক বৌদ্ধ দার্শনিকের অস্তিত্ব ও প্রভাব কিরূপ বুঝা যায়, তাহা সুদী পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন।

“তार्কিক রক্ষা” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক বরদরাজ ইহাও লিখিয়াছেন যে, (১) ধর্ম শাস্ত্রে “ন বিগৃহ্য কথং কুর্য্যাৎ” অর্থাৎ জল ও বিতণ্ডা করিবেন না—এই নিষেধ বাক্য আছে বটে, কিন্তু অনুচিত উদ্দেশ্যে জিগীষু হইয়া শিষ্ট আস্তিকগণের সহিত উহা করিবেনা, ইহাই ঐ নিষেধবাক্যের তাৎপর্য। কারণ সময় বিশেষে অশিষ্ট বা হুকিনীত নাস্তিকগণকে নিরস্ত করা প্রয়োজন হওয়ায় তাহাদিগের সহিত জল ও বিতণ্ডাও কর্তব্য, মহর্ষি গৌতমও ইহা বলিয়াছেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব দার্শনিক বহু বিজ্ঞ বেকটনাথ ও তাঁহার

(১) ন চ “ন বি গৃহ্যকথাং কুর্য্যাৎ” দিত্যা দিতি জল-বিতণ্ডা-নিষেধঃ শঙ্করীয়ঃ, নাস্তিক নিরাকরণার্থ-
 অবশ্য কর্তব্যঃ তদিত্যয়ঃ বিষয়জান্নিষেধস্ত। তদুক্তং “তৎসাধ্যবসায় সংরক্ষণার্থঃ” ইত্যাদি।

“শ্রায়পরিণুক্তি” গ্রন্থে ঐরূপ সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন এবং ঐ ব্যবস্থা যে শাস্ত্রসিদ্ধ-ইহা সমর্থন করিতে পরে—ভগবদ্গীতার “বানঃ প্রবদতামহং”—এই ভগবদ্-বাক্যের রামানুজের ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত রূপ ব্যবস্থা যে রামানুজেরও সম্মত, ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। (১)।

বস্তুতঃ যে উদ্দেশ্যেই হউক, যে অবস্থাতেই হউক, চিরকালই সময় বিশেষে অনেক শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিও জিগীষামূলক শাস্ত্র বিচার করিয়াছেন। প্রেমাবতার ঈশৈতেন্তদেব পরে কোন স্থানে সেরূপ বিচার করিয়াছিলেন কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ৮পুরীধামে সার্কভোম ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার বিচার-বার্তার বর্ণন করিতে “চৈতন্য চরিতামৃত” কারও লিখিয়াছেন—“বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল। সব খণ্ডি প্রভু নিজমত সে স্থাপিল” (মধ্য ষষ্ঠ পঃ)। আর রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ সভায় ব্রহ্মবিৎ যাজ্ঞবল্ক্যও ত জিগীষু হইয়াই উবস্ত, কহোল ও আর্তভাগ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং তখন সেই সমস্ত ব্রাহ্মণও যাজ্ঞবল্ক্যের পরাভবেচ্ছু হইয়াই তাঁহাকে ক্রমে বহু ছন্দস্তর প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে সেই বিবরণ প্রকাশিত আছে। যদিও আমরা সেখানে সেই সমস্ত প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর বাক্যকে গৌতমোক্ত “জল্প” বা “বিতণ্ডার” লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বুঝি না, কিন্তু “জীবনুক্তিবিবেক” গ্রন্থে অদ্বৈত বাদী বিচারণ্য মুনিও সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকে “বিজিগীষু কথায়” প্রবৃত্ত বলিয়া তাঁহাদিগেরও বিজ্ঞা গর্বের সমর্থন করিয়াছেন। (২) এবং কোন স্থলে “বিতণ্ডা” নামেও উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। অতঃপর “হেতুভাসে”র পরিচয় বলিতে হইবে।

(১) “আগম সিদ্ধাচ্ছেৎ ব্যবস্থা, “বাদজল্প বিতণ্ডাভি” রিত্যদি বচনাৎ। ভগবদ্ গীতা-ভাষ্যেহপি”—ইত্যাদি “শ্রায়-পরিণুক্তি” (চৌধাষা সংস্কৃত সিরিজ) দ্বিতীয় আত্মিক দ্রষ্টব্য।

(২) “অস্তি হি যাজ্ঞবল্ক্যস্ত তৎপ্রতি বাদিনামুদন্ত কহোলাদীনাঞ্চ ভূয়ান্ বিদ্যামদঃ, তৈঃ সর্বৈরপি বিজিগীষুকথায় প্রবৃত্তাঃ”—ইত্যাদি “জীবনুক্তি বিবেক” দ্বিতীয় অক্ষরণ (ষষ্ঠ সংস্করণ ২৫৭ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

(১১) হেত্বাভাস

অনুমান স্থলে যে হেতু দৃষ্ট, তাহাকে বলে “হেত্বাভাস”। যিনি ঐ হেত্বাভাসের তত্ত্ব জানেন না, অর্থাৎ কোন স্থলে কিরূপ হেতু সৎ এবং কিরূপ হেতু দৃষ্ট বা অসৎ, এ বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ নহেন, তাহার পূর্বোক্ত বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই ত্রিবিধ কথার অধিকারই হয় না। সুতরাং মহর্ষি গৌতম উহার পরেই “হেত্বাভাস” পদার্থের উল্লেখ করিয়া উহার তত্ত্ব-নিরূপণের ক্ষমতা পরে বলিয়াছেন—

“সব্যভিচার—বিরুদ্ধ—প্রকরণসম—সাধ্যসম—

কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ ॥১/২।১॥

অর্থাৎ (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম (৪) সাধ্যসম ও (৫) কালাতীত নামে হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার। পূর্বে প্রমাণবিভাগ হুত্রে “প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ সূচিত হওয়ায় মহর্ষি গৌতম যেমন পৃথক্ করিয়া প্রমাণের সামান্য লক্ষণ হুত্র বলেন নাই,—তজ্জপ, উক্ত হুত্রেও “হেত্বাভাস” শব্দের দ্বারাই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ সূচিত হওয়ায় পৃথক্ করিয়া উহার সামান্য লক্ষণ হুত্র বলেন নাই। কারণ “হেতু বদাভাসন্তে” অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ হেতুর লক্ষণাক্রান্ত নহে, কিন্তু হেতুর স্থায় প্রতীয়মান হয়,—এইরূপ ব্যাপ্তি অনুসারে “হেত্বাভাস” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—দৃষ্ট হেতু (১)।

ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও গৌতমোক্ত হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন—“হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতু সামান্যাক্ষেত্বক-দাভাসমানাঃ”। অর্থাৎ হেতু পদার্থের লক্ষণ না থাকায় যে সমস্ত পদার্থ

(১) গঙ্গেশের ‘তত্ত্ব-চিন্তামণি’র টীকায় রঘুনাথ শিরোমণি “ভাভাস” শব্দের দোষ অর্থগ্রহণ করিয়া হেতুর যে ব্যভিচারাদি পঞ্চবিধ ভাভাস বা দোষ, তাহাকে হেত্বাভাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও মতান্তরে যে দৃষ্ট হেতুই “হেত্বাভাস” ইহা বলিয়া সেই মতেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৌতমের উক্ত হুত্রের দ্বারাও সরলভাবে তাহাই বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও “হেত্বাভাস” শব্দের ঐ রূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িক গোবর্দ্ধন মিশ্র ও “তর্ক সংগ্রহে”র “স্থায়-বোধিনী” টীকায় প্রাচীন সত্যসূত্রসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“হেতু বদাভাসন্তে ইতি হেত্বাভাসা দৃষ্টহেতব ইত্যর্থঃ”।

যে স্থলে অহেতু (প্রকৃত হেতু নহে), কিন্তু হেতুর সাদৃশ্য বশতঃ হেতুর ত্ৰায়
প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত পদার্থই সেই স্থলে হেতুভাস।

তাহা হইলে এখন হেতু পদার্থের লক্ষণ কি, ইহাই বুঝা আবশ্যক।
মৌলিক পূর্বে দ্বিতীয় অবয়ব হেতু বাক্যের লক্ষণ স্বত্বে “সাধ্যসাধনঃ”—
এই পদের দ্বারা সাধ্যধর্মের সাধনত্বই যে হেতু পদার্থের সামগ্র্য লক্ষণ,
ইহাও স্থচনা করিয়াছেন। পরে পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ হেতুভাসের লক্ষণ
বলিয়া যেরূপ পদার্থ সাধ্যধর্মের সাধন হয়, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।
তদনুসারেই পরবর্তী ত্ৰয়াচাৰ্য্যগণ সুব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, (১)
“পক্ষসত্ত্ব” (২) “সপক্ষসত্ত্ব” (৩) “বিপক্ষাসত্ত্ব” (৪) “অসংপ্রতিপক্ষিতত্ত্ব” ও
(৫) “অবাধিতত্ত্ব”, এই পঞ্চরূপ বা পঞ্চধর্মই হেতু পদার্থের লক্ষণ। *

যে ধর্মীতে কোন ধর্মের অনুমান করা হয়, তাহার নাম “পক্ষ” এবং
যে ধর্মী বা যে পদার্থ সেই অনুমেয় ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, তাহার নাম
“সপক্ষ” এবং যে পদার্থ সেই অনুমেয়-ধর্ম-শূন্য বলিয়া নিশ্চিত, তাহার
নাম “বিপক্ষ”। যেমন পর্বতরূপ ধর্মীতে ধূম হেতুর দ্বারা বহির অনুমান
স্থলে পর্বত “পক্ষ”, রন্ধন শালা “সপক্ষ” এবং জলাদি “বিপক্ষ”। পক্ষ
পদার্থে বিद्यমান থাকাই (১) “পক্ষ-সত্ত্ব” এবং সপক্ষ পদার্থে বিद्यমান থাকাই
(২) “সপক্ষ-সত্ত্ব” এবং বিপক্ষ পদার্থে বিद्यমান না থাকাই (৩) “বিপক্ষ-
সত্ত্ব”। পূর্বোক্তস্থলে পর্বতরূপ পক্ষ এবং রন্ধনশালারূপ সপক্ষে ধূম বিद्य-
মান থাকায় এবং বিপক্ষ জলাদি পদার্থে ধূম বিद्यমান না থাকায় উহাতে
পূর্বোক্ত “পক্ষসত্ত্ব”, “সপক্ষ সত্ত্ব” ও “বিপক্ষাসত্ত্ব” এই ধর্মত্রয় আছে
এবং শেষোক্ত ধর্মদ্বয়ও আছে। কারণ, গৃহীত হেতু পদার্থের তুল্যবলশালী
বিরোধী অত্ৰ হেতু না থাকা সেই হেতুর “অসংপ্রতি পক্ষিতত্ত্ব”। এবং
অনুমানের সেই ধর্মীতে সেই অনুমেয় ধর্ম নাই, ইহা বলবৎ প্রমাণের
দ্বারা পূর্বে নিশ্চিত না হইলে সেই হেতুকে “অবাধিত” বলে, স্মতরাং

* যে স্থলে “সপক্ষ” কোন পদার্থ নাই সেই স্থলে “সপক্ষ সত্ত্ব”কে ত্যাগ করিয়া এবং যে স্থলে
“বিপক্ষ” কোন পদার্থ নাই সেই স্থলে “বিপক্ষাসত্ত্ব”কে ত্যাগ করিয়া অস্ত চারিটা ধর্মই হেতু পদার্থের
লক্ষণ বুঝিতে হইবে। “তর্কামৃত” গ্রন্থে ভগদীশ তর্কালঙ্কারও ইহা বলিয়াছেন।

তাদৃশ হেতু পদার্থেই “অবাধিতত্ব” ধর্ম থাকে। পূর্বোক্ত স্থলে ধূম-হেতুর তুল্য বলশালী বিরোধী কোন হেতু না থাকায় উহাতে “অসংপ্রতিপক্ষিতত্ব” ধর্ম আছে এবং পক্ষিতে যে বহি নাই, ইহা বলবৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত না হওয়ায় উহাতে “অবাধিতত্ব” ধর্মও আছে। সূত্রাং ধূম পদার্থে পূর্বোক্ত “পক্ষসত্ত্ব” প্রভৃতি পঞ্চধর্ম ই থাকায় উক্তস্থলে উহা হেতুর লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। সূত্রাং উহার দ্বারা পক্ষিতে বহির যথার্থ অনুমিতিই হয়।

এখন যদি পূর্বোক্ত পঞ্চধর্মই হেতুর লক্ষণ, ইহা স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে উহার মধ্যে যে কোন একধর্ম না থাকিলেও তাহা প্রকৃত হেতু হইবে না—ইহা স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি গৌতম উক্ত পঞ্চধর্মের এক একটি ধর্মের অভাব গ্রহণ করিয়া পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। তন্মধ্যে “বিপক্ষাসত্ত্ব” ধর্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (১) “সব্যভিচার” নামক হেত্বাভাস হয়। “সপক্ষসত্ত্ব” ধর্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (২) বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হয়। “অসংপ্রতিপক্ষিতত্ব” ধর্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (৩) “প্রকরণ সম” নামক হেত্বাভাস হয়। “পক্ষসত্ত্ব” ধর্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (৪) “সাধ্যসম” নামক হেত্বাভাস হয়। “অবাধিতত্ব” ধর্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (৫) “কালাতীত” নামক হেত্বাভাস হয়। ঐ সমস্ত পদার্থে—হেতুর কোন কোন ধর্ম থাকায় উহা হেতুর সদৃশ, তাই উহা হেতুর ত্রায় প্রতীয়মান হওয়ায় পূর্বোক্ত অর্থে “হেত্বাভাস” নামে কথিত হইয়াছে। “তार्কিক রক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজও বলিয়াছেন—

“হেতোঃ কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদ্বিতাঃ।

হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধা তে গৌতমেন প্রপঞ্চিতাঃ” ॥

মহর্ষি গৌতম পরে যথাক্রমে তাঁহার পূর্বোক্ত “সব্যভিচার” প্রভৃতি পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রকাশ করিতে পাঁচটি সূত্র বলিয়াছেন—

(১) “নৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ”।

(২) সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধীবিরুদ্ধঃ ॥

(৩) যন্মাৎ প্রকরণ-চিন্তা ন নির্ণয়ার্থ মপদিষ্টঃ প্রকরণ সমঃ।

(৪) সাধ্যাবিপিষ্টঃ সাধ্যায়াং সাধ্যসমঃ।

(৫) কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ ॥

সব্যভিচার

প্রথম স্তরের দ্বারা গৌতম বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ “অনৈকান্তিক” অর্থাৎ একতর পক্ষেই নিশ্চিত নহে, তাহা (১) “সব্যভিচার” নামক হেতুভাস। “অন্ত” শব্দের নিশ্চয় অর্থ গ্রহণ করিলে সাধ্যধর্ম বিশিষ্ট এবং সাধ্যধর্ম শূত্র, ইহার মধ্যে কোন এক স্থানেই যাহার অন্ত বা নিশ্চয় আছে, তাহাকে ঐ অর্থে “ঐকান্তিক” বলা যায়। সুতরাং উহার বিপরীত পদার্থই “অনৈকান্তিক”, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে যে পদার্থ সাধ্যধর্ম বিশিষ্ট স্থানেও থাকে এবং সাধ্যধর্ম শূত্র স্থানেও থাকে—এমন পদার্থই হেতুরূপে গৃহীত হইলে তাহাকেই বলে “অনৈকান্তিক, সুতরাং উহাই “সব্যভিচার” নামক হেতুভাস। যেমন শব্দের নিত্যত্বানুসারে মীমাংসক যদি স্পর্শ শূত্রকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া বলেন—“শব্দো-নিত্যঃ, অস্পর্শত্বাৎ” তাহা হইলে উক্তস্থলে ঐ স্পর্শশূত্র হেতু “সব্যভিচার”,—নামক হেতুভাস। কারণ, আস্রা প্রভৃতি অনেক নিত্যপদার্থে যেমন স্পর্শ শূত্র আছে, তদ্রূপ, রূপাদি অনেক অনিত্যপদার্থেও স্পর্শ শূত্র থাকায় উহা নিত্যত্ব ধর্মের ব্যভিচারী। উক্তস্থলে নিত্যত্ব শূত্র রূপাদি পদার্থই “বিপক্ষ”, সেই বিপক্ষে সত্তাই নিত্যত্বের ব্যভিচার। সুতরাং উক্তস্থলে স্পর্শশূত্র হেতু—ব্যভিচার সহিত বা ব্যভিচার বিশিষ্ট বলিয়া উহাকে “সব্যভিচার” বলা যায়। এইরূপ বহির্কে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ধূমের অনুমান স্থলে (“ধূমবান্ বহ্নেঃ”) বহ্নিও “সব্যভিচার” নামক হেতুভাস। কারণ ধূম বিশিষ্ট স্থানে (সপক্ষে) যেমন বহ্নি থাকে, তদ্রূপ ধূমশূন্য স্থানেও (বিপক্ষেও) বহ্নি থাকে। সুতরাং বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী পদার্থ। যে পদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যভিচার নিশ্চয় হয়, তাহাতে উহার ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। কারণ ব্যভিচারের অভাবই ফলতঃ ব্যাপ্তি। সুতরাং ব্যভিচার-নিশ্চয় ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের অভাবে পূর্বোক্ত রূপস্থলে অনুমিতি হইতে পারে না। পরন্তু উক্ত হেতুরূপ সাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্তু পূর্বোক্ত স্থলে শব্দ নিত্য কিনা? এবং পর্কত ধূম বিশিষ্ট কি না? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। সুতরাং ঐ রূপ ব্যভিচারী হেতু প্রকৃত হেতু নহে, উহা হেতুভাস, ইহা স্বীকার্য।

মহর্ষি গৌতমও পরে “ব্যভিচারাদ হেতুঃ” (৪।১।৫) এই সূত্রের দ্বারা উহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া হেতু-পদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যভিচারের অভাবই যে, ব্যাপ্তি, এবং সেই ব্যাপ্তিনিশ্চয় ব্যতীত যে অনুমিতি হইতে পারে না—ইহাও সূচনা করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন—“প্রসিদ্ধি পূর্বকত্বাদপদেশশ্চ” (৩।১।১৪)। উক্তসূত্রে কণাদ “প্রসিদ্ধি” শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তির স্মরণ বা সেই স্মরণ বিষয়ীভূত ব্যাপ্তিকেই প্রকাশ করিয়াছেন। “উপস্কার” টীকাকার শঙ্কর মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“প্রসিদ্ধিঃ স্মর্যমাণা ব্যাপ্তিঃ”। ফলকথা হেতু পদার্থের পূর্বোক্ত পঞ্চ ধর্মের মধ্যে বিপক্ষে অর্থাৎ সাধ্যধর্মগুণ বলিয়া নিশ্চিত স্থানে হেতুর অসত্তাই ব্যাপ্তি এবং সেই ব্যাপ্তি না থাকিলেই তাহাকে বলে “সব্যভিচার”।

“তार्কিকরক্ষা”কার বরদরাজ উক্ত “সব্যভিচার” নামক হেত্বাভাসকে “সাধারণ” ও “অসাধারণ” নামে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে হেতু পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষে থাকে, তাহা সাধারণ সব্যভিচার। পূর্বোক্ত (“শব্দোনিত্যঃ অম্পর্শত্বাৎ”, “পর্কতো ধূমবান্ বহ্নেঃ” ইত্যাদি) স্থলেই ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে। আর যে হেতু সপক্ষেও থাকে না, বিপক্ষেও থাকে না, কিন্তু কেবল পক্ষমাত্রেই থাকে, তাহা “অসাধারণ” নামে দ্বিতীয় প্রকার সব্যভিচার। *

* “তত্ত্ব-চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় “অনুপসংহারী” এই নামে তৃতীয় প্রকার সব্যভিচারও বলিয়াছেন। পরবর্তীকালে উক্ত “সাধারণ”, “অসাধারণ” ও “অনুপসংহারী” এই ত্রিবিধ সব্যভিচারের নানারূপ ব্যাখ্যাও হইয়াছে। গঙ্গেশ প্রভৃতির মতে “সর্বত্র প্রমেনঃ” এইরূপে সমস্ত পদার্থেই প্রমেনর ধর্মের অনুমান করিতে যে কোন হেতু গৃহীত হইবে, তাহাই “অনুপসংহারী” সব্যভিচার। কারণ, উক্তস্থলে সমস্ত পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ায় সপক্ষ বা বিপক্ষরূপ দৃষ্টান্তের অভাবে সেই হেতুতে প্রমেনরূপ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। ফলকথা, যেকোনই হউক, সমস্ত পদার্থই কোন অনুমানে পক্ষরূপে গৃহীত হইলে উক্তমতে সেখানে যে কোন হেতুই “অনুপসংহারী” হইবে। অনেক নব্য নৈয়ায়িকের মতে সমস্ত পদার্থে বর্তমান বাচ্য ও প্রমেনর প্রভৃতি কেবলমাত্র ধর্ম সাধ্যধর্মরূপে অথবা হেতুরূপে গৃহীত হইলে সেই স্থলীয় হেতু “অনুপসংহারী”। অনেকের মতে যে হেতু কেবল বিপক্ষ অর্থাৎ সাধ্যধর্মগুণ স্থানেই থাকে, তাহাই “সাধারণ” নামক প্রথম প্রকার সব্যভিচার; কিন্তু অনেকের মতেই উহা “বিরুদ্ধ” নামক পৃথক্ হেত্বাভাস। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

যেমন শব্দে নিত্যত্বের অনুমান করিতে শব্দরূপ পক্ষমাত্রস্থ অর্থাৎ শব্দের অসাধারণ ধর্ম শব্দত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উচ্ছিন্ন প্রকৃত হেতু হইবে না। কারণ, অনুমান দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপ কোন ধর্মের নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত শব্দ সপক্ষও নহে বিপক্ষও নহে, কিন্তু পক্ষ। উক্তস্থলে সপক্ষ আত্মাদি নিত্য পদার্থে যেমন শব্দত্ব নাই, তদ্রূপ, বিপক্ষ ঘটাদি অনিত্য পদার্থেও শব্দত্ব নাই। সুতরাং সপক্ষ বা বিপক্ষরূপ কোন পদার্থই উক্তস্থলে দৃষ্টান্ত সম্ভব না হওয়ায় দৃষ্টান্তের অভাবে ঐ শব্দত্বরূপ হেতুতে নিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মের কোন ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। পরন্তু শব্দে ঐ শব্দত্ব রূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মে। সুতরাং উক্তরূপ হেতুও “সব্যভিচার”। উক্তমতে গৌতমের উক্তসূত্রে “অনৈকান্তিক” শব্দের দ্বারা উক্তরূপ (“অসাধারণ”) হেতুও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎশ্রায়ন সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

(২) বিরুদ্ধ

গৌতম পরে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা “বিরুদ্ধ” নামক দ্বিতীয় প্রকার হেত্বাভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী বা ব্যাঘাতক কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা (২) “বিরুদ্ধ”। অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী কোন সিদ্ধান্তকে সাধ্য ধর্ম রূপে প্রকাশ করিয়া তাহার বিরোধী অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্মের অভাবের সাধক কোন পদার্থকে যদি হেতু বলেন, তাহা হইলে সেই হেতু হইবে “বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস।

যেমন শব্দের নিত্যত্ববাদী যীমাংসক “শব্দোনিত্যঃ”—এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া যদি ভ্রম বশতঃ হেতু বাক্য বলেন—“উৎপত্তি ধর্মকত্বাৎ”—তাহা হইলে তাহার গৃহীত হেতু হইবে—“বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস। কারণ, উৎপত্তি ধর্ম নিত্যত্বের বিরোধী, উহা নিত্যত্বকে বিশেষরূপে রুদ্ধ করে অর্থাৎ ব্যাহত করে। কারণ, যে যে পদার্থে উৎপত্তিমত্ব ধর্ম থাকে, তাহা অনিত্যই হয়, ইহা সর্বসম্মত। সুতরাং উৎপত্তিমত্ব ধর্মে অনিত্যত্বেরই ব্যাপ্তি থাকায়

উহা অনিত্যত্বেরই সাধক হয়। সুতরাং উক্তস্থলে বাদী শব্দে নিত্যত্ব সিদ্ধ করিতে যে হেতু বলিয়াছেন, তাহা উহার অভাবেরই অর্থাৎ অনিত্যত্বেরই সাধক হওয়ায় তাহা উক্তস্থলে কখনই হেতু হইতে পারে না। কারণ নিত্য বলিয়া নিশ্চিত আত্মাদি পদার্থই উক্ত স্থলে “সপক্ষ”। কিন্তু সেই সমস্ত পদার্থে উপস্থিত নহা থাকায় উহাতে “সপক্ষ সত্ত্ব” রূপ হেতু লক্ষণ নাই। সুতরাং সপক্ষ সত্ত্বের অভাব প্রযুক্ত উহা প্রকৃত হেতু নহে, উহা হেত্বাভাস।

ফলকথা যে পদার্থ কেবল পক্ষ ও বিপক্ষেই থাকে, সপক্ষে থাকে না, সেই পদার্থ সাধ্য ধর্মের অভাবেরই ব্যাপ্য পদার্থ হওয়ায় উহা “বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হইয়াছে। “তार्কিকরক্ষাকার” বরদরাজও বলিয়াছেন—“বিরুদ্ধঃ শ্রাদ্ বর্তমানো হেতুঃ পক্ষ বিপক্ষয়োঃ”। *

(৩) প্রকরণ সম (৪) আত্মত্যাগ

গৌতম পরে তৃতীয় সূত্রের দ্বারা “প্রকরণসম” নামক তৃতীয় প্রকার হেত্বাভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ প্রযুক্ত “প্রকরণ” বিষয়ে চিন্তা জন্মে অর্থাৎ বাদীর সাধ্য ধর্ম ও প্রতিবাদীর সাধ্য ধর্ম বিষয়ে সংশয় জন্মে, এমন পদার্থ যদি সেই সাধ্য ধর্মের নির্ণয়ের জ্ঞাত হেতুরূপে অপদিষ্ট বা প্রযুক্ত হয়—তাহা হইলে সেই পদার্থ হইবে (৩) “প্রকরণ সম” নামক হেত্বাভাস।

* প্রাচীন শ্রীমদাচার্য্য উদ্যোতকর গৌতমের উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের স্বরূপতাই বিরোধী অথবা যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের সাধ্য হই হয় না, তাহা “বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস। উক্ত রূপ তাৎপর্য্য না হইলে অনেক হেত্বাভাস আছে, যাহা গৌতমের সূত্রদ্বারা সংগৃহীত হয় না। উদ্যোতকর ইহা বলিয়া বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সাধনই হয় না তাহা বিরুদ্ধ, ইহা বলিলে সর্বপ্রকার হেত্বাভাসই “বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাসের অন্তর্গত হয়। তবে “সব্যভিচার” প্রভৃতি নামে পৃথক রূপে কথিত চতুর্বিধ হেত্বাভাসে যে সমস্ত বিশেষ ধর্ম আছে, তাহা গ্রহণ করিয়াই গৌতম পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। উদ্যোতকর হেত্বাভাসের ব্যাখ্যায় বহুপ্রকারে উহার যে সমস্ত অবাস্তব শব্দ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি বিভ্রত ও অতি দুর্বোধ। সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না।

যেমন বাদী নৈয়ায়িক বলিলেন—“শব্দোহনিত্যঃ, নিত্যধৰ্ম্মানুপলব্ধেঃ” । অর্থাৎ যেহেতু শব্দে নিত্য পদার্থের কোন ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না, অতএব শব্দ অনিত্য । প্রতিবাদী মীমাংসকও পরে তুল্যভাবে বলিলেন—“শব্দোহনিত্যঃ, অনিত্যধৰ্ম্মানুপলব্ধেঃ” । অর্থাৎ যেহেতু শব্দে অনিত্যপদার্থের কোন ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না,—অতএব শব্দ নিত্য ।

উক্তস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী যদি স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিতে অপরের হেতুর খণ্ডন করিতে না পারেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের উভয়ের উভয় হেতুই যদি সেখানে তুল্য বলশালী বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেখানে কাহারও হেতুই তাহার সাধ্য ধর্ম্মের সাধক হইতে পারে না । কারণ, বাদীর হেতুর দ্বারা তাহার সাধ্যধর্ম্মের অনুমিতি করিতে গেলে তখন প্রতিবাদীর হেতুর “পরামর্শ” বাদীর সাধ্যধর্ম্মের অভাবের অনুমিতির কারণ রূপে উপস্থিত হইয়া বাদীর সাধ্যধর্ম্মের অনুমিতির বাধা জন্মাইবে এবং তুল্যভাবে বাদীর হেতুর পরামর্শ উপস্থিত হইলে উহা প্রতিবাদীর সাধ্যধর্ম্মের অনুমিতির বাধা জন্মাইবে । সুতরাং সেখানে সেই হেতুদ্বয় “প্রকরণ” বিষয়ে চিন্তা অর্থাৎ সংশয়াত্মক জ্ঞানেরই প্রযোজক হওয়ায় উহা— “প্রকরণ সম” নামক হেত্বাভাস ।

বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ ও তাহার অভাবরূপ প্রতিপক্ষ নামক ধর্ম্মই উক্ত “প্রকরণ” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত । যেমন শব্দে অনিত্যত্ব ও তাহার অভাব নিত্যত্ব, এই উভয়ই উক্তস্থলে “প্রকরণ” । সেই প্রকরণ-সিদ্ধিতে বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতুই তুল্য বলিয়া গৃহীত হইলে ঐ তাৎপর্য্যে সেই উভয় হেতুই “প্রকরণসম” নামে কথিত হইয়াছে ।

পূর্ব্বোক্ত “সব্যভিচার” নামক হেত্বাভাস স্থলেও বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্য ধর্ম্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে মধ্যাহ্নগণের সংশয় জন্মে বটে, কিন্তু সেখানে বাদীর গৃহীত হেতুর তুল্যবল বিরোধী অত্ৰ হেতুর প্রয়োগ না হওয়ায় বাদীর সেই হেতুকে “প্রকরণসম” বলা যায় না ।

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি উক্ত “প্রকরণসম”কেই “সংপ্রতিপক্ষ” নামে উল্লেখ করিয়াছেন । পরবর্ত্তী গঙ্গেশ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ—প্রায়শঃ “সংপ্রতিপক্ষ” নামেই উহার উল্লেখ করিয়াছেন । কোন স্থলে উহা

“সংপ্রতিপক্ষিত” “সংপ্রতি সাধন” এবং “প্রতিপক্ষিত” নামেও কথিত হইয়াছে। ঐ প্রতিপক্ষ শব্দের অর্থ তুল্য বল বিরোধী। যে হেতুর তুল্যবল বিরোধী অপর হেতু সং অর্থাৎ বিद्यমান আছে এই অর্থে উক্তরূপ হেতুদ্বয়ই “সংপ্রতিপক্ষ” নামে কথিত হইয়াছে। অত্র কথা পরে ব্যক্ত হইবে।

গৌতম পরে চতুর্থ সূত্রের দ্বারা “সাধ্যসম” নামক চতুর্থ হেত্বাভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, “সাধ্যত্ব” বশতঃ অর্থাৎ অসিদ্ধত্ব বশতঃ যে পদার্থ “সাধ্যা-বিশিষ্ট”—অর্থাৎ সাধ্যধর্মের তুল্য, তাহা (৪) “সাধ্যসম”। তাৎপর্য্য এই যে সিদ্ধ পদার্থই হেতু হইতে পারে। যে পদার্থ সাধ্যধর্মের দ্বারা অসিদ্ধ বা বিবাদগ্রস্ত, তাহা কখনই সেই সাধ্য ধর্মের সাধক হইতে পারে না। সুতরাং কোন সাধ্যধর্মের সাধকরূপে গৃহীত হেতু পদার্থ যদি সেই সাধ্য ধর্মের দ্বারা অসিদ্ধ পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা—হেত্বাভাস, উহা সাধ্যধর্মের তুল্য বলিয়া উহার নাম “সাধ্যসম”।

যেমন ছায়া বা অন্ধকারের দ্রব্য সাধনের উদ্দেশ্যে মীমাংসক নৈয়ায়িকের নিকটে বলিলেন—“ছায়া দ্রব্যং গতিমত্বাৎ”। অর্থাৎ যেহেতু ছায়া গমন করে, তাহাতে গতিক্রিয়া আছে, অতএব উহা দ্রব্য পদার্থ। কিন্তু প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের মতে ছায়াতে গতিক্রিয়া বস্তুতঃ নাই। কোন ব্যক্তির গমনকালে তাহার শরীর উপরিস্থ আলোক বিশেষের আচ্ছাদক হওয়ায় ভূমিতে সেই আলোক বিশেষের অভাবই তখন দেখা যায় এবং উহারই নাম ছায়া। গমনকারী সেই ব্যক্তির গতিক্রিয়াই উহাতে আরোপিত হয়, অর্থাৎ ছায়াও গমন করিতেছে—এইরূপ ভ্রম জন্মে। বস্তুতঃ অভাব পদার্থরূপ ছায়া গমন করে না। সুতরাং বাদী মীমাংসকের কথিত গতিমত্ব হেতুতে উক্তস্থলে “পক্ষসম” রূপ হেতু লক্ষণ না থাকায় উহা “সাধ্যসম” নামক হেত্বাভাস।

ভাষ্যকারের পরে অনেক নৈয়ায়িক এবং ত্রায়ৈক দেশী ভাসরঞ্জ প্রভৃতি ও মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায় উক্ত “সাধ্যসম” নামক হেত্বাভাসকে “অসিদ্ধ” নামে উল্লেখ করিয়া উহার অনেকপ্রকার ভেদ ও তাহার অবাস্তব ভেদ বলিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্রমে উক্ত বিষয়ে সম্প্রদায় ভেদে নানামতের সৃষ্টি হইয়াছে। পরবর্ত্তী নব্য মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট ও “মানময়োদয়” গ্রন্থে হেত্বাভাসের ব্যাখ্যায় অনেক মতের বর্ণন করিয়াছেন। বাহ্য্য ভয়ে উক্ত

বিষয়ে সকল মতের প্রকাশ করা এখানে সম্ভব নহে। তবে কিছু কিছু বলিতে হইবে। প্রথমে প্রাচীন শ্রায়চার্য উদ্যোতকের কথাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

“শ্রায় বার্তিক” গ্রন্থে উদ্যোতক পূর্বোক্ত “সাধ্যসম” বা “অসিদ্ধ” নামক হেত্বাভাসকে “স্বরূপাসিদ্ধ”, “আশ্রয়াসিদ্ধ” ও অন্তথ্যাসিদ্ধ” নামে ত্রিবিধ বলিয়া পূর্বোক্ত স্থলেই তাহার উদাহরণ বক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, ছায়াতে গতিমন্ত বা গতিক্রিয়া স্বরূপতঃই অসিদ্ধ হইলে উহা (১) “স্বরূপাসিদ্ধ”। অর যদি বাদী মীমাংসক বলেন যে, ছায়া যখন একস্থানে দৃষ্ট হইয়া অন্তত্রও দৃষ্ট হয়, তখন তাহাতে গতি ক্রিয়া অবশ্য স্বীকার্য। কারণ একস্থানে দৃষ্ট পদার্থের যে অন্তত্ব দর্শন, উহা সেই পদার্থের গতিক্রিয়া ব্যতীত সম্ভব হয় না। কিন্তু ইহা বলিলেও ঐ হেতু (২) “আশ্রয়াসিদ্ধ”। কারণ ছায়াতে দ্রব্যস্ত সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মতে উহাতে স্থানান্তরে দর্শনরূপ হেতুও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দ্রব্যরূপ ছায়া সিদ্ধ না হওয়ায় তাহাকে আশ্রয় করিয়া কথিত যে স্থানান্তরে দর্শনরূপ হেতু, তাহা “আশ্রয়াসিদ্ধ”। পরন্তু আলোক বিশেষের অভাবকে ছায়া বলিলেও—তাহার স্থানান্তরে দর্শন হইতে পারে। কারণ—অভাবপদার্থ বিশেষের ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তথা অর্থ্যাং ছায়া দ্রব্য পদার্থ না হইলেও তাহার স্থানান্তরে দর্শন সিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতু (৩) “অন্তথ্যাসিদ্ধ”।

বস্তুতঃ পূর্বোক্ত স্থলে বাদী মীমাংসকের মতে ছায়াতে গতিমন্ত সিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের মতে যখন উহা অসিদ্ধ, তখন উহা হেতু হইতে পারে না। কারণ নৈয়ায়িকের মতে মীমাংসকের ঐ হেতু ও তাহার সাধ্যধর্মের তুল্য। মহর্ষি গৌতম “অসিদ্ধ” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া—“সাধ্যাবিশিষ্ট” শব্দের দ্বারা উহার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া ইহাই স্থচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ যে হেতু কেবল প্রতিবাদীর মতেও অসিদ্ধ, তাহাও “সাধ্যসম” নামক হেত্বাভাস।

প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য প্রশস্ত পাদ উক্তরূপ অসিদ্ধকে “অন্তত্বাসিদ্ধ” নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে হেতু বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অসিদ্ধ, তাহাকে “উভ্যাসিদ্ধ” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন শব্দে অনিত্যত্বের

অনুমান করিতে চাক্ষুষ প্রভৃতিকে হেতু বলিলে উহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই শব্দে অসিদ্ধ বলিয়া “উভয়াসিদ্ধ”।

বাচস্পতিমিশ্র “একদেশাসিদ্ধ” নামে আরও একপ্রকার অসিদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর প্রভৃতির মতে উহা পূর্বোক্ত “স্বরূপাসিদ্ধ”রই প্রকার বিশেষ। ভাসরীজ প্রভৃতি অনেকে উহাকে “ভাগাসিদ্ধ” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যেহেতু অনুমানের আশ্রয় বা পক্ষের কোন অংশে আছে এবং কোন অংশে নাই, তাহাই “একদেশাসিদ্ধ” বা “ভাগাসিদ্ধ”। নব্যনৈয়ায়িকগণও উহাকে “ভাগাসিদ্ধ” নামে স্বরূপাসিদ্ধই বলিয়াছেন এবং যেহেতু অনুমানের আশ্রয়ে উভয় মতেই সন্ধিদ্ধ, তাহাও “সন্ধিদ্ধা সিদ্ধ” নামে স্বরূপাসিদ্ধই বলিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্য “শ্রায়কুসুমাজলি” গ্রন্থে (৩৭) বিচার পূর্বক বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তপদার্থের যে পক্ষধর্মতা বোধ অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সেই পদার্থ অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয়ে আছে, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহার নাম “সিদ্ধি”। সেই সিদ্ধির অভাব অসিদ্ধি এবং উহা যথাক্রমে “অত্থাসিদ্ধি”, “আশ্রয়াসিদ্ধি” ও “স্বরূপাসিদ্ধি” নামে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে “আশ্রয়াসিদ্ধি” আবার দ্বিবিধ। অনুমানের আশ্রয় সেই পদার্থের স্বরূপের অসিদ্ধি প্রযুক্ত প্রথম প্রকার আশ্রয়াসিদ্ধি এবং সেই আশ্রয় পদার্থের পক্ষত্ব রূপ বিশেষণের অসিদ্ধি প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকার আশ্রয়াসিদ্ধি।

যেমন আকাশকুসুম প্রভৃতি অলীক পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে কোন ধর্মের অনুমান করিতে গেলে সেখানে সেই আশ্রয়ের স্বরূপই অসিদ্ধ বলিয়া যে কোন হেতুই প্রথম প্রকার আশ্রয়াসিদ্ধি। এবং যাহারা জগৎ কর্তা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারা ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া “ঈশ্বরো ন জগৎ কর্তা”—ইত্যাদি প্রকারে তাহাতে জগৎকর্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে গেলে সেখানে তাঁহাদিগের গৃহীত যে কোন হেতুও “আশ্রয়াসিদ্ধ”।

আর কেহ যদি কোন পদার্থে সিদ্ধ পদার্থেরই সাধনের জন্ত কোন হেতু বলেন, তাহা হইলে সেখানে উহা দ্বিতীয় প্রকার “আশ্রয়াসিদ্ধি”। কারণ অনুমানের আশ্রয়ে সাধ্যধর্ম সিদ্ধ পদার্থ হইলে সেই আশ্রয় পক্ষ হয় না, সন্ধিদ্ধ হইলেই পক্ষ হয়। প্রাচীনগণ সন্ধিদ্ধ সাধ্যবস্তুকেই পক্ষত্ব বলিয়াছেন। সুতরাং

উক্তরূপস্থলে (“সিদ্ধসাধন” স্থলে) অনুমানের সেই আশ্রয়রূপ পক্ষে পক্ষত্বরূপ বিশেষণ অসিদ্ধ বলিয়া সেই স্থলীয় হেতুও “আশ্রয়াসিদ্ধ”। কোন সম্ভদায় উক্তরূপ স্থলে “সিদ্ধ সাধন” নামে পৃথক্ হেত্বাভাস স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু উদয়নাচার্য্য পূর্বোক্ত কথা বলিয়া উক্তমতও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বোক্ত মতে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে পক্ষধর্ম অর্থাৎ অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষে বিত্তমান পদার্থ, তাহা সাধ্যধর্মের তুল্য অর্থাৎ অসিদ্ধ হইলে সেই স্থলীয় হেতুই “সাধ্যসম” নামক হেত্বাভাস, ইহাই গৌতমের উক্ত স্বত্রের তাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং হেতু পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি অসিদ্ধ হইলে অথবা অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষ অসিদ্ধ হইলে অথবা সেই পক্ষে সেই হেতুই স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হইলে “ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম” অসিদ্ধ হওয়ায় ঐ সমস্ত স্থলেই “সাধ্যসম” নামক হেত্বাভাস হইবে। তন্মধ্যে যেখানে গৃহীত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি অসিদ্ধ, সেই স্থলীয় হেতুই উদয়নাচার্য্যের মতে “অন্তথাসিদ্ধ”। প্রকাশ টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উদয়নোক্ত “অন্তথাসিদ্ধি”র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“অন্তথাসিদ্ধিঃ সোপাধিভাঃ”। অর্থাৎ যে হেতু সোপাধি, তাহাকে বলে, “অন্তথাসিদ্ধ”।

এখন উপাধি কাহাকে বলে, তাহা বুঝা অত্যাবশ্যক। অনুমান স্থলে যে পদার্থ সাধ্যধর্মের ব্যাপক ও ব্যাপ্য এবং হেতুপদার্থের অব্যাপক, তাহাই উদয়নের মতে মুখ্য উপাধি। আর যে পদার্থ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য না হইলেও ব্যাপক এবং হেতু পদার্থের অব্যাপক, তাহাও তুল্য যুক্তিতে উপাধি হয়। যেমন পর্ব্বতে ধূমের অনুমান করিতে বহ্নিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে (পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ) সেই স্থলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি। কারণ আর্দ্র ইন্ধনের সহিত বহ্নির সংযোগ ব্যতীত ধূম জন্মে না। সুতরাং যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই আর্দ্র ইন্ধন থাকায় উহা উক্তস্থলে সাধ্যধর্ম ধূমের ব্যাপক পদার্থ—এবং তপ্তলৌহপিণ্ডে বহ্নি থাকিলেও সেখানে আর্দ্র ইন্ধন না থাকায় উহা বহ্নিরূপ হেতুর অব্যাপক পদার্থ। সুতরাং শেযোক্ত লক্ষণানুসারে উক্ত স্থলে আর্দ্রইন্ধন উপাধি হওয়ায় বহ্নিরূপ হেতু সোপাধি হইয়াছে।

উক্ত উপাধি-পদার্থ সন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত ভেদে দ্বিবিধ। যে পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপকত্ব অথবা হেতু পদার্থের অব্যাপকত্ব অথবা ঐ উভয়ই সন্দিগ্ধ, তাহাকে

বলে সন্দিগ্ধ উপাধি। ইহারও অনেক উদাহরণ আছে। সন্দিগ্ধ উপাধি স্থলেও হেতু পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যভিচার সংশয় হওয়ায় সেই হেতু পদার্থের দ্বারা অনুমিতি হয় না। আর নিশ্চিত উপাধি স্থলে সেই উপাধি পদার্থের ব্যভিচারিৎস্ব হেতুর দ্বারা হেতু পদার্থে সেই সাধ্যধর্মের ব্যভিচারের অনুমিতি হওয়ায় ব্যভিচার নিশ্চয়রূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ তাহাতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব না হওয়ায় অনুমিতি হয় না।

যেমন পূর্বোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধন শূন্য তপ্তলৌহপিণ্ডে বহ্নি থাকায় বহ্নিহেতু আর্দ্র ইন্ধনের ব্যভিচারী পদার্থ, স্তূতরাং উহা সাধ্যধর্ম ধূমেরও ব্যভিচারী পদার্থ। কারণ যাহা ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচারী, তাহা তাহার ব্যাপ্য পদার্থের ও ব্যভিচারী হইয়া থাকে। স্তূতরাং উক্ত স্থলে (“বহ্নিধূমঃ ব্যভিচারী ঐর্দ্রেন্ধন-ব্যভিচারিৎস্বাৎ” এইরূপে) অনুমান প্রমাণ দ্বারা বহ্নি হেতুতে ধূমের ব্যভিচার নিশ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপ উপাধি পদার্থের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষে সাধ্যধর্মের অভাব নিশ্চয় হইলে উহা সেই অনুমিতিরই প্রতিবন্ধক হয়। স্তূতরাং অনুমান স্থলে উক্তরূপ উপাধি পদার্থ নানারূপেই হেতুর দুষক হইয়া থাকে। কিন্তু উহা কোন হেত্বাভাস নহে। কারণ উহা হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় না, উহাতে হেত্বাভাসের লক্ষণই নাই। শ্রায়শাস্ত্রের অনুমানকাণ্ডে উক্ত উপাধি পদার্থের লক্ষণাদি ও তৎসম্বন্ধে বিবিধ বিচার অতি বিস্তৃত ও দূরূহ। সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। *

মূলকথা উদয়নাচার্যের মতে—সোপাধি হেতুর নামই “অন্তথাসিদ্ধ” এবং উহা গৌতমোক্ত “সাধ্যাসম” বা “অসিদ্ধ” নামক হেত্বাভাসেরই প্রকার বিশেষ। কোন সম্প্রদায় উক্তরূপ উপাধি স্থলে “অপ্রযোজক” নামে পৃথক হেত্বাভাস স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কোন সম্প্রদায় সন্দিগ্ধ উপাধি স্থলে হেতুকে “সন্দিগ্ধা নৈকান্তিক” বলিয়াছিলেন। কিন্তু উদয়নাচার্য ঐ সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া নিজসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, যে স্থলে হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যভিচার-সংশয়ের নিবর্তক অমুকুল তর্ক নাই, সেই স্থলীয় হেতুকে বলে “অপ্রযোজক” এবং উহা “শঙ্কিতোপাধি” ও “নিশ্চিতোপাধি” নামে

* উপাধি পদার্থের লক্ষণ ও উদাহরণাদি ব্যাখ্যা সংস্পাদিত শ্রায়শাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

দ্বিবিধ। সুতরাং উহা পূর্বোক্ত “অসিদ্ধ”রই অন্তর্গত হওয়ায় পৃথক্ হেত্বাভাস নহে, উদয়নাচার্যের মতে উহার বিশেষ নাম “অন্তর্ভাসিদ্ধ”। এবং যে হেতু অনুমানের আশ্রয়ে স্বরূপতঃই অসিদ্ধ তাহাকে বলে “স্বরূপাসিদ্ধ”। পূর্বে ইহার উদাহরণ ও প্রকারভেদ বলিয়াছি। মতান্তরে “বিশেষণাসিদ্ধ” ও “বিশেষ্যাসিদ্ধ” প্রভৃতি নামে উহার আরও অনেক প্রকারভেদ কথিত হইয়াছে।

কিন্তু পরবর্তী কোন কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সোপাধি হেতুকে বলিয়াছেন—“ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ”। “তর্কসংগ্রহ”কার অন্নভট্ট ও তাহাই বলিয়াছেন। “তর্কভাষ্য”কার কেশবমিশ্রও বলিয়াছেন যে, “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ” দ্বিবিধ। ব্যাপ্তি নিশ্চায়ক প্রমাণের অভাব প্রযুক্ত এবং উপাধির সত্ত্বাপ্রযুক্ত। “তত্ত্ব-চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও “আশ্রয়াসিদ্ধি”, “স্বরূপাসিদ্ধি” ও “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি” নামে ত্রিবিধ অসিদ্ধি বলিয়া উক্ত অসিদ্ধিকে ত্রিবিধই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ বিশেষণাদি প্রয়োগস্থলেই “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি” দোষ বলিয়াছেন। যেমন পূর্বতে বহির অনুমান করিতে “নীলধূমাং” এইরূপে নীলধূমকে হেতু বলিলে তাহাতে নীলত্ব বিশেষণ ব্যর্থ বলিয়া ঐ হেতু “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ”। কারণ ধূমত্বরূপেই ধূমে বহির ব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ হয়, নীলধূমত্ব গুরুধর্ম বলিয়া উহা বহির ব্যাপ্যত্বাবচ্ছেদক না হওয়ার তজ্জপে ধূমে বহির ব্যাপ্তি নাই।

কিন্তু “দীপ্তি” টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি—উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত হেতু পদার্থে কোন ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ করিলে তজ্জপ সেই হেতুর কোন দোষ হইতে পারে না। কিন্তু দেখানে সেই ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগকারী বাদী বা প্রতিবাদীরই দোষ হইবে অর্থাৎ সেই ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে “নিগ্রহস্থান” হইবে (১)। ফলকথা,

(১) “বিশেষ ব্যাপ্তি দীপ্তি”র টীকার শেষভাগে রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মতের প্রকাশ করিতে জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন “অধিকৈব নিগ্রহস্থানেন পূর্বো নিগ্রহতে”। তদনুসারে আমি পূর্বে শ্রায়দর্শনের টিপ্পনীতে ব্যর্থবিশেষণ প্রয়োগস্থলে রঘুনাথ শিরোমণির মতে গৌতমোক্ত “অধিক” নামক নিগ্রহ স্থানই লিখিয়াছি। কিন্তু পরে দেখিয়াছি—“তত্ত্বচিন্তামণি”র “অসিদ্ধি” গ্রন্থের সর্বশেষে রঘুনাথ শিরোমণি উক্তস্থলে গৌতমের অন্তত পৃথক নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন। তিনি শ্রায়দর্শনের সর্বশেষস্থলে “চ” শব্দের অন্তত সমুচ্চয় অর্থগ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন—“চকারেণ সমুচ্চিতঃ পৃথগেব নিগ্রহস্থানঃ”।

রঘুনাথ শিরোমণির মতে ব্যর্থ বিশেষণ বিশিষ্ট হেতু “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ” নহে। কিন্তু সাধ্য ধর্ম বা হেতুপদার্থের বিশেষণ অসিদ্ধ হইলে সেই স্থলীয় হেতু “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ”। যেমন “পর্বতঃ স্তবর্ণময় বহ্নিমান্” এই রূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিলে সেখানে সাধ্যধর্ম বহ্নিতে স্তবর্ণময়ত্ব বিশেষণ অসিদ্ধ। এবং “স্বর্ণময় ধূমাৎ”—এই রূপ হেতু বাক্য বলিলে সেখানে হেতু পদার্থ ধূমে স্তবর্ণময়ত্ব বিশেষণ অসিদ্ধ। স্তত্রাং উক্তরূপ স্থলে হেতু পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় পূর্বক লিঙ্গ পরামর্শ সম্ভব না হওয়ায় উহা “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ” নামে তৃতীয় প্রকার-অসিদ্ধ”। এইরূপ আরও অনেক স্থলে ইহার উদাহরণ কথিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ও রঘুনাথ শিরোমণির মতানুসারে পূর্বোক্তরূপ স্থলেই ব্যাপ্যত্ব সিদ্ধির উদাহরণ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্বে “ভাষা পরিচ্ছেদে” গঙ্গেশের মতানুসারেই লিখিয়াছেন—“ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির পরা নীল শূমাди কে ভবেৎ”।

(৫) কালাতীত

মহর্ষি গৌতম শেষে তাহার কথিত প্রথম হেত্বাভাসের লক্ষণ সূত্র বলিয়াছেন—“কালাত্যাগপদিষ্টঃ কালাতীতঃ”। ভাষ্যকার বাৎসায়ন ইহার অন্তরূপ অর্থ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন করিলেও “তাৎপর্যাটীকা” কার বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারেরও ইহাই নিজমত বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেহেতু অনুমানের কালাত্যাগে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত) হয়, তাহাকে বলে “কালাতীত”। তাৎপর্য্য এই যে, যে কাল পর্য্যন্ত অনুমানের আশ্রয় বা ধর্ম্মীতে অনুমেয় ধর্ম্মের সংশয় থাকে অথবা বলবৎ প্রমাণের দ্বারা তাহার অভাব নিশ্চয় না হয়, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহাতে সেই ধর্ম্মের অনুমানের জন্য হেতুর প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু যে স্থলে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সেই ধর্ম্মীতে সেই অনুমেয় ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় জন্মিয়ছে, সেই স্থলে তাহাতে কোন হেতুর দ্বারাই সেই ধর্ম্মের অনুমিতি হইতে পারে না, সেই বিষয়ে তখন সংশয় ও জন্মিতে পারে না। কারণ তাহাতে সেই ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় তদ্বিষয়ে সংশয় ও অনুমিতির বিরোধী হয়। স্তত্রাং তখন তাহাতে সেই ধর্ম্মের সংশয় ও অনুমিতিরকাল অতীত

হওয়ার উহার অনুমানের ক্ষমতা যে কোন হেতু প্রযুক্ত হইবে—তাহাই কালাতীতে প্রযুক্ত বলিয়া “কালাতীত” নামক হেত্বাভাস। উহা “অতীত কাল” এবং “কালাত্যাগপরিহীত” নামেও কথিত হইয়াছে।

যেমন বহিতে উষ্ণতা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং তাহাতে কোন হেতুর দ্বারাই অনুক্ষণের অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ উক্ত স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বহিতে অনুক্ষণরূপ অনুমেয় ধর্মের অভাব নিশ্চয় হওয়ায় সেই বিষয়ে সংশয় ও অনুমিতির কালই নাই। অতএব “বহিরনুক্ষণঃ”—এইরূপে বহিতে অনুক্ষণের অনুমানে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই “কালাতীত” নামক হেত্বাভাস। এইরূপ “যাগো ন স্বর্গ সাধনং”—এইরূপে বেদ বিহিত স্বর্গকনক যাগে স্বর্গ সাধনত্বাভাবের অনুমান করিতে প্রযুক্ত যে কোন হেতু ও “কালাতীত” নামক হেত্বাভাস। কারণ যাগের সর্গসাধনত্ব বলবৎ প্রমাণ বেদবাক্যের দ্বারা পূর্বসিদ্ধ হওয়ায় তাহাতে উহার অভাবের অনুমানের কালই নাই। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ আছে।

ফল কথা যে কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষে অনুমেয় ধর্মের বাধ নিশ্চয় হইলে সেই স্থলীয় হেতুই “কালাতীত”। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ এইরূপ হেতুকেই “বাধিত” নামে এবং “বাধিত সাধ্যক” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। “তार्কিকরক্ষা” কার বরদরাজও বলিয়াছেন—“কালাতীতো বলবতা প্রমাণেন প্রবাধিতঃ”।

হেত্বাভাসের প্রকারভেদে মতভেদ

বৈশেষিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদের মতে হেত্বাভাস ত্রিবিধ। তিনি পৌত্তমোক্ত “প্রকরণসম” ও “কালাতীত” হেতুকে হেত্বাভাস বলেন নাই। যদিও যোগেশ্বরিবাচার্য্য কণাদের মতেও উক্ত হেত্বাভাসদ্বয় গ্রহণ করিয়া পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই বলিয়াছেন, কিন্তু কণাদের মতে যে, হেত্বাভাস ত্রিবিধ, ইহাই তাঁহার স্বত্বের দ্বারা সরলভাবে স্পষ্ট বুঝা যায় (১) এবং উহাই সুপ্রসিদ্ধ আছে।

(১) মহর্ষি কণাদ অনুমানের হেতুকে “অপদেশ” নামে উল্লেখ করিয়া পরেই বলিয়াছেন—“অপ্রসিদ্ধোহস্মৈ সন্দিক্তান পদেশঃ” (৩।১।১৫)। “অনপদেশ” অর্থাৎ অহেতু বা হেত্বাভাস।

কণাদের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, কোন স্থলে কোন হেতুর তুল্য মূলবিরোধী অপর হেতু সেই সাধা ধর্মের অভাবের সাধকরূপে উপস্থিত হইলে সেখানে কোনও পক্ষেরই অনুমিতি হইবে না, ইহা সত্য, কিন্তু যদি সেই হেতুদ্বয়ে “পক্ষ সত্ত্ব”, “সপক্ষ সত্ত্ব” ও “বিপক্ষা সত্ত্ব” এই ধর্মত্রয় থাকে, তাহা হইলে উহা হেতু লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় হেত্বাভাস কহিতে পারে না। এবং অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষে কোন বলবৎ প্রমাণ দ্বারা অনুমেয় ধর্মের অভাব নিশ্চয় স্থলে সেই বাধ নিশ্চয়রূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ অনুমিতি না হইলেও সেই স্থলীয় হেতুতে যদি পূর্বোক্ত ধর্মত্রয়রূপ হেতু লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও হেত্বাভাস বলা যায় না। অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলদ্বয়ে হেতুতে যথাক্রমে অসৎ প্রতিপক্ষত্ব ও অবাধিতত্ত্ব না থাকিলেও উহা হেতুর দোষ বলা যায় না। সুতরাং “অসৎ প্রতিপক্ষত্ব” ও “অবাধিতত্ত্ব”, হেতুর লক্ষণের মধ্যে গ্রহণ কর যায় না। পূর্বোক্ত ধর্মত্রয়ই হেতুর লক্ষণ। অর্থাৎ উক্ত ত্রিলক্ষণ বিশিষ্ট পদার্থই প্রকৃত হেতু এবং উহার মধ্যে এক বা দুই ধর্মের অভাব থাকিলে তাহা হেত্বাভাস। সুতরাং হেত্বাভাস ত্রিবিধ। *

ত্রিবিধ, “অশ্লিসিদ্ধ” (বিরুদ্ধ), “অসন্” (অসিদ্ধ), “সন্দিগ্ধ” (সব্যভিচার)। কিন্তু যোমশিবাচার্য্য নিজমত রক্ষার জন্ত বলিয়াছেন—যে, কণাদের উক্ত হুত্রে “চ” শব্দের অর্থ অনুক্ত সমুচ্চয়। সুতরাং উহার দ্বারা কণাদের অনুক্ত “প্রকরণসম” ও কালাতীত” নামক হেত্বাভাসরয় ও তাহার সম্মত বুঝা যায়। “উপস্থার” টীকায় শঙ্করমিশ্র বৃত্তিকারের মত বলিয়া যোমশিবাচার্য্যের উক্ত মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ প্রশস্ত পাদ কণাদের সম্মত হেতুও হেত্বাভাসের লক্ষণ বোধক যে দুইটি নোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্বারা কণাদের মতে পূর্বোক্ত “পক্ষসত্ত্ব” প্রভৃতি ধর্মত্রয়ই যে হেতুর লক্ষণ এবং হেত্বাভাস পূর্বোক্ত তিন প্রকার,—ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রশস্ত পাদ নিজেও উহার ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু তাহার উদ্ধৃত দ্বিতীয় নোকের পরোক্ষ স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—“বিরুদ্ধাসিদ্ধ সন্ধিদ্ধ মলিঙ্গঃ কণ্ঠপোহব্রবীৎ”। অর্থাৎ কণ্ঠপের পুত্র কণাদ “বিরুদ্ধ”, “অসিদ্ধ” ও “সন্দিগ্ধ” (সব্যভিচার) এই ত্রিবিধ “অলিঙ্গ” (অহেতু বা হেত্বাভাস) বলিয়াছেন। যোমশিবাচার্য্য নিজমত রক্ষার জন্ত অধ্যাহার ও কষ্ট কল্পনা করিয়া ঐ সমস্ত স্থলে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা যায় না। “যোমবতী বৃত্তি” “কাশীচৌখাষা সংকৃত সিরীঙ্গ” ৫৬৫-৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* “চরকসংহিতার” বিধান স্থানেও (অষ্টম অঃ) “প্রকরণসম,” “সংশয়সম” ও “বর্ণসম” নামে ত্রিবিধ অহেতু (হেত্বাভাস) কথিত হইয়াছে। কিন্তু চরক সর্বসম্মত “বিরুদ্ধকে

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বিজ্ঞান বাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও অনুমানের হেতুকে ত্রিলক্ষণ বলিয়া হেত্বাভাস ত্রিবিধই বলিয়াছেন। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন—“ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্ যদনুমেয়েজ্ঞানং তদনুমানং”। “শ্রায়-বিন্দু” গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তি স্পষ্ট বলিয়াছেন—“অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকান্ত্রয়ো হেত্বাভাসাঃ”। প্রাচীন অলঙ্কারিক ভামহও “কাব্যালঙ্কার” গ্রন্থে বলিয়াছেন—“হেতু ত্রিলক্ষণো জ্ঞেয়ো হেত্বাভাসোবিপর্যায়ঃ”। সুতরাং তাঁহার মতেও পূর্বোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বই হেতুর লক্ষণ এবং তাহার এক একটি ধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত হেত্বাভাস ত্রিবিধ। খেতাব্বর জৈন সম্প্রদায়ও “অসিদ্ধ,” “বিরুদ্ধ” ও “অনৈকান্তিক”—এই ত্রিবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন (১)। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় “অকিঞ্চিংকর” নামে আরও এক প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করিয়া হেত্বাভাস চতুর্বিধ বলিয়াছেন (২)।

মীমাংসার্চাধ্যা গুরু প্রভাকরও গৌতমোক্ত “প্রকরণসম” ও “কালাতীত” নামক হেত্বাভাস স্বীকার করেন নাই। পরন্তু তাঁহার মতে কোনদলে তুল্য বলবিরোধী হেতুদ্বয় সম্ভবই হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সেখানে সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে কোন দিনই সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং “সংপ্রতিপক্ষ” নামে কোন হেত্বাভাসের উদাহরণ সম্ভব না হওয়ায় উহা স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ভট্ট কুমারিলের মতের ব্যাখ্যা তা পার্থসারথি মিশ্র “শাস্ত্র দীপিকা”র ভূর্কপাদে প্রভাকরের যুক্তি খণ্ডন করিয়া “সংপ্রতি পক্ষ” হেত্বাভাস ও সমর্থন করিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে উহা অনৈকান্তিকেরই দ্বিতীয় প্রকার, অতিরিক্ত

অহেতু কেন বলেন নাই। তাহা বুঝা যায় না। পরন্তু চরক “প্রকরণসম”র যে অশ্লীল উদাহরণ বলিয়াছেন, তদ্বারা গৌতমোক্ত “প্রকরণসম”ই যে তাঁহার সম্মত, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু তথাপি টীকাকার গঙ্গাধরও সেখানে উহার ব্যাখ্যা করিতে গৌতমোক্ত “প্রকরণ সম”র লক্ষণ সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। গৌতমোক্ত সমাভিচার ও সাধ্যসমকেই চরক যথাক্রমে “সংশয় সম” ও “বর্ধ্যসম” নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

(১) “অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকা জ্ঞেয়োহেত্বাভাসাঃ”। জৈন বাদিদেব নৃসিংহ “প্রমাণনর ভাষ্যলোকালঙ্কার” — ৪৩পঃ ৩৭। “হেত্বাভাসা অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকা কিঞ্চিংকরাঃ”। পরীক্ষা সুবহুত।

কোন হেত্বাভাস নহে। পার্থসারথি মিশ্র বলিয়াছেন যে, “সব্যভিচার” হেত্বাভাস স্থলে যেমন সাধ্যধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে সংশয় জন্মে, তদ্রূপ “সংপ্রতিপক্ষ” অর্থাৎ তুল্যবল বিরোধী হেতুদ্বয় স্থলেও সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে সংশয় জন্মে। সুতরাং “অনৈকান্তিক” নামক হেত্বাভাসই সব্যভিচার ও “সংপ্রতিপক্ষ” (সংপ্রতিপক্ষ) নামে দ্বিবিধ। ফলকথা, উক্ত মতেও সামান্যতঃ হেত্বাভাস ত্রিবিধ। সংপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়ও “অনৈকান্তিক” হেত্বাভাস।

তাহা হইলে সংপ্রতিপক্ষ স্থলে উভয় হেতুর তুল্য বলত্ব কিরূপে সম্ভব হইবে? কোন হেতুর দুর্বলত্ব নিশ্চয় না হইলে ত তৎপ্রযুক্ত সেই সাধ্যধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়ের নবৃত্তি হইতে পারে না। এতদ্বত্তরে পার্থসারথি মিশ্র বলিয়াছেন যে, যে কাল পর্য্যন্ত উভয় হেতুর মধ্যে কোন হেতুর দুর্বলত্ব নিশ্চয় না হয়, সেই কাল পর্য্যন্তই সেখানে সেই হেতুদ্বয়ের তুল্য বলত্ব ও সংপ্রতিপক্ষত্ব। অর্থাৎ সংপ্রতিপক্ষ স্থলে অনিশ্চিত বলাবলত্বই হেতুদ্বয়ের তুল্যবলত্ব।

প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও ঐরূপ বলিয়া হেতুদ্বয়ের সংপ্রতিপক্ষত্ব দোষকে অনিত্য দোষ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ দোষ সাময়িক, যে সময়ে কোন হেতুর দুর্বলত্ব নিশ্চয় হইবে তখন আর ঐ দোষ থাকিবে না, তখন সেখানে অপর হেতুর বলবত্তা নিশ্চয় হওয়ায় তদ্বারাই অনুমিতি হইবে, তখন সেই হেতুর দৃষ্ট হ থাকিবে না। অবশ্য পরে অনেক নব্য নৈয়ায়িক উক্তমত স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে বাধদোষের দ্বারা তুল্যভাবে সংপ্রতিপক্ষত্ব ও নিত্যদোষ। বাহ্য ভয়ে উক্তবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

মহর্ষি গৌতমের অভিপ্রায় এই যে, যথোক্ত “প্রকরণসম” ও “কালাতীত” হেতুর দ্বারা যখন সাধ্য ধর্ম্মের যথার্থ অনুমিতি হয় না, তখন সেট স্থলীয় কোন হেতুকেও প্রকৃত হেতু বলা যায় না। অতএব “অসংপ্রতিপক্ষত্ব” এবং “অবাসিতত্ব” এই ধর্ম্মদ্বয়কেও হেতুর লক্ষণ বলিতে হইবে। ফলকথা, গৌতমের মতে “হেত্বাভাস” শব্দের অন্তর্গত “হেতু” শব্দের অর্থ যথার্থ অনুমিতির প্রযোজক হেতু। তাই তিনি উক্ত যুক্তি অনুসারে পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই বলিয়াছেন। “সব্যভিচার” হইতে, প্রকরণ সমের স্পষ্ট ভেদ পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শৈবাচার্য্য ভাস্করজ্ঞ “শ্রায়স র” গ্রন্থে “অনধ্যবসিত” নামে ষষ্ঠ আর এক প্রকার হেত্বাভাস বলিয়াছেন। “তार्কিক রক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজও কোন সম্প্রদায়ের মত বলিয়া উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতমের মতে উহা প্রথমোক্ত সবাভিচারেরই অন্তর্গত। কারণ, যে হেতু সপক্ষ ও বিপক্ষে থাকে না, কেবল পক্ষ মাত্রেই থাকে, তাহা “অসাধারণ” নামে দ্বিতীয় প্রকার সবাভিচার। যেমন “শকো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ”—এই স্থলে শব্দই হেতু। “পূর্বে ইহা বলিয়াছি।

প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান জ্ঞাত “অনধ্যবসায়” নামক পৃথক্ জ্ঞান স্বীকার করায় তিনি উক্তরূপ স্থলে “অনধ্যবসিত” নামে হেত্বাভাসের উল্লেখ করিলেও তাঁহার মতেও উহা অতিরিক্ত কোন হেত্বাভাস নহে। “শ্রায়কন্দলী”কার শ্রীধরভট্টও সেখানে বলিয়াছেন যে, কণাদের স্থলে “অপ্রসিদ্ধ” শব্দের দ্বারা “বিরুদ্ধ” ও “অসাধারণ” হেত্বাভাস সংগৃহীত হইয়াছে। প্রশস্তপাদ সেই “অসাধারণ”কেই “অনধ্যবসিত” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, প্রশস্তপাদ যে হেত্বাভাস কে ত্রিবিধই বলিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার কথা পূর্বে বলিয়াছি।

পরন্তু ভাস্করজ্ঞ “অনধ্যবসিত” নামে যে ষষ্ঠ হেত্বাভাসের অনেক প্রকার ভেদ ও তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন, সেই সমস্ত স্থলেই গৌতমোক্ত কোন হেত্বাভাস সম্ভব হওয়ার ষষ্ঠ হেত্বাভাস স্বীকার করা অনাবশ্যক। অবশ্য গৌতমের মতেও একই হেত্বাভাস বা দুই হেতু অল্পপ্রকার হেত্বাভাসও হয়। কারণ, একই স্থলে একই দুই হেতুতে ব্যভিচারাদি অনেক দোষও থাকিতে পারে। কিন্তু সেই ব্যভিচারাদি দোষগুলি পরস্পর ভিন্ন বলিয়া সেই পঞ্চবিধ দোষ গ্রহণ করিয়াই গৌতম পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি সেই পঞ্চবিধ দোষকেই হেত্বাভাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, মূলকথা, গৌতমের মতে হেত্বাভাস পঞ্চবিধই। কোন সম্প্রদায় যে “অপ্রযোজক” নামে এবং “সিদ্ধসাধন” নামে পৃথক্ হেত্বাভাস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা গৌতমোক্ত “সাধ্যসম” বা “অসিদ্ধের”ই অন্তর্গত। অনেকের মতে সিদ্ধ সাধন” স্থলে হেতুতে ব্যভিচারাদি অল্প কোন দোষ না থাকিলে তাহা হেত্বাভাসই নহে। এ বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

গৌতমের মতানুসারে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ “কালাতীত” নামক হেত্বাভাস স্থলে হেতুর ছষ্টত্বই সমর্থন করিয়া সেই দোষের নাম বলিয়াছেন “বাধ” এবং সেই বাধদোষ বিশিষ্ট এই অর্থে উক্ত হেতুকে বলিয়াছেন “বাধিত”। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্ত “বাধ” দোষকে দশবিধ বলিয়া প্রত্যক্ষ-বাধিত, অনুমান-বাধিত, উপমান-বাধিত এবং শব্দ প্রমাণ বা শাস্ত্র-বাধিত স্থলে উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ জৈন ও মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায় উক্তরূপ স্থলে হেতুর দোষ অস্বীকার করায় “পক্ষাভাস” বা “প্রতিজ্ঞাভাস” নামে পৃথক্ দোষ বলিয়াছেন এবং তাহার নানাপ্রকার “প্রতিজ্ঞাভাস” বলিয়া তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

যেমন “বহ্নিরনুষ্ণঃ, দ্রব্যত্যাৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া দ্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা বহ্নিতে অনুষ্ণত্বের অনুমান করিতে গেলে সেখানে “বহ্নিরনুষ্ণঃ,” এই বাক্য প্রতিজ্ঞাই হইবে না—কিন্তু উহা তখন প্রতিজ্ঞার স্থায় প্রতীয়মান হওয়ায় উহার নাম “প্রতিজ্ঞাভাস” এবং উহারই নাম “পক্ষাভাস”। পূর্বোক্ত স্থলে উহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণ বিরুদ্ধ এবং “স্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ”, “স্ববচন বিরুদ্ধ” প্রভৃতি নামেও নানাপ্রকার প্রতিজ্ঞাভাস ও তাহার উদাহরণ কথিত হইয়াছে। এবং উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্য ধর্ম বা হেতু পদার্থ না থাকিলে সেখানে তাহাকে বলে “উদাহরণাভাস” বা “দৃষ্টান্তাভাস”। উক্তমতে উহাও পৃথক দোষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত “প্রতিজ্ঞাভাসা”দিস্থলেও সর্বত্র হেতুর দোষ স্বীকার করায় তিনি পৃথক্ করিয়া প্রতিজ্ঞাভাসাদি বলেন নাই, কেবল হেত্বাভাসই বলিয়াছেন। কারণ ঐ সমস্ত স্থলেও কোন হেত্বাভাস অবশ্যই থাকিবে। “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—

“অতএব হি শাস্ত্রেহস্মিন্ মুনির্নাতত্ব-দর্শিনা।

পক্ষাভাসাদয়োনোক্তা হেত্বাভাসাস্ত দর্শিতাঃ” ॥

(১২) ছল

পূর্বোক্ত “জল” ও “বিতণ্ডা” নামক কথাস্থলে প্রতিবাদী কোন সময়ে সহস্তর করিতে অসমর্থ হইলে পরজয় ভয়ে নীরব না থাকিয়া বহু প্রকার অসহস্তর করিতে পারেন এবং চিরকালই অনেকে তাহা করিতেছেন—ইহা সত্য। মহর্ষি গৌতম সেই সত্যকে গ্রহণ করিয়াই সেই সমস্ত অসহস্তরকে “ছল” ও “জাতি” নামে দুইটি পদার্থ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যেস্থলে প্রতিবাদী বাদীর বিবক্ষিত অর্থ হইতে ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণ করিয়া কোন দোষোদ্ভাবন করেন, সেইস্থলে প্রতিবাদীর সেই অসহস্তরের নাম “ছল”। গৌতম সেই ছলকে বলিয়াছেন,—ত্রিবিধ। “তৎ ত্রিবিধং বাক্ ছলং সামান্য, ছলমুপচার ছলঞ্চ” ॥১২।১১॥*

বাদী নির্বিশেষে কোন বাক্য বলিলে তাহার বিবক্ষিত অর্থ হইতে ভিন্ন কোন অর্থ বিশেষের কল্পনা করিয়া প্রতিবাদী যদি কোন দোষোদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে (১) “বাক্‌ছল”।

যেমন কোন বাদী কোন ব্যক্তির শরীরে নেপাল দেশীয় নূতন কঞ্চল দেখিয়া বলিলেন—“নেপালাদাগতোঃ নবকঞ্চলবস্ত্রাৎ”। উক্ত বাক্যে বাদী নূতন কঞ্চল অর্থেই “নবকঞ্চল” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত বাক্যে “নবন্” শব্দ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কৈ? ইহার শরীরে ত নয়খানা কঞ্চল নাই। উক্ত স্থলে উক্ত বাক্যের দ্বারা বাদীর হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম “বাক্‌ছল”।

যে স্থলে যে অর্থ সম্ভব, সেখানে তাহার অতি সামান্য ধর্ম বা ক্রিয়ং সাদৃশ্য বিশেষের সম্বন্ধ প্রযুক্ত প্রতিবাদী যদি কোন অসম্ভব অর্থের

* “চরক সংহিতা”র বিমানস্থানে “বাক্‌ছল” ও “সামান্যছল” এই দ্বিবিধ “ছল” কথিত হইয়াছে। হুতরাং বৃথা যায়, চরকের “মতে উপচার ছল” বাক্‌ছলেরই প্রকার বিশেষ। কিন্তু মহর্ষি গৌতম পরে পূর্বপক্ষরূপে উক্ত মত সমর্থন করিয়া বাক্‌ছল ও উপচার ছলের ভেদ প্রদর্শন দ্বারা উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। হুতরাং চরকোক্ত ঐ মত যে তাহার পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা বৃথা যায়। চরকের পরে স্মার্যদর্শনে গৌতম উক্ত মতের খণ্ডন করিলে তিনি বিমান স্থানে চরকোক্ত অন্তান্ত মত বিশেষেরও খণ্ডন করিতেন।

কল্পনা করিয়া কোন দোষোদ্ভাবন করেন,—তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম (২) “সামান্যছল”।

যেমন কোন বাদী বলিলেন—“সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণ সম্পৎ” অর্থাৎ, বিদ্যাচরণ সম্পন্নতা ব্রাহ্মণে সম্ভব। পরে প্রতিবাদী উহার প্রতিবাদ করিতে বলিলেন যে, যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে শিত্ত ও ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ সম্ভবও বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হউক? তাহারও ত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব জাতিতে বিদ্যাচরণ সম্পন্নতার ব্যভিচার রূপ দোষোদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু উক্তস্থলে পূর্বোক্ত বাক্যে ব্রাহ্মণ জাতির উক্ত রূপে প্রশংসা করাই বাদীর উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণ সম্পন্নতার সাধক হেতু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মাত্রই বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, ইহা বাদীর বিবক্ষিত অর্থ নহে। কারণ তাহা অসম্ভব। কিন্তু প্রতিবাদী সেই অসম্ভব অর্থের কল্পনা করায় তাঁহার উক্ত উত্তর ঐ স্থলে “সামান্য ছল”।

বাদী মুখ্য বা গৌণ অর্থে কোন শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি তদ্ভিন্ন গৌণ বা মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষোদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে (৩) “উপচারছল”।

যেমন কোন বাদী বলিলেন—“মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি”। “মঞ্চ” শব্দের মুখ্য অর্থ আসন বিশেষ। কিন্তু সেই মঞ্চস্থ পুরুষ উহার লাক্ষণিক অর্থ। মঞ্চস্থিত পুরুষগণ সকলেই এক সঙ্গে রোদন করিতেছে, এই তাৎপর্য্যেই বাদী বলিয়াছেন—“মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি”। কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াই বলিলেন—মঞ্চ কখনই রোদন করিতে পারে না, উহা অসম্ভব। উক্ত স্থলে বাদী “মঞ্চ” শব্দের পূর্বোক্ত লাক্ষণিক অর্থে প্রয়োগ করিলেও এবং ঐরূপ প্রয়োগ প্রসিদ্ধ হইলেও, প্রতিবাদী উহার মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া মঞ্চ রোদন কর্তৃত্বের প্রতিষেধ করার উহার নাম “উপচার ছল”।

মহর্ষি গৌতম পরে পূর্বোক্ত “বাক্ছল” হইতে শেষোক্ত “উপচার ছলে”র ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বাক্ছলে প্রতিবাদী বাদীর কোন বাক্যের অর্থান্তর কল্পনাই করেন। আর “উপচার ছলে” পদার্থের সত্তারই প্রতিষেধ করেন। যেমন “মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি”, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী মঞ্চ রোদন কর্তৃত্বের সত্তারই প্রতিষেধ করিয়া উক্তরূপ ছল

করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত “নবকঞ্চল বন্ধাৎ” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী সেই ব্যক্তিতে কঞ্চলের সত্তার প্রতিবেদ করেন না, কিন্তু ঐ বাক্যের অর্থান্তর করিয়া করিয়াই পূর্বোক্ত রূপ চল করেন। উক্তরূপ চলের নামই “বাক্‌ছল,” উহা হইতে শেযোক্ত উপচার চলের বিশেষ আছে। মহর্ষি গৌতম সেই বিশেষ গ্রহণ করিয়াই চলকে ত্রিবিধ বলিয়া পরে বিচার পূর্বক উক্তমত সমর্থন করিয়াছেন। বাদীর অভিপ্রেত অর্থের দৃষক না হওয়ায় পূর্বোক্ত ত্রিবিধ চলই অসহৃতর।

(১০) জাতি

“জাতি” শব্দের অনেক অর্থ আছে। কিন্তু গৌতমের প্রথম সূত্রোক্ত পঞ্চদশ পদার্থ যে “জাতি,” তাহা পূর্বোক্ত “ছলে”র শ্রায় অসহৃতর বিশেষ। পূর্বোক্ত “জল” ও “বিতণ্ডা”য় প্রতিবাদীর যে উত্তর স্বব্যবহৃতক, অর্থাৎ তুল্যভাবে নিজেরই ব্যাবহৃতক হয়, সেই উত্তরের নাম “জাতি” বা জাত্যুত্তর। উক্তরূপ অর্থেই ঐ “জাতি” শব্দটি পারিভাষিক। মহর্ষি গৌতম সামান্যতঃ ঐ জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন,—“সাধর্ম্য বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ” (১২/১৮) অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য দ্বারা যে “প্রত্যবস্থান” অর্থাৎ দোষোদ্ভাবন, তাহাকে বলে “জাতি”।

গৌতম পরে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে উক্ত জাতিকে চতুর্বিংশতি প্রকারে বিভক্ত করিয়া ক্রমে উহার লক্ষণ বলিয়াছেন এবং ঐ সমস্ত জাতি অসহৃতর কেন, তাহাও বলিয়াছেন। গৌতমোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতি যথা—

(১) “সাধর্ম্যসমা”, (২) “বৈধর্ম্যসমা”, (৩) “উৎকর্ষসমা”, (৪) “অপকর্ষসমা”, (৫) “বর্গ্যসমা”, (৬) “অবর্গ্যসমা”, (৭) “বিকল্পসমা”, (৮) “সাধ্যসমা”, (৯) “প্রাপ্তিসমা”, (১০) “অপ্রাপ্তিসমা”, (১১) “প্রসঙ্গসমা”, (১২) “প্রতিদৃষ্টান্তসমা” (১৩) “অনুপপত্তিসমা”, (১৪) “সংশয়সমা” (১৫) “প্রকরণসমা”, (১৬) “অহেতুসমা” (১৭) “অর্থাপত্তিসমা”, (১৮) “ঋবিশেষ্যসমা” (১৯) “উপপত্তিসমা”, (২০) “উপলব্ধিসমা”, (২১) “অনুপলব্ধিসমা”, (২২) “অনিত্যসমা”, (২৩) “নিত্যসমা” (২৪) “কার্য্যসমা”।

প্রতিবাদী যদি কোন একটি বিপরীত সাধর্ম্য মাত্র অথবা বৈধর্ম্যমাত্রকে গ্রহণ করিয়া তদ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মী বা পক্ষে তাহার সাধর্ম্ম্যের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম যথাক্রমে—“সাধর্ম্ম্যসন্না” ও “বৈধর্ম্ম্যসন্না” জাতি।

যেমন কোন বাদী প্রথমে “শব্দোহনিত্যঃ, কার্য্যত্বাদ্ ঘটবৎ”—ইত্যাদি ত্রায় প্রয়োগ করিয়া কার্য্যত্ব বা জগত্ত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে তখন প্রতিবাদী সত্ত্বের দ্বারা উহার খণ্ডন করিতে অশক্ত হইয়া যদি বলেন যে, শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্ব আছে, তদ্রূপ, আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বও আছে। কারণ, শব্দও আকাশের ত্রায় অমূর্ত্ত পদার্থ। তাহা হইলে নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্ব প্রযুক্ত শব্দও আকাশের ত্রায় নিত্য হউক ? ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্ব প্রযুক্ত শব্দ ঘটের ত্রায় অনিত্য হইবে, কিন্তু আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্ব প্রযুক্ত আকাশের ত্রায় নিত্য হইবে না,—এবিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্তস্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম “সাধর্ম্ম্যসন্না” জাতি।

এবং উক্তস্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্ব আছে, তদ্রূপ অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বও আছে। সুতরাং শব্দে যখন অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্যও আছে, তখন তৎপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য কেন হইবে না ? ঘটের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য হইবে, কিন্তু বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত নিত্য হইবে না,—এবিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম “বৈধর্ম্ম্যসন্না” জাতি।

পূর্ব্বোক্তস্থলে উক্ত দ্বিবিধ উত্তরই সত্ত্বের নহে। কারণ প্রতিবাদী শব্দে নিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করিতে আকাশের সাধর্ম্ম্য ও ঘটের বৈধর্ম্ম্য যে অমূর্ত্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে নিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাপ্তি নাই। অর্থাৎ অমূর্ত্ত পদার্থ হইলেই যে, উহা নিত্য হইবে, এমন নিয়ম নাই। কারণ রূপাদি বহু অমূর্ত্ত পদার্থ অনিত্য, সুতরাং অমূর্ত্তত্ব ধর্ম্ম, নিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাভিচারী। কিন্তু প্রতিবাদী ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র ঐ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বকে গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ দোষোদ্ভাবন করায় উহা অসত্ত্বের, পরন্তু উহা স্বব্যাঘাতক উত্তর।

কারণ, প্রতিবাদী ব্যাপ্তিশূন্য কোন সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্য মাত্রকে গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ আপত্তি করিলে তুল্যভাবে সেখানে বাদীও বলিতে পারেন যে, প্রতিবাদীর ঐ উত্তর আমার মতের দৃষক নহে। কারণ, অদৃষক বচনমাত্রের সাধর্ম্য যে বচনত্ব বা প্রমেয়ত্ব, তাহা প্রতিবাদীর উক্ত বচনেও থাকায় তৎপ্রযুক্ত অত্যাশ্রয় অদৃষক বচনের শ্রায় প্রতিবাদীর ঐ বচনও অদৃষক কেন হইবে না? তাহা হইলে প্রতিবাদীর ঐ উত্তর উক্তরূপে নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা কখনই সহ্যতর হইতে পারে না। এইরূপ অত্যাশ্রয় সমস্ত জাতিও তুল্যভাবে স্বব্যাঘাতক উত্তর হওয়ায় অসহ্যতর। তাই উদয়নাচার্য্য স্বব্যাঘাতক উত্তরত্বই জাতিমাত্রের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত “ছল” নামক অসহ্যতর স্বব্যাঘাতক নহে।

গৌতমোক্ত ঐ “জাতি” পদার্থের ব্যাখ্যায় বহু বক্তব্য আছে। পূর্বাচার্য্যগণ উহার ব্যাখ্যায় বহুহুম্বিচার করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত শাস্ত্রের হুম্বিচার বুঝিতেও উক্ত “জাতি” পদার্থের পরিজ্ঞান আবশ্যক হয়। যিনি গৌতমোক্ত “জল”, “বিতণ্ডা” ও “জাতি” এবং “নিগ্রহস্থানে”র বিশেষ পরিচয় জানেন না, তিনি শ্রীহর্ষের “খণ্ডনখাত্ত” প্রভৃতি গ্রন্থ বুঝিতেই পারেন না। কিন্তু পূর্বোক্ত “জাতি”তত্ত্ব সংক্ষেপে লিখিলে কিছুই বুঝা যায় না। সংক্ষেপের অনুরোধে বিস্তৃতরূপে উহার ব্যাখ্যা করাও এই গ্রন্থে সম্ভব নহে—এজন্য গৌতমোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার জাতির লক্ষণও উদাহরণাদি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মৎসম্পাদিত শ্রায়দর্শনের পঞ্চমখণ্ডে আমি ঐ বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিশেষ জিজ্ঞাসু তাহা প্রণিধান পূর্বক পাঠ করিবেন।

(১৪) নিগ্রহস্থান

নিগ্রহস্থানই গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের চরম পদার্থ। পূর্বোক্ত “জল” ও “বিতণ্ডা” নামক কথায় বাদী বা প্রতিবাদীর যে পরাজয়, তাহার নাম নিগ্রহ। পূর্বোক্ত “বাদ” নামক কথায় কাহারও জিগীষা না থাকায় পরাজয় রূপ নিগ্রহ নাই। কিন্তু তাহাতে বাদী বা প্রতিবাদীর বিবক্ষিত বিষয় প্রতিপাদন করিতে না পারাই নিগ্রহ। প্রাচীন শ্রাদ্ধাচার্য্য উদ্যোতকর ঐরূপ

নিগ্রহের নাম বলিয়াছেন, “খলীকার”। কিন্তু তিনি “খলীকার” নামে কোন নিগ্রহস্থান বলেন নাই। গৌতমও ঐ নামের কোন উল্লেখ করেন নাই।

পূর্বোক্ত পরাজয়রূপ নিগ্রহ এবং “বাদ”স্থলে খলীকাররূপ নিগ্রহের যাহা স্থান অর্থাৎ কারণ, তাহাকে বলে “নিগ্রহস্থান”। বাদী অথবা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিপরীত জ্ঞানরূপ ভ্রম এবং অনেকস্থলে অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতাই তাঁহাদিগের নিগ্রহস্থানের মূল। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—“বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিষ্চ নিগ্রহস্থানং” (১২।১৯)। বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, যদ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি অনুমিত হয়, তাহাকে বলে “নিগ্রহস্থান”, ইহাই গৌতমের উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। তন্মধ্যে বিপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলি “বিপ্রতিপত্তি” নামে এবং অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলি “অপ্রতিপত্তি” নামে কথিত হইয়াছে।

মহর্ষি গৌতম পরে গ্রায় দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে পূর্বোক্ত নিগ্রহ স্থানকে দ্বাবিংশতি প্রকারে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান যথা—

(১) প্রতিজ্ঞাহানি, (২) প্রতিজ্ঞাস্তর, (৩) প্রতিজ্ঞাবিরোধ, (৪) প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস, (৫) হেত্বস্তর, (৬) অর্থাস্তর, (৭) নিরর্থক, (৮) অবিজ্ঞাতার্থ, (৯) অপার্থক, (১০) অপ্রাপ্ত কাল, (১১) ন্যূন, (১২) অধিক, (১৩) পুনরুক্ত, (১৪) অননুভাষণ, (১৫) অজ্ঞান, (১৬) অপ্রতিভা, (১৭) বিক্ষেপ, (১৮) মতানুজ্ঞা, (১৯) পর্যানুযোজ্যোপেক্ষণ, (২০) নিরনুযোজ্যানুযোগ, (২১) অপসিদ্ধান্ত, (২২) হেত্বভাস।

বাদী বা প্রতিবাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাশয়ব প্রয়োগ পূর্বক নিজ পক্ষ স্থাপন করিয়া পরে তাঁহার প্রতিবাদীর প্রদর্শিত কোন দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া যদি তাঁহার পূর্বোক্ত পক্ষ প্রভৃতি যে কোন পদার্থ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার (১) “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়।

যেমন কোন বাদী প্রথমে “নদোহনিত্যঃ”—এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োগ করিয়া হেতু বাক্যাদির প্রয়োগ দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে পরে প্রতিবাদী সীমাংসক শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বাদীর

পূর্বোক্ত অল্পমানে “বাধ” দোষ সমর্থন করিলেন। তখন বাদী নৈয়ায়িক সেই দোষ খণ্ডন করিতে অশক্ত হইয়া পরে যদি বলেন—“পক্ষতোহ নিত্যঃ”। অর্থাৎ আমি শব্দকে পরিত্যাগ করিয়া পক্ষতকেই পক্ষ রূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই অনিত্যত্ব স্থাপন করিব,—তাহা হইলে উক্ত স্থলে সেই বাদীর “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহ স্থান হইবে। এইরূপ বাদী তাহার পূর্ব কথিত হেতু, দৃষ্টান্ত, সাধ্যধর্ম ও বিশেষণ প্রভৃতি যে কোন পদার্থের পরিত্যাগ করিলেও সেখানে তাহার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহ স্থান হইবে।

বাদী যদি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাহার পূর্ব কথিত হেতু ভিন্ন যে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার (২) “প্রতিজ্ঞাস্তম্” নামক নিগ্রহ স্থান হইবে।

যেমন বাদী মীমাংসক “শব্দো নিত্যঃ”—এই প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে নিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে,—ধ্বন্যাত্মক শব্দ যে অনিত্য ইহাতে সর্বসিদ্ধ, সুতরাং শব্দ মাত্রে নিত্যত্ব সাধন করা যায় না। নৈয়ায়িক ঐ কথা বলিয়া উক্তাল্পমানে অংশতঃ “বাধ” দোষের উদ্ভাবন করিলে তখন মীমাংসক যদি বলেন—“অস্ত বর্ণাত্মকঃ শব্দঃ পক্ষঃ”, অর্থাৎ আমি বর্ণাত্মক শব্দ মাত্রকেই পক্ষ রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই নিত্যত্ব সাধন করিব। উক্ত স্থলে বাদী মীমাংসক তাহার পূর্ব-গৃহীত শব্দরূপ পক্ষে বর্ণাত্মকত্ব রূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট করায় তাহার “প্রতিজ্ঞাস্তম্” নামক নিগ্রহ স্থান হইবে। এই রূপ উদাহরণ বা উপনয় বাক্যে ও পরে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে সেখানেও উক্ত “প্রতিজ্ঞাস্তম্” নামক নিগ্রহ স্থানই হইবে।

পূর্বোক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” স্থলে বাদী তাহার পূর্বোক্ত কোন পদার্থকে পরিত্যাগই করায় ফলে তাহার গৃহীত পক্ষেরই হানি হয়। কিন্তু “প্রতিজ্ঞাস্তম্” স্থলে বাদী তাহার পূর্বোক্ত কোন পদার্থের পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু তাহার কথিতহেতু ভিন্ন কোন পদার্থে অতিরিক্ত বিশেষণ মাত্র প্রবিষ্ট করেন। সুতরাং “প্রতিজ্ঞাহানি” হইতে “প্রতিজ্ঞাস্তম্”র উক্তরূপ ভেদ বা বিশেষ আছে। এখন শেষোক্ত নিগ্রহস্থানগুলির স্বরূপ মাত্রই সংক্ষেপে বলিব। তাহাদিগের উদাহরণ প্রদর্শন করা সম্ভব নহে।

বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞা ও হেতু যদি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে (৩) “**প্রতিজ্ঞাবিরোধ**” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিলে বাদী তাহার খণ্ডন করিতে অশক্ত হইয়া যদি নিজের প্রতিজ্ঞার্থ অস্বীকার করেন, অর্থাৎ পরে যদি বলেন যে, ‘আমি ইহা বলি নাই’, তাহা হইলে সেখানে তাহার (৪) “**প্রতিজ্ঞাসম্মান**” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে সেই দোষের উদ্ধারের জন্ত বাদী পরে যদি তাঁহার সেই হেতুতেই কোন বিশেষণ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (৫) “**হেতুস্তর**” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

পূর্বোক্ত “প্রতিজ্ঞাস্তর” স্থলে হেতু ভিন্ন পদার্থেই বিশেষণ প্রবিষ্ট হওয়ার উহা “হেতুস্তর” হইতে ভিন্ন।

বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিতে মধ্যে যদি কোন অসম্বন্ধার্থ বাক্য অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহাদিগের (৬) “**অর্থাস্তর**” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে যদি অর্থশূন্য অর্থাৎ যাহা কোন অর্থের বাচক নহে এমন শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহাদিগের (৭) “**নিব্বর্থক**” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী যদি এমন কোন বাক্য প্রয়োগ করেন যে, যাহা তিনি তিন বার বলিলেও অতি দুর্বোধার্থ বলিয়া মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, তাহা হইলে সেখানে বাদীর সেই বাক্য অবিজ্ঞাতার্থ বলিয়া তাঁহার (৮) “**অবিজ্ঞাতার্থ**” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

যে পদ সমূহ বা বাক্য সমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ থাকিলেও সমুদায়ের প্রতিপাদ্য অর্থ নাই, অর্থাৎ যে পদ সমূহ বা বাক্য সমূহ মিলিত হইয়া কোন বিশিষ্ট অর্থবোধ জন্মায় না, বাদী বা প্রতিবাদী তাদৃশ পদ সমূহ বা বাক্য সমূহের প্রয়োগ করিলে তাঁহাদিগের (৯) “**অপার্থক্য**” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্য অথবা অত্যন্ত বক্তব্যের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া যে কালে যাহা বক্তব্য, তৎপূর্বেই তাহা বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের (১০) “অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে নিজ সম্প্রদায় সম্মত অবয়বের মধ্যে যে কোন একটি অবয়ব ও নূন হইলে অর্থাৎ তাহার প্রয়োগ না করিলে তাঁহাদিগের (১১) “ন্যূন” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে নিম্নয়োজনে হেতু বাক্য বা উদাহরণ বাক্য একের অধিক বলিলে তাঁহাদিগের (১২) “অধিক” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী নিম্নয়োজনে কোন শব্দ বা অর্থের পুনরুক্তি করিলে (১৩) “পুনরুক্ত” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী প্রথমে নিষ্ক পক্ষ স্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী পরে মধ্যস্থগণের নিকটে বাদীর সেই সমস্ত বাক্যার্থ অথবা তন্মধ্যে তাহার খণ্ডনীয় পদার্থের অনুভাষণ করিয়া অর্থাৎ বাদী ইহা বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াই তাহার খণ্ডন করিবেন, ইহাই জল্প ও বিতণ্ডা স্থলে নিয়ম। কিন্তু বাদী প্রথমে তিনবার তাঁহার সমস্ত বাক্য বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ সেই বাক্যার্থ বুঝিলেও প্রতিবাদী যদি তাহার অনুভাষণ না করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৪) “অননুভাষণ” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী তাঁহার বক্তব্য তিনবার বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ বাদীর সেই বাক্যার্থ বুঝিলেও প্রতিবাদী যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৫) “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়া মধ্যস্থগণের নিকটে তাহার অনুভাষণ পর্যন্ত করিলেও পরে উত্তর কালে যদি তাহার উত্তরের ক্ষুণ্ণি বা জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৬) “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী যদি তখনই অথবা নিজ বক্তব্য কিছু বলিয়াই ভাবী পরাজয়ের সম্ভাবনায় কোন কার্য ব্যাসঙ্গ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ আমার বাড়ীতে অবশ্য কর্তব্য এমন কার্য আছে, এবে জন্ম এখনই আমার বাড়ী যাওয়া অত্যাৱশ্যক, পরে যথা বক্তব্য

বলিব,—এইরূপ কোন মিথ্যা বলিয়া আরও “কথা”র ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান। তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৭) “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

প্রতিবাদী যদি নিজ পক্ষে বাদীর প্রদর্শিত দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ নিজপক্ষে সেই দোষ মানিয়া লইয়াই বাদীর পক্ষেও তত্বল্য দোষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৮) “মতানুভ্রা” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহ স্থান প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রতিবাদী যদি সেই নিগ্রহ স্থানের উল্লেখ না করেন অর্থাৎ যে কোন কারণে তাহার উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে উহা সেখানে তাঁহার (১৯) “পর্য্যানুযোজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহ স্থান হয়। এই নিগ্রহ স্থান পরে মধ্যস্থই উদ্ভাবন করিবেন।

যাহা যেখানে বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া বাদী বা প্রতিবাদী, যদি অপরকে বলেন যে, আপনি এই নিগ্রহস্থান দ্বারা তিগৃহীত হইয়াছেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (২০) “নিব্বনুযোজ্যানুযোগ” নামক নিগ্রহস্থান হয়।

বাদী বা প্রতিবাদী কোন শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া নিজমত সমর্থন করিতে পরে যদি বাধ্য হইয়া সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (২১) “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়।

পূর্বে “সব্যভিচার” প্রভৃতি নামে পঞ্চবিধ হেত্বাভাস যেরূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত সেই সমস্ত (২২) “হেত্বাভাস” ও নিগ্রহস্থান। তাই মহর্ষি গৌতম ত্রায়দর্শনে সর্বশেষ সূত্র বলিয়াছেন—“হেত্বাভাসাশ্চ অযোক্তব্যঃ”।

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেক পূর্বাচার্য্য গৌতমের উক্ত চরম সূত্রে “চ” শব্দের দ্বারা আরও কোন কোন নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “তত্ত্বচিন্তামণি”র অসিদ্ধিগ্রন্থের দীপ্তিচীকার শেষে রবুনাথ শিরোমণিও উক্তসূত্রে “চ” শব্দের দ্বারা অতিরিক্ত নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণও “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান”

বিষয়ে বহু হৃদয়বিচার করিয়াছেন এবং তাঁহারা গৌতমোক্ত অনেক “জাতি” ও অনেক “নিগ্রহস্থান” স্বীকারই করেন নাই। পূর্বকালে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের সহিত গৌতম মতসমর্থক ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকগণের উক্ত বিষয়েও বহু হৃদয় বিচার হইয়াছে। উদ্যোতকর প্রভৃতি অনেক শ্রায়চাৰ্য্য নিজগ্ৰন্থে উক্ত বিষয়েও অনেক বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়া গৌতমমতের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে শ্রায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় সে বিষয়েও কিছু কিছু লিখিয়াছি।

পূর্বোক্ত দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে “অপসিদ্ধান্ত” ও “হেতু-ভাস”রূপ নিগ্রহস্থান, তত্ত্বনির্ণয়ার্থ “বাদ” কথাতেও উদ্ভাব্য। মতান্তরে আরও কোন কোন নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্য। কিন্তু “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক কথায় সর্বপ্রকার নিগ্রহস্থানই উদ্ভাব্য এবং তাহাতে প্রতিবাদীর জয়লাভের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত “ছল” ও “জাতি” নামক নানাপ্রকার অসহজতরেরও প্রয়োগ হইতে পারে। তাই মহর্ষি গৌতম পূর্বে “জল্পের” লক্ষণস্বরে বলিয়াছেন— “ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান—সাধনোপালম্বো জল্পঃ”। পূর্বে যথাস্থানে ইহা বলিয়াছি এবং স্থলবিশেষে যে, নিজের অপক তত্ত্বনিশ্চয়-রক্ষার্থ মুমুক্ষু ব্যক্তিরও “জল্প” ও “বিতণ্ডা” কর্তব্য হয়, এবিষয়েও গৌতমের কথা পূর্বে বলিয়াছি। সুতরাং গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় মুক্তিলাভে আবশ্যিক হয়, ইহা পূর্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—ইহা অনেকবার বলিয়াছি যে, গৌতমের মতেও সেই জ্ঞানদাতা পরমেশ্বরে পরাভক্তি ব্যতীত মুক্তির কারণ চরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার জন্মিতে পারে না। বহু জন্মের বহু সাধনার ফলে সর্বথা জিগীষামুক্ত হইয়া পরে শিশুর শ্রায় তাঁহারই শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকেই, আত্মনিবেদন করিলে তখন তাঁহারই পুণ্যম অল্পগ্রহে চরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু সাধনার অভাবে আমরা ক্ষণকালের জ্ঞানও তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিতে পারি না। তথাপি পূর্বপুরুষগণের শিক্ষায় বলি—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারুণ্যব্রহ্ম হেতবে ।

নিবেদয়ামি চাত্মানং স্তব্ধং গতিঃ পরমেশ্বর ।

শুদ্ধি পত্র

| পৃষ্ঠা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|--------|-------------------------|------------------------|
| ২ | কুর্ধ্যান্নিশ্রেয়সং | কুর্ধ্যান্নিশ্রেয়সং |
| ৪ | মৃতমশ্রুতে | মৃতমশ্রুতে |
| ৮ | প্রিরতমার | প্রিয়তমার |
| ১২ | করিতেছ | করিতেছে |
| ১৭ | উল্লেখ | উল্লেখ |
| ১৭ | বৃহদারণ্যক | বৃহদারণ্যক |
| ২২ | কহারও | কাহারও |
| ২২ | একেবার | একেবারে |
| ২২ | বিনিষ্ট | বিনষ্ট |
| ২৪ | পাশ্চাত্য | পাশ্চাত্য |
| ২৭ | থাকে | থাকে |
| ২৯ | আবাসবদয়ং যতঃ | আকাশবদয়ং যতঃ |
| ৩০ | বিষয়কে | বিষয়কে |
| ৩১ | বলিয়াছি ছিলেন | বলিয়াছিলেন |
| ৩৩ | হুংখের | হুংখের |
| ৩৮ | কখন ও অবশ্য | কখনও |
| ৩৯ | কম্বোন্ত্যক্তা | কামাংস্ত্যক্তা |
| ৪০ | স্বীকার্য, স্বীকার্য | স্বীকার্য |
| ৪৪ | আবার | আবার |
| ৪৭ | ফলান্ন বন্ধাতত্ত্বপত্তি | ফলান্নবন্ধাতত্ত্বপত্তি |
| ৪৯ | হ্যবেশোহপি | হ্যবশোহপি |
| ৫৩ | মধুরাং | মধুরাং |
| ৫৬ | সাক্ষাৎকারে জন্ত | সাক্ষাৎকারের জন্ত |
| ৫৬ | শ্রোব্যো | শ্রোতব্যো |
| ৫৮ | ব্যথ্যা | ব্যাথ্যা |
| ৫৮ | তঁাহাদিকে | তঁাহাদিগকে |

| পৃষ্ঠা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|--------|---------------------|----------------------|
| ৫৯ | স্বরূপ ত | স্বরূপ |
| ৬০ | পরা যায় | পারা যায় |
| ৬০ | অতিমত | অভিমত |
| ৬১ | প্রতিবেধঃ | প্রতিবেধঃ |
| ৬১ | যুগপজ্ | যুগপজ্ |
| ৭৫ | তদচিস্ত্য | তদচিস্ত্য |
| ৭৫ | কুতর্কেরই প্রতিষ্ঠা | কুতর্কেরই অপ্ৰতিষ্ঠা |
| ৭৭ | গুরু পরম্পরা | গুরু পরম্পরা |
| ৭৭ | একই সময় | একই সময়ে |
| ৭৯ | সংঘাত | সংঘাত |
| ৮৫ | ভেদভাব | ভেদভাব |
| ৮৯ | মধিগন্যতে | মধিগম্যতে |
| ৯৭ | তন্ত্বেহং | তন্ত্বেহং |
| ১০০ | ধাতু নিম্পন্ন | ধাতু নিম্পন্ন |
| ১০১ | পরমাণু যে অনিত্য | পরমাণু যে নিত্য |
| ১০১ | পরমাণুর নিত্য | পরমাণুর নিত্য |
| ১০৩ | ভিন্ন ভিন্ন | ভিন্ন ভিন্ন |
| ১০৩ | ভাই বলিয়াছেন | তাই বলিয়াছেন |
| ১০৫ | প্রবিষ্টদিত্যকরণেষু | প্রবিষ্টদিত্যকিরণেষু |
| ১০৬ | চরকসংহিতা | চরকসংহিতা |
| ১০৮ | দ্যাণুকের | দ্যাণুকের |
| ১১১ | উৎপত্তি | উৎপত্তি |
| ১১২ | উহা হৃদয় হয় না | উহা যে হৃদয়ই হয় |
| ১১৯ | জায়ন্তে | জায়ন্তে |
| ১২৫ | কিঞ্চিদন্তি | কিঞ্চিদন্তি |
| ১২৯ | কয়িছেন | করিয়াছেন |
| ১৩৯ | প্রভু যেমন | প্রভু যেমন |

| পৃষ্ঠা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|--------|--------------------|-------------------|
| ১৪২ | কঃ প্রাণাৎ | কঃ প্রাণ্যাৎ |
| ১৫২ | এবং (৪) | এবং (৩) |
| ১৫৩ | কবেন | করেন |
| ১৫৪ | প্রত্যক | প্রত্যক্ষ |
| ১৫৫ | প্রত্যকের | প্রত্যক্ষের |
| ১৫৬ | দীর্ঘিতিকার | দীর্ঘিতিকার |
| ১৬০ | পদার্থের দ্বার | পদার্থের দ্বারা |
| ১৭৫ | সকল | সফল |
| ১৭৫ | সকল | সফল |
| ১৭৫ | প্রমাণ্য | প্রমাণ |
| ১৭৬ | অপৌরুষেয় | অপৌরুষেয় |
| ১৮৬ | সেই অনুপত্তি | সেই অনুপপত্তি |
| ১৯১ | প্রমাণত্ব | প্রমাণত্ব |
| ২০৯ | ব্রহ্মণোহি | ব্রহ্মণোহি |
| ২১২ | তল্লিঙ্গ | তল্লিঙ্গ |
| ২১৬ | উপাদান | উপাদান |
| ২৩১ | পরমহংস | পরম মহৎ |
| ২৩১ | ইত্যাদী | ইত্যাদৌ |
| ২৪৪ | অব্যবস্থা | অব্যবস্থা |
| ২৫৭ | ধূমবাংশচায়াং | ধূমবাংশচায়াং |
| ২৫৭ | জন্মে | জন্মে |
| ২৫৮ | “অনিত্যঃ শব্দঃ” :— | “অনিত্যঃ শব্দঃ”— |
| ২৬৪ | সামগ্র্যাদিনিরূপণ | সামগ্র্যাদিনিরূপণ |
| ২৬৫ | তীহার | তীহার |
| ৩০০ | সর্গ | স্বর্গ |
| ৩০১ | সন্ধিগ্ন | সন্ধিগ্ন |
| ৩০১ | সংস্কৃত | সংস্কৃত |